দুই বাঙালি, এক বাঙালি

অরুণ সেন

অবভাস

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক পার্থ চক্রবর্তী, *অবভাস*, গড়িয়া স্টেশন রোড, কলকাতা-৮৪। ডিটিপি রতন বণিক, জেনিথ গ্রাফিক্স, কলকাতা-৯, মুদ্রক ডি. এন্ড পি. গ্রাফিক্স প্রা. লি., গঙ্গানগর, কলকাতা-১৩২।

উৎসর্গ

সন্‌জীদা খাতুন

যাঁর গানে শ্রোতার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের আত্মপরিচয়

ওয়াহিদুল হক

বাংলাদেশকে চেনায় যিনি আমার প্রথম দিশারি

সূ চি প ত্র

বাংলাদেশ বিষয়ে লেখকের অন্যান্য বই

সেলিম আল দীন/নাট্যকারের স্বদেশ ও সমগ্র

বাংলা বই বাংলাদেশের বই : দু খণ্ড

সম্পাদনা : একক বা যুগ্ম ভাবে

মোহাম্মদ রফিকের কবিতা

ধ্বংসস্তূপে আলো

বাংলাদেশের নির্বাচিত উপন্যাস সংকলন : দু খণ্ড

বাঙালি ও বাংলাদেশ/বাংলাদেশের প্রবন্ধ সংকলন

দেশে বাংলাদেশে/বাঙালির আত্মসত্তা নির্মাণ

ভূমিকা

পাকিস্তানের বন্দীদশা ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশের যখন জন্ম হচ্ছিল, সেই জন্মযন্ত্রণার এবং জন্মের গৌরবের কোনো একভাবে ভাগীদার তো ছিলাম প্রতিবেশী আমরাও, পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা। নবজাতকের সুসংবাদ-দুঃসংবাদ সবই কানে পৌঁছোচ্ছিল। কিন্তু শুধু কানে শোনা নয়, চোখের দেখা সম্ভব হল ১৯৮৭-তে, তার জন্মের ষোলো বছর পরে। ইতিমধ্যে অনেক ওলোটপালোট হয়ে গেছে। যে-প্রত্যাশা জন্মকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল, তার অনেকটাই ধসে গেছে। প্রতিনিয়ত সেই দেশ সংকটের মুখোমুখি। তবু, তখনও, সেই নতুন দেশে পা দিয়ে যেটুকু দেখতে পাই তাতেই বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। বাঙালির ভিন্ন পরিচয়ের গরিমা সেখানে কখনোই লুপ্ত হয়েছে বলা যায় কি? বাংলাদেশের প্রকৃতি-পরিবেশ, তার নতুন মানুষ এবং তার সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ চেনাজানার এই অভিজ্ঞতাই আমার সামান্য লেখালেখিতে প্রকাশ পেতে থাকে সে-সময় থেকেই। সেই মুগ্ধতা যে অস্থায়ী ছিল না, তার প্রমাণ বারবার আমাকে যেতেই হয় আমার এই দ্বিতীয় স্বদেশে। তবে শুধু মুগ্ধতা বললে ভুল হবে, বাংলাদেশের মানুষের অনেক দুর্বলতা ও ক্ষয় সম্পর্কেও প্রায় গোড়া থেকেই ওয়াকিবহাল হতেও হয়—আমার যাওয়া-আসার সীমার মধ্যেই তাকে বেড়ে যেতেও দেখি। কিন্তু প্রীতির উৎস তো শুধু সুকৃতিই নয়, তার সামগ্রিক—ভাষার ও জাতিত্বের বন্ধনে যে-আত্মীয়তা সত্য, তারই সামগ্রিক। সেখানে পিছিয়ে-পড়া বা ব্যর্থতারও সমব্যথী হতে হয়।

এভাবেই বাংলাদেশের জমিতে নবজাগ্রত এই হিন্দু-মুসলমানকেই প্রথম চিনতে পারি। কিন্তু আমি যতদিনে পৌঁছেছি, ততদিনে মুসলমান জনগণের বহুলতা এত বেশি প্রতিষ্ঠিত যে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মুসলমানের ব্যক্তিগত, তার পরিবার-পরিজন কিংবা তার ভাবনার সঙ্গে অন্তরঙ্গতাটাই আমার বড়ো উপার্জন। তাঁরা সবাই যে একরকমের নন, তা বুঝতেও আমার দেরি হয় না। আমার বন্ধুদের বাইরেও যে একটা বিরাট জগৎ আছে, তার সঙ্গে সার্বিক যোগাযোগ ঘটেছে এমন বলা যাবে না। তবু, সেখানকার গোঁড়া মৌলবাদী মুসলমানদের রক্তচক্ষু যেমন টের পেয়েছি, তাদের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও বদ্ধতা কীভাবে ছড়ানো আছে সারা দেশে তা যেমন

দেখেছি—তেমনি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, সুশীল সমাজের নির্দ্বন্দ্ব অংশী, সংস্কৃতিবান মুসলিম পরিবারের সদস্যদের কাছাকাছি থাকার সুযোগও পেয়েছি। সংখ্যাগত অনুপাত বিচার করতে বসিনি। বলাই বাহুল্য, প্রগতিশীলেরা যতই সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হোন, সংখ্যায় নিতান্তই লঘু। তাই তো ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে তাদের এগোনোটা বড়োই মন্থর, মাঝে-মাঝেই স্তব্ধ, হয়তো পশ্চাৎমুখীও কখনো। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাটাও যেন সময়-সময় অনিশ্চিত। কিন্তু এই বহিরঙ্গের মধ্যেই অল্পমাত্র পুরোযাত্রীদের অস্তিত্ব, এবং যত ক্ষীণভাবেই হোক, পরিবর্তন বা অগ্রগতির একটা গোপন অভ্যন্তরীণ গতি আমি অন্তত অনুভব করেছি, এমনকী ঘোরতর দুঃসময়েও। সব মিলিয়ে এই বাংলাদেশ, তার মানুষ ও তার সংস্কৃতির সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে-করতেই ওখানে যাওয়া, এই বোধ এবং তা নিয়েই লেখালিখি। এপারের বাঙালি হিশেবে ওপারের বাঙালির রূপকে চিনতে চাওয়া, আর তারই মধ্যে অপার বাংলার স্বরূপকে বুঝে নেওয়া।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এইবাংলা ওইবাংলা-সম্পর্কে আবেগ প্রকাশে যতটা অভ্যস্ত, তার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জানাচেনার উদ্‌যোগ নিতে প্রায় ততটাই নিষ্ক্রিয়। অথচ সেই জানাটাই তো সবচেয়ে জরুরি। এই কারণেই বাংলাদেশ-সম্পর্কে এ-দেশের আগ্রহী মানুষের কাছে তথ্য ও অভিজ্ঞতা হাজির করাই ছিল সে-সময়ের লেখাগুলির লক্ষ্য বা দায়। নজর ছিল আবেগ বা তারিফের যেটুকু প্রকাশ ঘটবে তার যেন ভিত্তি থাকে। সমালোচনা বা অভিযোগের যেটুকু স্পর্শ থাকবে তা যেন যুক্তিসহ হয়। বাংলাদেশ-সম্পর্কে অভিজ্ঞতার চারদিকই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু অনেকগুলি দিকই যে হয়েছে তা হয়তো দেখা যাবে। তাই, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ও বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধগুলিতে যে ভিন্ন-ভিন্ন প্রসঙ্গ আছে, তাদের কয়েকটি গুচ্ছে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যে-বাঙালিয়ানার ওপর ভর করে ওপারের বাঙালির মিল-অমিলের জগৎকে দেখতে যাওয়া, তার তত্ত্ববিশ্ব ও ইতিহাসের এক-একটি জরুরি প্রশ্ন এসেছে প্রথম গুচ্ছে—তা সে বাঙালি মুসলমানের জাগরণই হোক, কিংবা ভাষাদ্বন্দ্ব, কিংবা মুক্তিযুদ্ধ, কিংবা সাম্প্রদায়িকতা। পরের গুচ্ছগুলিতে আছে বাংলাদেশের মানুষের স্বভাবের ও সংস্কৃতির নানা সাম্প্রতিক পরিচয়। তা হতে পারে যেমন জনসংস্কৃতির অভিব্যক্তি (একুশের অনুষ্ঠান, নববর্ষের উৎসব, বইমেলা ইত্যাদি), তেমনি উঁচুতলার সংস্কৃতির স্বকীয়তা ও সার্থকতা (সাহিত্য, শিল্পকলা, গান, নাটক)। আবার কোনো রচনাগুচ্ছে ব্যক্তিগত অবলোকন ও স্মৃতি ভ্রমণকাহিনীর আদল নিয়ে এগোয়। আর একেবারে শেষে ফিরে আসা সম-এ—দুই বাঙালি ও এক বাঙালির অর্থ-অর্থান্তরে।

এই অভিজ্ঞতাগুলোই লেখা হয়েছিল কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। সে-সময়ে 'প্রতিক্ষণ'-এর সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে সেখানেই সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া 'পরিচয়', 'বিতর্কিকা', 'অনুষ্টুপ', 'অবভাস', 'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমণ' ও 'অন্তঃসার'-এ। দৈনিক 'আজকাল' ও 'প্রতিদিন'-এও। একটি লেখা পঠিত হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের আলোচনাচক্রে। বিভিন্ন সময়ে লেখা এবং বিষয়গুলিও অনেক সময়ই পরস্পর সম্পর্কিত। তাই এদের একজায়গায় সংকলিত করার ফলে কোথাও-কোথাও যদি ভাব ও ভাষার পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে, আশা করি তা ক্ষমার্হ হবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া আমি বড়োসড়ো কোনো পরিমার্জনা করিনি, কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে চেনাপরিচয়ে একজন পশ্চিমবঙ্গবাসীর অনুভবই উন্মোচিত হোক স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায়, তা-ই চেয়েছি। সে-ক্ষেত্রে বিষয়-অনুসারে সাজানো হলেও, লেখার নীচের রচনাকাল অতি অবশ্যই দ্রষ্টব্য।

এই লেখাগুলির সঙ্গে চিন্তা ও আবেগের আদানপ্রদানে যুক্ত ছিলেন দুই বাংলার সমবয়সী ও বয়ঃকনিষ্ঠ অনেক বন্ধুই—তাঁদের কথা আজ খুবই মনে হচ্ছে। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় এতজন যে আলাদা করে উল্লেখ করা প্রায় অসম্ভব। তবু বলতেই হয়, শিল্পধারা-বিষয়ক আলোচনাটিতে আবুল হাসনাত ও রেজাউল করিম সুমনের এবং গানের আলোচনাটিতে শান্তা সেনের বেশ কিছু পরামর্শ আমি নিয়েছি।

নববর্ষের মিছিল ও রমনার গানের অনুষ্ঠান, এই দুটি ছবির আলোকচিত্রী তরুণ কর্মকার, এবং 'নূরুলদীনের সারাজীবন' ও 'যৈবতী কন্যার মন' নাটকাভিনয়ের ছবি দুটির আলোকচিত্রী যথাক্রমে অসীম পাল ও নিমাই ঘোষ ('প্রতিক্ষণ'-এর সৌজন্যে)। 'বিষাদ সিন্ধু'-র ছবিটি সৈয়দ জামিল আহমেদের 'ইন প্রেইজ অব নিরঞ্জন/ইসলাম, থিয়েটার অ্যান্ড বাংলাদেশ' বই থেকে নেওয়া (বাংলাদেশের 'লোসাউক'-এর সৌজন্যে)।

আমি যে বানান মূল লেখায় অনুসরণ করেছি, উদ্ধৃতাংশে সেই বানানই ব্যবহৃত হয়েছে—যদি না সেই লেখকের ভাষারীতির পক্ষে তা অপরিহার্য হয়।

অবভাস আমার এই ছড়ানো প্রবন্ধগুলিকে একসঙ্গে একটি বইতে প্রকাশ করার ব্যাপারে যে-উৎসাহ দেখিয়েছে, তা আমার কাছে অবিস্মরণীয়।

অরুণ সেন

বাঙালির আত্মপরিচয় : উনিশশো পাঁচ থেকে একাত্তর

বলা বাহুল্য, বাঙালির পরিচয় এবং বাঙালির আত্মপরিচয় এক বস্তু নয়। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক সত্তার উৎস, বাঙালির জীবনযাপন ও তার উপকরণ, বাঙালির আবেগ ও কল্পনার নিজস্ব ধরণ (যার পেছনে আছে বাংলার ভূগোল, প্রকৃতি, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি অনেক কিছুই), সর্বোপরি বাঙালির ভাষা—এ সবের মধ্য দিয়েই তো তার হাজার বছরের ইতিহাস। পরে দেখব, বিবেচ্য এমনকী বাঙালির ধর্মও। কারণ, যাই বলি না কেন, বাঙালি হিন্দু সর্বভারতীয় হিন্দু থেকে আলাদা, বাঙালি মুসলমান বিশ্বের অন্য জায়গার মুসলমান থেকে আলাদা। বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তাই প্রভূত অমিল সত্ত্বেও আছে গভীরের এক মিল। তারই নাম বাঙালির পরিচয় বা চরিত্র। কিন্তু সেই পরিচয় থাকা এক জিনিশ, আর তাকে চেনা আরেক। বাঙালির আত্মপরিচয়ের সূচনা তখনই, যখন এই পরিচয়ের মধ্যে নানা দিক থেকে, নিজের ভেতর থেকেও, বাধা আসে, সমস্যা ও সংকট তৈরি হয়। নিজের পরিচয় সম্পর্কে বাঙালি সচেতন হয়ে ওঠে।

একেবারে গোড়ার ইতিহাস বাদ দিলে বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের প্রথম সংযোগেই বাঙালি জাতির উত্থান ও বিকাশ, যদিও হয়তো উভয়ের ঐক্য ও বিরোধের একটা দ্বৈত সম্পর্ক প্রথম থেকেই ছিল। সমন্বয়েরও একটা বড়ো দিকই ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। বাঙালি হিন্দুরা তুর্কি-আক্রমণের পর থেকেই আরবি-ফারসিকে অনায়াসে বাংলায় গ্রহণ করতে থাকে। আর বাঙালি মুসলমানেরা বাংলাতেই (কখনো হয়তো আরবি-ফারসির ব্যাপক মিশেল থাকে তাতে কিন্তু সেটা বাংলাই) বহু উল্লেখযোগ্য লেখা লেখেন প্রাক-ব্রিটিশ মধ্যযুগে।

অবশ্য বাঙালি মুসলমানের ওপর আরবি-ফারসি উপাদান ও ভাষার সূত্রে বাইরের একটা চাপ বরাবরই ছিল, কিন্তু বেশ কয়েকজন বাঙালি মুসলমান কবি তাকে অগ্রাহ্য করে মধ্যযুগেই বাংলার সপক্ষে সোচ্চার হন। ষোড়শ শতকের দুই কবি সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদ 'দেশী ভাষা' ও 'হিন্দুয়ানি' অক্ষরে পরিচিত বাংলা সম্পর্কে সমকালীন মুসলিম সমাজের অবজ্ঞার প্রতিবাদ করেন। হাজী মুহম্মদ

লেখেন : "দেশী ভাষা দেখি মনে না করিও ঘিন।" সপ্তদশ শতকের শেখ মুত্তালিব আরো স্পষ্ট : "আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ। তেকারণে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ।" আর তখনই কঠোরতর উক্তি আবদুল হাকিমের : "যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।। দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়। নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়।। মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি। দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।"[১] বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রাচীনতম নিদর্শন হিশেবে এই বাঙালি মুসলমান কবিদের ভাষা-সচেতনতাকে তুলে ধরা যায়।

ইংরেজ-শাসনকালে ইংরেজি-শিক্ষা এবং ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষার পরিণামে বাঙালির আত্মপরিচয়ের সমস্যা আবার একটা নতুন মোড় নিল। বাঙালি দরিদ্র মুসলমানেরা যে কারণেই হোক সেই শিক্ষা থেকে দূরে সরে ছিল। আর শহরের বাঙালি হিন্দুরা কেউ-কেউ এতই কাছে ঘেঁষল যে প্রায় 'সাহেব' বনে উঠতে চাইল। যারা চাইল না, তারাও ইংরেজি-শিক্ষাকে বর্জন করেনি, বরং উনিশ শতক থেকেই শুরু হল শহুরে ইংরেজি-জানা বাঙালি হিন্দুদের নতুন বাংলা লেখালেখি। শিক্ষিত বলতে ক্রমশই বোঝাল ইংরেজি-শিক্ষিত মানুষকে। বাঙালি মুসলমানেরা তো কার্যত কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেনি তখন, অথবা যারা করেছে তারা বানিয়েছে মুসলমানি বাংলা বলে একটা বস্তু। গ্রামের হিন্দুরাও বাংলা ছাড়া কিছুই জানে না। গ্রামের ইংরেজি-অজ্ঞ হিন্দু-মুসলমান ও শহরের ইংরেজি-জানা হিন্দুদের মধ্যে ব্যবধান তখন তাই দুস্তর। আর তার ফলে হিন্দুদের নিজেদের ভেতর এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে একটা বিচ্ছেদ রইলই, শুধু ভাষার ব্যাপারে নয়, সংস্কৃতির অন্য ক্ষেত্রেও। বাঙালি-পরিচয় নিয়ে আত্মসচেতনতার কথাই ওঠে না মূলত এই অবজ্ঞাত অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের মধ্যে। বাঙালির আত্মপরিচয় বলতে শিক্ষিত শহুরে হিন্দুরই আত্মপরিচয়। মুসলমান সম্পর্কে ও গ্রামের নিম্নবর্ণ হিন্দু সম্পর্কে অপরিসীম অজ্ঞতা ও উপেক্ষাই তাদের।

অবশ্য নিজেদের সীমিত পরিধিতেও শিক্ষিত বাঙালির সমস্যা যে খুব আলোচিত হত তা নয়। তখনও ভারতীয়-পরিচয় ও বাঙালি-পরিচয় ছিল মূলত অঙ্গাঙ্গি। উনিশ শতকে বাঙালি শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক ঘটত প্রধানত শিক্ষা ও সমাজকে কেন্দ্র করে, তাতে বাঙালির সমস্যা পৃথকভাবে তেমন উঠত না—বোধহয় একমাত্র বেথুন সোসাইটিতে ছাড়া। সেখানে "অধিকাংশ আলোচনাই বাংলা দেশের সমস্যা নিয়ে করা হত।"[২]

বাঙালির স্বতন্ত্র পরিচয় এবং আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্বমুখর স্বভাব ভালোভালে টের পাওয়া গেল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে। ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির

প্রশ্রয় নেই জেনেও তিনিই প্রথম বাংলা উপন্যাস লিখলেন। 'বঙ্গদর্শন'-এর পাতায় বাঙালির ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ভাষা নিয়ে—সে যুগের জ্ঞানের পরিসীমায়—আলোচনা করলেন প্রবল দায়বোধে। উনিশ শতকের চিন্তাভাবনার যে ক্রম-পরিণতি বাঙালির জাতীয়তাবোধে তার সাক্ষ্য পাওয়া গেল। বাঙালির উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে তিনি যেমন বাঙালি মুসলমানের কথা বলতে ভোলেননি, তেমনি সেই সঙ্গে বাঙালির আত্মপরিচয় প্রত্যাখ্যানের ও সাহেবিয়ানার সেই আবহাওয়ায় তাঁর তীব্র শ্লেষ ফুটে উঠেছিল 'লোকরহস্য' গ্রন্থে "উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙালি বাবু" আর "তস্য ভার্যা" কিংবা রামবাবু-শ্যামবাবু আর পর্দার আড়ালে থাকা রামবাবুর "পাড়াগেঁয়ে" স্ত্রী-র নাট্য-কথোপকথনে। ভাষা-পরিচয় যখন অনিশ্চিত, তখনই তো তার জাতি-পরিচয়ের সংকট—বঙ্কিমচন্দ্র তারই মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের প্রকল্পে, তাঁর নিজের ভাবনার অবয়ব যাই হোক, বাঙালির জাতীয়তার একটা পরিণতিই দেখা দিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের দিকে।

এবং এই জাতীয়তাবোধ উনিশ শতকের শেষে ক্রমশ টেনে নিয়ে গেল হিন্দুধর্মেব পুনরুত্থানের দিকে। সর্বভারতীয় জাতীয়তা, বাঙালি জাতীয়তা ও হিন্দুত্ব, এ সবেরই মিশ্রণ যেন সে-সময়ের 'হিন্দুমেলা'য়। এই জাতীয়তার বোধে মুসলমানদের কোনো স্থান ছিল না—যারা এতদিন ইংরেজি-শিক্ষা ও হিন্দু-সান্নিধ্য বর্জন করে প্রায় আড়ালে চলে গিয়েছিল, তারাও ওয়াহবি-আন্দোলনের গোঁড়ামির প্রভাবে সাম্প্রদায়িকভাবে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ-আমলের আধুনিকতায় বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরেই রইল, যদিও ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই। মূলত যা ঘটতে থাকলে তা এই : বাঙালি-পরিচয় আর হিন্দু-পরিচয়ের সমীকরণ এবং বাঙালি-পরিচয় আর মুসলমান-পরিচয়ের বিচ্ছিন্নতা। উনিশ শতকেই যা শুরু হয়েছিল, বিশ শতকে তা বেড়েই গেল।

২

এই পটভূমিতেই বিশ শতকের গোড়ায় পরিকল্পিত ও ঘোষিত হল বঙ্গভঙ্গ। ইংরেজ-শাসকদের কাছ থেকে যুক্তি হিশেবে মূলত হাজির করা হয়েছিল প্রশাসনিক সুবিধা-অসুবিধা। কিন্তু, যেহেতু মুসলমান-প্রধান এলাকাকে বিযুক্ত করে ভিন্ন প্রদেশ গড়া হয়েছিল, তাই অনেকেই বঙ্গভঙ্গের পেছনে ইংরেজদের যে মতলব আছে বলে মনে করেছেন তা হল এই : বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদের একটা ঝোঁক, সে-সময়ে যতই ক্ষীণভাবে হোক, আত্মনিয়ন্ত্রণের ঐক্যবদ্ধ ও সম্ভাবনাময় শক্তি অর্জনের দিকে—তাই বাংলাকে যদি টুকরো করে দেওয়া যায়, এবং বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি

মুসলমানদের মধ্যে যে দূরত্ব ইতিমধ্যেই আছে, তাকে আরো প্রকট করা হয়, তবে শাসকেরা 'নিরাপদ' হবে।

প্রথমে কিন্তু ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ যা ভেবেছিল তা ঘটেনি। হিন্দু-মুসলমান একই সঙ্গে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিল। একই ভূখণ্ডের মানুষ হিশেবে এই সংহতির বোধ যে খানিকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হবে তা স্বাভাবিক। বহিরঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের বিভিন্নতা যা-ই থাকুক, প্রতিবেশিত্বের একটা সত্য তো ছিলই। প্রথমাবস্থায় স্বদেশকে এভাবে খণ্ডিত হতে দেখে আপামর মানুষই তাই বেদনা অনুভব করেছে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে তীব্র আলোড়ন তা হয়তো প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু কলকাতাকে ছাড়িয়ে পূর্ববঙ্গেও যে তুলনীয় প্রতিবাদ ঘটবে তা বোধহয় ভাবা হয়নি। বস্তুত বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত যখন প্রথম করা হয়, তখনই পূর্ববঙ্গে যে বিপুল-সংখ্যক হিন্দু সে-সময়েও বাস করত তারা তো বটেই, সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের কাছ থেকেও সম্মিলিতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তুমুল প্রতিবাদ শোনা গেছে।[৩]

কিন্তু অল্প কিছুকালের মধ্যেই দ্রুত এই চিত্রটি পালটে যায়। বিশেষ করে বঙ্গ-ভঙ্গের পরে নতুন প্রদেশের গঠন ও লক্ষ্য কী হবে, সে-সম্পর্কে যখন শিক্ষিত মুসলমানেরা জানতে পারেন এবং ইংরেজ-শাসকদের এই 'শুভ' পরিকল্পনা সাধারণ মুসলমানদের জানাতে পারেন। অবশ্য সাধারণ মুসলমান, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বললেও কম বলা হয়, তারা তো বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে কখনোই মাথা ঘামায়নি। (বস্তুত কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত হিন্দু বাঙালির নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনে দরিদ্র অশিক্ষিত হিন্দুরাই বা কতটা যুক্ত ছিল?) কিন্তু মুসলমান নেতারা অধিকাংশই বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মতামত প্রকাশ করতে থাকেন—বিশাল জনসভা ও মিছিল করে, হিন্দুবিরোধী উত্তেজক পুস্তিকা ও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। একটু অবাকই লাগে : ভাষা ও ভূখণ্ডের বন্ধন কি এত তাড়াতাড়ি শিথিল হয়ে গেল? ইংরেজদের অভিপ্রায় সম্পর্কে যে-সন্দেহ তা-ই ঠিক প্রমাণিত হল?

সত্যি বলতে কী, প্রথম পর্বে পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ প্রতিবাদের যে-কথা আমরা শুনি, তা বস্তুত পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দু জমিদার ও হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর অংশগ্রহণে ও নেতৃত্বে। কোনো-কোনো মুসলমান জমিদার ও স্বল্পসংখ্যক মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত (প্রধানত শহরকেন্দ্রিক) তাদেরই অনুপ্রেরণায় এই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে বা বয়কট-স্বদেশী আন্দোলনে সোৎসাহে যোগ দিয়েছিল। কোনো-কোনো জায়গায় একই কারণে সাধারণ মুসলমানেরাও তাতে শামিল হয়েছিল, এই মাত্র। কিন্তু কখনো মুসলমান সভাপতি ও বক্তা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের এই সভাগুলি যে মূলত হিন্দুপ্রধান ও হিন্দুপরিচালিত, তা সে-সময়ের পত্রপত্রিকার বিবরণ থেকে বোঝা যায়।[৪]

তবে এটা সবটাই সত্য তা নয়। এমন শিক্ষিত মুসলমানের কথাও আমরা জানি, যাঁরা এই পরিবর্তমান অবস্থাতেও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন, এমন সভাও ডাকা হয়েছে যেখানে মুসলমান বক্তারা অখণ্ড বঙ্গের পক্ষে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। 'দি মুসলমান' পত্রিকার পাতা ওলটালে টের পাওয়া যায় এরকমই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে সম্পাদকীয়তে বা পরিবেশিত সংবাদে। 'স্বদেশী বয়কটে'র 'শুভদিন' হিশেবে বঙ্গভঙ্গের বার্ষিকীতে শোভাযাত্রা, সভা, রাখিবন্ধন ইত্যাদিও পালিত হয়েছে ১৯০৭-এ ফরিদপুরে পাবনায় বরিশালে মাদারিপুরে রংপুরে খুলনায়, কিংবা ১৯০৮-এ পাবনায় ও ময়মনসিংহে। অবশ্য এই আয়োজনগুলির পেছনেও হিন্দুদের উপস্থিতি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু 'মহামেডান প্রোটেস্ট' বা 'মুসলমানের প্রতিবাদ'টাও স্পষ্ট।[৫]

কিন্তু পুরো ছবিটা দেখলে এ-সবকেই নিতান্ত ব্যতিক্রম বলে মনে হবে। ইতিমধ্যেই বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে বেশির ভাগ মুসলিম নেতারা ও তাঁদের প্রভাবে চালিত হতে পারে এমন ব্যাপকতর মুসলিম জনগণ একত্র হয়েছে। তাদের মধ্যে যে-স্বাতন্ত্র্যের একটা চাপ সবসময়ই কমবেশি ছিল তাকে বাড়িয়ে তুলেছে, যতই সংখ্যাল্প হোক, আগন্তুক অবাঙালি মুসলমান অভিজাতদের মন্ত্রণা ও প্ররোচনা। যে বাঙালি মুসলমান আরবি-ফারসি জানে না, ইসলামের কোনো জ্ঞানই নেই, সে-ও প্রচারের ফলে আরবি-ফারসি বা অজানা ইসলামি প্রথা সম্পর্কে সম্ভ্রম ও আনুগত্য তৈরি করেছে। বাঙালি মুসলমানদের সর্বাঙ্গ থেকে বাঙালি-পরিচয় খসিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছে। "মিথ্যার জাল" তৈরি করে "প্রমাণ" করতে চেয়েছে তুর্কি-মোঘল শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব।[৬] রাজনীতিতেও এ-সময়ে মুসলিম লীগের জন্ম (১৯০৬) এই মনোভাবকে শক্ত জমি দিয়েছে। বঙ্গভঙ্গের সমর্থন হয়েছে তারই একটি প্রধান কার্যক্রম।

অবশ্য মুসলমানদের এই প্রতিক্রিয়ার পেছনে হিন্দুদের ভূমিকাকেও দায়ী করা যায়। কারণ, স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাতেই আমরা দেখেছি, যতই হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির কথা বলা হোক, কলকাতা-কেন্দ্রিক বয়কট বা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচিতে এমন কিছু হিন্দুদের ধর্মীয় আচারের যোগ ঘটতে থাকে য়া হয়তো ওই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করেছে, কিন্তু তাতে আন্দোলনের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রও ক্ষুণ্ন হয়েছে। ১৯০৫ সালেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কীর্তি 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'য় যে 'লক্ষ্মী'র কথা বলা হয়েছে, তিনি অবশ্যই "বাংলার লক্ষ্মী", যুগপৎ হিন্দু ও মুসলমানের লক্ষ্মী। কিন্তু বাংলার লক্ষ্মী যখন "বাঙালিকে দয়া করে" কালীঘাটের "মা-কালীতে" আবির্ভূত হন, এবং বিলেতি দ্রব্য বর্জনের সঙ্গে-সঙ্গে অরন্ধন, ঘট-

স্থাপন, সিঁদুর-ধারণ, শঙ্খ-বাদন, হরীতকী ও সুপারি হাতে ব্রতকথা শোনার নির্দেশ আসে, তখন হিন্দুত্ববাদী প্রবণতাকে অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ক্রমশ দেখি, স্বদেশী আন্দোলনের একাংশ বিপ্লবী কর্মসূচির দিকে গড়ায় স্পষ্টত এই ধর্মীয় উচ্চারণ নিয়েই। রবীন্দ্রনাথ যে-আত্মশক্তির সাধনার সঙ্গে জড়িয়ে ওই আন্দোলনকে দেখেছিলেন, এমনকী তাঁর সেই পথের পথিকেরাও অভিযুক্ত হয়েছেন ধর্মীয় নির্ভরতা বা আনুগত্যের জন্য—যদিও আমরা জানি, স্বদেশী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ উপার্জন রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের ভাবনাই, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সংসর্গ বা বৈপ্লবিক লিপ্ততা কোনোটাই ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে তাই অনেকসময়ই কিছুটা আড়ালেই থাকতে হয়েছে। আর মূল ধারার আবেগ হিন্দুধর্মের অনুষঙ্গবাহী উপমায় উল্লেখে বাচনে কিংবা বৈপ্লবিক রাজনীতির অকাল তীব্রতায় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে এতটাই ভরপুর থেকেছে যে, আন্দোলন-বিরোধীদের সুবিধাই হয়েছে এই আন্দোলনকে হিন্দুত্বের বা বিপ্লববাদের তকমা পরানোর। শাসক-ইংরেজদের স্বার্থ ও হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ধর্মীয় বা বৈপ্লবিক এই ঝোঁক এক জায়গায় এসে মিলেছিল এবং নষ্ট করে দিতে পেরেছিল বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের আবহমান সম্পর্ককে।

হিন্দুদের, বিশেষত উচ্চবর্ণ হিন্দুদের স্বাভাবিক ছুঁতমার্গী প্রবণতা যে ছিল, তার প্রমাণ আমরা অনেক আগে থেকেই তো পাই নিম্নবর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে তাদের অমানবিক ব্যবহারে। বাঙালি মুসলমানেরা যেহেতু মূলত সেই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের থেকেই এসেছে, তাই বাঙালি মুসলমান বাঙালি হিন্দুর চোখে 'হীন' এবং তাদের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরেই বঞ্চিত ও উপেক্ষিত, আর্থিক সামাজিক শিক্ষাগত সবদিক থেকে। হিন্দুরা অনেকেই তাদের 'বাঙালি' বলে গ্রহণ করে না, মুসলমানেরাও সেই পরিচয়কে আমল দেয় না। বরং বাঙালি হিন্দু সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক বিরোধ বা বিদ্বেষ মুসলমানদের মনে জমতে থাকে। গ্রামের দরিদ্র কৃষক ছাড়া শহরের যে-সব মুসলমান নিরুপায় দারিদ্র্যে কিংবা স্বেচ্ছাকৃত জেদে ইংরেজ-আমলের শিক্ষা থেকে পিঠ ফিরিয়ে থেকেছে, তারা বলা বাহুল্য ইংরেজ-আমলের চাকরিবাকরি থেকেও অনেকটাই বঞ্চিত ছিল। কারণ যা-ই হোক, হিন্দুদের পাশে তাদের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদপদতায় তারা খুবই বিক্ষুব্ধ ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের এই বিদ্বিষ্ট মনোভাবেরই পরিণতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যা বঙ্গভঙ্গের সময় বারবার ঘটতে থাকে দুই অঞ্চলেই। ময়মনসিংহের জামালপুরের দাঙ্গা তার কুখ্যাত উদাহরণ।

পক্ষান্তরে, বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালেই মুসলমানদের মনে এই আশা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, মুসলমানপ্রধান একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হলে বিভিন্ন সুযোগ তাদের

করায়ত্ত হবে, এবং হিন্দুপ্রাধান্য থেকে তারা রেহাই পাবে। ইংরেজ-শাসকেরা এই প্রতিশ্রুতিকেই ক্রমশ কেন্দ্রবিন্দু করেছিল এবং বঙ্গভঙ্গ-সমর্থক মৌলবাদী মুসলমানেরা তার প্রচারে সহায়ক হয়েছিল। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ও সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের একটি বিরাট ভূমিকা ছিল এ-ব্যাপারে। অনেকেই মনে করেন, এই আঞ্চলিকতার বোধ সঞ্চারিত করে দেওয়াটাই বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে মুসলমানদের জড়ো করার ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো কাজ দিয়েছে। (ঠিক যেমন পূর্ববঙ্গে জমিদারি বা অন্যান্য সুযোগ হাতছাড়ার সম্ভাবনায় বঙ্গভঙ্গের স্বভাব-বিরোধী হয়েছিল সম্পন্ন হিন্দুরা)।

ইংরেজ-শাসকদের প্রতিশ্রুতি এবং বঙ্গভঙ্গের সমর্থক মুসলমান-নেতাদের প্রত্যাশা যে সম্পূর্ণ অমূলক প্রমাণিত হয়েছিল তা নয়। এটা ঠিক, উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই বাঙালি মুসলমানদের সংখ্যাই শুধু বাড়েনি, মুসলমান-সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যাও একটু-একটু করে বাড়ছিল—তবু, শিক্ষার হার, সহজেই অনুমেয়, হিন্দুদের তুলনায় খুবই নগণ্য। বঙ্গভঙ্গের পরে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার শিক্ষার উন্নয়নের ব্যাপারে অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং তাতে বিভিন্ন স্তরে স্কুলের সংখ্যা বা মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষকদের সংখ্যা বেশ কিছুটা বেড়ে যায়। সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের নিয়োগও বেশি হয়, অন্তত হিন্দুদের তুলনায়।[৭] ইংরেজ-শাসকদের তাকে 'সর্বক্ষেত্রে উন্নতি' বলতেও বাধেনি এবং তাদের মতে সে-উন্নতি বাণিজ্য আইনশৃঙ্খলা পরিবহণ নারীশিক্ষা ইত্যাদি আরো নানা ক্ষেত্রে। এর পরিমাপ ও বিস্তার নিয়ে সন্দেহ পোষণ করলেও উন্নতি যে ঘটেছিল তা অস্বীকার করেননি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরাও। মুসলমানদের ফলাকাঙ্ক্ষা বেশ খানিকটা পূরণ হয়েছিল।

তাই, ১৯১১-তে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার আদেশে এতই আক্রান্ত বোধ করেছিল তারা যে এ ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল, আন্দোলনের চাপে নয়, হিন্দু উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত ও ইংরেজ-শাসকদের যোগসাজশেই ঘটেছে এটা, যদিও একই সঙ্গে বঙ্গভঙ্গের পোষক ইংরেজ রাজপুরুষেরা অনেকটাই বিস্মিত ও আহত হয়েছিল এই আদেশে। আর এর ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরের বছরগুলিতে ক্রমশই হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ বাড়তেই থাকল্ এবং তার পরিণতিতে দাঙ্গা-সংঘর্ষ।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে হিন্দুদের মধ্যে উল্লাস ও মুসলমানদের মধ্যে নৈরাশ্যের যে-বিবরণ পাই, তা বলা বাহুল্য উভয় সম্প্রদায়েরই সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে। এ ব্যাপারেও সাধারণ মানুষের কাছে তার গুরুত্ব কতখানি ছিল তা খুবই সন্দেহজনক। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী একসময় বলেছেন, "বঙ্গভঙ্গ রহিত হলে

বাঙালি মুসলমান সমাজে গভীর নৈরাশ্য নেমে এসেছিল, এমন কোনো তথ্য আমার জানা নেই", কারণ "বাংলার মুসলমান তখনও চাওয়ার স্তরে পৌঁছোতে পারেননি।"[৮] তবে বঙ্গভঙ্গের সময়কালে (১৯০৫-১১) মুসলমানদের জন্য মক্তব ও মাদ্রাসার সংখ্যাবৃদ্ধি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উর্দু ও ফারসি পড়ার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, আরবি বিভাগ খোলা, ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তার, মসজিদ থেকে চাঁদা তুলে বিদ্যালয় খোলা—এসব পন্থা বেশ জোরদার হয়। মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে অতিরিক্ত উৎসাহ দান এবং মুসলমান কর্মকর্তা ও পরিদর্শক নিয়োগ, ইত্যাদি ব্যবস্থাও চালু হয়। এগুলোই প্রমাণ করে, মুসলমানদের বাঙালি-পরিচয়কে রুদ্ধ করার পরিকল্পনা কীভাবে চলছে। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও অর্থনৈতিক সুবিধাদানের এই প্রক্রিয়া বঙ্গভঙ্গ রদের পরেও অব্যাহত রইল। ফলে, সামগ্রিক ভাবেই এ-সময়ে মুসলিম উগ্র স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসাব ঘটতেই থাকল।

৩

বাঙালি মুসলমানদের সবাইকে অবশ্য কখনোই একটি পরিচয়ের মধ্যে এনে ফেলা সংগত নয়। একই সঙ্গে হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্কে দূরত্ব যেমন, তেমনি নৈকট্যও ছিল সবসময়। বিশ শতকের সূচনায় মুসলমানদের মধ্যে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জাগরণের কথা বলা হয় এবং যার বিকাশ ঘটে বিশ শতকের প্রথমার্ধে, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ভাবটাও যথেষ্টই ছিল। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও আরবি-ফারসি গ্রহণের যে-ঝোঁক বারবারই মাথাচাড়া দিতে চায় বাইরের প্রভাবে, তার প্রতিবাদে ভিন্ন স্বরও শোনা যায়। বাঙালি মুসলমান বাংলাভাষাকেও আঁকড়ে ধরার কথা বলে। পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলনে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সহমর্মিতায় একটা মিলই বরং চায়। তাই তো এমন বলা হয়েছে, জাতীয়তাবাদী মুসলমান যাঁরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই 'ব্যক্তিগত' চেতনায় তাড়িত হয়েই সেই দিকে গেছেন, কোনো সাংগঠনিক হাতছানিতে নয়।[৯] এই ভাবেই অসাম্প্রদায়িক বাঙালি মুসলমানের অস্তিত্ব অন্তত ব্যক্তিগত স্তরে অবশ্যই ছিল। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সূচনাতে এই বাঙালি মুসলমানই তো আন্তরিকভাবে অংশ নিয়েছিলেন বাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে। তা বলে তাঁরা যে মুসলমান-পরিচয় ত্যাগ করে অসাম্প্রদায়িক হতে চেয়েছেন তা-ও নয়। 'খাঁটি মুসলমান' হয়েও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথে চলা যে সম্ভব তার অনুকূল মানসিকতাও দেখা গেছে। তাই মুসলমানের অকপট কণ্ঠস্বর শোনা গেছে : "ভাই হিন্দু, অগ্রে আমাদিগকে মুসলমান হইতে অবসরটুকু দাও,...তারপর রাজনীতিক্ষেত্রে এক হইতে ডাকিও।"[১০]

১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধিতায় মুসলিম জনমতকে সংহত করার জন্যই প্রকাশিত হয়েছিল 'দি মুসলমান' নামে পত্রিকা। কলকাতা থেকে বের হলেও, এই মুখপত্র অখণ্ড বাংলার মুসলমানদের, বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের, আত্মসচেতনতার দিকটিকে উন্মোচিত করেছিল দীর্ঘকাল। আবদুর রসুল, মৌলবী মুজীবর রহমান, আবুল কাসেম, আবদুল হালীম গযনবী—দুই বঙ্গের এই কয়েকজন প্রগতিমনা মুসলমানদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের সময় মুসলিম শিক্ষা, হিন্দুমুসলিম ঐক্য ও সহযোগিতা, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার রোধ ইত্যাদি নিয়ে সংবাদ বা সম্পাদকীয় বা নিবন্ধ নিরন্তর প্রকাশ করে গেছে পত্রিকাটি। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরেও ১৯৩৬ অবধি 'দি মুসলমান' এই ভূমিকা পালন করে এসেছে—কেউ-কেউ প্রয়াত হলেও বা পক্ষবদল করলেও। কিন্তু এখানে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রসঙ্গটাই ঘুরেফিরে এসেছে, বাঙালি মুসলমানের বাঙালি হিশেবে আত্মপ্রকাশের প্রসঙ্গ কদাচিৎ। পত্রিকার ভাষা ইংরেজি, লেখকেরাও সকলে বাংলায় অভ্যস্ত এমন নয়—যদিও আবদুল করিম, সৈয়দ এমদাদ আলী, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এস ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল শামসুদ্দীনের মতো ব্যক্তিরা এতে লিখেছেন বা আলোচিত হয়েছেন।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন, এই দুয়েরই ভেতর অনেক প্রসঙ্গ বা লক্ষ্য আছে। বঙ্গভঙ্গের সমর্থন ও বিরোধিতা উভয়ের মধ্যেই রয়েছে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক নানা দৃষ্টিকোণ ও স্বার্থ। কিন্তু এসব ছাড়াও আরেকটি বড়ো দিককে সবচেয়ে আগে ধরতে হয়। তা হল, বঙ্গভঙ্গে-র ফলে বাঙালির যে জাতিগত গর্ববোধ ও আবেগ আহত হয়েছে, তার কথা। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ১৯০৪-এর ১৮ মার্চ কলকাতার টাউন হলে যে প্রথম প্রতিবাদী সভা ডাকা হয়েছিল, তাতে জানানো হয়েছে : বাঙালির রীতি ও আচারব্যবহার সম্পর্কে শাসকদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ফলেই শুধু মনে করা যায়, এই প্রতিবাদ নিছকই "অলস ভাবালুতা"—ইংরেজরা বুঝতে পারেনি কীভাবে বাঙালি "জাতিগতভাবে, ভাষা বিচারে, এবং সামাজিক দিক থেকে" আঘাত পেতে পারে।[১১] বাঙালির এই জাতি হিশেবে যে আবেগ ও গর্ববোধ তাকে হিন্দুদের আবেগের সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। অনেক মুসলমানই যে সেই আবেগকে অনুভব করতে পারে না তা-ও সত্যি, বিশেষ করে যারা অবাঙালি কিংবা যারা বাঙালি হয়েও তাদেরই প্রভাবে বাঙালি-পরিচয় জানে না বা মানে না। কিন্তু পূর্ববঙ্গে সেই আবেগের শরিকও যে অনেকে ছিল তারও তো প্রমাণ আছে। ১৯০৭-এ ফরিদপুরের মুসলমান উকিল বা খানপারার মুসলমান জমিদার 'মুসলিম প্রতিবাদ' হিশেবেই জানিয়েছেন : "কলকাতা বাঙালির

শিক্ষা মনন সংস্কৃতির 'সুস্থ' কেন্দ্র—তা থেকে নতুন প্রদেশের বিচ্ছিন্নতা বাংলার প্রগতির ওপর একটা বড়ো আঘাত।"[১২]

অবশ্যই, 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে'র কারণে বাঙালির এই যে বেদনাবোধ, বাঙালি হিশেবে তার আহত আবেগ ও গর্ববোধ, তার সঙ্গে একটা গভীর যোগ আছে বাঙালির আত্মপরিচয়ের শিকড় সন্ধানের। তারই অন্তঃসারকে চেনা যায় বয়কট-আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালির পরিচিত অনুষ্ঠানগুলির উদ্‌যাপনে—প্রভাতফেরি, সংগীতমুখর শোভাযাত্রা, রাখিবন্ধন ইত্যাদিতে। তার অনুষঙ্গে রচিত রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্তের গানে। বিভিন্ন যাত্রায় বা নাট্যে। এই উপলক্ষে লেখা অজস্র কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে। এই সবকিছুর মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনে নিহিত বাঙালির আবেগ ও আত্মবোধের সবকটি দিকই। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে এই যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বদেশ-সন্ধান তার ইশারা পাওয়া গিয়েছিল সামান্য কিছু আগেই। প্রধানত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে সংগঠন গড়ার ভাবনাতেই তার সূত্রপাত উনিশ শতকের শেষে, আর যাত্রা শুরু স্বদেশী আন্দোলনের প্রায় সমকালে।

১৯০২-এ প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলন : সময়ের ব্যবধান খুব সামান্যই। স্বদেশী আন্দোলনের স্মরণীয় দিনগুলিতেই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষণার যে উজ্জ্বল কর্মকাণ্ড চলেছিল তার সূত্রেই তো বলা যায়, এটা ছিল এই পরিষদের গৌরবময় অবদানের কাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তাফি-র পরিচালনায় ও রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর একজন প্রধান সংগঠক ব্যোমকেশ মুস্তাফিই তো ছিলেন 'স্বদেশী সমাজ'-এর অন্যতম পরিকল্পক।[১৩] পরিষৎ ও স্বদেশী আন্দোলন, দুইকেই ছুঁয়েছিলেন যে-রবীন্দ্রনাথ, এবং যেভাবে, তাঁকে ধরেই চেনা যায় তাদের ভাব ও লক্ষ্যের সমান্তরালতা। বাঙালির আত্ম-আবিষ্কার ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেতনা উভয়ের মধ্যেই বিরাজমান, যদিও তাদের ক্ষেত্র একেবারেই ভিন্ন। বলা বাহুল্য, সাহিত্য পরিষৎ-এর প্রধান এলাকা ভাষা ও সাহিত্য। কিন্তু ভাষার 'ছাঁদ' এবং সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ের মধ্যেই তো সেই ভাষা যারা বলে তাদের জাতি-পরিচয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই, রবীন্দ্রনাথের কথায়, "বাঙালির চরিত্র"। সেই চরিত্রকে খুঁজে বের করাই সাহিত্য পরিষৎ-এর 'ব্রত'। পরিষৎ-এর গৃহপ্রবেশের উৎসবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে তাই একে বলেন "বাংলাদেশের আত্মপরিচয়ের চেষ্টা"। ভাষা বা সাহিত্যই শুধু নয়, তার সঙ্গে সংলগ্ন বাংলার পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভৌগোলিক-তত্ত্ব, পল্লী ও লোকসংস্কৃতি—এককথায় বাঙালির সংস্কৃতির সম্পূর্ণ অবয়ব দেখতে ও গড়তে চায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

কিন্তু, এ-সূত্রেও একটা বড়ো প্রশ্ন ওঠে, অবয়বের একটি প্রধান দৃশ্য বা তার দ্রষ্টা যদি গরহাজির থাকে, তবে কি ব্রত সম্পূর্ণতা পাবে? তাই, আজ ইতিহাস লিখতে গিয়ে লক্ষ করা যায়, "সাহিত্য পরিষদের ক্রিয়াকলাপে মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বা গফুর সিদ্দিকির ভূমিকা ও দান সত্ত্বেও মুসলমান সাহিত্যসেবীদের কাছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ জনপ্রিয় হয়নি।"[১৪] 'সাহিত্য পরিষৎ কার্যবিবরণী'র 'নিবেদন'-এ বলা হয়েছে : "অধুনা সকল ক্ষেত্রেই মুসলমান স্বীয় অধিকার সপ্রমাণ করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই মাতৃমন্দিরের সেবায়েৎ শ্রেণীভুক্ত হইবার আগ্রহের এত অভাব দেখা হয় কেন?" কিংবা "বঙ্গ ভাষার উন্নতিতে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সমান স্বার্থ ও অধিকার। শিক্ষিত মুসলমানগণ কেন যে পরিষৎকে তাহাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"[১৫] কিন্তু, শুধু দোষারোপ করলেই চলে না, মুসলমান সাহিত্যসেবীরা সেখানে শনাক্ত করেছিলেন "হিন্দুয়ানির ছোঁয়াচ", ভাষার ব্যাপারে এক ধরণের আধিপত্য।[১৬] যে-কারণে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ভাষার সার্বজনীনতা মেনে নিয়েও বলেন, "ঢাকাতেই যদি সমস্ত বাংলার রাজধানী হইত তবে এতদিনে নিশ্চয়ই ঢাকার লোকভাষার উপর আমাদের সাধারণ ভাষার পত্তন হইত।"[১৭] এটা তো বাঙালি মুসলমানদেরও মনে হতেই পারে। এর পেছনে আছে একটা অনিবার্য আঞ্চলিকতার বা স্বাতন্ত্র্যের বোধ, শুধু অর্থনৈতিক বা সামাজিক দিক থেকেই নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও—যে-আঞ্চলিকতার তাড়নায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনেও চিড় ধরেছিল।

১৯২৫-২৬-এর বঙ্গীয় সহিত্য পরিষদের ছাত্র-সম্মিলনীতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পরিষৎ থাকা সত্ত্বেও "বাংলার নিভৃত কোণে গুপ্ত" বাঙালি উপাদানকে প্রকাশ্য করার অসমাপ্ত কাজে আহ্বান জানিয়েছিলেন—এতে মনে হয় একটা অভাববোধ তাঁর মধ্যেও ছিল। তখনও "বঙ্গীয় মুসলমানের সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রশ্নগুলি" স্বতন্ত্রভাবে ওঠেনি, কিন্তু "শহীদুল্লাহ্-র মনে সেই জিনিশগুলি যে কাজ করেছিল তার সুপ্ত ইঙ্গিত হয়তো তাঁর উক্ত ভাষণের মধ্যে রয়েছে।"[১৮] ১৯৪৭-এর দেশভাগের পরে দেখতে পাই, পূর্ববঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আদলে বাংলা একাডেমী গড়ার কথা তাই প্রথম থেকেই উঠেছে।

৪

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার ঘটনায় উঁচুতলার মুসলমানেরা যে প্রকাশ্যতই বিচলিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। সে-সময়ের অনেক সভা ও ডেপুটেশনের বিবরণ থেকে তা

বোঝা যায়।[১৯] এর ফাঁকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে কলকাতা ও সেই সূত্রে সমগ্র বাঙালির ক্ষমতা যে খর্বিত হল, সে-বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ই অন্যমনস্ক ছিল বলেই মনে হয়। বিক্ষুব্ধ মুসলমানের উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য তাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের যে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল ইংরেজ-শাসকদের পক্ষ থেকে, তার মধ্যে প্রধান ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন। একেই তারা নিজেরাই বলেছে "চমৎকার ক্ষতিপূরণ"। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারকে খর্ব করার জন্য এটাও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত হয়েছিল ১৯১২-তে, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার এক বছর পরে—আর তা রূপ পেল ১৯২১-এ। তখনও মুসলিম-স্বাতন্ত্র্যকে প্রশ্রয় দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদই যে ইংরেজরা বজায় রাখতে চায়, এমনকী এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়েও, তার প্রমাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্ট-মিটিঙে ইংরেজ ভাইস-চ্যান্সেলর হার্টগ বললেন, "ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধ্যয়নই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে।"[২০] সৌভাগ্যের বিষয়, তা হয়নি—জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু আধুনিক বিষয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হল। তবে প্রথমাবস্থায় মুসলমান ছাত্ররা এই উচ্চশিক্ষা কতদূর গ্রহণ করেছিল সন্দেহ। বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিশেবে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পিত হয়েছিল, তখনই পূর্ববাংলার মুসলমানদের এক প্রতিনিধিদল তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে দেখা করে বলেছিল : "পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই তো কৃষিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় তারা অল্পই উপকৃত হবে।"[২১] যতই স্তোকবাক্য শোনানো হোক তাদের, প্রথম পর্বে সত্যিই মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু ক্রমশই মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকল এবং তারা এক ধাপ করে-করে কৃতিত্বের সোপানে উঠল—তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন পরবর্তীযুগের প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। কারণ, ইতিমধ্যেই, "বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বকালীন অবস্থা, কলকারখানার বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা, পাটের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে পূর্ববঙ্গে মধ্য এবং উচ্চ কৃষক যেমন তৈরি হয়েছে, তেমনি তাদের সন্তানরা স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে শুরু করেছে।"[২২]

মনে রাখতে হবে, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরে পূর্ববঙ্গে তখন মৌলবাদ ক্রমশই দানা বাঁধছে—ইসলাম ধর্মের প্রভাব ও মুসলিম লীগের রাজনীতির প্রতাপ ক্রমশই বাড়ছে। এমনকী একসময়ের বঙ্গভঙ্গের বিরোধী জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরাও অনেকে (যেমন আবদুর রসুল, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ) স্থানবদল করে ওইদিকে ঝুঁকেছেন।[২৩] মুসলিম নেতাদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্কলহ থাকলেও, মুসলিম-

পরিচয়ের একান্ত নির্ভরতায় কোনো ফাঁকি নেই। কিন্তু, এরই মধ্যে, ১৯২৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের কয়েকজন তরুণ শিক্ষক ও ছাত্র গড়ে তুললেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। প্রথম উদ্যোক্তা হিশেবে যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন : আবুল হুসাইন, কাজী মুতাহার হুসাইন ও কাজী আবদুল ওদুদ। ১৯২৭ থেকে বেরোল তাঁদের বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা'। তখন তো, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, মুসলমানদের প্রায় সব পত্রপত্রিকারই নাম ছিল আরবি-ফারসিতে ও ধর্মীয় ব্যঞ্জনাযুক্ত। কিন্তু 'শিখা'-র নামকরণে বাঙালি মানসটা লক্ষ করেছেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম।[২৪] 'শিখা'-র প্রকাশক ছিলেন আবদুল কাদির। আর সম্পাদনায় কালক্রমে আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ আবদুর রশীদ ও আবুল ফজল। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর ঘোষিত 'মন্ত্র' ছিল "বুদ্ধির মুক্তি"। কাজী আবদুল ওদুদের ভাষায় : "বুদ্ধির মুক্তি অর্থাৎ বিচারবুদ্ধিকে অন্ধসংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তি দান। বাংলার মুসলমান সমাজে (হয়তো বা ভারতের মুসলমান সমাজে) এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। কিন্তু সেদিন বিস্ময়কর হয়েছিল বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের উপর এর প্রভাব—একটি জিজ্ঞাসু ও সহৃদয় গোষ্ঠীর সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল এর দ্বারা।"[২৫] কিংবা "'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সেই দিনে বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের উপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাবই বিস্তার করেছিল—তবে কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে কি না জানা যাবে ভবিষ্যতে। বাংলার জাগরণের একটি অপেক্ষাকৃত-অল্প-পরিসর কিন্তু বেগবন্ত ধারা যে এই দল বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অল্প কিছু কালের জন্য প্রবাহিত হতে পেরেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।"[২৬] মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর প্রভাবের যে-সম্ভাবনার আশা ব্যক্ত করেছিলেন ওদুদ, তা-ই যেন শোনা যায় পরবর্তীকালে : "বাংলাদেশের অনেকেই এখন মনে করেন, দেশভাগের পর ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে বাঙালি মুসলমানের মুক্তমনের যে নতুন একটা সমাজ গড়ে উঠতে শুরু করল তাকে সেই বিশের দশকের 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনেরই উত্তরাধিকার বলা যেতে পারে।"[২৭] 'শিখা' বেরিয়েছিল মাত্র পাঁচ বছর—পত্রিকার প্রচার বা পাঠকসংখ্যাও ছিল সীমাবদ্ধ। যদিও পূর্ববাংলার এই জাগরণকে ভারতের জাগরণের সঙ্গেই এক করে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরা, তবু পাঁচটি সংখ্যার তালিকা থেকে বোঝা যায় বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ই কীভাবে সামনে উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গেই স্মরণীয় কয়েকটি প্রবন্ধের নাম : কাজী আবদুল ওদুদের 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা' ও 'বাঙ্‌লার জাগরণ', আনোয়ারুল কাদিরের 'বাঙালী মুসলমানের সামাজিক গলদ', নাজিরউদ্দীন আহমদের 'মুসলিম জাগরণ', আবুল ফজলের 'তরুণ

আন্দোলনের গতি', সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদের 'বাঙ্‌লায় পীরপূজা', রকীবউদ্দীন আহমদের 'বাঙালী মুসলমানের আর্থিক সমস্যা', আবুল হুসেনের 'বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা', কাজী মোতাহার হোসেনের 'সঙ্গীতচর্চায় মুসলমান', আবদুল কাদেরের 'বাংলার লোকসঙ্গীত' ইত্যাদি।

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) থেকে দেশভাগ (১৯৪৭) পর্যন্ত বিশ শতকের প্রথমার্ধ বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানের জাগরণের কাল যেমন, তেমনি বাঙালি-সত্তাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেওয়ারও কাল। বাঙালি মুসলমানের একটা বিরাট অংশ বাঙালি হিন্দুদের কাছ থেকে ক্রমশই দূরে সরে গেল শুধু তা-ই নয়, অবাঙালি মুসলমানের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতেও চাইল। অবশ্য এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আগেই, উনিশ শতকের শেষে আলিগড়-আন্দোলনের সমসাময়িক কালে। বঙ্গভঙ্গ মুসলমানেরা নিজেরাই চেয়েছিল এমন তো নয়, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের ঘোষণাতেই তাদের চাওয়াটা তৈরি হল এবং ততই বাঙালি-পরিচয়কে অস্বীকার করার জমিটা চওড়া হল। হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদকে আরো পাকিয়ে তুলে দফায়-দফায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও চূড়ান্ত দেশভাগের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের বাঙালি-পরিচয়কে প্রায় সম্পূর্ণ অবান্তর করে দিতে সফল হল ব্রিটিশরাজ।

কিন্তু, বলবার কথা এখানে এটাই, এই বিরূপ কঠিন সময়েও বাঙালি-পরিচয়ের গৌরব নিয়েই কেউ-কেউ সক্রিয় ছিলেন, সংখ্যায় তাঁরা যতই নগণ্য হোন। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই তার শুরু ও তার ধারাবাহিকতা। মুস্তাফা নূরউল ইসলামের লেখা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিই :

ক. "আমরা বাংলা দেশের কথা বিশদরূপে বুঝি। বাঙালি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া সন্তুষ্ট হই। সহস্র বৎসর যে দেশে বাস করিয়া আসিতেছি ; যাহার শীত গ্রীষ্ম, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য দুর্ভিক্ষ, সুখ সম্পদ, হর্ষ বিষাদ সমভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছি, সে আমার স্বদেশ নহে, তাহার বাহিরে আবার আমার এক নিজের দেশ আছে, এ কথাও কেহ মনে করিতে পারে না।" (রেওয়াজ অল দিন আহম্মদ, 'প্রচারক', আষাঢ় ১৩০৭, ১৯০০)।

খ. "আমাদের পূর্বপুরুষ আরব, পারস্য, আফগানিস্তান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙালি, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।" (হামেদ আলী, 'বাসনা', বৈশাখ ১৩১৬, ১৯০৯)।

গ. "বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও : /এই পবিত্র বাংলাদেশ/বাঙালির—আমাদের।/বাংলা বাঙালির হোক। বাংলার জয় হোক।/বাঙালির জয় হোক।" (কাজী নজরুল ইসলাম, 'বাঙালীর বাংলা', 'নবযুগ', ৩ বৈশাখ ১৩৪৯, ১৯৪২)।

ঘ. "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনও আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।" (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮)[২৮]।

আবদুল হক বলেছেন এস ওয়াজেদ আলী-র কথা—যিনি তাঁর মতে "সর্বপ্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদী।" তাঁর মধ্য দিয়েই সেদিনকার ভাবুক বাঙালি মুসলমানদের দুই দিকের টানটা বোঝা যায় এবং বোঝা যায় তার উত্তরণও। একদা যিনি "ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কালচারে"র সপক্ষে ওকালতি করেছিলেন তিনিই অনতিবিলম্বে (১৩৩৭ শ্রাবণ, ১৯৩০) বললেন, "বাংলার গৌরব, বাংলার স্বাতন্ত্র্য, বাংলার বিশেষত্ব হচ্ছে আমাদের সাধনার বিষয়" এবং "এই আদর্শে বাঙালি মুসলমান যেদিন দীক্ষিত হবে সেদিন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধেরও সমাপ্তি ঘটবে।" ১৯৪০-এ এসে ওয়াজেদ আলী 'ভবিষ্যতের বাঙালী' গ্রন্থে আরো এগিয়ে এসে ব্যক্ত করলেন এই বিশ্বাস, আবদুল হকের ভাষায়, "বাঙলাভাষার সহায়তায় অখণ্ড জাতিগঠনই বাঙালির নিয়তি।"[২৯]

১৯৪০-এ লাহোর-প্রস্তাবের পরই বাঙালি মুসলমান লেখকেরা অনেকেই নেমে পড়েন সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানবাদী সাহিত্য সৃষ্টিতে। ১৯৪২-এ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি', তারপর ১৯৪৩-এ 'পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সংসদ', ১৯৪৪-এ 'পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন'—এইভাবে রাজনীতিতে তো বটেই, সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতেও পাকিস্তানবাদী দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসন, কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, মোহাম্মদ আবদুল হক—এঁরা প্রত্যেকে বাংলা ভাষার বদলে উর্দু কিংবা বড়ো জোর উর্দু-মিশ্রিত পুঁথিসাহিত্যের বাংলা চালু করার কথা বললেন। সেই সঙ্গে বললেন, বাংলা সাহিত্যের "হিঁদুয়ানি" সুর পালটে "প্রবল ইসলামি ভাব" আনতে হবে। পাকিস্তান সৃষ্টির সমস্ত পরিবেশ ছেয়ে গেল এই বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিবিমুখ চেতনায়। এ সময় আমরা বারবার গোলাম মোস্তাফা বা সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের কথা শুনেছি, 'নওবাহার' পত্রিকার কথা শুনেছি। অবশ্য তখনও, বলা বাহুল্য এমন তো কেউ ছিলেনই, যাঁরা মুসলমান-পরিচয় ও বাঙালি-পরিচয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখতে চেয়েছেন এবং ব্যক্তিগতের পরিধিতে তা হয়তো রাখতেও পেরেছেন—কিন্তু পাকিস্তানবাদী ভাবনার চাপ এতই প্রকট ছিল যে, পরবর্তীকালে যাঁরা মত পালটেছেন

বা এমনকী প্রগতির শিবিরে যোগ দিয়েছেন, তাঁদেরও অনেকে এ-সময়ে হিন্দুবিরোধিতার নামে বাংলা-বিরোধিতার পথ নিয়েছেন। অনেকের কাছেই বাংলাভাষা উহ্য হয়ে গেছে, বাঙালি-পরিচয় অবান্তর হয়ে গেছে কিংবা আড়ালে চলে গেছে। এ সময়ের অজস্র পাকিস্তানবাদী রচনায় তার সাক্ষ্য আছে।[৩০]

৫

বাংলাভাষা ও বাঙালি-পরিচয় যে সত্যিই শেষপর্যন্ত আড়ালে যেতে পারে না, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, ১৯৪৭-এর দেশভাগের মাত্র কয়েক মাস পরেই, পাকিস্তানবাদী পরিবেশের মধ্যে বাংলাভাষার অবলম্বন ও বাঙালি-আত্মপরিচয়ের অধিকার একটা প্রবল বিক্ষোভের সূত্র হয়ে দাঁড়াল। খাম-পোস্টকার্ড বা ছাপানো টাকায় বাংলা ব্যবহার না করার ব্যাপারটাই হয়ে উঠতে পারল বাঙালির আত্মসম্মানবোধ ঘা খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তারপর তো ১৯৪৮-এর ও ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন সমস্ত পরিবেশটাকেই দিল বদলে। হিন্দু-মুসলমানেরই মিলিত এই আন্দোলন—তবু তারই মধ্যে নবজাগ্রত শিক্ষিত মুসলমানদের, ছাত্রদেরই প্রধানত, যে জঙ্গি ভূমিকা তা এর আগে কখনো দেখা যায়নি—এমনকী তা আন্দোলিত করেছে গ্রাম ও শহরের সাধারণ মুসলমানকেও। বাঙালি-পরিচয়কে যেন ফিরিয়ে এনেছে ভাষা-আন্দোলন। যা অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছিল তারই পুনরুদ্ধার। হয়তো আরো উঁচু স্তরে। বাঙালি-আত্মপরিচয় উন্মেষের পুরোনো ইতিহাস মনে পড়ে যাওয়াও সম্ভব। বঙ্গভঙ্গের সমকালীন জাগরণে মুসলমানদের যে প্রায়-অনুপস্থিতি তা নিয়েই তো যত গোলমাল—এবারের এই আত্মপরিচয় আবিষ্কারের সুবর্ণ মুহূর্তে সেই ধর্মীয় বিচ্ছেদ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ধারাবাহিকতার এই তুলনা-প্রতিতুলনাতেই বলেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, "প্রবল একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঘটে গেছে ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগের পরে", কিন্তু তাতে "মুসলমানদের দূরত্ব ছিল...শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের", আর "বাহান্নতে যে-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা তাতে ধর্ম ছিল না।"[৩১]

ভাষা-আন্দোলন অবশ্য বাহান্নতেই শেষ নয়, তার পরিধি বাহান্নকে ছাপিয়ে চলে গেছে একাত্তরে। বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠার দাবি থেকে ক্রমশই অন্য দাবিদাওয়ার আন্দোলনে, স্বাধিকারের আন্দোলনে, শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার আন্দোলনে। বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় হয়েছে পরের বছরগুলিতে পালিত বার্ষিকীতে, তাকে কেন্দ্র করে বাঙালি-আত্মপরিচয়ে ঋদ্ধ হওয়ার সংকল্পে।

বছরের পর বছর এই উপলক্ষে ভাষা-আন্দোলন অন্য মাত্রা পেতে থাকে—সারা রাস্তা জুড়ে বাঙালির আলপনায়, বাঙালির শোভাযাত্রায়, বাঙালির পুষ্পস্তবকে ও

গানে। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের গান, এবং বিস্ময়করভাবে তাতে প্রাধান্য পায় বঙ্গভঙ্গের সময়ে রচিত সেই বিখ্যাত গানগুলি। সন্‌জীদা খাতুন স্মৃতিচারণে লেখেন, "মনে পড়ে, উনিশ-শো তেষট্টি সালে একুশে ফেব্রুয়ারির সময় বাংলা একাডেমীর বটমূলে কী অসাধারণ সংবেদন সৃষ্টি করেছিল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গান। এ গান রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সেই কতদিন আগে, উনিশ-শো পাঁচ সালে। ভাষা-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে, মায়ের মুখের বাণী যে সন্তানের কানে সুধার মতো লাগে সে-কথা নতুন তাৎপর্যে প্রাণ পেল।"[৩২] তাঁর ওই লেখা থেকেই জানতে পারি, ভাষা-আন্দোলন আর রবীন্দ্রানুসরণ কীভাবে এক হয়ে আছে বাংলাদেশে। আর তাই "বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদজনিত আন্দোলন যুগের লেখা" গানগুলি কীভাবে বাংলাদেশের সে-সময়ের "বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বিশেষ জোরালো করেছে।" কীভাবে 'ও আমার দেশের মাটি' 'নিশিদিন ভরসা রাখিস' 'আমি ভয় করব না, ভয় করব না' ইত্যাদি "অনেক আগে লেখা গান আবার ফিরে এলো।"

বাংলা ভাষা ও বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলনে স্বদেশী যুগের আরো অনেক অনুষঙ্গই হয়তো আসে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উদ্যোগে। দৃষ্টান্ত হিশেবেই বলা যায়, স্বদেশী আন্দোলনের সমান্তরালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর যে-কর্মকাণ্ড, যাতে মুসলমানদের অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি নিয়ে খেদ করা হয়েছিল, তারই তুলনীয় প্রণোদনা পঞ্চাশ বছর পরে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের একাডেমী প্রতিষ্ঠায় ও সাধনায় খুঁজেই পেতে পারেন কেউ।

১৯৪৮-এর ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছিলেন "বাংলা ভাষার রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও উপযোগিতা"র কথা, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালির বাঙালি হিশেবে সত্যপরিচয়ের কথা এবং তারই জন্য গড়তে চেয়েছিলেন একটি একাডেমী বা পরিষদ্।[৩৩] সেই বাংলা একাডেমী-ই তৈরি হল ভাষা-আন্দোলনেরই গৌববজনক সাফল্যের প্রমাণ হিশেবে—১৯৫৫-এর ৩ ডিসেম্বরে, পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হওয়ার অল্প আগে। ভাষা-আন্দোলনের ঠিক পরেই শিক্ষিতমহলে ও সংবাদপত্রে একাডেমীর দাবি উঠেছিল, কিন্তু পাকিস্তানের রাজনীতিতে তা অত সহজ হয়নি—অনেক রাজনৈতিক ওঠাপড়া ও সাংগঠনিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে অবশেষে তা রূপ পেল। বস্তুত যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মধ্যেই ছিল তার দাবি এবং স্বায়ত্তশাসিত এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন আবু হোসেনের নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে। একাডেমীর লক্ষ্য ও কার্যক্রম দেখে অনেকেরই স্বভাবত মনে হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কথা। ১৯৫৩-তে শহীদুল্লাহ্ বলেছিলেন, "এই বাংলা সাহিত্য নিকেতন বলিতে

আমি বুঝি কলিকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র ন্যায় বরং তদ্-অপেক্ষা উন্নততর ও ব্যাপকতর একটি প্রতিষ্ঠান।"[৩৪] বলা বাহুল্য, পূর্ববঙ্গের এই বাংলা একাডেমীতে, খানিকটা যেন প্রাক্তনের ঘাটতি পূরণের জন্যই, বাঙালি মুসলমানের চাহিদা ও দায়ের ওপর বেশি জোর পড়বে তা তো খুবই সংগত, এবং পড়েছেও তা-ই। ১৯৫৭ থেকে একাডেমী প্রকাশিত গ্রন্থ কিংবা 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা'র সূচিপত্র দেখলেই এই ঝোঁক এবং তার ব্যাপকতা স্পষ্ট হয়। মুসলমান লেখক ও তাঁদের রচনা, ইসলামি বা আরবি-ফারসি উপাদান, গবেষণা-সংগ্রহ, অনুবাদ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাঙালি-পরিচয়ের এই অল্প-আলোচিত দিকগুলো উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে একটা বড়ো জোর পড়েছে আঞ্চলিকতার ওপর—পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা, লোকসাহিত্য ও লোকসংগীত, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদিতে। বাঙালির স্বদেশসন্ধান বা আত্মসন্ধান যে এতে পূর্ণতর রূপ পেল তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তুলনাটা বোধহয় সে-কারণেই এখানে প্রাসঙ্গিক।

শুধু বাংলা একাডেমী-ই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই স্বদেশসন্ধানের চেষ্টায় অনেক কাজ করেছে—তার বিবরণী আমরা পাই। ১৯৬৩-র 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' ছিল "ঢাকার একটি সাড়া জাগানো উৎসব" এবং সেখানে অবহেলিত মুসলমান লেখকদের পক্ষে বলতে গিয়ে এই মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে, "তাই বলে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে আমরা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়তে চাই না।"[৩৫] কিংবা আরো যে-সব প্রতিষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল—যেমন 'সংস্কৃতি সংসদ', 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ', 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী', 'ছায়ানট', 'নজরুল একাডেমী' ইত্যাদি—সেখানেও নানারকম কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বাঙালির প্রতিরোধী সাংস্কৃতিক পরিচয় ঘোষিত হয়েছে। দেশভাগের পর থেকেই বেশ কয়েকটি সাহিত্য-সম্মেলন বা সাংস্কৃতিক সম্মেলনেও বাঙালির সেই একই আত্মপ্রকাশ। ১৯৪৮-এর ঢাকার 'পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে'র কথা তো আগেই হয়েছে। ১৯৫১-তে চট্টগ্রামে এবং ১৯৫২-য় কুমিল্লায় যে 'পূর্বপাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে প্রগতিশীল বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল অনন্য। কোনো-কোনো সম্মেলনে আবার ইসলামি ভাবধারা ও পূর্ববাংলার বাঙালির স্বতন্ত্র সংস্কৃতির একটা সমন্বয়ের কথাও উঠেছিল। তবে, সবকে ছাপিয়ে গুরুত্ব পেয়েছিল ১৯৫৭-য় টাঙ্গাইলের কাগমারিতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন, মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে ও প্রেরণায়—"এত ব্যাপকভিত্তিক আর কোনো সাংস্কৃতিক সম্মেলন বাংলাদেশে হয়নি"[৩৬]—যার সম্পর্কে আবু জাফর শামসুদ্দীন বলেছেন, "বাঙালি জাতির যৌথ উদ্যমে ও আয়োজনে শত শত বৎসরব্যাপী গ্রহণ ও

আবার ইসলামি ভাবধারা ও পূর্ববাংলার বাঙালির স্বতন্ত্র সংস্কৃতির একটা সমন্বয়ের কথাও উঠেছিল। তবে, সবকে ছাপিয়ে গুরুত্ব পেয়েছিল ১৯৫৭-য় টাঙ্গাইলের কাগমারিতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন, মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে ও প্রেরণায়—"এত ব্যাপকভিত্তিক আর কোনো সাংস্কৃতিক সম্মেলন বাংলাদেশে হয়নি"[৩৬]—যার সম্পর্কে আবু জাফর শামসুদ্দীন বলেছেন, "বাঙালি জাতির যৌথ উদ্যমে ও আয়োজনে শত শত বৎসরব্যাপী গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে সৃজিত বাঙালির আলাদা জাতীয় সত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করে কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন।"[৩৭]

তবে, এই উপার্জন শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বা একাডেমীর চার দেয়ালের মধ্যেই নয়—জ্ঞানবিজ্ঞান ও ভাষাসাহিত্যের মুক্তচর্চা ও সৃজনকর্মেও। বিশেষ করে এ-সময়ে বাঙালির আত্মপরিচয়ের সন্ধানে যে অজস্র লেখালেখি হতে থাকে পূর্বপাকিস্তানে, তা প্রায় তুলনাহীন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, মুহম্মদ এনামুল হকের কথা তো আমরা আগে থেকেই জানি, তাঁরা তখনও লিখছেন। এর পরেও, বিশেষত ভাষা-আন্দোলন ও পরবর্তী বিভিন্ন আন্দোলনকে ঘিরে, নবীন-প্রবীণ বহু লেখক নবজাগ্রত এই বাঙালি-সত্তার জন্ম-স্ফূর্তি, বিকাশ-বিবর্তন, সংকট-সমাধান নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন, অজস্র লেখা লিখেছেন—বেশ বোঝা যায় বাংলাদেশের আত্মসচেতন বুদ্ধিজীবীরা তাকে একটা দায় বলেই গ্রহণ করেছেন। অসম্পূর্ণতার ঝুঁকি নিয়েও নাম করা যায় : আবু জাফর শামসুদ্দীন, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, মুহম্মদ আবদুল হাই, আবদুল হক, আহমদ শরীফ, সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আহমদ রফিক, বদরুদ্দীন উমর, ওয়াহিদুল হক, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জামান এবং আরো অনেকে—তাঁদের আলোচনা-পদ্ধতি বা সিদ্ধান্তে যে-পার্থক্যই থাকুক। এ সবই পাকিস্তান-আমলে বাংলাদেশের বাঙালির আত্ম-অনুভবের শক্ত জমি। এই অনুভব তো সঞ্চারিত হয়েছেই রাজনীতিতে ও রাজনৈতিক আন্দোলনে, পরবর্তী স্বাধিকারের ও পূর্ণ স্বাধীনতার স্পৃহায়। বাঙালি-জাগরণের এই উন্মোচন টের পেয়ে পাকিস্তানের শাসকেরা ক্রমশই বাঙালি-পরিচয়কেই ভয় করতে শুরু করেছে, বাঙালি-পরিচয়ের যা কিছু প্রকাশ তারই বিরুদ্ধে তাই তারা বিমুখ, কখনো-কখনো আক্রমণাত্মক—তা সে রবীন্দ্রসংগীত কিংবা বাংলা নববর্ষ কিংবা বাংলাভাষার চর্চা যা-ই হোক। এবং বলা বাহুল্য, তাদের সমর্থক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করে চলে—কখনো ইসলামি সাংস্কৃতি সম্মেলন বা সাহিত্য সম্মেলন ডেকে, কখনো বাংলা ভাষা বা অক্ষরের সংস্কার প্রস্তাবে, কখনো

রবীন্দ্রসংগীতের বা রবীন্দ্রনাথেরই বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রচারে। তথ্য হিশেবে উল্লেখ করা যায়, সৈয়দ আলী আহসান বা খাজা শাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে রবীন্দ্র-বিরোধিতায় উদ্যত ৪০ জন বুদ্ধিজীবীর এবং তার চেয়েও বেশি মওলানা আকরম খাঁ-র নেতৃত্বে ৩০ জন মওলানার বিবৃতি তো এসময়েই। পাকিস্তান-শাসকেরা নিরন্তর ইন্ধন জুগিয়ে গেছে তাদের। ইংরেজরা যেমন ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গে ও ১৯৪৭-এর দেশভাগে চেয়েছিল বাঙালি মানস যাতে খণ্ডিত হয় হিন্দু-মুসলমানের বিভাজনে—তেমনি পাকিস্তান-আমলে শাসকরা চেয়েছে মুসলমানদের মধ্যেই বাঙালি-পরিচয় ও পাক-পরিচয়ের একটা বিভেদ-রেখা টানতে। পাকিস্তানিরা তখন সবসময় শঙ্কিত থাকত, বাঙালি মুসলমানেরা তাদের মধ্যেকার এই বিভেদকে কাটিয়ে, বাঙালি-আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শুরু না করে। কিন্তু তাদের সেই শঙ্কা ও সতর্কতা ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবিতাকে ঠেকাতে পারেনি।

ভাষা-আন্দোলনে বাঙালি-সত্তা আবিষ্কারের যে-অভিযান শুরু হয়েছিল, পাকিস্তান-পর্বের ইতিহাসে তা উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পৌঁছোল যেন অনিবার্যভাবেই। ভাষা-সচেতনতা থেকে জাতিসচেতনতা ও জাতিমুক্তির সংগ্রামে। ঠিক এরকম মাত্রায় উত্তরণ আর কোথাও কখনো ঘটেছে বলে মনে হয়নি অনেক ঐতিহাসিকেরই। এই যুদ্ধে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, অন্তর্কলহ আছে—কিন্তু 'বাঙালি' হিশেবেই বা 'বাঙালি' পরিচয়েই এতজন মানুষ একসঙ্গে যুদ্ধ করেছে শেষপর্যন্ত। তা ছাড়া যতই ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্তার ভূমিকা থাকুক, বাঙালি এই মাপের যুদ্ধ করেছে এই প্রথম, তার সাফল্যও অভাবিত। আবদুল হক তাই তাঁর অসামান্য দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলেন :

"বহুকাল বাংলাদেশের মাটিতে যুদ্ধ হয়নি, এবং বহুকাল আগে সংঘটিত যুদ্ধে প্রধানত বাঙালিরা অস্ত্র ধরেনি। সেই বাঙালি যুদ্ধ করেছে একাত্তর সালে। ব্যাপ্তি, তীব্রতা এবং সমগ্র জনসমাজের অংশগ্রহণের দিক দিয়ে বাঙালির ইতিহাসে এর তুলনা নেই। আর এ-যুদ্ধ বাঙালি করেছিল অধিকতর সশস্ত্র শিক্ষিত অভিজ্ঞ বাহিনীর বিরুদ্ধে, সবকিছু জেনে-শুনে। শিক্ষা অস্ত্র অভিজ্ঞতা সবই ছিল তার স্বল্প, কিন্তু সংগ্রামী ঐক্য, দৃঢ়তা এবং তীব্রতা বাঙালির সমগ্র ইতিহাসে অতুলনীয়, এবং বুঝি তার চেয়েও বড়ো কথা—অভাবনীয়। এই ছিল বাঙালির নবজন্ম ; এ-জন্ম আমরা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি। এই যুদ্ধের আগে বিশ্বসমাজে বাঙালির পরিচয় ছিল না। জাতি হিশাবে এবং বিপ্লবী সংগ্রামী হিশাবে বিশ্বসমাজে বাঙালির এই প্রথম পরিচয়।"[৩৮]

৬

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন/বয়কট-আন্দোলন/স্বদেশী আন্দোলন বাঙালিকে পৌঁছে দিয়েছিল এক নতুন আত্মসচেতনতায়—কিন্তু শেষপর্যন্ত হিন্দু বাঙালিকে যেভাবে, সেভাবে মুসলমান বাঙালিকে নয়। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাকেই বলেছেন মুসলমান মধ্যবিত্তের মধ্যে "পালটা একটা আত্মসচেতনতার সূত্রপাত"[৩১]। আত্মসচেতনতার এই দ্বিমুখীনতাই বাড়িয়ে দিল হিন্দু-মুসলমানের ব্যবধান এবং নিয়ে গেল অবিরাম সাম্প্রদায়িকতায়। বঙ্গ-ভঙ্গ চালু করে এবং রদ করে বাঙালিকে জব্দ করার যে-খেলা খেলতে চেয়েছে ইংরেজ-কর্তারা তাতে ছিল তারই প্রশ্রয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে হিন্দু-মুসলমান বাঙালির যে-মনোভাব ছিল বাঙালি হিশেবে, সেই বাঙালি-মন এতই খণ্ডিত যে তা জোড়া লাগে না সহজে, অথচ তারই প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। বরং দেখা যায়, সেই মন ক্রমশই আরো খণ্ডিত হয়েছে, বিকৃত হয়েছে। ১৯৪৭-এর দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ তারই অপ্রতিরোধ্য পরিণাম। কিন্তু দেশভাগের পরে, পাকিস্তানের আমলে, মুসলমান বাঙালি টের পেয়েছে বাঙালি-পরিচয় ছাড়া অন্য সব পরিচয়ের অসারতা। তখনই শুরু হল নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদেরই লড়াই, এক সময়ের 'পালটা আত্মসচেতনতা'র বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের বাঙালির লড়াই—বাঙালির 'সুস্থ' আত্মপরিচয়ের উন্মোচন। এর তাগিদ ও সাফল্য যতটা তাদের ততটা বোধহয় এপারে নয়। আর সেই বাঙালি-আত্মপরিচয় নিয়ে ভাষা-আন্দোলনে, একাত্তরের আগের আন্দোলনগুলিতে বিভিন্ন দৃষ্টির ও স্বার্থের রাজনীতিরও সমন্বয় সম্ভব হয়েছে। মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের যে-সাফল্য, তার পেছনেও বাঙালি-আত্মপরিচয়ের আবেগই ছিল। মুজিব তাঁর ভাষণে বা রাজনৈতিক আচরণে তারই সাক্ষ্য রেখেছেন। মওলানা ভাসানী ও মুজিবুর রহমান একসঙ্গে লড়াই করেছেন তারই নির্ভরতায়। নানা শিবিরের জাতীয়তাবাদী বা সাম্যবাদী দল এবং মানুষও তা-ই। এরই মধ্য দিয়ে পাকিস্তান-পর্বে বাঙালির গণসংস্কৃতি একটা প্রতিবাদী চরিত্র পেল সৃজন ও কর্মসচলতার নানা ক্ষেত্রে। দেশভাগের আগে কলকাতার যে-প্রভাব এড়ানো যেত না, তা থেকে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন নির্মাণ ও সংগঠনের স্বকীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারই প্রকাশ এই বিভাগোত্তর পর্বের বাঙালির চিত্রভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, সংগীতে এবং অবশ্যই সাহিত্যে। পশ্চিম-পাকিস্তানের আধিপত্যে তার বিকাশ ও বিস্তার বারবার ঘা খায়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরাধীনতা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করতে চায়—তবু, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তা থেকে মুক্তি পাওয়ার

আকাঙ্ক্ষা ও সক্রিয়তাও প্রকাশ পায়। যে-সাম্প্রদায়িকতার চাপে পাকিস্তানের জন্ম অনিবার্য হয়েছিল, সেই সাম্প্রদায়িকতা দূর হয়নি ঠিকই, কিন্তু পাকিস্তান-আমলেই ক্রমশ সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সংস্কৃতির একটা নিজস্ব চেহারাও তৈরি হল। বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে এই ধর্মনিরপেক্ষ ও অনন্যপর বাঙালি-আত্মপরিচয়ের চেতনা হয়ে উঠল বাঙালির জাগরণেরই একটা শক্ত ভিত, নতুন বাঙালি-সংস্কৃতিরই অঙ্গ। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম তারই ওপর ভর করে। যে মুসলিম মৌলবাদ তখনও, সবসময়ই, কুড়ে-কুড়ে বাঙালি-সত্তার ভিত আলগা করে দেয়, কখনোই উধাও হয় না, আড়ালে ঘুপটি মেরে থাকে, স্বাধীনতার পরের বাংলাদেশের ইতিহাসে তাকে তো বারবার অতিকায় হতে দেখছি—কিন্তু পাকিস্তান- আমলে এই নতুন বাঙালির অভ্যুত্থানের গৌরব তাতে মিথ্যে হয়ে যায় না।

সূত্র-নির্দেশ

১. 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম', আজহার ইসলাম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৯২। পৃ ৬১, ৯৩, ১০৪, ১২৪।

২. 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ', বিনয় ঘোষ। প্রকাশ ভবন, কলকাতা। ৪র্থ সং ২০০০। পৃ ১১৯।

৩. 'বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়', সুফিয়া আহমেদ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ২০০২। পৃ ১২৬-২৯।

৪. '১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া', মুনতাসীর মামুন। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। ১৯৯৯। 'দি বেঙ্গল টাইম্‌স' ও 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে সংকলিত সংবাদ, চিঠি, সম্পাদকীয়।

৫. *Selections from the Mussalman. 1906—1908.* ed. Bhuiyan Iqbal. Papyrus, Kolkata. 1994.

৬. 'ভাষা সংস্কারের নামে বাঙালী সত্তায় চির ধরানোর প্রয়াস', আহমদ শরীফ। উৎস : 'বাঙালি ও বাংলাদেশ', সম্পা. অরুণ সেন ও আবুল হাসনাত। নয়া উদ্যোগ, কলকাতা। ১৯৯৯। পৃ ৬৬।

৭. 'বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম', ইমরান হোসেন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৯৩। পৃ ৩৫-৪৫।

৮. 'বাঙালির আত্মপরিচয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ', জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। গ্লোব লাইব্রেরি, ঢাকা। ১৯৯১। পৃ ১৫৮।

৯. *The Swadeshi Movement in Bengal,* Sumit Sarkar. PPH, New Delhi. 1973. p 440.

১০. 'রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান', মুন্‌শী লেহাজউদ্দীন আহ্‌মদ। 'নবনূর', আষাঢ় ১৩১২ (১৯০৫)। উৎস : 'থির বিজুরী', 'সমসাময়িকের চোখে বঙ্গভঙ্গ',

১১. *Partition of Bengal / Significant Signposts 1905-1911.* ed. Nityapriya Ghosh & Ashoke K. Mukhopadhyay. Sahitya Samsad,

১২. সূত্র ৫। p 110-11.

১৩. সূত্র ৯। p 346.

১৪. 'চিন্তার চালচিত্র : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (১৩০০-১৩৩০)', গৌতম ভদ্র ও দীপা দে। 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', শতবর্ষপূর্তি স্মারক সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৭।

১৫. সূত্র ১৪।

১৬. সূত্র ১৪।

১৭. 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, কলকাতা। ১৩৯১ (১৯৮৪-৮৫)। পৃ ১১।

১৮. 'বাংলা একাডেমীর ইতিহাস', বশীর আল্‌হেলাল। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৮৬। পৃ ৭। 'অ্যাকাডেমি' যে-বানানে পূর্বপাকিস্তানে বা বাংলাদেশে বরাবর ব্যবহৃত হয়েছে, সেটাই আগাগোড়া অনুসৃত হল।

১৯. সূত্র ৩। পৃ ১৫৩-১৫৫।

২০. 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ', সরদার ফজলুল করিম। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা। ১৯৯৩। পৃ ১৩২।

২১. সূত্র ৩। পৃ ১৫৪।

২২. সূত্র ২০। পৃ ১৩৩।

২৩. 'বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ', এ টি এম আতিকুর রহমান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৯৫। পৃ ১৪।

২৪. 'শিখা সমগ্র', সম্পা. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ২০০৩। পৃ ছয়-সাত।

২৫. 'নিবেদন', 'শাশ্বত বঙ্গ', কাজী আবদুল ওদুদ। উৎস : সূত্র ২৪। পৃ সাত।

২৬. 'বাংলার জাগরণ', কাজী আবদুল ওদুদ। বিশ্বভারতী, কলকাতা। ১৩৬৩ (১৯৫৬-৫৭)। পৃ ১৯৬।

২৭. 'কাজী আবদুল ওদুদ : এক অন্তহীন যাত্রা', মিলন দত্ত। উৎস : 'বাংলার

মুসলমানের কথা', কাজী আবদুল ওদুদ। মৃত্তিকা,

২৮. 'বাংলাদেশ, বাঙালী-স্বরূপের সন্ধান', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। উৎস : 'সেরা সুন্দরম্', সম্পা. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। ইউ. পি. এল, ঢাকা, ২০০৪। পৃ ৩১-৩২।

২৯. 'একজন বাঙালী জাতীয়তাবাদী', আবদুল হক। উৎস : 'নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪। পৃ ৮২।

৩০. 'ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি', হুমায়ুন আজাদ। ইউ. পি. এল., ঢাকা। ১৯৯০।

৩১. 'শেখ মুজিবের অঙ্গীকার', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। উৎস : 'নির্বাচিত প্রবন্ধ'। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯। পৃ ২৪৪-৪৫।

৩২. 'স্বাধীনতার অভিযাত্রা', সন্জীদা খাতুন। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা। ২০০৪। পৃ ৩৪-৩৫।

৩৩. সূত্র ১৮। পৃ ৯।

৩৪. সূত্র ১৮। পৃ ২০।

৩৫. 'পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন', রেজোয়ান সিদ্দিকী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৯৬। পৃ ২৮০-৮১।

৩৬. সূত্র ৩৫। পৃ ২৩৫।

৩৭. সূত্র ৩৫। পৃ ২২৭।

৩৮. 'আত্মহত্যার আগে', আবদুল হক। উৎস : 'নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'। সূত্র ২৯। পৃ ১৩২।

৩৯. 'বাঙালীর জাতীয়তাবাদ', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। ইউ. পি. এল., ঢাকা। ২০০০। পৃ ১৭৩।

ভাষা নিয়ে দ্বন্দ্ব

হিন্দু ও মুসলমানের যে বিচ্ছিন্নতা ও দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছিল অখণ্ড বাংলায়, আঠারো শতকের শেষে বা উনিশ শতকের গোড়ায়, ইংরেজ আমলে, তার একটা বড়ো বহিঃপ্রকাশ ভাষাকে কেন্দ্র করে। তার আগে মধ্যযুগে, তুর্কি-আক্রমণের পর থেকে, কিংবা তারও আগে যখন থেকে বঙ্গে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়েছিল, তখন থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, এমনকী বাঙালি পরিচয়টাই গড়ে উঠেছিল হিন্দু ও মুসলমানের যুগ্মতায় ও সমন্বয়ে। বাংলাভাষায় সংস্কৃত বা সংস্কৃতজাত শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দের অনায়াস মিশ্রণ ঘটেছে। তাই তো মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের কাব্যে থাকতে পারে অজস্র আরবি-ফারসি শব্দ, এবং দৌলত কাজী বা আলাওলের কাব্য হতে পারে সংস্কৃত শব্দ বহুল। মধ্যযুগ থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালি-সত্তার নির্মাণে ও বিকাশে মুসলমানদের অংশগ্রহণ ও প্রভাবের কথা বলেছেন অনেকেই।

ইংরেজ-আধিপত্যের পরই হিন্দু ও মুসলমানের বিচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে উঠল। এর অনেক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সামাজিক এমনকী মনস্তাত্ত্বিক কারণও আছে, আপাতত আমাদের তা আলোচ্য নয়। কারণ যাই হোক, এর প্রতিক্রিয়াতেই বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ভাষার ক্ষেত্রেও একটা ব্যবধান ও দূরত্ব তৈরি হল। একই বাংলাভাষার দুটি ভিন্ন গড়ন যেন দেখতে পাওয়া গেল। মুসলমানেরা আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দ বহুল একরকমের বাংলায় (প্রথমে মুখে-মুখে, পরে লেখালেখিতেও) আশ্রয় নিতে চাইল। তাকেই পরবর্তীকালে বলা হয়েছে 'মুসলমানি বাংলা' বা 'দোভাষী বাংলা' বা 'মিশ্ররীতির বাংলা'। ঠিক যেমন হিন্দুদের একাংশের গোঁড়ামি প্রকাশ পেয়েছিল অতিরিক্ত সংস্কৃত শব্দ বহুল বাংলা লেখায়।

উনিশ শতকে হিন্দুদের লেখালেখির ভাষার প্রবণতা অবশ্য অতটা সরলভাবে বর্ণনা করা যায় না—নানা ধরণের গদ্যই সে-সময়ে লিখিত হত। ইংরেজ-আগমনের আগে তো রাজভাষা ছিল পারসিক—হিন্দুরা সে-ভাষা চর্চা করেছে ব্যাপকভাবে। আর টুলো পণ্ডিতদের সংস্কৃতভাষা তো ছিলই। ফলে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভট্টাচার্যি গদ্য যেমন ছিল, তেমনি ছিল রামরাম বসুর গদ্য, যেখানে গোঁড়া হিন্দুদের ভাষায়

'পেঁয়াজ-রশুনের গন্ধ'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন 'সীতার বনবাস' লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন 'আবার অতি অল্প হইল'। বাঙালি হিন্দুদের ভাষায় এই যে বৈচিত্র্য ও ঔদার্য, তার কারণ ইংরেজ-আমলের আধুনিকতার স্পর্শে সংখ্যাগরিষ্ঠের মনস্তত্ত্ব তাদের সেই স্বাধীনতা দিয়েছে। তাই, সাহিত্য ও ভাষার ব্যাপারে মুসলমানদের রক্ষণশীলতা বা ভিন্ন পথ-পরিক্রমার দিকে তাদের চোখই পড়েনি, পড়লেও উপেক্ষাই করে এসেছে। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ধারণায় মুসলমানদের অবস্থান সম্পর্কে পোষণ করে এসেছে অজ্ঞতা। আর ঢাকি-সুদ্ধ প্রতিমা-বিসর্জনের নীতিতে বাঙালি মুসলমানের এই ভিন্ন-পরিক্রমার মধ্যে রক্ষণশীলতার পাশাপাশি যে ইতিবাচক দিকগুলি ছিল তা-ও লক্ষ করা হয়নি। অথচ, কখনো-কখনো প্রতিক্রিয়া হিশেবে অতিরিক্ত সংস্কৃত-নির্ভরতা সাময়িকভাবে কাউকে তাড়িত করলেও তা প্রবল হয়নি—বরং মুসলমানদের সম্পর্কে উপেক্ষা সত্ত্বেও হিন্দু বাঙালির ভাষায় আরবি-ফারসি মিশ্রণের প্রক্রিয়া অব্যাহত থেকেছে পরেও। ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন, উনিশ শতকের গোড়াতেও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ভাষাবিতর্কে সংস্কৃতের পক্ষ সমর্থন ও পারসিক ভাষার বিরুদ্ধে বাঙালি হিন্দুদের আপত্তি সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত উভয়কেই ছাড়িয়ে যে খাঁটি বাংলা উঠে এল সেখানে সমন্বয়ের বাস্তবই গ্রাহ্য ছিল। এমনকী আঠারো শতকে লেখা যে-সব চিঠিপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কোনো-একটি বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে :

> পুরো চিঠিটিকে সমগ্রভাবে দেখলে বোঝা যায়—চিঠিগুলির পরিষ্কার তিনটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে, প্রথানুগত বা বিধিসম্মত সম্বোধন। শেষ ভাগে, প্রথানুগত বা বিধিসম্মত সমাপ্তি। মাঝখানে, চিঠির বক্তব্য বা মূল চিঠি। এই প্রথম ও শেষ ভাগে সংস্কৃত রীতি প্রায় অন্ধভাবে, অনেক সময় অর্থহীনভাবে, অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে, চিঠির আসল কথাটি বলার সময়, সংস্কৃতের ওপর এই নির্ভরতা থাকছে না, সেখানে যত সরলভাবে সম্ভব মূল খবরটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মূল কথাটি জানিয়ে দেয়ার এই দায়ে চিঠির এই দ্বিতীয় ভাগে কখনো মুখের কথা লেখায় ব্যবহৃত হচ্ছে, কখনো আরবি-ফারসি শব্দ আসছে, কোথাও সংস্কৃত শব্দও আসতে পারে। কিন্তু সব কিছুই আসছে পত্রলেখকের নিজস্ব প্রয়োজনবোধ থেকে, নির্ভুল খবরটি জানাবার দায় থেকে।[১]

আসলে বাঙালির ভাষার বাস্তবতাতেই এই সমন্বয় তখন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। আর সে কারণেই বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারে তৎসম-তদ্ভব বা দেশী শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি-তুর্কি থেকে আগত শব্দও ভিড় করে এসেছে।

উনিশশতকী জাগরণের একটা বড়ো লক্ষণই ছিল—ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বাঁকবদল। হিন্দুরা তাতে বিপুলভাবে অংশ নিলেও মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠের আহত মন নিয়ে ইংরেজ-আমলের সেই আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অধিকাংশের ক্ষেত্রে হয়তো গ্রহণের বাস্তবতা ছিল না, যাদের ছিল তারাও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। হিন্দু-বিদ্বেষ, ইংরেজ-বিদ্বেষ বা আধুনিকতার প্রতি বিদ্বেষ প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাষা-দ্বন্দ্বে তার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। সেই কালপর্যায়ে বাঙালি হিশেবে নয়, মুসলমান হিশেবে পরিচয়ই তাঁদের কাছে প্রাথমিক এবং কখনো-কখনো সর্বাঙ্গীণ। 'হিন্দু-বাংলা'র বদলে 'মুসলমান-বাংলা' বা দোভাষী পুঁথির বাংলার নির্মাণ বা প্রচলন ঘটেছে তারই ফলে। বাংলার সঙ্গে অজস্র আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দের যথেচ্ছ মিশ্রণ ঘটিয়ে এই যে দো-আঁশলা ভাষা তৈরি হল এবং দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি মুসলমানেরাও তার চর্চা করল, এর কারণ তাদের বোঝানো হয়েছিল, মুসলমান মাত্রেরই পূর্বপুরুষদের দেশ আরব এবং ভাষা আরবি-ফারসি। এমনকী সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমান যারা কোনোদিনই বাংলা ছাড়া কিছুই জানে না বা বলে না, তাদেরও মাথায় এই ভুল ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছিল বাইরে থেকে আসা মুষ্টিমেয় অবাঙালি মুসলমান—আর্থিক ও ধর্মীয় আধিপত্যের জোরে। আর তাই বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে সমস্ত মুসলমানেরই মোক্ষ ছিল আরবি-ফারসিকে আঁকড়ে ধরা। মাদ্রাসা-শিক্ষার প্রসার ও জনপ্রিয়তা সেদিক থেকেই। কিন্তু সত্যিই তো বিশাল সংখ্যক বাঙালি মুসলমানদের পক্ষে সম্ভবই নয় সেই শিক্ষা অর্জন—তাই 'মুসলমানি বাংলা' ছিল এক ধরণের আপোস। আর তা পাকাপোক্তভাবে শুরু হয়েছিল উনিশ শতকেই। নবাব আবদুল লতিফের মতো উর্দুভাষী শিক্ষিত মুসলমানেরা দেখতে পাই তখন থেকেই "বাংলাভাষার জাতি বিচার শুরু করে সরকারি সহায়তায় ভাষাবিভেদের গোড়া পত্তন করেছিলেন।"[২]

সমস্ত উনিশ শতক বা বিশ শতকের একটা বড়ো সময় জুড়ে মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্যের হিন্দু-প্রধান মূল ধারা থেকে দূরে সরে থেকেছে এবং স্বেচ্ছায় নিজেদের গণ্ডির মধ্যে 'মুসলমানি বাংলা' চালু রেখেছে। সেই সাহিত্য ও ভাষা মধ্যযুগেরই অনুবর্তন—নিকৃষ্ট অনুবর্তন। বাঙালি হিন্দুরা ক্রমশই মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, তাদের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকেও বাংলায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের যে-ঐতিহ্য তাকে বিসর্জন দেয়নি। বাংলায় আরবি-ফারসি শব্দের অস্তিত্ব ও ব্যবহারকে কোনো-কোনো শুদ্ধতাবাদী "অশুচিতার লক্ষণ" বলে মনে করলেও অনেকেই, এমনকী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাও তাকে স্বাভাবিক ও

সংগত মনে করতেন। তবে সেটা কখনোই পরবর্তী আরবি-ফারসি-বহুল 'মুসলমানি বাংলা' চালু করার চেষ্টার সঙ্গে তুলনীয় নয়। 'মুসলমানি বাংলা'-য় আরবি-ফারসি শব্দের সংখ্যাগত প্রাচুর্যই শুধু নয়, তাতে কোনো ভাষাগত বা সাহিত্যগত অনিবার্যতা ছিল না, ছিল একরকমের জবরদস্তি। প্রথম ঘটনাকে যদি বলা যায় "স্বাধীনপ্রক্রিয়া", তবে দ্বিতীয়টিকে বলতে হবে "ভাষা-আগ্রাসন" বা "ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ"। এই দ্বিতীয় ঘটনাই স্পষ্ট হয়ে উঠল পরবর্তীকালে।

বিশ শতকেই মুসলমানদের মধ্যে এ-ব্যাপারে আত্মসমালোচনা শুরু হল বলা চলে। আরবি-ফারসি বা উর্দু যে কখনোই বাঙালি মুসলমানদের ভাষা হতে পারে না, এমনকী আরবি-ফারসি শব্দ বহুল মুসলমানি বাংলাও নয়—সে-বিষয়ে কোনো-কোনো মুসলমান লেখক বা বুদ্ধিজীবীর মধ্যে সংবিদ এল, দেখতে পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে আর্থিক-সামাজিক নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ ও বিস্তার ঘটছে—তাদের আত্মসচেতনতা অবাঙালি মুসলমানদের চাপকে অস্বীকারও করতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে অবাঙালি মুসলিম শিক্ষিতরা অনেকেই ছিলেন ইংরেজি-নবিশ—তাঁদের ইংরেজি-পক্ষপাতও যে অবান্তর সে বোধও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। দুর্বল পুঁথি সাহিত্য এবং অবাস্তব মুসলমানি ভাষা এবং সেই সঙ্গে ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল। ১৯০২ সালেই সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলেছেন "আমরা যতই আরবি পারসি উর্দু এবং ইংরেজিতে পণ্ডিত হই না কেন, যতই আমরা অন্যান্য ভাষার আলোচনা করি না কেন, যতদিন আমরা বাঙ্গালার আলোচনায় বদ্ধপরিকর না হইব...ততদিন আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা করা নিতান্তই মূর্খতা।"[৩] যাঁরা মুসলিম জাগরণে বা মুসলিম আদর্শবাদে প্রবল বিশ্বাসী তাঁরাও অনেকে বাঙালি মুসলমানের কাছে মাতৃভাষা বাংলাই যে একমাত্র অবলম্বন, তা সোচ্চারে বলতে শুরু করেছেন। ১৯১৫-তে সৈয়দ নবাব আলী বলেছেন, "আমরাও বর্তমান মুসলমানি বাংলা হইতে অনেক অনাবশ্যক আরবি ফারসি শব্দ ত্যাগ করিয়া বহু সংস্কৃত শব্দ সাদরে গ্রহণ করিব।... আমরা হিন্দু বাংলাও চাহি না, মুসলমানি বাংলাও চাহি না, আমরা চাই খাঁটি বাংলা, যাহা বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয়ে বুঝে।"[৪]

অর্থাৎ, মধ্যপথের কথা, খাঁটি বাংলার কথা উনিশ-শতক থেকেই অনেক 'হিন্দু' লেখকেরা যা বলেছিলেন বা অনুশীলন করেছিলেন, তা কোনো-কোনো মুসলমান লেখকেরাও এখন বলতে শুরু করলেন। ১৯২৮-এ সৈয়দ এমদাদ আলী 'বাংলাভাষা ও মুসলমান' প্রবন্ধে আরবি-ফারসি শব্দ যে বাংলাভাষার "অধিকার-সীমার মধ্যে নিজের স্থান" করে নিয়েছে, তা স্বীকার করেও সে-ব্যাপারে অত্যুৎসাহের নিন্দা

করেছেন। মধ্যযুগের কথা আমরা জানি, আধুনিক কালেও বাংলা সাহিত্যে "হিন্দু লেখক নিজেদের রচনায় সহজ ও দেশপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার" করেছেন তা বলতে গিয়ে এমদাদ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের উদাহরণ দিয়েছেন। হিন্দুরা যখন বাংলাভাষায় সংস্কৃত শব্দ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, কিংবা "ভাষার পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলমানি শব্দের প্রচলন বন্ধ করতে" চায়, তখন যেমন এমদাদ আলী আপত্তি করেন—তেমনি যে মুসলমান লেখকের বাংলা রচনায় অর্ধেক শব্দই আরবি-ফারসি এবং সেই "দুর্বোধ্য ও কঠিন অনাবশ্যক" শব্দের অর্থগ্রহণ "সাধারণ মুসলমান পাঠকের পক্ষেও অসম্ভব"—তাঁদের রচনা যে "মাঠে মারা যায়" সে-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। তাই তাঁর কথা :

> একপক্ষ কেবল সংস্কৃত ভাষার আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিবেন, আর একপক্ষ কেবল আরবি-ফারসির দামামা বাজাইবেন, তাহা হইলে দুই দলের মধ্যে এমন পার্থক্য দাঁড়াইয়া যাইবে যে, কেহ আর কাহারও ভাষা বুঝিবেন না। তখন বাঙ্গালি হিন্দু ও বাঙ্গালি মুসলমানের ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে। আমাদের মনে হয়, মধ্যপথ অবলম্বন করিলেই সকল দিক বজায় থাকিতে পারে। হিন্দুও প্রচলিত মুসলমানি শব্দকে বর্জন করিবেন না, মুসলমানও অত্যধিক আরবি, ফারসি শব্দের প্রয়োগ করিয়া বাংলা ভাষার যাহা নিজস্ব রূপ, তাহা বদলাইয়া দিবেন না।[৫]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা একটু উঁচু গলায় একই কথা বলেন :

> ভাই সকল! হিন্দু-মুসলমানি দ্বন্দ্ব আজ হইতে ভুলিয়া যাও ; 'হিন্দু-বাঙ্গলা' 'মুসলমানি-বাঙ্গলা' এই পার্থক্যবোধক শব্দগুলি অভিধান হইতে উঠাইয়া দাও উভয়ের সাহায্যে বঙ্গভাষার আয়ত্ত বৃদ্ধি করো এবং ভাষার উত্তরোত্তর উন্নতি দ্বারা দেশের মঙ্গলসাধন করো।.....দরিদ্র মুসলমানগণ এতকাল মোহনিদ্রায় সুষুপ্ত ছিল। অল্পদিন হইল তাহারা জাগরিত হইয়াছে ; নাটক, নভেল, স্কুলপাঠ্য, কাব্য লিখিতে অগ্রসর হইয়াছে। এখন যদি হিন্দু-মুসলমানের মিলন না হয়, তাহা হইলে বঙ্গভাষা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পরকে হীনবল করিতে চেষ্টা করিবে ও জাতীয় উন্নতির প্রতিপদে ব্যাঘাত ঘটাইতে থাকিবে।.....তাই বলি, যদি বঙ্গদেশের উন্নতি চাও, যদি বঙ্গভাষার প্রাধান্য দেখিতে চাও, যদি মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চাও, তবে ভাষাব্যবচ্ছেদ হইতে বিরত থাকো।[৬]

এরকম কথা দেশ-বিভাগ বা পাকিস্তান-সৃষ্টির মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই বলেছেন। তসদ্দুক আহমদ, হুমায়ুন কবীর, মুহম্মদ এনামুল হক বা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখের লেখা আমরা পেয়েছি মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত

'বাংলাদেশ : বাঙালী' বইতে। এ ছাড়াও পেয়েছি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ অনেকেরই উক্তি-প্রত্যুক্তি। ১৯৪৭-এ মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, "বাংলা ভাষাকে হিন্দু সংস্কৃতির বাহন বলা যেরূপ অন্যায়, উর্দুকেও মুসলিম সংস্কৃতির বাহন বলিয়া উল্লেখ করা তদ্রূপ অবিচার।....বাংলা হিন্দুর এবং উর্দু মুসলমানের ভাষা এই জাতীয় ধারণা ও বিশ্বাস নিতান্তই আজগুবি।"[৭] এ-কথা এতটা জোর দিয়ে তাঁকে বলতে হয়েছে, কারণ এ-সময় থেকেই পাকিস্তানপন্থী প্রবক্তাদের একটা বড়ো অস্ত্রই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই "আজগুবি ধারণা"। ১৯৪৮-এ পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে দাঁড়িয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছিলেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।"[৮] এই সত্যটাকেই তিনি চিনে নিতে চেয়েছেন বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও। তাই মর্মাহত হয়ে বলেছেন, "এক দল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত ঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর এক দল বাংলাকে আরবি-ফারসি ঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে। এক দল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে বলি দিতে, আর এক দল চাচ্ছে 'জবে' করতে। এক দিকে কামারের খাঁড়া, আর এক দিকে কসাইয়ের ছুরি।"[৯] খাঁটি বাংলাভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্থ ধারণার এই দৃষ্টান্ত শুধু এটুকুই নয়, আরো অনেক পাওয়া যাবে। আলী আনোয়ার তাঁর 'বাংলাভাষার সঙ্গে বাঙালী মুসলিম সমাজের সম্পর্ক : পারস্পরিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া' প্রবন্ধে বেশ কয়েকজনের নাম করেছেন, উদ্ধৃতি দিয়েছেন, বিশেষত বিশ শতকের গোড়াকার পত্রপত্রিকা থেকে।[১০] যেমন, ১৯০০-তে 'নূর অল ইমান' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, "বাঙ্গালা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া ঘৃণা না করিযা আপনাদের অবস্থা ও সময়ের উপযোগী করিয়া লউন।" তিন বছর পরে 'নবনূর' পত্রিকায় বলা হয়েছে, "বঙ্গ ভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে?" 'ইসলাম প্রচার' পত্রিকার প্রবন্ধে আছে : "বাঙ্গালা আদালতের ভাষা, অর্থকরী ভাষা, কার্যকরী ভাষা, দেশের ভাষা মাতৃভাষা কিনা প্রত্যেক মুসলমানেরই তন্ময় চিত্তে দেখিবার বিষয়।" ১৯০৯-১০-এ 'বাসনা' পত্রিকায় "বাঙ্গালার পরিবর্তে উর্দুকে মাতৃভাষা করিবার মোহ"-কে বলা হল "দুর্বল ব্যক্তির অলৌকিক স্বপ্ন দর্শন"। আর ১৯১৬-তে 'আল-এসলাম' পত্রিকায় "এক শ্রেণীর" বাঙালি মুসলমানের উর্দু-প্রীতি বা বাংলা-অপ্রীতিকে বলা হল "মারাত্মক রোগ।"

বাঙালি মুসলমানের ভাষা-বিষয়ক এই যে মুক্তদৃষ্টি তা যত ব্যাপকই হোক, তা যে সর্বাঙ্গীণ নয় তা বুঝতে অসুবিধা হয় না যখন আমরা সমসাময়িক অন্যান্য দৃষ্টান্ত থেকে পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের চেহারাটাও খুঁজে পাই। এই

সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাতও গোড়া থেকেই, যার প্রতিবাদে সীমাবদ্ধভাবে হলেও ওই মুক্তদৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল। বস্তুত মুষ্টিমেয় সচেতন বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সংস্কৃতমুক্ত ও আরবি-ফারসিমুক্ত খাঁটি বাংলার সপক্ষে যে কণ্ঠস্বরই আমরা শুনতে পেয়েছি, তাঁদের প্রত্যেকের উচ্চারণে প্রতিপক্ষের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেছে। এবং ক্রমশই প্রতিপক্ষের স্বর প্রবল হয়ে উঠেছে—১৯৩০-এর দ্বিজাতিতত্ত্ব ও ১৯৪০-এর পাকিস্তান-প্রস্তাব যে বাঙালি মুসলমানকে সাম্প্রদায়িকতায় উৎসাহী করেছে, তাঁরাই, বিশেষত ১৯৪০-এর পর থেকে, সক্রিয় হয়েছেন সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানবাদী সাহিত্য ও ভাষার সৃষ্টিতে। এতই ব্যাপক সেই সক্রিয়তা যে খাঁটি বাংলাভাষার প্রবক্তাদের কথাবার্তাকে প্রায় ব্যতিক্রমী বলেই গণ্য করতে হয়। হুমায়ুন আজাদ ভাষা-আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে এই পাকিস্তানবাদী ভাষা ও সাহিত্যের যে রচনাপঞ্জি দিয়েছেন, তার দৈর্ঘ্য বিস্ময়কর।[১১] চল্লিশের দশকের মুসলিম সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকা বা সাহিত্য সম্মেলনগুলিতে যে লেখালেখি হয়েছে বা ভাষণ দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায়, সাহিত্য ও ভাষার বিচারে সেগুলো প্রায়শই প্রগতিবিমুখ। হুমায়ুন আজাদ দেখিয়েছেন : পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ[?] সোসাইটি, পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ[?] সম্মেলন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কিংবা 'নওবাহার', 'দিলরুবা', 'মাসিক মোহাম্মদী' ইত্যাদি পত্রপত্রিকা শেষ-পর্যন্ত ভাষা-সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক মনোভাবই পোষণ করে গেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে জাগরণ ও স্বাতন্ত্র্যবোধ এনে দিয়েছে পাকিস্তানি চেতনা, সাহিত্য ও ভাষায় তার প্রতিফলন ঘটুক—এই প্রত্যাশাই করেছে সবাই। এমনকী এ-ব্যাপারে যাঁরা চরমপন্থী নন, তাঁদেরও মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে 'দিলরুবা'য় প্রকাশিত মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের প্রবন্ধে—

> আমাদের মধ্যে একদল ভাবছেন বাংলাভাষাকে একেবারে বাদ দিয়ে উর্দুকে বরণ করা যখন সম্ভব হল না তখন প্রচুর আরবি ফারসি তথা উর্দু শব্দ আমদানি করে, বাংলার বর্ণমালা পর্যন্ত পালটে দিয়ে বাংলাকে ধীরে ধীরে উর্দুর সমপর্যায়ে টেনে তুলতে হবে। এরা হলেন চরমপন্থী। নরমপন্থীরা মনে করেন...আমরা যখন পাকিস্তান অর্জনে সফলকাম হয়েছি তখন পূর্বপাকিস্তানের ভবিষ্যৎ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তার জন্য আস্ফালনের প্রয়োজন নেই, ভাষাকে আজই ঠেলে দিয়ে হুরুফুল কোরাণের ভাঁওতায় উর্দু অক্ষর গ্রহণ করারও জরুরাত পাকিস্তান রাষ্ট্রের উন্নতির সঙ্গে পূর্বপাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যও ধীরে ধীরে পাকিস্তানি (পূর্বপাকিস্তানি অবশ্য) ছাপ বহন করবে।[১২]

এটাও মূল সুর নয়, এর চেয়েও যে বক্তব্য জোরালো হয়েছে তা হল, ইসলামি ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে, কিংবা বলা যায়, পুঁথিসাহিত্যকে ঐতিহ্য হিশেবে গ্রহণ করে সাহিত্যে নবজাগরণ আনা। ফররুখ আহমদ বা সৈয়দ আলী আহসানের মতো লেখকও এই ভাবনার শরিক হয়েছেন।

১৯৪৭-এ এবং ৪৮-এ, অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত আগে ও পরে কলকাতা ও ঢাকা থেকে যে বহুসংখ্যক মুসলমান পরিচালিত পত্রপত্রিকা বেরোত, তার রচনায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের প্রাচুর্য বিস্ময় উৎপাদন করে। বিশেষ করে কবিতায় মধ্যপ্রাচ্যের উপাদানের সঙ্গে-সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার প্রায় সীমাহীন হয়ে ওঠে। ফররুখ আহমদের কবিতার নাম হতে পারে 'কোন বিয়াবানে', 'জসনে আজাদী', 'কওমী তামান্না' ইত্যাদি। হুমায়ুন আজাদ এরকম 'বাংলা' কবিতার অজস্র উদাহরণ দিয়েছেন—তার মধ্যে থেকে দু-একটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

কোন সন্ধ্যার বিয়াবানে আজ
থামল কাফেলা 'সিপা'সালার?
পেরেশান পথ-যাত্রীরা, ঢুলে
তন্দ্রায় নত উটের সার (ফররুখ আহমদ)

সায়ফুল্লার কুওৎ আবার নামছে কলবে দুর্নিবার
খালেদী বাজুর তলোয়ার নাচে মুমিনের হাতে খর-দুধার
(ফররুখ আহমদ)

তোমার শারাব পানে মন ধরে বেহুঁশ বেতাবী (মুফাখখারুল ইসলাম)

বে-নেকাব হও, গুলেবকাউলী-রাত।...
তুমি এনেছিলে একদা এখানে প্রভাত-আরগাওয়ানী
(মুফাখখারুল ইসলাম)

জরির জোব্বা, শেরোয়ানী আর আমামার সজ্জায়
আতরের পানি, মেশকের রেণু খোসবু বিলায়ে যায়
(সৈয়দ আলী আহসান)

মোবারক হো জিন্দেগী!
মোবারক হো জিন্দেগী!
চল্ সিপাহী জিন্দাদিল
কর্ আজাদ জিন্দেগী!!...

কোরবাণের কর্-আবাদ—
পুণ্য রহে আন্ জাহান। (তালিম হোসেন)

এই উদাহরণগুলি সবই হুমায়ুন আজাদের 'ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি' বই থেকে নেওয়া হয়েছে। তিনি একে বলেছেন "নজরুলের ইসলামি কবিতার দরিদ্র পাকিস্তানি পরিণতি।"[১৩] সন্‌জীদা খাতুনের 'রবীন্দ্রনাথ : বাঙালী মুসলমান সমাজ : বাংলাদেশ' প্রবন্ধে পাই এরকম আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত।"[১৪]

কলিজার খুনে ওয়াতানের ধূলি করিয়া লাল
আজাদীর তরে শহীদ হলে যে বীর দুলাল,
তাহারা মোদের সালাম নাও, তাহারা মোদের আশিস্ দাও
ভাঙা কেল্লার ঊর্ধ্বে যাহারা উড়ালে ঝান্ডা আল-হেলাল।

কিংবা

ভাঙিল জিন্দান, টুটিল জিঞ্জির,
আগে চল্ আজাদ রাহাগীর।
জিন্দা গাজী ওরে ভুলিয়া ভয়ডর
ঝান্ডা হেলালী দু-হাতে তুলে ধর্।
আজাদী অভিযানে, কওমী জয়গানে
আসুক সাহারায় প্লাবন বারিধির।

সন্‌জীদা খাতুনের ওই প্রবন্ধেই পাই তৎকালীন সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত কোনো এক গল্পে, নির্জন ঘরে প্রেমিকের মুখোমুখি হয়ে নায়িকার অবস্থা কী হয়েছিল, তার বর্ণনা—"লেবাসের অন্দরে তার তামাম তনু পোসিনায় তরবতর।"[১৫]

এই ধরণের 'বাংলা'কেই 'প্রবাসী'-তে বলা হয়েছে "মক্তব-মাদ্রাসার বাংলাভাষা"। বোধহয় এরই প্রতিক্রিয়ায় যে-বাংলাভাষায় আরবি-ফারসির সসম্মান স্থান সেখানেও এই বাড়াবাড়ি হিন্দু লেখকদের কখনো-কখনো ছুঁতমার্গী করে তুলেছিল—তা না হলে রবীন্দ্রনাথের মতো কবিও কেন নজরুলের কবিতায় রক্তের প্রতিশব্দ হিশেবে 'খুন' নিয়ে আপত্তি জানাবেন?

অর্থাৎ বাংলাভাষাকে নিয়ে এই দুই বিপরীত আচরণই ক্রমশ টের পাওয়া গেল পূর্বপাকিস্তানে। একদিকে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালিরই ভাষা যে বাংলা তার সপক্ষে বলার মতো লোক বাড়তে থাকল। লেখালেখি শুরু হয়েছিল আগেই তা আমরা দেখেছি, কিন্তু এখন তার ব্যাপকতা বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। যেমন আবদুল হক, যিনি পাকিস্তানের জন্মের আগে থেকেই মুসলমানদেরও ভাষা হিশেবে বাংলা ভাষার কথা বলে এসেছেন, তিনি ১৯৪৭-৪৮-এ একের পর এক

লিখতে থাকলেন 'বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব', 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে' ইত্যাদি প্রবন্ধ। শেষোক্ত প্রবন্ধে আবদুল হক বললেন :

> যাঁরা বলেন যে, বাংলা হিন্দুর ভাষা এবং পৌত্তলিকতার ভাষা, মুসলমানদের ভাষা নয়, তাঁরা কেউ এই ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন না।... বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন নয়, কিন্তু সে কথা থাক। সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন বলেই যদি বাংলা মুসলমানদের ভাষা না হয়ে হিন্দুদের ভাষা হয়, তবে দুনিয়ার কোনো মুসলমানকেই মুসলমান বলা চলে না, কেননা এমন একদিন ছিল, যেদিন তাদের কোনো পূর্বপুরুষই মুসলমান ছিল না। বাংলা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ভাষা এবং হিন্দু বাংলাভাষী অপেক্ষা মুসলিম বাংলাভাষীর সংখ্যা বেশি।[১৬]

১৯৪৮ ও ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনের সময় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যে দাবি তার পেছনে তো ছিল এই বিশ্বাস ও প্রেরণাই। কিংবা উলটো করে বলা যায়, ভাষা-আন্দোলনের প্রেরণাতেই ভাষার ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তার ঘটল আরও। তাই তো সে-সময়ের বিবরণে পড়ি, 'বাঙালি না মুসলমান' এই বিতণ্ডা নিয়ে ব্যস্ত ছিল যে 'আজাদ' পত্রিকা, তারাও একুশে ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। ওই দিনগুলিতে ঢাকার সমস্ত সাধারণ মানুষ যখন উদ্বেল, তখন "পুরোনো ঢাকার অধিবাসী এক বিশেষ ধরণের উর্দু বলা 'কুট্টি' সম্প্রদায় পর্যন্ত 'বাঙালি না মুসলমান' এই তর্ক ভুলে নিগৃহীত মানুষের পক্ষ নিয়ে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিন।"[১৭]

অন্যদিকে, ঠিক এর পাশাপাশি বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও বাংলাভাষাকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার কিংবা পালটানোর মনোভাব যে খুব দুর্বল ছিল পাকিস্তানি আমলে তা মনে করলে ভুল হবে। এর মূলে গোঁড়া ধর্মান্ধতা যেমন ছিল, তেমনি ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের চক্রান্ত ও উশকানি। উর্দু আর বাংলার মিশ্রণে নতুন ভাষা তৈরি করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংহতি এবং পূর্ববাংলার বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিই ছিল লক্ষ্য। পাকিস্তানের জন্মের একেবারে গোড়ায়, স্বাধীনতা লাভের আনন্দে, আপামর সমস্ত মুসলমানদের মধ্যেই ভাষা-স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারে হয়তো একটু উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল, অন্তত কিছু কালের জন্য—"এই সব আরবি-ফারসি শব্দের ভিতর দিয়েই স্বাধীনতার বিশেষ আনন্দ ঝংকৃত হচ্ছিল।"[১৮]

পরেও সকলের মধ্যেই মোহভঙ্গ ঘটেছিল এমন বলা যাবে না। এই তথাকথিত 'স্বাতন্ত্র্য'-কে জিইয়ে রাখা বা বাড়িয়ে তোলার জন্য অবিরল চেষ্টা চলতেই থাকল

পাকিস্তানি শাসকদের উদ্যোগে, গোটা পাকিস্তান-আমলে, এবং সে-ব্যাপারে বেশ কিছু বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীরও যথেষ্ট সমর্থন ও সহায়তা ছিল। ভাষা-আগ্রাসনের ক্ষেত্রও ছিল ব্যাপক। হুমায়ুন আজাদকে উদ্ধৃত করি :

> পাকিস্তান-আন্দোলন একটি স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক ভাষারীতি—আরবি-ফারসির উৎকট আতিশয্য যার চারিত্র্য...। এ পাকিস্তানিকরণ-আন্দোলন শুধু বাংলা শব্দভাণ্ডারকেই আক্রমণ করেনি, তা হানা দিতে চেষ্টা করে বাংলা বাকভঙ্গি পর্যন্ত। এ উৎকট প্রক্রিয়া কী রকম ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় 'দাতা কর্ণে'র বদলে 'দাদা হাতেম', 'বিদ্যাদিগগজে'র বদলে 'এলেমের জাহাজ', 'সতী সাবিত্রী'র বদলে 'সতী রহিমা', 'জুতো শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠে'র বদলে 'জুতো শেলাই থেকে টুপি শেলাই তক', 'জন্মান্তরের' বদলে 'কেয়ামতের দিন পর্যন্ত' ব্যবহারের প্রস্তাবে।"[১৯]

শুধু যে শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে বা পুরোনো রচনার শব্দ পালটিয়ে (নজরুলের কবিতায় 'ভগবান'-এর বদলে 'রহমান') বাংলাভাষার ওপর আঘাত আনার চেষ্টা হল তা নয়, "বানান-সংস্কার' ও হরফ-বদলের উদ্যোগও নেওয়া হল। বলা বাহুল্য, সবেরই পেছনে ছিল পাক-সরকারের ইচ্ছা ও ফতোয়া। এর পেছনের মতলবটা কী?

> পাকিস্তানি রাজনীতির সার কথা ছিল বাঙালিদের আহত ও পঙ্গু করা। বাংলাভাষা যেহেতু বাঙালি জাতিসত্তার কেন্দ্রবস্তু, তাই পাকিস্তানি সামন্ত শাসকদের আক্রমণের নিরন্তর লক্ষ্য হয়ে ওঠে বাংলা ভাষা ও তার বর্ণমালা ও তার বানান। পাকিস্তানপর্বে বাংলাদেশে রচিত বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার বিষয়ক রচনাগুলোতে দুটি প্রবণতা লক্ষ্যে পড়ে : একটি হচ্ছে বিনাশাত্মক প্রবণতা—সংস্কারের নামে বাংলা বর্ণ ও বানানকে বিকল-বিনাশ করা এর উদ্দেশ্য.....।"[২০]

একের পর এক কমিটি তৈরি হতে থাকল, প্রস্তাব উত্থাপিত হল। অবশ্য যে-সব পরিবর্তনের কথা এ-সময়ে উঠছে, তার ভাবনা শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। চল্লিশের দশকে যখন মুসলমানদের 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার'-এর কথা প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল, তখনই অনেক কিছুর সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছিল "বানান পদ্ধতি ও বর্ণমালার আশু সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা"-র কথা। প্রস্তাবিত হয়েছিল বাংলা বর্ণের সংখ্যা কমিয়ে বানানকে সরল করা এবং সেভাবেই সংস্কৃতের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া। আরো আগে, এমনকী ১৯১৫ সালেই আরবি হরফে বাংলা লেখার সুপারিশ করা হয়েছিল 'আল এসলাম' পত্রিকায়। চল্লিশের পাকিস্তান-আন্দোলনের

সময় অবশ্য বাংলা বর্ণমালার উচ্ছেদের কথা বলা হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই সেই কথা আবার উঠল। ১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে হবীবুল্লাহ্ বাহার প্রস্তাব করলেন, বাংলা বর্ণমালার সংস্কার সাধন এবং আরবি বা রোমান লিপি গ্রহণের সপক্ষে। ১৯৪৮ সালে ফেরদাউস খান তার সপক্ষে পুস্তিকা প্রকাশ করলেন, 'যুক্তি' দিয়ে বোঝাতে চাইলেন বাংলা হরফের তুলনায় আরবি বা রোমান হরফ কেন বেশি উপযোগী। এই সময়ে আরবি হরফের সমর্থনে একটা বড়ো যুক্তি ছিল, প্রত্যেক মুসলমানকে তো কুরআন শরিফ পড়তেই হবে আরবি হরফে, তবে আর বাংলা হরফ শেখার জন্য আলাদা শ্রম করা কেন। আরবি হরফে বাংলা লেখার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষকরাও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার এই হরফ-বদলানোর প্রস্তাবের পেছনে থাকলেও প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৯-এ যে 'পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি' গঠন করেছিল, তারা বর্ণমালা ও বানান-পদ্ধতি সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করলেও বাংলা-হরফ বর্জন বা আরবি-হরফ গ্রহণের প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। তবে এই কমিটি সংস্কৃত-বাংলাকে 'সহজ বাংলা' করার জন্য ব্যাকরণ, বাগ্‌ভঙ্গি, শব্দসম্ভার ইত্যাদি ব্যাপারেও "আক্রমণাত্মক ভূমিকা" নিয়েছিল। তাদের প্রস্তাবসমূহ প্রকাশিত হয় বেশ পরে, ১৯৫৮-তে, কিন্তু এর মধ্যেই লোকের মুখে-মুখে তা প্রচারিত হওয়ার ফলে বিরুদ্ধ-জনমত গড়ে ওঠে। লিখিত হয় বিভিন্ন ব্যক্তির "প্রতিরোধাত্মক" প্রবন্ধ, "যার লক্ষ্য বিজ্ঞানমনস্ক বিশ্লেষণ ও জাতীয় আবেগের সাহায্যে সরকারি ষড়যন্ত্র রোধ।"[২১] অবশ্যই সমর্থকও ছিলেন অনেকেই, মুনীর চৌধুরী যাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, "ভাষাতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, ব্যাকরণের মর্মোদ্ধারে অনভ্যস্ত, অভিধানে অনাস্থাবাদী, তাঁরাই নির্দ্বন্দ্বচিত্তে ব্যাপকতম সংস্কারের সোপারেশ করেছেন এবং গভর্নমেন্টের শরণাপন্ন হয়েছেন নিজেদের প্রস্তাব অনুযায়ী আইন জারি করার জন্য।"[২২]

তবু, গোটা পাকিস্তানি আমলেই, বিশেষত আইয়ুব খানের সময়, চেষ্টা চলতেই থাকল বাংলা বর্ণমালা ও বানান-সংস্কারের এবং বাংলা ও আরবি-উর্দু মিশিয়ে একটি "সাধারণ ভাষা", অর্থাৎ পাকিস্তানি বাংলাভাষা তৈরি করার। সেই দোঁআশলা ভাষা ব্যবহার করে প্রচুর পাঠ্যপুস্তক ও প্রচারপুস্তক লেখা হতে থাকল। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সেগুলো আরবি হরফে ছাপিয়ে বিলি করা হল জেলায়-জেলায়।

১৯৬৬-তে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে বিশেষজ্ঞ পরিষদ গঠন করে বাংলা বানানা-সংস্কারের বিধি রচিত হল। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, তা নিয়ে পরে কিন্তু কোনো উচ্চবাচ্য হল না—সমর্থনও নয়, বিরোধিতাও নয়। বলা যায়, ঠান্ডা জল

ঢেলে দেওয়া হল। বোধহয় সরকারও বুঝতে পেরেছিলেন কোনো লাভ হবে না। ১৯৬৭ সালে "বাংলা ভাষার সংস্কার ও সরলায়নের জন্যে" উদ্যোগ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করেছিল, তাদের রিপোর্ট পেশ করা হল ১৯৬৮-তে। দেখা গেল, কমিটির তিনজন সদস্য (মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী) লিপি ও বানান সংস্কারের বিরোধিতা করছেন। এমনকী একসময়ে যাঁরা লিপি-সংস্কারের সপক্ষে বলেছিলেন, তাঁরাও এখন নিজেদের জায়গা থেকে সরে এসেছেন। তবু প্রস্তাব গৃহীত হল এবং অনেকের কাছেই তা "বাংলা একাডেমীর প্রস্তাবের অনুরূপ ও গ্রহণ-অযোগ্য"।[২৩]

এর কারণ অবশ্যই বৃহত্তর রাজনৈতিক পট। পূর্বপাকিস্তানের স্বাধিকারের আন্দোলন ক্রমশ যতই দানা বাঁধতে লাগল, ভাষা-আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হল, ততই বাংলাভাষার বিরুদ্ধবাদীরা বা উগ্রসংস্কারপন্থীরা আড়ালে চলে গেলেন। তবে আড়ালেই গেলেন, মিলিয়ে গেলেন বলা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের পরে, এমনকী স্বাধীন বাংলাদেশেও, মাঝে-মাঝেই সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার মতো ভাষা-সাম্প্রদায়িকতাও জিইয়ে রেখেছে সে-দেশের অনড় মৌলবাদ। তা টের পাওয়া যায় তাদের নিজস্ব পত্রপত্রিকায়, পুস্তকে বা ভাষণে। এখনও তাই লড়াই করেই টিকে থাকতে হয় খাঁটি বাংলাকে, মান্য বাংলাকে। একসময় বলা হয়েছিল, "বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলন ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বাংলাকে পুনরায় বাংলা"[২৪] করে তুলেছে— সেই বাংলাই তবু স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও সগৌরবে বেঁচে আছে, বিকশিত হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, বাংলাভাষা এমন মর্যাদা বা সম্মান পেয়েছে যা এপার বাংলার মানুষকেও শ্রদ্ধাবনত করতে পারে। অবশ্য বিপথগামিতার চিহ্ন সেখানেও আজ দেখা দিতে শুরু করেছে। আমরা যেমন 'ভারতীয়ত্বের' মোহে, বাংলা ভুলে, "কেউ বা হিন্দির হন্যে, কেউ ইংরেজির হাঙর" অনেককাল—সেই ইংরেজির হাঙর হওয়ার লোভ স্বভাবতই তাদেরও আক্রান্ত করেছে। বাংলাভাষার জন্য মমত্ববোধ বোধহয় আগের অবস্থানে আর থাকতে পারছে না। তবু, এরই মধ্যে, এখনও বলা যায়, বাংলাভাষার যে-চর্চা সেখানে বাস্তব, তার মান কোনো-অর্থেই খাটো নয়, তার লক্ষ্য কখনোই নিচু নয়—সেটাও তো ইতিহাসের বিচারে একটা বড়ো অর্জন।

বাংলায় শিষ্ট ভাষার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ অবশ্য কোনোদিনই ছিল না। শিষ্ট ভাষা—তা সে লেখাতেই হোক কিংবা নাগরিক মানুষের কথাবার্তা, বেতার-দূরদর্শনের ভাষ্য বা সভাসমিতির ভাষণ ইত্যাদিতেই হোক—পূর্ববঙ্গের ভাষা কলকাতার ভাষাকেই অনুসরণ করে দীর্ঘকাল। হয়তো ঠিক হবে বললে, পশ্চিম ও পূর্ব উভয় বঙ্গেরই শিক্ষিত নাগরিকদের শিষ্ট ভাষা কৃষ্ণনগরের পরিশীলিত বাংলা। স্বাধীন বাংলাদেশে

তো বটেই, পাকিস্তানি আমলেও এই দুই বঙ্গের বিদগ্ধ গদ্য ব্যবহারে তেমন কোনো তফাত চোখে পড়ে না। পূর্ববঙ্গের মানুষের উচ্চারণে বা প্রয়োগে আঞ্চলিক উপভাষাগত টান এখনও আছে, হয়তো কিছু-কিছু একান্ত নিজস্ব শব্দের ব্যবহারে বা বাক্যের গঠনেও। কিন্তু সেটা তত ব্যাপক নয়, মুখ্য নয়। তবে, গ্রামীণ স্তরে মানুষের মুখের ভাষাতে উপভাষার ছাপ অনেক বেশি—সেখানে মুসলমান- জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু শব্দ বা বাগ্‌ধারাও আছে, যেটা গ্রামীণ হিন্দুরাও ব্যবহার করে। ফলে এখানে যে তফাত তা হিন্দু-মুসলমানের শুধু নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষ মানুষের গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের পার্থক্যের কারণেও।

ক্রমশই গ্রামের ওপর শহরের প্রভাবের ফলে উভয় বঙ্গেই গ্রামীণ ও নাগরিক ভাষার ব্যবধানটা ঘুচে যাওয়ার দিকেই হয়তো চলেছে। এখনও ব্যবধান দুস্তর, কিন্তু সেই প্রক্রিয়াই তো চলছে। পূর্ববঙ্গের নাগরিক ভাষা যেহেতু কলকাতার ভাষারই অনুসারী দীর্ঘকাল এবং নাগরিক ভাষা ও গ্রামীণ ভাষার ব্যবধান যেহেতু ধীরগতিতে হলেও ক্ষীয়মাণ পূর্ববঙ্গেও, তাই এর ফলে হিন্দু ও মুসলমানের জীবন ও অভিজ্ঞতার ভাষাগত ভিন্নতা যে বাংলাভাষাকেই সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পেরেছিল একদা, তা আর ভবিষ্যতে ঘটবে কিনা সে-বিষয়ে সংশয় হয়। আমরা জানি, মধ্যযুগ থেকে মুসলমান-জীবন ও সংস্কার এবং সেই সূত্রে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যাপক প্রবেশ বাংলার সংস্কৃতি ও ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। এর সঙ্গে পরবর্তীকালে হিন্দু শুচিবায়ুগ্রস্ততার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম রক্ষণশীলতার সৃষ্টি যে 'মুসলমানি বাংলা', তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার পুনরাবর্তন কাঙ্ক্ষিতও নয়। কিন্তু যে স্বাধীন প্রক্রিয়ায় কোনো ভাষা "সচেতন ও স্বাভাবিক ভাবে, স্বেচ্ছায়, নিজের প্রয়োজনে ও শর্তে, আহরণ করে বিভাষী শব্দ",[২৫] তা না ঘটলে তো সেই ভাষারই ক্ষতি। ভাষাগত দ্বন্দ্ব এড়িয়ে হিন্দু ও মুসলমানের সেই ভাষাগত বিনিময়ের পথ কি একেবারেই বন্ধ?

সূত্র-নির্দেশ

১. 'উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য', দেবেশ রায়। সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন স্যোসাল সায়েন্স, কলকাতা। মার্চ ১৯৯০। পৃ ৯০।

২. 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাই', সন্‌জীদা খাতুন। কবি মতিউর রহমান স্মারক বক্তৃতামালার ৬ষ্ঠ বক্তৃতা, ২০০০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ ৬।

৩. 'মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি', সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী। 'একুশের স্মারকগ্রন্থ '৯৪', বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জুন ১৯৯৪। পৃ ২।

৪. 'বঙ্গ ভাষার গতি', সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী। 'বাংলাদেশ : বাঙালি/আত্মপরিচয়ের সন্ধানে' (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত), সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা। জানু. ১৯৯০। পৃ ১১৮।

৫. সূত্র ৩। পৃ ৬-৭।

৬. সূত্র ৩। পৃ ১৩।

৭. 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা', মুহম্মদ এনামুল হক। সূত্র ৪। পৃ ১৫৩-৫৪।

৮. 'অভিভাষণ', মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। সূত্র ৪। পৃ ১৫৬।

৯. ওই। পৃ ১৬৪।

১০. সূত্র ৪। পৃ ১৭৫-৭৮।

১১. 'ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি', হুমায়ুন আজাদ। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা। ১৯৯০।

১২. ওই। প্রথম পরিচ্ছেদ : 'পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব : প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষবৃক্ষ'। পৃ ৮।

১৩. ওই পৃ ১৬।

১৪. 'রবীন্দ্রনাথ : বিবিধ সন্ধান', সন্‌জীদা খাতুন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জুন ১৯৯৪। পৃ ১৫৫-৫৬।

১৫. ওই। পৃ ১৫২।

১৬. 'ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব', আবদুল হক। মুক্তধারা, ঢাকা। ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৫। পৃ ২৩।

১৭. সূত্র ২। পৃ ২৭।

১৮. সূত্র ২। পৃ ২২।

১৯. 'বাঙলা ভাষা'/১ম খণ্ড, হুমায়ুন আজাদ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৮৪। পৃ পঁয়তাল্লিশ।

২০. ওই। পৃ বায়ান্নো।

২১. ওই। পৃ বায়ান্নো।

২২. ওই। পৃ বায়ান্নো।

২৩. ওই। পৃ তেপ্পান্নো।

২৪. ওই। পৃ পঁয়তাল্লিশ।

২৫. ওই। পৃ পঁয়তাল্লিশ।

রচনাকাল : ২০০১

অন্য বাঙালির অন্য ইতিহাস : একাত্তরের স্মৃতি

'একাত্তর' বলতে বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটা জিনিশই বোঝায়—সেই ১৯৭১ সাল, মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ন-মাস পশ্চিম-পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যখন তারা দেশকে স্বাধীন করেছিল। ব্যাপারটা যত সহজ করে বলা হল, অত সহজ নিশ্চয় নয়। পূর্ব-ইতি.হাস আছে। জটিল ধারাবাহিকতা আছে। পরিণতিটাও কম জটিল নয়।

ভাষা-আন্দোলন থেকেই তার শুরু। কেউ-কেউ শুরু করতে পারেন দেশভাগেরও আগে, এমনকী বিশ শতকের মুসলিম জাগরণের সময় থেকেই। উনিশশতকী জাগরণে মুসলমানেরা কেন দূরে সরে রইল সে-প্রসঙ্গ না হয় আপাতত বাদ দেওয়াই গেল। বিলম্বিত জাগরণের কারণেই মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ একটু প্রবল ও উগ্র চেহারা নেবে সে তো খুবই স্বাভাবিক। তার পেছনে সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের আচার-আচরণের পক্ষপাতমূলক ভূমিকাও কম নেই। তাই এই স্বাতন্ত্র্যবোধের যেমন একটা সংগত দিক আছে, তেমনি আছে আতিশয্যের দিক, বিকারের দিক। তারই তাড়নায় জন্ম হল দ্বিজাতিতত্ত্বের। অর্থাৎ বাঙালি পরিচয় নয়, হিন্দু বা মুসলিম পরিচয়ই মৌলিক—এরকম ভুল ধারণা চারিয়ে দেওয়া সম্ভব হল। এই মৌলবাদ যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল মুসলমানদের মধ্যে তাতে সন্দেহ নেই। আলাদা হওয়ার পেছনে অগ্রসর হিন্দুদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে উন্নত হওয়ার স্বপ্নও যেমন ছিল, তেমনি ছিল হিন্দু-বিদ্বেষের ঝোঁক। অর্থাৎ যে-কোনো কারণেই হোক, মুসলমানদের স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটু সুস্থতার দিক ছিল, সত্যও ছিল। কিন্তু তাকে রূপ দিতে গিয়ে বাঙালিত্বের পরিচয়ের বদলে ধর্মীয় পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়াতে ছিল মস্ত এক ফাঁদ।

এই ভুল ভাঙতে অবশ্য দেরি হল না। দেশভাগ এবং ইসলামি রাষ্ট্রের অঙ্গ হিশেবে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব-পাকিস্তানের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় প্রমাণিত হল, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বা জাতিত্ব একটা অলীক ব্যাপার। এটা টের পাওয়া গেল বাংলাভাষার প্রতি পাকিস্তানি কর্তাদের ব্যবহার থেকেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও

উর্দু কেন রাষ্ট্রভাষা হবে, তার কোনো সদুত্তর নেই। ফলে বাংলাভাষার পক্ষে সোচ্চার হওয়ার অর্থই হল ভাষাই যে প্রকৃত সংহতির একটা বড়ো উপাদান তা স্বীকার করে নেওয়া। মুসলমান হলেই উর্দুভাষার দাবিকে মেনে নিতে হবে এই তথাকথিত মুসলিম সংহতির ধারণাকে স্বীকার করে না নেওয়া। ভাষাকে কেন্দ্র করে এই যে বৈষম্য তা তো সবদিকের বৈষম্যেরই চিহ্ন এক হিশেবে। অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি সব ব্যাপারেই দেখা গেল পূর্ব-পাকিস্তানকে হতে হবে পশ্চিম-পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী। চাকরি, স্বাস্থ্য, সম্পদ, জীবনযাত্রার মান, সবদিক থেকে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অসমতা এত বেশি যে, দেশবিভাগের পর থেকে উভয়ের সম্পর্ক শোষক ও শোষিতের। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানে সম্পদ লুণ্ঠন এত ব্যাপক যে পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম-পাকিস্তানের উপনিবেশ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

বাঙালি মুসলমানের এই অনুভব যত স্পষ্ট হয়েছে, যত তারা বুঝতে পেরেছে তাদের জাতি-পরিচয় মুসলমান হিশেবে নয়, বাঙালি হিশেবে, ততই পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা গভীর হয়েছে। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন সেই বিচ্ছিন্নতাবোধেরই প্রথম প্রকাশ। তারপর দুই দশক জুড়ে তাদের প্রতিবাদ শুধু ভাষাকে কেন্দ্র করে নয়, বৈষয়িক ও মানসিক সব ক্ষেত্রেই উচ্চারিত হয়েছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের আধিপত্য আর আড়ালে থাকেনি, প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে। আর যতই তাদের মুঠি শক্ত হয়েছে, ততই প্রতিবাদের ঝড় হয়েছে জোরালো। একটার পর একটা আন্দোলন উঠে এসেছে। আইয়ুবের শাসন এবং ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন তারই একটা চূড়ান্ত পর্যায়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বেরও তো মাত্রাবদল ঘটল, কঠিন শাসন আর প্রবল আন্দোলনের পুরোনো ছক পালটে গেল। পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালির আকাঙ্ক্ষা আর শুধু সীমাবদ্ধ দাবিদাওয়াতেই শেষ হল না, অনিবার্যভাবেই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকারের ঘোষণায় গিয়ে তা থামল। পশ্চিম-পাকিস্তানেরও আর শুধু পুলিশি অত্যাচারে নয়, রক্তাক্ত মিলিটারি আক্রমণে আত্মপ্রকাশ ঘটল। এখন দুই শক্তির মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব তা যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চিম-পাকিস্তানের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতার যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ তার সময়পরিধি।

এই যুদ্ধে ঠিক কারা অংশ নিয়েছিল? একদিকে পশ্চিম-পাকিস্তানের সৈন্যরা—যাদের খানসেনা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত মানুষ। সত্যিই কি আপামর সমস্ত বাঙালিরই যুদ্ধ এটা? অবশ্যই তা নয়, তা হতেও পারে না। পাকিস্তানি চেতনা অনেক বাঙালির মনেই অটুট ছিল শেষাবধি, অর্থলোভ কিংবা নানারকমের সুযোগ-সুবিধা কিংবা ধর্মীয় অন্ধতা তাদের সম্পূর্ণ

ভিন্ন শিবিরে নিয়ে গিয়েছিল। রাজাকার বা আলবদর বা আল-শামসের কথা আমরা শুনেছি। কেউ আবার তারা 'শান্তি বাহিনী'-র সদস্য! সংখ্যার দিক থেকে একেবারে উপেক্ষা করার মতো নয়। তা ছাড়া বহু মানুষ অসহায়ভাবে এই যুদ্ধে মার খেয়েছে, গৃহহারা বা বাস্তুহারা হয়েছে, শরণার্থী হয়েছে—যুদ্ধে তাদের কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না—না এ-পক্ষে, না ও-পক্ষে। তারা ভয়ার্ত হয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে—শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে। যারা পালাতে পারেনি বা পালাতে চায়নি, নিরুপায়ভাবে বা কখনো স্বেচ্ছায় রয়ে গেছে, তারাও সহসা আক্রান্ত হয়েছে, শারীরিক ও মানসিক ভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এরকম নিস্ক্রিয় ভুক্তভোগীদের মধ্যে কোনো-কোনো অংশ হয়তো কালক্রমে সক্রিয় হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে, এমনও দেখা গেছে।

যুদ্ধে লড়াই যারা করেছে, তারা জনসংখ্যার কত অংশ, তার পরিমাপ করা খুবই কঠিন। কারণ এই লড়াইয়ের তো নানা ক্ষেত্র, অংশ গ্রহণেরও নানা ধরণ। কেউ প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছে হয়তো অস্ত্র হাতে নিয়েই, কেউ পরোক্ষভাবে, আড়ালে, নিজের মতো করে হাত বাড়িয়েছে। কেউ সর্বক্ষণের যোদ্ধা হিশেবে জীবন উৎসর্গ করেছে, কেউ সাধ্যমতো আংশিক সক্রিয়তায় নিজের ছোটো ভূমিকা পালন করেছে। সব মিলিয়ে স্বাধীনতার সৈনিক সকলেই।

২

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে যা কিছু হয়েছে, যা কিছুই ঘটেছে, তাকে একসঙ্গে গ্রথিত করার কাজ শুরু হয়েছে প্রায় বাংলাদেশের জন্মের বা স্বাধীনতা-অর্জনের অব্যবহিত পর থেকেই। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সেই কাজ। ক্রমশই সেই কাজের পরিমাণ ও মাত্রা বেড়েছে। ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র। আগে যে কাজগুলো হচ্ছিল, তা-ই যেন সংহত রূপ পেল এখানে। এদের কাজের বিবরণ থেকেই বোঝা যাবে, কী কী কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল—"মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত যাবতীয় সরকারি-বেসরকারি দলিল-দস্তাবেজ, দেশী-বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত মূল ভাষ্য, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের রিপোর্ট, বিবৃতি, চিঠিপত্র, ইশতেহার, মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ-তৎপরতার সংবাদ, মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ে দেশবিদেশের প্রকাশিত গ্রন্থ ইত্যাদি সংগ্রহ"। এ তো গেল মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের কাজ। এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৫ খণ্ড দলিল প্রকাশিত হয়েছে—"এগুলো স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস-লিখন ও মুদ্রণ-প্রকল্পের সংগৃহীত সাড়ে তিনলক্ষ পৃষ্ঠা দলিলের মধ্যে সাড়ে তেরো হাজার পৃষ্ঠা দলিল

নিয়ে সংকলিত হয়েছে।" কবি হাসান হাফিজুর রহমানের স্বপ্ন আজ সফল। সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হিশেবে আঞ্চলিক ইতিহাস লেখাও শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন তাঁর বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের সহায়তার দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের বিবরণী তুলে ধরার কাজ করে যাচ্ছেন দীর্ঘকাল ধরে—এই বোধ থেকেই যে "কোনো দেশ ও সমাজের সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার আগে সেই দেশ ও সমাজের আঞ্চলিক ইতিহাসের উদ্‌ঘাটন প্রয়োজন, যার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে সাধারণত রচিত হয়ে থাকে জাতীয় ইতিহাস।" দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত বই 'মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডটিতে অন্তত পনেরোটি অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে পরবর্তী খণ্ডগুলিতে তা আরো সম্প্রসারিত হবে। আলাদা করে তাজুল মহম্মদের 'সিলেটের যুদ্ধকথা' বা আরো অনেক আগে আবুল কালাম আজাদের 'মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা/পাবনা জেলা'-র মতো বইও তো আমরা পেয়েছিলাম। কাজ আরো হচ্ছে। এমনকী লোকের মুখের কথা থেকে আহরিত তথ্য অবলম্বন করে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের কথাও ভাবা হচ্ছে।

এই সব কিছুর মধ্যেই, বলা বাহুল্য, স্মৃতির একটা বড়ো ভূমিকা আছে। তা ছাড়াও সরাসরি স্মৃতিনির্ভর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লেখনেরও তো আছেই অন্য আবেদন। তার জাত একেবারেই আলাদা। একাত্তরের যুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিমূলক রচনার সংখ্যা বিপুল এবং প্রতিনিয়ত তা বেড়েই চলেছে। এই যুদ্ধের আঘাত এবং গৌরববোধ অনেকের মনেই এখনো টাটকা। ফলে খুবই স্বাভাবিক ও সংগত যে যুদ্ধের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে লিপ্ত সেইসব মানুষ তাঁদের স্মৃতিধৃত অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করতে চাইবেন। মুক্তিযুদ্ধ কত বিচিত্রভাবে এবং গভীরভাবে অজস্র মানুষকে আচ্ছন্ন করেছিল, তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, তারও সাক্ষ্য এই স্মৃতিকথাগুলি। একাত্তরের শহিদ ডাক্তার আলীম চৌধুরী সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর স্ত্রী শ্যামলী চৌধুরী। সেই স্মৃতিকথনের ভূমিকায় যে-কথা তিনি বলেছেন তা বস্তুত সমস্ত স্মৃতিকথা প্রসঙ্গেই সত্য। তিনি বলেছেন : "যে ঘটনা এ বইয়ে বিবৃত হয়েছে তার প্রত্যক্ষদর্শী আমি।/মহান মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে এ-ঘটনা ক্ষুদ্র এবং অকিঞ্চিৎকর হলেও, তা ইতিহাস। ইতিহাসের সাক্ষী হিশেবে আগামী প্রজন্মের কাছে সত্যের উচ্চারণ আমার নৈতিক দায়িত্ব। উপরন্তু দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান স্মৃতি থেকে অনেক কিছুই আড়াল করে দেয়। পাছে আমার স্মৃতি থেকেও তারা ঝরে পড়ে, তাই তা লিপিবদ্ধ করার তাগিদ অনুভব করেছি।"

স্মৃতিকথার সপক্ষে যা-যা বলার তা যেন সবই বলে দেওয়া হয়েছে এখানে। স্মৃতিকথাও ইতিহাসের অঙ্গ, শুধু ব্যক্তির কাহিনী নয়। এবং ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিকে স্থায়িত্ব দেওয়া এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ তো করতেই হবে সচেতন মানুষকে, কেননা সেই স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে যে-ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যায়, তা সে-দেশের উত্তরসূরিদের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান।

৩

একাত্তরের এই স্মৃতিকথাগুলির ধরণও ভিন্ন-ভিন্ন। কেউ-কেউ সামগ্রিকভাবেই এই সময়ের কথা বলতে চান, কেউ কোনো একটি বা কতকগুলি ঘটনা সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে দেন। ফলে, সংক্ষিপ্ত পরিসরের টুকরো কথা যেমন আছে, তেমনি এক বা একাধিক খণ্ডে রচিত বৃহৎ বিবরণও পাওয়া যায়, যাকে মহাকাব্যোপম বলা হয়েছে।

এই সূত্রেই মনে পড়ে যাবে রশীদ হায়দার সম্পাদিত বইগুলোর কথা। ১৯৮৯-এ '১৯৭১ : ভয়াবহ অভিজ্ঞতা' নামে যে-সংকলনটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তাতে ১৯৭১-এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেকটি মাস ধরে পঞ্চাশ জন ব্যক্তির ভয়াবহ স্মৃতি বর্ণিত হয়েছে। সম্পাদকীয় নিবেদনে বলা হয়েছে :

> পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর-শান্তি কমিটির সদস্যরা স্বাধীনতাকামী বাঙালির ওপর যে কী পরিমাণ ও কত প্রকার অত্যাচার করতে পারে তার কিছু প্রমাণ যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাঁদের লেখাতেই পরিস্ফুট হয়েছে।....
>
> কে না জানেন ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর বাংলাদেশ ছিল একটি বন্দীশালা, যেখানে অবস্থানরত প্রতিটি মানুষ প্রতিটি প্রহর অতিক্রম করেছে মৃত্যু সামনে রেখে, অনিশ্চয়তায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে? দেশের ভেতরে অবস্থানরত মানুষরাই একাত্তরের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছে সবচেয়ে বেশি, এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁদেরই অভিজ্ঞতার প্রমাণ এই সংকলন।

লেখকদের মধ্যে অনেকে পরবর্তীকালে বিশদভাবে লিখেছেন, কিন্তু এই সংকলনের লেখাতে সংক্ষিপ্তভাবে ও তীব্রভাবে সেই অভিজ্ঞতা যতটুকু ভাষা পেয়েছে এবং পরপর সব মিলিয়ে যে-অভিঘাত তৈরি করেছে, তার তুলনা নেই। মন্টু খান বা জাহানারা ইমাম বা শ্যামলী চৌধুরীর লেখাগুলিই তার উদাহরণ। বাস্তবের এইসব প্রত্যক্ষ বিবরণ এতটাই আলোড়িত করে যে অনেকেই বার-বার নাৎসি-আক্রমণ বা নাৎসি-পীড়নের কথা স্মরণ করেছেন।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। জগন্নাথ হলের ছাত্র কালীরঞ্জন শীল তাঁর লেখায় বর্ণনা করেছেন ২৫ মার্চের সেই ভয়াবহ দিনটিতে ল্যাট্রিনের জানালা দিয়ে নিজেকে গলিয়ে কীভাবে সারারাত্রি তিনি জগন্নাথ হলের তিনতলার কার্নিশে শুয়েছিলেন এবং অবিরাম শুনে গিয়েছিলেন বোমা ও গুলির আওয়াজ আর মানুষের আর্তনাদ। সকালে নিরাপদ ভেবে বেরিয়ে এসে ধরা পড়ে গেলেন। তারপর তাঁর কাজ হল মিলিটারির নির্দেশে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা লাশ জড়ো করা। জড়ো করা শেষ হলে সংগ্রহকারীকেও মেরে মিলিটারি পরের শিকারের সন্ধানে যাবে।

কালীরঞ্জন লিখছেন :

> লাশগুলো গাছের নীচে জড়ো করতে লাগলাম।... কতগুলো লাশ এভাবে বহন করেছি ঠিক মনে নেই। তবে শেষ যে লাশটি টেনেছিলাম তা ছিল দারোয়ান সুনীলের। তার শরীর তখনো গরম ছিল। অল্পক্ষণ আগে মরার কারণে কিংবা রোদে থাকার কারণেও হতে পারে। সুনীলের লাশ নিয়ে মাঠের মাঝামাঝি যেতেই হঠাৎ অনেক মেয়েলোক বস্তির দিক থেকে চিৎকার করে উঠল। দেখি মাঠের দক্ষিণ দিকের বস্তির মেয়েছেলেরা মাঠের দিকে আসতে চাচ্ছে আর মিলিটারি মেশিনগান নিয়ে ওদের তাড়াচ্ছে। সামনে চেয়ে দেখি আমাদের থেকে আলাদা করে যে সকল সুইপারদের নিয়ে এসেছিল তাদের গুলি করছে।... বুঝলাম এবার আমাদের পালা। আমাদের আগে যারা লাশ নিয়ে পৌঁছেছিল তাদেরও দাঁড় করিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন খুব জোরে জোরে শব্দ করে কোরানের আয়াত পড়ছিল।...গুলি করল তাদের সবাইকে। বন্ধ হয়ে গেল কোরানের আয়াত পড়া।

একটি লাশ হাতে ধরে পাশের একটি লাশের গায়ে শুয়ে চোখ বুঝে পড়েছিলেন কালীরঞ্জন—কী করে যেন রেহাই পেয়ে গেলেন এবং অনেক কষ্টে, অনেক ধকল সয়ে পৌঁছুলেন বুড়িগঙ্গার ওপারে।

স্মৃতিকথা সংগ্রহে ও সম্পাদনায় রশীদ হায়দারের আরো বড়ো কাজ ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'স্মৃতি : ১৯৭১' নামে আট খণ্ডের সিরিজটি। প্রথমটি বেরিয়েছিল ১৯৮৮-তে, অষ্টমটি ১৯৯৫-এ। জানি না, এর পরেও কোনো খণ্ড বেরিয়েছে কিনা। চতুর্থ খণ্ডটিও এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। সেটি বাদ দিয়ে আপাতত ১৭৯ জনের স্মৃতি ছাপা হয়েছে। এঁদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ আছেন—প্রকৌশলী, আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, পুলিশ, নাট্যকার, গায়ক, লেখক ইত্যাদি। প্রথম খণ্ডটির ভূমিকায় বাংলা একাডেমীর

মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল লিখেছিলেন, "বাংলাদেশের শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে এরকম কত রক্তাক্ত মা-বোন, ভাই-বন্ধু, পত্নী-প্রিয়জন শোকের দুর্বহ ভার আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন।" তাঁদের সেই শোক-লিখনই এই গ্রন্থমালায়। বস্তুত '১৯৭১ : ভয়াবহ অভিজ্ঞতা'-র সঙ্গে এই বইগুলোর তফাত এখানেই। অভিজ্ঞতার কথা এসেছে কোনো ব্যক্তির সূত্রে—তাতে মুনীর চৌধুরী, গোবিন্দচন্দ্র দেব, শহীদুল্লাহ্ কায়সার, ডাঃ মোহাম্মদ মোর্তজা, জহির রায়হান, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের মতো স্বনামধন্য ব্যক্তিরা যেমন আছেন, তেমনি আছেন এমন অনেকেই যাঁরা আমাদের কাছে হয়তো ততটা পরিচিত নন, কিন্তু স্মৃতিকথা পড়তে-পড়তে স্পষ্ট হয় তাঁরা নানা দিক থেকেই বিশিষ্ট। লেখকেরা যেহেতু সেইসব ব্যক্তির নিকটজন, তাই এখানে ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলো ধরা পড়ে—"স্বজন হারানোর নিদারুণ কষ্ট"ও প্রকাশ পায় তাঁদের ভাষায়। সপ্তম খণ্ডের ভূমিকায় বাংলা একাডেমীর সে-সময়ের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ তাই বলেন :

> ....স্মৃতিচারণসমূহে যে তথ্য ও বিবরণ লাভ করি, তা যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসের জন্যে এক অনন্য উপাদান। সেই উপাদানে মিশ্রিত আছে স্বজন হারানোর নিদারুণ কষ্ট এবং সেই কষ্টই আমাদের স্বাধীনতা, ইতিহাস ও জাতীয় সত্তা সম্পর্কে সচেতন করে ভবিষ্যৎকে আরো অর্থময় করবে....।

প্রতিটি খণ্ড প্রকাশের সময়ই স্বীকার করা হয়েছে, প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে "সকলের মধ্যে যে গভীর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় তা ছিল অকল্পনীয়, অচিন্ত্যনীয়।" শুধু ঢাকাতেই নয়, পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে ২৫ মার্চ থেকে যে-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সব লেখাগুলি জুড়ে তার একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি যেন পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই বিভিন্ন জীবিকা ও মতামতের মানুষেরা একটা বড়ো পরিবর্তনের জন্য যে অপেক্ষা করছিলেন তা অনুভব করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়-চত্বরের অবস্থা, ভয়ংকর কয়েকটি দিনরাত্রি কেটে যাবার পর শহর ছেড়ে পালানোর দৃশ্য, হাসপাতালের ভিড়, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করার মরিয়া চেষ্টা আর তারই মাঝখানে লাগাতর কারফিউ, গোলাগুলির শব্দ এবং মৃত্যু—বারবার ফিরে এসেছে ঢাকাবাসীদের স্মৃতিতে। শহরতলি এবং মফস্বলে সেই একই বাতাবরণে নতুন-নতুন ঘটনা ও দৃশ্য। পাঠক হিশেবেও আমরা বিস্ফারিত চোখে সেইসব লক্ষ করি। পড়ি ১৪ ডিসেম্বর দুপুরবেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী কীভাবে ভাত খেতে বসার ঠিক আগে মধুরভাষী কয়েকজন রাইফেলধারীর নির্দেশে মাইক্রোবাসে উঠে হারিয়ে যান তার কাহিনী।

কীভাবে একের পর এক মানুষের বুকে সরাসরি গুলি চালানো হয়। কীভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হবে স্ত্রীকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েও আর ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। চট্টগ্রাম বন্দরের প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ শামসুজ্জামান পাহাড়ের চুড়োর বাড়ি থেকে এস-পি সাহেবের বাসায় যান ভেতরের রাস্তা দিয়ে, যুদ্ধের খবরাখবর আনতে এবং সেটাই হয়ে ওঠে তাঁর ধরা পড়ার ও মৃত্যুর কারণ। চট্টগ্রামেরই চিকিৎসক ডঃ মোহাম্মদ শফীর বাড়ির নীচের তলায় মুক্তিযোদ্ধাদের লুকোনো অস্ত্র ধরা পড়ে এবং শফীকে নিয়ে যাওয়া হয়। নেত্রকোনা কলেজের শিক্ষক আরজ আলীকে পাক-মিলিশিয়া জিজ্ঞাসা করে মুক্তিযোদ্ধাদের হদিশ জানতে।

> আরজ ভাই দৃঢ় কণ্ঠে বলল, জানি না। আমি দার্শনিক জি সি দেবের ছাত্র। মিথ্যা বলতে শিখিনি। মুহূর্তে কঠিন হয়ে গেল কর্নেলের মুখ। গর্জে উঠল মেশিনগান। দুজন সৈনিক এসে আরজ ভাইয়ের লাশটি সোমেশ্বরীর খরস্রোতে ফেলে দিল। তলিয়ে গেল আরজ ভাই।

এইভাবে অজস্র কাহিনী ছড়িয়ে আছে স্মৃতির খাতায়। শুধু রশীদ হায়দারের সম্পাদিত বইতেই নয়, আরো অনেক সংকলনেই এই ন-মাসের পীড়ন ও মৃত্যুর কাহিনী, আত্মীয়-পরিজনের শোক গ্রথিত আছে। নয় মাস ব্যাপী নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, লুণ্ঠন আর ধ্বংসযজ্ঞের পর ১৯৭১-এরই ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। সেই দিনটিও তো অবিস্মরণীয় সেই দেশের মানুষের কাছে। 'বিজয়ের মুহূর্ত : ১৯৭১' সংকলনটি থেকে পাই সেই "বিজয়ের মুহূর্তের অনুভূতি"। ২৩ জন লেখক শিল্পী সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা সেই দিনটিকেই যেন ফিরিয়ে এনেছেন তাঁদের স্মৃতিকথায়।

> যুদ্ধ শেষ খবরটা যখন শুনলাম, তখন মনে হয় আল্লাহ্‌র শোকরানা আদায় করেছি। যতটা উচ্ছ্বসিত হওয়া উচিত ছিল, যতটা আনন্দ করা যেত, ততটা করতে পারিনি/'যুদ্ধ শেষ' কথাটা শুনলেই থেকে থেকে মনে পড়ছিল মেয়েদের কথা। মায়ের মন তো...। কেবল মনে হচ্ছিল, ওরা কেমন আছে, কোথায় আছে? কখন ওদের দেখব? (সুফিয়া কামাল)।
>
> সত্যি কথা বলতে কি, ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয়-মুহূর্তে আমার অনুভূতি কী ছিল আজ তা শত চেষ্টা করলেও বলতে ব্যর্থ হব। সেই মুহূর্তগুলোর বিবরণ দেয়ার মতো ভাষা আমার জানা নেই। তবে এটুকু বলব, সেদিনের মতো আনন্দ জীবনে আর কখনো পাইনি। (শামসুর রাহমান)।
>
> আমার নিজের বোঝাটি কাঁধে নিয়ে জেলগেটের বাইরে রাস্তায় পা দিতে কেবল দেখেছিলাম জেল থেকে সদ্য বেরিয়ে যাওয়া শত শত বন্দীর

পরিত্যক্ত কয়েদি-পোশাকের স্তূপ। সেই স্তূপের মধ্য দিয়ে আমি আর এক বন্দী ১৭ ডিসেম্বর মুক্তির সড়কে পা দিয়েছিলাম। ১৬ ডিসেম্বর নয়, ১৭ ডিসেম্বরের এই খণ্ডচিত্রটি আমার স্মৃতিতে এখনো থেকে থেকে ভেসে ওঠে। (সরদার ফজলুল করিম)।

ভূগর্ভস্থ একটি বাঙ্কার।... এই বাঙ্কারের পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের ক্যান্টনমেন্টে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে আসছে একজনের পর একজন নগ্ন বাঙালি তরুণী।/জীবনে আমি এমন দৃশ্য দেখিনি (আর দেখতেও চাই না)। সেই আর্ত, বিষাদমলিন তরুণীদের সারা নগ্ন দেহে অত্যাচারের চিহ্ন। মুখ, স্তন, ঊরু এবং বাহুতে ক্ষতের চিহ্ন। মনে হচ্ছিল তারা যেন পাথরের স্ট্যাচু। কারো চোখে পানি নেই। (আবদুর গাফ্‌ফার চৌধুরী)।

৪

একাত্তরের স্মৃতির সেরা বই হিশেবে গণ্য জাহানারা ইমামের লেখা 'একাত্তরের দিনগুলি'। এই বইটি এবং জাহানারা ইমাম নিজেও বাংলাদেশে এখন প্রবাদতুল্য। জাহানারা ইমাম ছিলেন একসময়ের ভালো ছাত্রী, বিয়ের পর ভালো অভিজাত গৃহবধূ এবং দুই সন্তানের মা। কিন্তু সেই জাহানারারই জীবন তোলপাড় হয়ে গেল যখন তাঁর বড়োছেলে রুমী একাত্তরের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঢাকায় থেকেই গেরিলা যুদ্ধ। জাহানারা নিজেও জানতেন না, পরে আবিষ্কার করলেন। তারপর শুধুই ছেলের জন্য উৎকণ্ঠাময় অপেক্ষা। মাঝে-মাঝে ছেলে ঘুরে যায়। তার শিয়রে বসে শুভকামনাই শুধু করতে পারেন মা। ছেলের সঙ্গে কথাবার্তায় কাজকর্মের কিছু-কিছু আন্দাজও পান। জাহানারা ইমামও বদলে যান। টুকরো কাগজে লিখে রাখেন নিজের অভিজ্ঞতার কথা। কখনো সাংকেতিক ভাষায়। সে-সব জুড়েই 'একাত্তরের দিনগুলি'। যে-ছবি তা থেকে বেরিয়ে আসে তা অবশ্য খুবই মর্মান্তিক। ঢাকা শহরে একের পর এক গেরিলা অ্যাকশনে অংশ নিতে-নিতেই স্বাধীনতার প্রায় প্রাক্কালে ধরা পড়ে যায় রুমী। রুমীকে পাক-সেনারা কীভাবে অত্যাচার করে তাও জানতে পারেন জাহানারা। রুমীর সঙ্গে জাহানারার স্বামী ও ছোটোছেলেকেও ধরে নিয়ে যায়। শরীফ ও জামী ছাড়া পায়, রুমী পায় না। কোনোদিনই রুমী আর ফিরবে না তাও জেনে ফেলেন তাঁরা। সেদিনের অত্যাচারের পরিণতিতে অসুস্থ শরীফও মারা যান অকস্মাৎ। আর চোখের জলের মধ্যেই স্বাধীনতা চলে আসে জাহানারার জীবনে। এর পর থেকে জাহানারা একেবারে অন্য মানুষ। মুজিবের

হত্যার পর বাংলাদেশে স্বাধীনতার মূল্যবোধ বিপর্যস্ত—তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে-আন্দোলন তার নেত্রী জাহানারা ইমাম। কিন্তু সে তো পরের কথা। একাত্তরের ব্যক্তিগত অতুলনীয় ক্ষতির মধ্য দিয়ে তাঁর যে উপলব্ধি তারই অসামান্য চিত্রণ 'একাত্তরের দিনগুলি'। কোনো তত্ত্বকথা নেই, চোখের সামনে যা ঘটছে তা-ই লিখে যাচ্ছেন। ব্যক্তিগত কাহিনী বলার সুরই সেখানে, তার চেয়ে বেশি কিছু দাবি নেই, কিন্তু বলার গুণে তা ব্যক্তিগতকে ছাপিয়ে যায়, হয়ে ওঠে ইতিহাস। হুমায়ুন আহমেদের ভাষায়, তাঁর নিজের গল্প "কোনো এক অলৌকিক উপায়ে হয়ে গেছে আমাদের সবার গল্প।" সাইয়িদ আতিকুল্লাহ লেখেন, "ঢাকায় গেরিলাদের তৎপরতা নিয়ে এত ভালো বই এখন পর্যন্ত আর কেউ লিখেছেন বলে জানি নে। দলিল-প্রমাণাদি সম্পর্কে উদাসীন বাঙালিদের জন্য জাহানারা ইমাম এক অমূল্য দলিল উপহার দিয়েছেন। মনোজ্ঞ বলে এ দলিলের প্রতি উদাসীন থাকা সহজ হবে না কারো পক্ষে।"

নিতান্তই পারিবারিক গৃহবধূর দিনলিপি। খুবই ঘরোয়া ভঙ্গিতে চোখে যা দেখছেন, কানে যা শুনছেন লিখে রাখেন। স্বামীর কথা, ছেলে দুজনের কথা, তাদের বন্ধুদের কথা, পাড়াপড়শিদের কথা। এত আন্তরিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ যে তার মধ্যেই বেরিয়ে আসে ১৯৭১-এর টালমাটাল দিনের চাপ কীভাবে বাড়ির অভ্যন্তরেও ঢুকে পড়েছে। সহজ কিছুই আর সহজ থাকছে না।

> ২৭ মার্চ ১৯৭১
>
> পঁচিশ নম্বর থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে যাবার পথে লক্ষ করলাম, দলে দলে লোক বাক্স-বোঁচকা ঘাড়ে-মাথায় নিয়ে হেঁটে চলেছে। সমস্ত রিকশা লোকজন-বাক্স-প্যাটরা বোঝাই হয়ে ছুটে চলেছে। একটাও খালি রিকশা চোখে পড়ল না। পথযাত্রীরা মাঝে-মাঝে প্রাইভেট গাড়ি থামানোর জন্য হাত তুলছে। দু-তিনটি বাচ্চাসহ একটি পরিবার আমাদের গাড়িটি থামিয়ে বলল 'আমাদের একটু মালিবাগে নামিয়ে দিবেন? একটাও রিকশা পাচ্ছি না।'
>
> আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'আমাদের নিজেদেরই আত্মীয় আনা-নেওয়া করতে হবে। হাসপাতালে আমাদের আগুনে-পোড়া রুগি আছে।' আমাদের সময় নেই। মাপ করবেন।'
>
> না পেরে খুব খারাপ লাগল। কিন্তু এখন মালিবাগে যাবার সময় নেই আমাদের।
>
> হাসপাতালের আউটডোর গেটে ঢোকার আগে রুমী আরেকবার 'ও গড!' বলে ব্রেক কষে ফেলল। পাশেই শহিদ মিনারের স্তম্ভগুলো গোলার আঘাতে

ভেঙে দুমড়ে মুখ থুবড়ে রয়েছে। আমার দু-চোখ পানিতে ভরে গেল। এ কি করেছে ওরা! শহিদ মিনারের গায়ে হাত? চারদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাথায় জাল-দেয়া হেলমেট পরা সৈন্য। আমি চাপা-স্বরে বললাম, 'রুমী, ভেতরে ঢোকো। সময় নেই বেশি।'...

পুরো হাসপাতাল লোকে লোকারণ্য।

২১ এপ্রিল ১৯৭১

রুমীর সাথে কদিন ধরে খুব তর্কবিতর্ক হচ্ছে। ও যদি ওর জানা অন্য ছেলের মতো বিছানায় পাশ-বালিশ শুইয়ে বাবা-মাকে লুকিয়ে পালিয়ে যুদ্ধে চলে যেত, তাহলে একদিক দিয়ে বেঁচে যেতাম। কিন্তু ওই যে ছোটোবেলা থেকে শিখিয়েছি লুকিয়ে বা পালিয়ে কিছু করবে না। নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছি। রুমী আমাকে বুঝিয়েই ছাড়বে, সে আমার কাছ থেকে মত আদায় করেই ছাড়বে।

কিন্তু আমি কী করে মত দেই? রুমীর কি এখন যুদ্ধ করার বয়স?...

'আম্মা, দেশের এই রকম অবস্থায় তুমি যদি আমাকে জোর করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও, আমি হয়তো যাব শেষপর্যন্ত। কিন্তু তাহলে আমার বিবেক চিরকালের মতো অপরাধী করে রাখবে আমাকে। আমেরিকা থেকে হয়তো বড়ো ডিগ্রি নিয়ে এসে বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হব ; কিন্তু বিবেকের ভ্রুকুটির সামনে কোনোদিনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। তুমি কি তাই চাও আম্মা?'

কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক-প্রতিযোগিতার উজ্জ্বল তারকা রুমী কোনোদিনই বিতর্কে হারেনি প্রতিপক্ষের কাছে, আজই বা সে হারবে কেন?

আমি জোরে দুই চোখ বন্ধ করে বললাম, 'না তা চাই নে। ঠিক আছে, তোর কথাই মেনে নিলাম। দিলাম তোকে দেশের জন্য কোরবানি করে। যা, তুই যুদ্ধেই যা।'

এইসব পড়তে-পড়তেই মনে হয়, যে-কথা লিখেছেন হুমায়ুন আহমেদ, জাহানারা হৃদয়কে পাথর করে লিখেছেন তাঁর ডায়রি।

৫

জাহানারা ইমাম লিখেছেন তাঁর ছেলে রুমীকে নিয়ে। অন্তত তিনটি বই এখন আমার হাতে—তিনজন শহিদকে নিয়ে লিখেছেন তাঁদের স্ত্রীরা। তার মধ্যে ২৫

মার্চের ওই কালোরাত্রে পাকসেনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টার থেকে ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে টেনে হিঁচড়ে বের করে বাসার সামনেই গুলি করে এবং ফেলে রেখে যায়। জ্যোতির্ময় তখনই মারা যাননি। ঘাড়ে গুলি লাগায় সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায় এবং হাসপাতালে দিন কতক শুয়ে থেকে অবশেষে ৩০ মার্চ মারা যান। মৃত্যুর অল্প আগে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা স্ত্রীকে বলেছিলেন, এই ইতিহাস যেন লিখে রাখা হয়। সেই কথা রাখতেই অনভ্যস্ত কলমে বাসন্তী গুহঠাকুরতা লিখলেন 'একাত্তরের স্মৃতি'। ভূমিকায় বলেছেন :

> আমি তাঁকে কথা দিতে পারিনি, কখনোও যে তাঁর কথা রাখতে পারব, তাও ভাবিনি।/ঘটনার আঠারো বছর পর সংবাদের সাহিত্য-সাময়িকীর সম্পাদক আবুল হাসনাত আমাকে দিয়ে শেষপর্যন্ত লিখিয়ে ছাড়লেন। ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় ডঃ এ এফ সালাহ্উদ্দিন সাহেবের তত্ত্বাবধানে ওরাল হিস্ট্রি প্রজেক্টে কাজ করে স্মৃতিচারণমূলক রচনা লেখায় নিজের উপর কিছুটা আস্থা এসেছে, অপর দিকে হাসনাতের পুনঃপুনঃ তাগিদে, ডাইরি দেখে ছক কেটে কেটে পরীক্ষার উত্তরপত্র লেখার মতো করে লিখতে থাকলাম। নিজের লেখার ক্ষমতার ওপর আমার আস্থা ছিল না, কিন্তু পাঠকেরা লেখাটি গ্রহণ করলেন। কেউ চিঠি লিখে, কেউ দেখা করে আমাকে লিখে যেতে উৎসাহ দিতে থাকলেন।

পাঠকেরা কেন লেখাটি গ্রহণ করেছিলেন তা 'একাত্তরের স্মৃতি'-র পাতা ওলটালেই টের পাওয়া যায়। শুধু স্বামীর মৃত্যুর সময়টাই নয়, তার পরে ন-মাস কীভাবে একমাত্র কন্যাকে নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে গেলেন তিনি, সেই অভিজ্ঞতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর বইতে।

এক প্রান্তে এই একাত্তরের মার্চ, আরেক প্রান্তে ডিসেম্বর। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত আগে বেশ কয়েকজন লেখক-বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে মীরপুরের রায়ের বাজারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল—সে-ইতিহাস তো আমাদের জানা। সেই বুদ্ধিজীবীদের একজন ছিলেন ডাঃ আলীম চৌধুরী, আরেকজন শহীদুল্লাহ্ কায়সার। চোখের চিকিৎসক ছিলেন আলীম—নিজের মতো করে সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন ঘটনা ও আন্দোলনের সঙ্গে যোগও রাখতেন। তারই দাম দিতে হল তাঁকে ১৫ বা ১৬ ডিসেম্বর। ওই দিন আরো যাঁদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁদের সবাইকেই। রায়ের বাজারের সেই বধ্যভূমির আলোকচিত্র দেখে তো এখনো আমরা শিউরে উঠি। সেই বধ্যভূমি থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছিলেন একজন—মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। তাঁরই জবানিতে শুনি :

> এর পর বদরবাহিনী আমাদের বাসে করে নিয়ে চলল। কৌশলে চোখের বাঁধন আলগা রাখার সুযোগ হল বলে দেখতে পেলাম সামনে বিরাট এক বটগাছ। তার সুমুখে একটা বিরাট বিল। মাঝে-মাঝে কোথাও পুকুরের মতো রয়েছে। বটগাছের আরো কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম ১৩০ থেকে ১৪০ জন লোককে বসিয়ে রাখা হয়েছে। জল্লাদের দল বেয়নেট দিয়ে হত্যালীলা শুরু করে দিয়েছে। ছুঁড়ছে গুলি। চারদিকে আর্ত চিৎকার। আমি চোখের বাঁধনের কাপড়টি সরিয়ে ফেলে খুব জোরে দৌড় দিলাম।

'একাত্তরের শহীদ ডাক্তার আলীম চৌধুরী' বইটি থেকে এই উদ্ধৃতি। ডাঃ আলীমের স্ত্রী শ্যামলী চৌধুরী এই আদর্শবাদী মানুষটির যে জীবনপরিচয় সংক্ষেপে হাজির করেছেন, তাতে ব্যক্তিগতের সঙ্গে পরিবেশসচেতনতা এত সুন্দর মিশেছে বলেই তাঁর লেখা এত মর্মস্পর্শী হয়েছে। ডিসেম্বরের সেই ভয়াবহ দিনটি দিয়েই শুরু হয়েছে তাঁর লেখা—তারপর ক্রমশই পেছনের দিকে চলে গেছেন তিনি। কিন্তু পাঠকের কাছে বোধহয় সবচেয়ে জ্বলজ্বল করতে থাকে প্রথম অধ্যায়ের সেই উপসংহার :

> ১৫ ডিসেম্বর আলবদরদের বন্দুকের সামনে 'হ্যান্ডস আপ' করা অবস্থায় হেঁটে একটা কাদালেপা ছোটো মাইক্রোবাসে উঠে গিয়েছিল যে মানুষটি, তিনদিন পর ১৮ ডিসেম্বরে সে-ই ক্ষতবিক্ষত একটা লাশ হয়ে ফিরে এল। ঘটনার এই আকস্মিকতা ধারণ করবার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না। তখন কী যে আমার হয়েছিল কিছুই আর মনে নেই। কখন আলীমকে গোসল করিয়ে শাদা কাফনে ঢেকে আজিমপুর গোরস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে কথা আর বলতে পারব না। কেবল আবছা মনে পড়ে, যেন অনেক মানুষের কাঁধে ধবধবে কাফনে মোড়া একটি লাশ ধীরে ধীরে দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। জ্বলজ্যান্ত একজন মানুষ চোখের পলকে এমন করে হারিয়ে যেতে পারে, আমাকে স্থবির করে দিয়েছিল এই ভাবনার আলোড়ন।

বাংলাদেশের সাহিত্যসংস্কৃতি সম্পর্কে যাঁরা সামান্য খোঁজ রাখেন, তাঁরাই জানেন শহীদুল্লাহ্ কায়সারের নাম। সাংবাদিক, 'সারেং বৌ' বা 'সংশপ্তক'-এর মতো উপন্যাসের লেখক শহীদুল্লা "প্রথম বিবাহের বিচ্ছেদের পরে, একাকী জীবনযাপনের সংকল্প ভঙ্গ করে" একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করলেন যাঁকে, তাঁরই নাম পান্না কায়সার—'মুক্তিযুদ্ধ : আগে ও পরে' বইয়ের লেখক। পান্না কায়সারের এই আত্মকথায় বাল্যকাল থেকে বড়ো হওয়ার সমস্ত ইতিহাসই বলা হয়েছে—কিন্তু স্বভাবতই

জোর পড়েছে শহীদুল্লাহ্-র সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বিবাহের পর্বটিতে। পান্না-র আগের জীবন খুব সুখের ছিল না—স্মৃতির দুর্বহ ভার তিনি বহন করেছেন। আর শহীদুল্লাহ্ তো আদ্যন্ত রাজনীতির মানুষ। তাই সেই মানুষটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার অর্থ ওই অভিজ্ঞতার সঙ্গেই জড়িয়ে পড়া। নানা কারণেই দ্বিধা ছিল পান্না-র। কিন্তু "শহীদুল্লাহ্ কায়সারের ইচ্ছাশক্তির প্রবলতাই পান্নার সব দ্বিধা দূর করে দিয়েছিল। তাঁদের বিয়েও হয়েছিল এক বৈপ্লবিক পরিবেশে। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের উত্তাল তরঙ্গময় কারফিউর অস্বাভাবিকতার মধ্যে। জীবনের নতুন পথে শহীদুল্লাহ্ ও পান্নার যাত্রা শুরু।" (আনিসুজ্জামান)।

অল্পকালের মধ্যেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের শরিক হলেন শহীদুল্লাহ্। চোখের সামনে সময়ের বদলের সঙ্গে-সঙ্গে যেন শহীদুল্লাহ্-র বদল ঘটল। পান্না কায়সারের ভাষায় : "৭১-এর দিনগুলোতে শহীদুল্লাহ্‌র যে রূপ আমি দেখেছি সে রূপ ছিল একেবারেই ভিন্ন। ১৯৬৯-এ বিয়ের সময় বা বিয়ের পরের মানুষটি সে আর নেই।" বিয়ের পর ভালোবাসায় বিভোর মানুষটির কথা যেমন পড়ি, তেমনি একাত্তরের সদাব্যস্ত উম্মন মানুষটিও সামনে এসে দাঁড়ান তাঁর লেখায়। কত টুকরো-টুকরো স্মৃতি পান্নাকে উদ্বেল করে। কিন্তু ডিসেম্বরে, স্বাধীনতার দু-দিন আগের এক সকালে আলবদর বাহিনীর লোকেরা যখন শহীদুল্লাহ্‌কে ধরে নিয়ে যায়, তখন তার বর্ণনায় পান্নার কলমও যেন আর চলতে চায় না।

> এ বাড়ির প্রিয় মানুষটিকে ওরা নিয়ে গেল। আমরা কেউ আটকাতে পারিনি। ঘটনাটা ঘটল এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে।...শহীদুল্লাহ্‌কে যখন টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—ছোড়দির হাতটা জোরে ধরে রেখেছিল। হাতটা ছাড়তে চাইছিল না। পাষণ্ডদের নারকীয় হাত থেকে ও বাঁচতে পারল না। ফিরে ফিরে কেবলই পেছনে তাকাল। আমার চোখের সামনে পৃথিবীর সব রং ধূসর হয়ে গেল। আমার আর কিছু মনে পড়ে না।

৬

অ-সাধারণ নন, একেবারেই সাধারণ মানুষ যাঁরা, তাঁদের মধ্যেও একাত্তরের যুদ্ধের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার বিবরণীও জানতে ইচ্ছে করে—হয়তো বাস্তবের আসল ছবি সেখানেই বেশি করে ফুটে ওঠে। এরকম দুটো বইয়ের কথা এই মুহূর্তেই মনে পড়ে যায়।

প্রথমটি সাহিদা বেগমের 'যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস'। এক তরুণীর চোখে দেখা একাত্তর। উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার এক মহকুমা-শহর গাইবান্ধা—সেখানকারই

দশম শ্রেণীর ছাত্রী সাহিদা, ১৯৬৯-এ। খুবই অনুভূতিপ্রবণ, লেখালেখিতেও আগ্রহী, জীবন সমাজ বা পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতন। তাঁরই কলমে আমরা পাই : মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে, ঢাকা থেকে বেশ দূরে, মফস্বল শহর বা গ্রামে যে আলোড়ন ঘটেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। ওপরতলার রাজনীতির কথা আছে বটে, কিন্তু আমাদের নজর কাড়ে সাধারণ মানুষের ঘরোয়া কথা—রাজনীতি নিয়ে অবিশেষজ্ঞ তর্কবিতর্ক, ৬৯-এ গণ-অভ্যুত্থানের ঢেউ, ১৯৭০-এর নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা, এমনকী মুজিবের ভাষণের দিনে গাইবান্ধার ময়দানে চালা ভেঙে পড়ার দুর্ঘটনা। একসময় পড়াশোনা এবং বাবার চাকরি-বদলের সুবাদে ঢাকাতেও যেতে হয়। ফলে এই তরুণীর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই একাত্তরের ঘটনাবলি রাস্তার মানুষের মধ্যেও কী আলোড়ন তৈরি করেছিল তা জানতে পারি। ফিরে যেতে হয় সাহিদাকে গাইবান্ধায়। সেখানেও থাকা চলে না, ফলে আত্মীয়তার সূত্রে গ্রামের বাড়িতে। তাই একদিকে সেই মফস্বল শহরেই লুঠতরাজ, গুজব, খানসেনাদের আক্রমণে পালিয়ে বেড়ানো ইত্যাদি চলতেই থাকে, কিংবা অন্যদিকে গ্রামে গিয়ে ছোট্ট বাড়িতে ভিড়, পারিবারিক অশান্তি ও ক্ষুদ্রতা, রাজাকারদের সরীসৃপ গতিবিধি—সবই সহ্য করে নিতে হয় তাঁকে। এর মাঝখানে কৌতুকও বাদ পড়ে না। তবে বড়োই বীভৎস সেই কৌতুক।

> ছোট চাচী ইলিশ মাছ ভাজছিলেন। মাছের শরীর থেকেই প্রচুর তেল উঠছে। কটুদাদা এসে পাশে বসে বললেন, 'এইবার ইলিশে খুব তেল, তাই না গো বাবিছাব! মড়া মানুষ খাইয়া এইবার নদীর ইলিশে এত তেল। মিলিটারিও মানুষ মাইরা নদীতে ফালায়, মুক্তিবাহিনীও মিলিটারি মাইরা নদীতে ফালায়। মিলিটারিগো এমন তেলতেইল্ল্যা লাশটা খাইয়া ইলিশ একেবারে মিলিটারিগো মতোন তেলওয়ালা অইছে।' কটুদাদার সব কথাতেই এমন রসিকতা।

এইভাবে কখনো গাইবান্ধায়, কখনো দাদা-র বাড়ি, কখনো নানা-র বাড়ি ছোটাছুটি। গ্রামও বদলে গেছে। সেখানে এরকম দৃশ্যও দেখা যায় :

> বাচ্চারা সব ছুটল বুলেট খুঁজতে। এক-একটা গর্তে হাত ঢোকায় আর বুলেট বের করে আনে। যেন ইঁদুরের গর্তে হাত ঢুকিয়ে সাপ ধরে আনছে। উঠোনে মনুচাচার লাশ পড়ে আছে। একদিকে সেই লাশ ঘিরে কান্নার মাতম, অন্যদিকে বাচ্চাদের বুলেট নিয়ে মিলিটারি-মুক্তিবাহিনী খেলার ডামাডোল। শ্যামল বাংলার মাটিতে বুলেটের খেলা শুরু হয়েছে, এ খেলার শেষ কবে, কতদিন?

সাহিদা বেগমের লেখায় এই বাচনের তাৎপর্য নিয়ে বহুমুখী জিজ্ঞাসাও আছে। তাই তিনি বলেন, লেখার প্রায় শেষে, "বাংলাদেশের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি অস্ত্র চিনল। কৃষক, শ্রমিক, জেলে, তাঁতি অর্থাৎ সাধারণ মানুষ অস্ত্র চিনল।"

দ্বিতীয় বইটিতে এনায়েত মাওলা-র 'মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ছবি'। লেখক চট্টগ্রামের বিত্তবান ব্যবসায়ী। চিন্তাভাবনা আছে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কোনো কথাই ছিল না তাঁর। তিনিও কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তারই কাহিনী এখানে। তিনি 'পূর্বকথা'-য় বলেন তাই, "লেখা শুরু করার আগে একটা কথা বলে রাখা ভালো। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়ি ঘটনাচক্রে, কোনো আদর্শগত কারণে নয়। রাজনীতি আমি করিও না, আর বুঝিও না। নেতাদের সঙ্গেও আমার পরিচয় নেই।" চট্টগ্রামে তাঁর বাড়ির নাম 'কাকলী'। সেই 'কাকলী' হয়ে উঠল মুক্তিযোদ্ধাদের মিলবার জায়গা।

> একাত্তরে চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ এলাকার বাসিন্দা ছিলাম আমি। আমার বাড়ির নাম ছিল 'কাকলী' আর এই বাড়িকে ঘিরেই আমার এই স্মৃতিকথা বা কাহিনী যা-ই বলুন, অধিকাংশই আবর্তিত।

জাঁক করে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলেছেন তা নয়, কিন্তু লেখা থেকেই বেরিয়ে আসে এই জেদি ও সাহসী মানুষটির আত্মত্যাগের বৃত্তান্ত। 'কাকলী'-র মালিক হওয়ার সুবাদে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিতে-দিতে আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব হওয়ার ঘটনা।

> যুদ্ধ শেষ। নিজের পরিবারপরিজন নিয়ে আবার বাড়ি ফিরে এসেছি। খুশিরই কথা, কিন্তু যতটা খুশি হওয়ার কথা, ঠিক ততখানি হতে পারলাম না। বারবার মনে পড়তে লাগল, গাড়িটা আগেই গেছে। রোজগার অনেক দিন থেকেই বন্ধ আর এখন চাকরিও নেই। টাকাপয়সা যা ছিল, তা দিয়ে সারা বছর যুদ্ধ করে এখন তার সবই শেষ। অন্যদিকে জমে আছে দেনার পাহাড়/এসেছে স্বাধীনতা।

তা নিয়ে অবশ্য খেদ নেই এনায়েত মাওলার—প্রাপ্তির দিকটিই মনে রাখেন তিনি। তাই শেষ করেন বইটি এই নির্মোহ ভঙ্গিতে :

> স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেক কথা আর অনেক মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাদের কে যে এখন কোথায়, জানি না। কী অবস্থায় আছে, তাও জানি না। নেতারা কিছুদিনের মধ্যেই বুঝেছিলেন যে, আমাকে দিয়ে তাঁদের কোনো কাজ হবে না। ফলে তাঁরাও সরে যান আমার কাছ থেকে। নতুন প্রজন্মের ছেলেরা আজ জানতে চায় সেই যুদ্ধদিনের কথা, সেই যুদ্ধে যাঁরা আহুতি দিয়েছিলেন, তাঁদের কথা। সেসব কথা বলার লোক

এখন দেখি অজস্র। এঁরা কোথা থেকে এলেন, জানি না। চেনা মুখ একটাও চোখে পড়ে না।

৭

'আরেক ধরণের স্মৃতিকথা পাই যেখানে পাকসেনাদের বা তাদের দেশীয় অনুচর রাজাকারদের হিংস্র অত্যাচারের বিবরণ রয়েছে। কখনো তা কারাগারের স্মৃতি হিশেবেই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। '১৯৭১ : ভয়াবহ অভিজ্ঞতা' বইতে শামসের এম চৌধুরী-র 'ছয়বার মৃত্যুদণ্ড', কাজী আল আশরাফের 'কারাগারের দিনগুলো', মুহাম্মদ আবু নূরের 'বন্দীশিবিরের দিনগুলি' এইসব ছোটো-ছোটো লেখাগুলোতেও পীড়নের যে বর্ণনা আছে তা পড়ে স্তব্ধ হতে হয়।

> যতদিন হাসপাতালে ছিলাম ততদিনই অত্যাচার হয়েছে আমার ওপর। পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন-তখন এসে ইলেকট্রিক রাবার তার দিয়ে কিংবা খালি হাতেই অত্যাচার করে যেত। একবার এক পাকিস্তানি সৈন্য এসে আমার ভাঙা পা-টা শূন্যে তুলে ধপাস করে বিছানার ওপর ছেড়ে দেয়। এতে যে কী কষ্ট ও ব্যথা আমি পেয়েছিলাম তা বর্ণনা করা অসম্ভব। সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার ছিল—আমি চিৎকার করতে পারব না, করলে সৈন্যরা আবার অত্যাচার শুরু করবে।/সম্ভবত বর্বর পশুসেনাদের পক্ষেই হাসপাতালের আহত বন্দীর ওপর এরকম অভিনব অত্যাচার করা সম্ভব।" ('ছয়বার মৃতুদণ্ড')।

> এরপর হঠাৎ আমাকে চোখ ও হাত বেঁধে জিপে করে নিয়ে গেল। ক্যাম্প থেকে খুব দূরে নয়। একটা ব্যারাকে নিয়ে চোখ খুলে দিল। এখানে দেখলাম নির্যাতনের অনেক সামগ্রী। দুই দেয়ালের সঙ্গে চেন ঝুলানো।...এরপর আমাকে সাইকেলের টায়ার কাটা অংশ নিয়ে পিটাতে আরম্ভ করল। এরপরও কিছু না বলায় আমাকে উলঙ্গ করল এবং দুই হাত দেয়ালে ঝুলানো চেন দিয়ে বাঁধল। তারপর পিটাতে আরম্ভ করল। মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত শরীর থেঁতলে গেছে। হাতের কবজিতে চেন কেটে বসে গেল। রক্ত ঝরছে। তারপর যখন অসহ্য হয়ে গেল তখন বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও সব বলছি।...তারপর অনেক কষ্টে তাদের আগে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছি সেইভাবে বললাম। ('কারাগারের দিনগুলো')।

> বেশিরভাগ বন্দীকেও তারা উলঙ্গ করে দেখত। একদিন এক বন্দীকে উলঙ্গ করে তার লজ্জাস্থানের পশম অন্য বন্দীদের টেনে উঠিয়ে ফেলতে বলে।

> বাধ্য হয়ে তাই করে। অনেক সময় তারা গভীর রাতে ঘুম থেকে তুলে দু-চারটে চড়-থাপ্পড় দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত। আমরা রাতের বেলায় মেঝের উপর মাথার তলে হাত দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। একদিন রাত প্রায় একটা কি দুটার সময় তারা আমাকে ঘুম থেকে ডেকে ওঠায়। একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার দিল কাউকে দেখতে চাচ্ছে কিনা? মিঠাই খেতে মন চাচ্ছে কিনা? ('বন্দীশিবিরের দিনগুলো')।

তবে অত্যাচারের বর্ণনায় সবাইকে ছাপিয়ে গেছে মন্টু খানের 'হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন' বইটি। শুধু বিস্তৃত বলেই নয়, এই লেখাটি থেকেই বোধহয় সুস্পষ্ট জানা যায় বন্দীজীবনে নির্যাতন কত রকমের হতে পারে—একাত্তরের দিনগুলিতে কত রকমের নির্যাতন সইতে হয়েছিল বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের। তাই এই বইয়ের কোনো-কোনো অধ্যায়ের নাম হতে পারে 'নির্যাতনের বিচিত্র কৌশল' কিংবা 'প্রহারের সেই প্রহরগুলি'।

মন্টু খান ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী এবং বামপন্থী। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং জেলেও কাটিয়েছেন বহু সময়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকসেনাদের হাতে বন্দী হন। তাঁর ওপর প্রবল অত্যাচার চলতে থাকে। শুধু তাঁর ওপরই নয়, অন্যদের ওপর অত্যাচারও তাঁর চোখের সামনে ঘটতে থাকে। সেই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের বিশদ বিবরণ তাঁর বইতে অকপটভাবে প্রকাশ পায়। এর আগে বন্দীজীবনের যে-অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে, তার সঙ্গে তুলনাই হয় না এবারের অভিজ্ঞতার। এই কারণেই বইটির অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয় পাঠকদের মনেও। মুখবন্ধে আনিসুজ্জামান তাকেই প্রকাশ করেন এইভাবে : "এ এক মর্মান্তিক, ভয়াবহ, শোচনীয় বিবরণ। এ বিবরণ যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি অবিস্মরণীয়। অবিশ্বাস্য বলছি এজন্য যে, মানুষ যে এমন অমানুষিক অত্যাচার করতে পারে এবং অত্যাচারিত হয়েও মানুষ যে বেঁচে থাকতে পারে, তা এ বই না পড়লে বিশ্বাস হবার নয়।" আনিসুজ্জামানের মতো অনেকেই লেখাটি পড়তে-পড়তে বারবার স্তম্ভিত হয়েছেন, শারীরিক যন্ত্রণা বোধ করেছেন, এমনকী পড়া বন্ধও রেখেছেন। একাত্তরের স্মৃতির বহু কথনেই পাকসেনাদের অত্যাচারের বিশদ বর্ণনা আছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতায় ভর করে—মন্টু খানের দুঃস্বপ্নময় স্মৃতিতে যেন সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাই জমাট হয়ে আছে।

> এখন ওরা সবাই এক-একজন সম্রাট, প্রশ্নের সাথে সাথে দুচারটে চড়-চাপড়-কিল-ঘুষি তো আছেই। অবশ্য সে-সময় আমার কাছে ওগুলো খুবই মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একজন জিজ্ঞাসা করল—আবে শালে তু মুসলমান হো? বললাম—হ্যাঁ মুসলমান। বলল—পাতলুন উতারো।

খুললাম পাতলুন। একেবারে উলঙ্গ করে ভালো করে পরীক্ষা করতে শুরু করল সকলে মিলে, সত্যিই আমি মুসলমান কিনা। পুরুষাঙ্গ ধরে টানাটানি করল কিছুক্ষণ। এর মধ্যে একজন এসে হঠাৎ দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে যৌন-কেশগুলিতে দিল আগুন লাগিয়ে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগলাম। আমি যন্ত্রণায় যত লাফাই, ওরা ততই উল্লাসে ফেটে পড়ে। বলা বাহুল্য যে এ সময়ে আমার দুই হাতে হাতকড়ি লাগানো ছিল না। শুধুমাত্র ডানহাতেই হাতকড়া ছিল।...

একজন আমার মাথাটা নিচু করে ঘাড়ের উপর ঘোড়ায় চড়ার মতো করে বসল। আমার দু-হাতে হাতকড়া লাগানো এবং দুই বাহু পিছমোড়া করে বাঁধা। এদিকে দুই পায়ের পাতার উপরে সবুট দুই জোয়ান দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করল। যে জোয়ানটা ঘাড়ের উপরে বসেছিল তার হাতে ছিল একটা রোলার, তাই দিয়ে সে আমার পিঠেব উপর পেটাতে শুরু করল।...এইভাবে চলতে থাকে। কিছুক্ষণ পর-পর পায়ের উপরে নাচবার লোক বদল হয়, কিন্তু ঘাড়ের উপর সিন্দাবাদের বুড়ো, কিছুতেই নামে না, বদলও হয় না। তার দুশো ডান্ডা গুনতে চেষ্টা করি, এক-দুই-তিন-চার করে।... মনে আছে ষোলো পর্যন্ত গুনেছিলাম। তার পরের খবর আর বলতে পারি না। যখন আবার সম্বিৎ ফিরে পেলাম তখন আমার শরীর থেকে ওরা সবাই সরে গেছে। কিন্তু পিপাসায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। পানি খেতে চাইলাম। কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না।

সত্যিই পৈশাচিক নির্যাতনের দৃষ্টান্ত—যা ভয়াবহ 'হরর ফিল্ম' কিংবা রোমহর্ষক কাহিনীকেও ম্লান করে দেয়। অন্য দিক থেকে আবার মন্টু খানের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা এবং অপরাজেয় মানসিকতা লক্ষ করেই শামসুর রাহমান বলেছিলেন, এই বইটি পড়তে-পড়তে জুলিয়াস ফুচিকের 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' মনে পড়ে যায় তাঁর।

৮

যাঁরা সরাসরি বন্দুক হাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের স্মৃতিকথার স্বাদ একেবারেই আলাদা।

যেমন, ধরা যাক কাদের সিদ্দিকী, যিনি বাঘা সিদ্দিকী হিশেবে খ্যাত, তাঁর লেখা দু-খণ্ডের 'স্বাধীনতা '৭১' বইতে যুদ্ধক্ষেত্রের বিস্তারিত বর্ণনা আমাদের একেবারে

অন্য জগতে নিয়ে যায়। বিভিন্ন অভিযান বা অপারেশন, রিক্রুটিং, সাংগঠনিক তৎপরতা, থানা দখল, ঝটিকা আক্রমণের পরিকল্পনা, টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ, মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন ইত্যাদির জগৎ। বলা বাহুল্য সমস্ত রণাঙ্গনের বিবরণ এখানে নেই, যে "সীমিত গণ্ডি"তে তিনি কাজ করেছেন, সেই টাঙ্গাইলকে কেন্দ্র করেই নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। স্বাধীনতার পরে, মুজিব-হত্যার পরে, যে উলটো যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই বেদনার্ত পরিবেশেই কাদের সিদ্দিকী অনুভব করেছিলেন নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলা জরুরি, হয়তো নিজের নৈরাশ্যের দিক থেকে পরিত্রাণও। ফলে ডিকটেশন দেওয়া শুরু করলেন। কথা আর শেষ হয় না—এত বলার আছে তাঁর! তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন, সম্পাদনা করেছেন বন্ধুরা—কিন্তু লেখাটি পড়তে গিয়ে বোঝা যায়, তথ্য ও অনুভব এমনভাবে মিশে আছে যে সে-সব কাদের সিদ্দিকীর নিজস্বতাকেই প্রকাশ করে। পুঙ্খানুপুঙ্খ তো বটেই এবং পুঙ্খানুপুঙ্খতাই লেখাটির আসল জোর।

একটি উদাহরণ দিই। পশ্চিম-পাকিস্তানিদের অত্যাচারের লক্ষ্যই ছিল বাঙালি। কিন্তু তার মধ্যে আবার বাঙালি হিন্দুদের বিপদ ছিল আরো বেশি। ফলে, অন্তত সাময়িক বিপদমুক্তির আশায় অনেক হিন্দু নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেবার চেষ্টা করত, মুসলিম আচার-আচরণ রপ্ত করে নিত, এমনকী কখনো-কখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেলত। দীনেশচন্দ্র দেবনাথের লেখা অসামান্য বই 'কত কথা কত স্মৃতি'-তে পড়েছি একাত্তরের যুদ্ধের সময় সাহস হারিয়ে ফেলে তিনি কীভাবে মুসলমান হয়ে যান এবং স্বাধীনতার পর আবার এফিডেবিট করে স্বধর্মে ফিরে আসেন। কাদের সিদ্দিকী-র বইতে এরকম সংখ্যাতীত হিন্দুর প্রাণভয়ে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিবরণ আছে। এবং যুদ্ধের পরে আবার স্বধর্মে ফিরে যাওয়ারও। দুই অনুষ্ঠানেরই পরিহাসের দিকটি কাদের সিদ্দিকী দেখিয়েছেন—সেইসব ব্যক্তিদের প্রায় প্রত্যেকের নামধান সহ।

> শুরু হয়ে গেল হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়ার জোয়ার। কয়েকদিনের মধ্যে তিন-সাড়ে তিন হাজার মুসলমান হয়ে গেলেন। তারা নিয়মিত মসজিদে যাওয়া শুরু করলেন। নভেম্বরের শেষ এবং ডিসেম্বরের দিকে দেখা গেল, নব-দীক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যাই মসজিদে বেশি। শেষপর্যন্ত এমন হল, কোনো-কোনো জায়গায় পাঁচ-ছয়শো জনের নামাজের জামাতে দু-দিনজন প্রকৃত মুসলমান। হিন্দু যাঁরা মুসলমান হয়েছেন তাঁরা কট্টরদের দেখাবার জন্য হলেও রীতিমতো মসজিদে হাজিরা দিচ্ছেন। একদিন নিকুঞ্জবিহারী সাহা নামাজ পড়তে বসে হাঁটুর গুলে চোট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

তাঁকে কট্টরেরা বলে দিল, আপনি শুধু মসজিদে এসে বসে থাকলেই চলবে। তা হলেই আপনি বেহেশতে চলে যাবেন।...
ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে অবস্থার নতুন মোড় নিল। দশ তারিখ মসজিদে প্রায় ছয়-সাতশো লোক মগরেবের নামাজে দাঁড়িয়েছেন। এমন সময় টাঙ্গাইলের আকাশে অসংখ্য যুদ্ধবিমান চক্কর মারতে থাকে। এক সময় জামাতের মাঝখান থেকে ৭/৮ জন দৌড়ে পালিয়ে গেল।...নব-দীক্ষিতেরা নামাজ পড়েই চলেছেন। কেউ উঠছেন, কেউ বসছেন, তাঁরা কোনো নিয়মকানুন জানেন না।...পরদিন আমাদের হাতে টাঙ্গাইল শত্রু-মুক্ত হল, এরপর আর এঁদের মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে হয়নি। ২২ অথবা ২৩শে ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে তিন-সাড়ে তিন হাজার নব-দীক্ষিত মুসলমানেরা টাঙ্গাইল কালীবাড়িতে অনুষ্ঠান করে আবার সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেন। এ অনুষ্ঠানও বিচিত্র। পুরোহিত কিছু জপতপ করলেন। গোবর, সামান্য গোরুর চোনা ও অন্যান্য জিনিশ দিয়ে প্রসাদ বানিয়ে সকলের হাতে এক-ফোঁটা দুই-ফোঁটা করে তুলে দিলেন। সকলে তৃপ্তি সহকারে তা খেলেন। দু-একজন আবার সে প্রসাদ খেতে গিয়ে বমি করে ফেললেন।

যুদ্ধের একেবারে ভেতরের কথা বলতে-বলতে কাদের সিদ্দিকী এরকম বাইরের কথাও বলতে পারেন এবং কৌতুকের সঙ্গেই পারেন। কিন্তু যুদ্ধ নিয়ে গম্ভীর স্মৃতিচারণ আমরা পাই আরো অনেক। রফিকুল ইসলামের 'এ টেল অব মিলিয়নস'-এর বাংলা অনুবাদ 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে'। রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, "আমাদের নিজস্ব ডাইরি, আমার সেক্টরের যুদ্ধ-সংক্রান্ত ডাইরি, যুদ্ধের সময় বিভিন্ন গেরিলা দলের রিপোর্ট—এ সব কিছুই এই গ্রন্থের তথ্য হিশাবে ব্যবহৃত। সামরিক অফিসারদের সাথে আলোচনা করেই এ সব সেক্টরের যুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ করি।" এরই ওপর নির্ভর করে একাত্তরের যুদ্ধের সামরিক ও গেরিলা তৎপরতার বিবরণ এখানে পাওয়া যায়—সঙ্গে-সঙ্গে এসবের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্যের ব্যাপারেও তিনি যে ওয়াকিবহাল তা বোঝা যায়।

মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ তাঁর 'রক্তভেজা একাত্তর' বইতে এবং লেঃ কর্নেল নূরুন্নবী খান তাঁর 'জীবনের যুদ্ধ : যুদ্ধের জীবন' বইতেও রণাঙ্গনের কথাই বলেছেন মূলত। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ। একাত্তরের লড়াইয়ের একেবারে গোড়াতেই পক্ষ ত্যাগ করে যোগ দিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। সেই যোগাযোগেরই বিবরণ এবং যুদ্ধের বাস্তবতা ফুটে

উঠেছে তাঁর বইতে। কর্নেল নূরুন্নবী খানের বইয়ের পরিসর আরেকটু বড়ো। একেবারে শৈশব থেকেই শুরু। ছাত্র-রাজনীতির সক্রিয়তা থেকে সেনাবাহিনীর ব্যস্ততায় চলে গেলেন তিনি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যথোচিত দায় পালন করলেন। পশ্চিম-পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপারেশনে তাঁর যোগ্য ভূমিকা ছিল। সেইসব অভিজ্ঞতাই সাবলীল ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন নূরন্নবী খান।

মাহবুব আলমের দুই খণ্ডে রচিত 'গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে' একাত্তরের প্রত্যক্ষ-যুদ্ধস্মৃতির গ্রন্থমালায় এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। বিশালকায় এই গ্রন্থকে এপিক বলে আখ্যাত করা হয়েছে। সামরিক বাহিনীর কর্তাদের লেখা যুদ্ধস্মৃতি আমরা অনেক পড়েছি। কিন্তু এ একেবারে অন্য লেখা। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধার অভিজ্ঞতা এত অকপট ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে বাস্তবের একটা গভীর দিক আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়। মাহবুব আলম ছিলেন দিনাজপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক গেরিলা-দলের নেতা। সহযাত্রীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, বন্দুক হাতে নিয়ে ঘাসে শুয়ে থেকেছেন, শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য অস্ত্র হাতে উন্মুখ অপেক্ষা করেছেন। এই সব কিছু খুঁটিনাটি রোজনামচার আদলে লেখা হয়েছে। প্রত্যেকটি অপারেশনের পরিকল্পনার কথা বলেছেন তিনি, মানচিত্র এঁকেছেন, যুদ্ধে কী কী হল তা বিবৃত করেছেন। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার পৃষ্ঠার লেখা। ঘটনার শেষ নেই, মানুষের শেষ নেই। বিরাট এর পটভূমি। এত বিস্তৃত পট নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব অন্য কোনো বইতে নেই, এমন দাবি নিশ্চয়ই সংগত। কারো যদি বিষয়ের গুণে রেমার্কের সুবিখ্যাত বইটির কথা মনে পড়ে, তাতেও আপত্তি করা যায় না।

লেখক 'নিজের কথা' অংশে বলেছেন :

> একাত্তরের ঘটনাবলি নিয়ে ইতোমধ্যে অনেককিছু লেখা হয়েছে। যদিও মুক্তিযুদ্ধের সেই ব্যাপক-বিশাল যজ্ঞের তুলনায় এখনো তা খুব বেশি কিছু নয়।...এই গ্রন্থে কেবল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে একটা গেরিলা দলের তৎপরতার কথা, তাদের প্রায় প্রতিদিনের তৎপরতার বিবরণ, যারা এই যুদ্ধের সূচনায় এবং তার অন্তিম লগ্নে সম্মুখসমরে অংশ গ্রহণ করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। বর্তমান গ্রন্থে সেই তাদের কথাই তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। কোথাও কোনো অতিরঞ্জন নেই। যা সত্য, তাই শুধু অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে গল্প বলে যাওয়ার মতো করে। তবে সে গল্প শুধু গল্প নয়। একান্ত বাস্তব সেই গল্প।

৯

রণাঙ্গনের স্মৃতিকথা যদি থাকে এক প্রান্তে, তবে আরেক প্রান্তে আছে সেখান থেকে পালিয়ে অন্য দেশে থেকে-যাওয়ার স্মৃতি। ঠিক পালিয়ে যাওয়া নয়, যদিও গোলাম মুরশিদ তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছেন 'যখন পলাতক'। বরং আরেক স্তরে সেটা যে মুক্তিযুদ্ধেরই কাজ, বিদেশে বসেও, তা টের পাওয়া যায় আনিসুজ্জামানের 'আমার একাত্তর' পড়ে।

এই পালিয়ে-আসা এবং বাইরে থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা—কলকাতা ছাড়াও এর একটা বড়ো কেন্দ্র ছিল ত্রিপুরা-র আগরতলা। তাই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আগরতলার নাম। এর ইতিহাস লিখতে গেলে আগরতলাকে ঘিরে মুক্তিযুদ্ধের যে কর্মকাণ্ড তাকে অনুধাবন করতে হবে। সেই কাজেই ব্রতী হয়ে হারুন হাবীব লিখেছেন বই—'মুক্তিযুদ্ধ : ডেটলাইন আগরতলা'। বইটিকে বলেছেন "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরাকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের যৎকিঞ্চিৎ দলিল"। কিন্তু সেই দলিল-সন্ধানে স্মৃতিকথাটা স্বভাবতই বড়ো হয়ে উঠেছে। আজও আগরতলার পথেঘাটে-বাড়িতে কিংবা বর্ষীয়ান মানুষের মনে, এমনকী সে-সময়ের কিশোরেরও অস্পষ্ট স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ ও তার মানুষেরা বেঁচে আছেন। তাঁদেরই খুঁজে বেরিয়েছেন হারুন হাবীব তাঁর বইয়ের জন্য। একাত্তরের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, "এই ঐতিহাসিক সংকট-সীমায় আগরতলা তথা সমগ্র ত্রিপুরার কিছু অজানা মুখ চিরচেনা হয়ে গিয়েছিল আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। এই মুখগুলো এতই বেশি আপন হয়ে গিয়েছিল যে, সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা যতদিন বেঁচে থাকবেন, হয়তো কখনোই বিস্মৃত হবেন না, ভুলতে পারবেন না তাঁদের কথা। তাঁরা ত্রিপুরা অথবা আগরতলার স্মৃতি।" অন্যদিক থেকে ত্রিপুরার সেই মানুষেরাও ভুলতে পারেননি মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। তাঁদেরও কিছু-কিছু স্মৃতিচারণ সংগ্রহ করে দিয়েছেন হারুন হাবীব। মুখবন্ধে বলেছেন, "স্মৃতি ধারণ করা হয়েছে বরণীয় বেশ কজন মুক্তিযোদ্ধার এবং আগরতলার সংশ্লিষ্ট কজনের। আমার বিশ্বাস, এই লেখাগুলোর ভেতর দিয়ে এমন একটা ছবি উঠে আসবে, যে ছবি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের এক অলিখিত উজ্জ্বল উপাখ্যান।"

আগরতলাকে বিশেষ-অর্থে হারুন হাবীব "আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অলিখিত রাজধানী" বললেও, কলকাতায় বাংলাদেশ-কেন্দ্রিক কর্মচাঞ্চল্য ও আনাগোনা যে অনেক বেশি ছিল সে-বিষয়ে কারোরই সন্দেহ নেই। গোলাম মুরশিদ এবং আনিসুজ্জামানের বইতে সেই একাত্তরের কলকাতাই হাজির হয়েছে। শুধু তাঁদেরই নয়, আমাদের স্মৃতিও আলোড়িত হয় পড়তে-পড়তে।

যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে এত দূরে থাকার কারণে ও-দেশের মানুষের কিছুটা আত্মগ্লানি ও আত্মসমালোচনা থাকতেই পারে। তার চেয়েও বড়ো কথা, নিজেদের মধ্যে ছোটো-ছোটো গোলমাল এবং অনেকসময় আত্মকেন্দ্রিকতাও হয়তো আক্রমণ করে। অতিথি-দেশ সম্পর্কে সংগত বা অসংগত কারণে প্রত্যাশাভঙ্গের বিরক্তিও চলে আসে। সেসব থাকলেও তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টাও যে তাঁরাই করেন, তার প্রমাণও পাওয়া যাবে গোলাম মুরশিদের 'যখন পলাতক'-এ, যার দ্বিতীয় শিরোনাম 'মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি'।

গোলাম মুরশিদ 'কৈফিয়ৎ' দিয়েছেন এই বলে : "মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যাঁরা দেশের ভেতরে ছিলেন, অথবা যাঁরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন—সবারই অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ, তাতে যত নগণ্য অথবা যত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই তাঁরা পালন করে থাকুন না কেন। সত্যি বলতে কি, সবারই বলার মতো একটা গল্প ছিল। আমারও ছিল।... সমস্ত যুদ্ধটাকে আমার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছি।"

আনিসুজ্জামানও তাঁর 'আমার একাত্তর'-এর মুখবন্ধে লিখেছেন : "১৯৭১-এর স্মৃতি যার সঞ্চয়ে আছে, তারই কিছু বলবার মতো কথা আছে। আমি তাদেরই একজন।" এই বিনীত উচ্চারণ তাঁর লেখায় সর্বত্র।

গোলাম মুরশিদ এবং আনিসুজ্জামান দুজনেরই লেখাতে কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধের তৎপরতার যে-বিবরণ আছে তা মূলত এই কাজগুলোকে ঘিরে—মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিভিন্ন সভাসমিতিতে অংশগ্রহণ, লেখালেখি, স্বাধীন বাংলা বেতারের সঙ্গে সংযোগ, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বৈঠক ও কথাবার্তা, ইত্যাদি। দুজনেই দুজনের মতো করে আলাদাভাবে সক্রিয়। অভিজ্ঞতার বর্ণনার সঙ্গে-সঙ্গে যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশ পেয়েছে দুজনের, তাও সবসময় এক নয়। এর মধ্যে গোলাম মুরশিদ দুই বঙ্গেরই সংগীতজ্ঞ ও গায়কদের ভূমিকার কথা অনেকবারই বলেছেন। আনিসুজ্জামান বলেছেন লেখকদের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কথা। তাঁর সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগের কথাও বেরিয়ে এসেছে।

তবে গোলাম মুরশিদের লেখায়, হয়তো অভিজ্ঞতার চাপেই, মাঝে-মাঝে যে অপ্রসন্নতা বা তিক্ততা প্রকাশ পেয়ে যায়, তাকে তিনি এড়াতে পারেন না। একাত্তরের অভিজ্ঞতার এও তো একটা দিক। আনিসুজ্জামান সে-সময়ের কলকাতাবাসের অন্ধকার দিকটি জানেন না তা নয়, কিন্তু আলোর দিকটিই বেশি ফুটে ওঠে তাঁর বইতে। মুখবন্ধে লেখেন, "আমি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটা খণ্ডচিত্র অঙ্কন করেছি। তাতে আমাদের গৌরবের কথা আছে, শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহায়তার কথা আছে, নিজেদের

কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও আছে। আমি কাউকে ছোটো করতে চাইনি, আঘাত দিতে চাইনি। নানারকম অবস্থার চাপে মানুষ অনেক সময়ে অসংগত আচরণ করে ফেলে, সেটাই তার স্বভাব নয়। এই লেখা পড়ে যদি কেউ বা কারো স্বজনেরা ক্ষুব্ধ হন, তাঁদের কাছে আমার একটাই কৈফিয়ত : যা সত্য বলে জেনেছি তাই লিখেছি।"

১০

বাংলাদেশের প্রাবন্ধিক আবদুল হক বলেছিলেন, তিনি তাঁর জীবনে তিনটি বিস্ময়ের মুখোমুখি হয়েছেন। প্রথম বিস্ময় ভাষা-আন্দোলন—যে আন্দোলনে একটি জাতির আত্মপরিচয় ঘটল। দ্বিতীয় বিস্ময় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। যোদ্ধা জাতি হিশেবে বাঙালির তেমন সুখ্যাতি কোনো সময়েই নেই—তবু সেই বাঙালিই এক সশস্ত্র অভিজ্ঞ বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুটোই বাঙালির বীরত্বেরই কাহিনী। কিন্তু তৃতীয় বিস্ময় এই যে-স্বাধীনতা হাতে পেয়েও এত অল্প সময়ের মধ্যে সেই গৌরবকে হারিয়ে ফেলতেও বাঙালির দেরি হল না। তাই এই প্রশ্ন বারবার ওঠে: একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য, স্বাধীনতার অর্জন, বাংলাদেশের জন্ম—এই সবকিছুকে ঘিরে বাঙালির যে-উল্লাস, তা পরবর্তীকালে হারিয়ে গেল কেন? সে-ইতিহাস বলার জায়গা এটা নয়। কিন্তু হারিয়ে যে গেল সেই অনুভব আজকের লেখা একাত্তরের প্রায় সব স্মৃতিকথাতেই গভীরভাবে আছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পেছনে যে স্বপ্ন ছিল, যে মূল্যবোধ ও প্রতিজ্ঞা ছিল, তা বাস্তবে অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেলেও, কিছু মানুষের ভাবনায় তো রয়েই গেছে। তাকে ফিরিয়ে আনা, আবার তার পুনর্জন্ম ঘটানোর জন্যই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আজও চর্চা। সেই চর্চারই একটা বড়ো আশ্রয় মানুষের দুর্মর স্মৃতি। একাত্তরের চেতনাকে ফিরিয়ে আনার জন্যই একাত্তরের স্মৃতি।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. লক্ষ প্রাণের বিনিময়। রফিকুল ইসলাম। ছায়াপথ প্রকাশনী। ১৯৮১।
২. স্বাধীনতা ৭১ (২ খণ্ড)। কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। ১৯৮৫।
৩. একাত্তরের দিনগুলি। জাহানারা ইমাম। সন্ধানী প্রকাশনী। ১৯৮৬।
৪. যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস। সাহিদা বেগম। সাহিত্য প্রকাশ। ১৯৮৬।

৫. স্মৃতি : ১৯৭১ (১-৮ খণ্ড)। রশীদ হায়দার সম্পাদিত। বাংলা একাডেমী। ১৯৮৮-১৯৯৫।

৬. ১৯৭১ : ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। রশীদ হায়দার সম্পাদিত। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী। ১৯৮৯।

৭. কত কথা কত স্মৃতি। দীনেশচন্দ্র দেবনাথ। লেখক-প্রকাশিত। ১৯৯০।

৮. হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন। মন্টু খান। উত্তরণ। ১৯৯০।

৯. একাত্তরের স্মৃতি। বাসন্তী গুহঠাকুরতা। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। ১৯৯১।

১০. মুক্তিযুদ্ধ : আগে ও পরে। পান্না কায়সার। আগামী প্রকাশনী। ১৯৯১।

১১. একাত্তরের শহীদ ডাক্তার আলীম চৌধুরী। শ্যামলী চৌধুরী। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী। ১৯৯১।

১২. মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা/পাবনা জেলা। আবুল কালাম আজাদ। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী। ১৯৯১।

১৩. গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে (২ খণ্ড)। মাহবুব আলম। যথাক্রমে জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ও সাহিত্য প্রকাশ। ১৯৯৩।

১৪. মুক্তিযুদ্ধের ভিন্ন ছবি। এনায়েত মাওলা। সাহিত্য প্রকাশ। ১৯৯৩।

১৫. সিলেটের যুদ্ধকথা। তাজুল মোহাম্মদ। সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৩।

১৬. জীবনের যুদ্ধ : যুদ্ধের জীবন। লেঃ কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম। সাহিত্য প্রকাশ। ১৯৯৩।

১৭. যখন পলাতক/মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি। গোলাম মুরশিদ। সাহিত্য প্রকাশ। ১৯৯৩।

১৮. বিজয়ের মুহূর্ত/১৯৭১। ভোরের কাগজ প্রকাশনী। ১৯৯৪।

১৯. মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত। সাহিত্য প্রকাশ। ১৯৯৪।

২০. রক্তেভেজা একাত্তর। মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ। সাহিত্য প্রকাশ। ১৯৯৭।

২১. আমার একাত্তর। আনিসুজ্জামান। সাহিত্য প্রকাশ। ১৯৯৭।

একটি বাদে প্রত্যেকটি গ্রন্থই বাংলাদেশে প্রকাশিত।

রচনাকাল : ১৯৯৭

বাংলাদেশ ও সাম্প্রদায়িকতা

১৯৮৭-র ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে গিয়ে যে-পরিবেশে ঘুরে বেড়িয়েছি তাতে সাম্প্রদায়িকতা আছে বলে যেন টেরই পাইনি। মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজ, বিশেষ করে তার তারুণ্যের উজ্জ্বল চেহারা দেখে অভিভূত হয়েছিলাম—সেই অনুভব প্রকাশ পেয়েছিল কথাবার্তায়, কোনো-কোনো ছোটোখাটো লেখাতেও অল্পবিস্তর। অবশ্য সেটা নতুন কথাও নয়—জানার জন্য সকলের বাংলাদেশে যাওয়ারও দরকার হয় না। অনেকেই শুধু বই পড়ে, খবরাখবর শুনে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। আমার সেদিনকার সেই উচ্ছ্বাসে যেমন কেউ-কেউ খুশি হয়েছিলেন, তেমনি কেউ-কেউ, এমনকী বাংলাদেশের দু-চারজন বন্ধুও পিঠচাপড়ানো মনে করে একটু বিরক্ত বোধ করেছিলেন। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো প্রতিক্রিয়া—সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুরা আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন অনেকে—এ তো বাইরে থেকে দেখা। আমিও জানতাম না তা নয়, গোটা দেশের চেহারা, আড়ালের চেহারা আর দেখলাম কই—কিন্তু খুশির ওই মুহূর্তে কান দিইনি, কান দিতে চাইনি। তারপর আস্তে-আস্তে অনেক কিছুই তো স্পষ্ট হয়েছে। অনেক কিছুর বদল হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদের ঘটনা ঘটে গেল। একদিনে ঘটলেও ছিল তার লম্বা প্রস্তুতি। চোখের সামনে দেখেছি, কীভাবে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা জোরদার হয়ে উঠল ভারতবর্ষে। পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতা হয়তো একটু আলাদা, তাও আর আলাদা রইল না। প্রতিবেশী বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের খবরও পৌঁছোল একে-একে। কেউ-কেউ ওখান থেকে এসে প্রথমে খবর দিয়েছিলেন তেমন কিছু ঘটেনি। প্রাথমিক স্বস্তিকে চুরমার করে দিল পরবর্তী লুঠতরাজ অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের বিবরণ। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সচেতন মানুষের প্রতিরোধের মিথ আর টিকল না। আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত ১৯৮৭-র অনেক সমালোচনা যেন এখন পায়ের তলায় মাটি পেল। কিন্তু সত্যিই তো আর 'মিথ' নয়—এ রাগ করে বলা—১৯৬৪-তে, এমনকী ১৯৯০-এ কম-বেশি যে সংগঠিত প্রতিরোধ ঘটেছিল তাকে কি ভোলা যায়? তবু ১৯৯২-এ এসে কেন বাংলাদেশেরই বিদগ্ধ পণ্ডিতকে বলতে হল "সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যাবর্তন"—কেন বলতে হল : "এবারেও আমরা

সময়োচিত, সংগঠিত ও কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারিনি। ওই অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ এখন আরো গভীর হবে—কেননা এবারেও সময়মতো প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়নি—এবং আমরা হয়তো তার কিছুই করতে পারব না?"[১] বাংলাদেশ থেকে ফিরে আমার ১৯৯৩-এর অভিজ্ঞতার লেখায় হয়তো মোহভঙ্গের ছাপ ছিল—ফলত বাংলাদেশের বন্ধুরা কেউ-কেউ তা পড়ে একটু আহতও হয়েছেন।[২] কিন্তু সত্যিই কি মোহভঙ্গ? 'মোহ' যদি হয় তবে তো তা ভেঙে যাওয়াই ভালো, সত্যের মুখোমুখি হওয়াই ঠিক। কিন্তু সেখানকার মানুষ এবং তার সব রকমের কৃতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের যে-অনুভব তা তো মোহ-মুগ্ধতার চেয়ে কিছু বেশি, তাই তা ভাঙার কথাই ওঠে না।

জানি, বাংলাদেশে যখন কিছু ঘটে, তখন বাংলাদেশের বন্ধুরা তাকিয়ে থাকেন ভারতের দিকে, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের দিকে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত প্রায়শ তাঁদের হতাশই করে। পশ্চিমবঙ্গেরও অসাম্প্রদায়িক মানুষজন তাকিয়ে থাকেন বাংলাদেশের দিকে। বাংলাদেশে কী প্রতিক্রিয়া হল, কী প্রতিক্রিয়া হবে? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গ ামার সময় বরাবরই তাই ঘটে। আগে দু-একবার সংঘর্ষের সূচনাতেই বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী শক্তি একজোট হয়ে দাঙ্গা রুখতে চেয়েছে তার খবর জেনে আনন্দে ও গর্বে বন্ধুদের মুখ স্মরণ করেছি, নিজের ভেতরও শক্তি পেয়েছি। আজও যে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে বসেছি, সেও তো সে-কারণেই। তা ছাড়া, এক দেশের প্রভাব অন্য প্রতিবেশী দেশের ওপর চট করে পড়ে বলেই বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা তীব্র সংলগ্নতার বোধ যেমন থাকে, তেমনি স্বদেশের সাম্প্রদায়িকতাও কোন দিকে মোড় নেবে সেই দুর্ভাবনায় জানতে হয় অনেক কিছুই। দুই দেশের মানুষ দুই সম্প্রদায়ের মানুষ এমনই জড়ানো বাইরে ও ভেতরে—তাদের মিলন ও বিভেদ মনে-মনে থাকে সব সময়।

বাংলাদেশে কী ঘটছে, সেখানকার সাম্প্রদায়িকতার কী স্বরূপ ও কতটুকু তার বিস্তার, সেখানকার সংখ্যালঘুদের অবস্থা কোথায় পৌঁছোল, তার একটা গোটা ইতিহাস আছে, পরিসংখ্যান আছে, বাস্তবতা আছে—সে-সম্পর্কে আমাদের বাংলাদেশের বন্ধুরা যতটা জানেন তা তো এখানে বসে পুরোটা জানা সম্ভব নয়। বস্তুত সেখানে লেখালেখি ও কথাবার্তা চলছে এবং চলবেও। কিন্তু এর বাইরে আরেকটা দিক আছে। পশ্চিমবঙ্গের বা ভারতের মানুষ হিশেবে, বাংলাদেশের মানুষের অনুরক্ত বন্ধু হিশেবে মনের ভেতর যে-বিপন্নতা জমে উঠছে আজকে, উভয় দেশেরই সাম্প্রদায়িকতার মলিন পরিবেশে, সেই অভিজ্ঞতার ওপর ভর করেই শেষপর্যন্ত পারস্পরিক কোনো অনুভবের সাধারণ্যে পৌঁছুতে পারব হয়তো এরকম কিছু আশা করেছি আমরা সবাই।

বাংলাদেশের মুসলমান, বাংলাদেশের হিন্দু, তাদের সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ও সংঘর্ষ—পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কীভাবে দেখে সেটাও তবে একটা জরুরি বিষয়। কেননা তার ওপরও অনেকটাই নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির গড়নটাও, প্রভাবিত করে তার ভূতভবিষ্যৎ। বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ঠিকভাবে বুঝতে পারবে এমন না-ই হতে পারে, কিন্তু তার মনোভাবের বাস্তবতাকে তো অগ্রাহ্য করা যায় না। তাই বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতাকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভাবনা ও মানসিকতার সূত্রে যদি প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হয়, তবে নিশ্চয়ই তার অনুসন্ধানের পরিধি ও লক্ষ্যও হবে একটু ভিন্ন। এই সব মিলিয়েই এখন ভাবা যেতে পারে : পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দৃষ্টিতে কীভাবে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা ও তার ভাবনা প্রতিভাত হচ্ছে, তার ঠিক এবং বেঠিক, তারও অনুসন্ধানের একটা স্বতন্ত্র এবং প্রয়োজনীয় এলাকা রয়েছে। কেননা বেঠিক যেটুকু তা দূর করার জন্য যেমন নজর থাকা উচিত এই অনুসন্ধানে, তেমনি উলটো দিক থেকে, এই উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক বাস্তবতার অন্য কোনো মাত্রা বা সত্য হয়তো স্পষ্ট হতে পারে যা শুধু অসংলগ্ন বা একপক্ষীয় জিজ্ঞাসায় ততটা পাওয়া যাবে না। বিষয়ের এই স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব ঠিক এই জায়গাতেই এবং পশ্চিমবঙ্গের কোনো লেখকের তা নিয়ে লিখতে চাওয়ার অধিকারও হয়তো সেখানেই।

বাংলাদেশের মুসলমানদের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বলে পরিচিত মানুষের অজ্ঞতা যে কতটা বিপুল, অনেক সময় আমরা তা ঠাহর করতে পারি না। শুধু বাংলাদেশের কেন, নিজের দেশের মুসলমান সমাজ সম্পর্কেও হিন্দুদের অপরিচয় যেন কখনোই ঘুচতে চায় না। কলকাতার হিন্দুদের অজ্ঞতার তবু একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়—এখনকার মুসলমানদের একটা বড়ো অংশই যেহেতু অবাঙালি এবং ভাষাগত অর্থনৈতিক সামাজিক সব দিক থেকেই তাদের সঙ্গে ব্যবধান দুস্তর, তাই পরিচয়ের কোনো সুযোগই ছিল না বা নেই। কিন্তু শুধু অজ্ঞতা বললে কম বলা হয়, মুসলমান এবং বলা বাহুল্য বাংলাদশের মুসলমান সম্পর্কে আজও বহু হিন্দুর যে-মনোভাব তা তাদের আবহমান সাম্প্রদায়িকতারই উত্তরাধিকার, এবং সেই মনোভাবের শুরু যে কবে থেকে হয়েছিল তার যেন ঠিকঠিকানা নেই।

এ-কথা, বলা বাহুল্য, দুই-বাংলার মুসলমানদের সম্পর্কেও সত্য। দাঙ্গার সময় এক ধরণের কথা খুব উচ্চারিত হয়—"সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যুগ-যুগ ধরে চলছে, এবারই তা লঙ্ঘিত হল।" এতে বক্তাদের শুভবুদ্ধি বা শুভাকাঙ্ক্ষা হয়তো প্রকাশ পায়, কিন্তু ঐতিহাসিক বিবেচনা নয়। অবশ্য এর উলটোটাই যে সত্যি তাও

নয়—সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি সবসময় ঘটে চলেছে তাও তো নয়। সব সময় ঘটে না, সব জায়গায় ঘটে না। সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে প্রীতি ও সহাবস্থানের এবং অসাম্প্রদায়িক উজ্জীবনের অজস্র উদাহরণ আছে ইতিহাসে। এক-এক স্থানে এক-এক সময়ে সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত ঘটনা যেমন অনেক ঘটে, তেমনি আবার সৌহার্দ্যের কথাও শোনা যায় অবিরল। বলবার কথা হয়তো এইটুকুই যে, এতদিনেও প্রতিবেশী এই দুই সম্প্রদায়ের নিহিত বিচ্ছিন্নতাকে দূর করা গেল না। বারবার ফিরে-ফিরে আসে, বারবার হানা দেয় এই দুঃসময়। অসাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বল সময়কে গ্রাস করে অপ্রতিরোধ্য এই সাম্প্রদায়িকতা।

পরাধীনতার যুগে বলা হত, এই উপমহাদেশে দাঙ্গার পেছনে আছে ইংরেজ শাসকেরা। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে দেখিয়েছেন হিন্দু-মুসলমানের নিজেরই ভেতরকার বিচ্ছেদের নগ্ন চেহারাটা। দেশভাগ ও স্বাধীনতার আগে হিন্দুদের আচার-আচরণে যে অন্যায় খবরদারি ও উন্নাসিকতা মুসলমানদের নিয়ত অসম্মানিত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ করে রেখেছিল, তারই পরিণতিতে দেশভাগ যতই হিন্দু বাঙালির জীবনে ও মনে ট্র্যাজিক বেদনা এনে থাকুক, আপামর মুসলমানদের কাছে যে তা গভীর আকাঙ্ক্ষার বিষয় হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কী! বস্তুত দেশভাগ না হলে মুসলিম জাগরণ যে-দ্রুততায় এবং যে-সমারোহে ঘটেছিল বাংলাদেশে তা ঘটত কিনা সন্দেহ।

হ্যাঁ, জাগরণ তো বটেই। সবটা আমাদের গোচরেও ছিল না প্রথম দিকে। কিন্তু ক্রমশ আমাদের কাছে, অন্তত পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের শিক্ষিত মানুষজনের কাছে পৌঁছোল সেই জাগরণের খবর। দু-চারটে করে বই এবং পত্রপত্রিকা হাতে পাওয়া যাচ্ছিল এবং তার মধ্য দিয়েই জানতে পারছিলাম নবীন মুসলিম সমাজের কল্পনা ও মননের নতুন স্ফূর্তি। বাঙালির যে-আত্মপরিচয় ক্রমশই ধূসর হয়ে উঠেছিল এ-বঙ্গে, ভারতীয়ত্বের বিস্তারের মধ্যেও বাঙালিয়ানার সুস্থ বিকাশ ঘটানোর যে-দুরূহ সাফল্য আমাদের আয়ত্তে আসছিল না বলে খেদ জমছিল—মনে হল, ও-পার বাংলার নবজাগরণের হাওয়ায় সেই আত্মস্থ বাঙালি-সত্তা তার শরীর খুঁজে পাচ্ছে। আর তা আমাদের কাছেও হয়ে উঠতে পারছে সমানই গ্রাহ্য, সমানই প্রেরণাদায়ক। মুসলমান সমাজের ধর্মীয় বহিরঙ্গ সম্পর্কে যে-ধারণা এ-বাংলায় বদ্ধমূল এতকাল, তাও কেটে যেতে শুরু করল—অসাম্প্রদায়িক পূর্ববঙ্গ আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল। অবশ্য, এটা যে সর্বাঙ্গীণ পরিচয় হতে পারে না তাও জানতাম। পূর্ব-পাকিস্তানের শাসকশক্তি সম্পর্কে কোনো সংশয় ছিল না—নিষ্প্রদীপ নিরক্ষর নিরন্ন গ্রাম যে এখনো অতীতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তাতেও সন্দেহ

ছিল না। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, সীমাবদ্ধভাবে হলেও পালাবদল শুরু হয়েছে, নতুন শক্তির জন্ম হচ্ছে। নতুন চেতনায় সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিঋদ্ধ বাঙালি ওই বাংলায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে—এবার তারা লড়াই করতে পারবে ধর্মীয় অন্ধতা, অশিক্ষা, সামাজিক ও আর্থিক অবিচারের বিরুদ্ধে।

কিন্তু লড়াই তো এত সহজ হতে পারে না। আমরা যাকে জাগরণ ভাবছি সেই মুষ্টিমেয় মানুষের জাগরণ কতদূর ছড়াতে পারে, কতটুকু গভীর হতে পারে, তা জানা ছিল না এমন নয়। সংকীর্ণ এই জাগরণের ক্ষেত্রটুকু বাদ দিলে পড়ে আছে গোটা দেশ, ধর্মীয় গোঁড়ামি যার আবহাওয়াকে শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছে। কলুষিত বা মিথ্যে করে দিতে চাইছে ব্যাপ্ত লোকজীবনের অন্তর্ভূত সহজ এবং উদার মানবিকতাকে। দেশভাগের আগে যে-বাঙালি মুসলমান, অন্তত তার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, হিন্দু-আধিপত্যের চাপে এবং ইংরেজ-বাহিত আধুনিকতা থেকে বিচ্ছিন্নতায় আশা করেছিল, পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মবিকাশ এবার সম্ভব হবে—অচিরেই দেখা গেল সেই আশা কতটা অলীক। কার্যত তারা আরেক আধিপত্যের মধ্যে গিয়ে পড়ল। পশ্চিম-পাকিস্তানের আধিপত্যে আর্থিক ও মানসিক কোনো স্বাধীনতাই সত্য হল না। অনেক দুঃখের বিনিময়ে এবার তারা জানল, দ্বিজাতিতত্ত্ব-নির্ভর সাম্প্রদায়িকতার বোধ থেকে যে-রাষ্ট্রের জন্ম তা তাদের মুক্তি নয়। এও আরেক ঔপনিবেশিক অস্তিত্ব—ধনী ও ক্ষমতাবান পশ্চিম-পাকিস্তানের উপনিবেশ পূর্ব-পাকিস্তান!

কিন্তু ইতিহাসের সত্য এই যে, যতই সীমাবদ্ধ হোক, জাগরণ একবার শুরু হলে তাকে রোখা যায় না। এবং সাম্প্রদায়িকতা থেকে বেরিয়ে এসে আত্ম-উন্মোচন ও আত্ম-স্বাতন্ত্র্য যাকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হল, তা বাংলা ভাষা, আর যেহেতু সেই ভাষাকেও স্বীকৃতি দিতে চায়নি পশ্চিমি শাসকেরা, তাই ভাষার আন্দোলন হয়ে উঠল সব রকমের মুক্তির যে-আন্দোলন তারই সূত্রপাত, তারই আধার।

আমরা, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা সবিস্ময় এই রূপান্তরের সাক্ষী হয়ে রইলাম। বাঙালি-পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গে বাংলাভাষাকেও তো আমরা নিজেরাই আড়ালে ঠেলে দিয়েছি অনেককাল—আমরা তখন, বিষ্ণু দে-র কবিতায় ভাষায়, কেউ হিন্দির হন্যে কেউ ইংরেজির হাঙর—তাই মাতৃভাষা নিয়ে এই আবেগ ও আত্মত্যাগ, যদিও তা থেকে আমরা অনেক দূরে, গভীরভাবে নাড়া দিল আমাদের। চোখের সামনে দেখলাম : ভাষা-আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন পর্যন্ত স্তরে-স্তরে কীভাবে চেতনার উত্তরণ ঘটল, গোটা দেশ জেগে উঠল, ঘুচে গেল এগিয়ে-থাকা আর পেছিয়ে-পড়ার ব্যবধান। ভাষা-আন্দোলনের এই জোয়ার কীভাবে উচ্চ সংস্কৃতিকে শুধু নয়, রাজনীতিকেও

টেনে বের করে আনল তার ক্ষুদ্রতা থেকে। যে-মানুষ কম-বেশি ধর্মীয় সংস্কারে আচ্ছন্ন তাকেও অন্তত সাময়িকভাবে আলোড়িত করতে পেরেছিল সময়। ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ধর্মীয় মৌলবাদের যে-ঘোষণা পূর্ব- পাকিস্তানের আকাশে-বাতাসে সব সময় শোনা যায়, তা-ও। সবচেয়ে বড়ো কথা এটাই, যে-কথা উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন ছোটোবড়ো অনেকেই, "১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত এদেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কোনো ঘটনা ঘটেনি।"[৩] এবং এই সময়টাতেই তো ভাষা-আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা-আন্দোলনে উত্তরণের সময়। ১৯৬৪-তেও যে-দাঙ্গা ঘটেছিল তার প্রতিরোধে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল এই আন্দোলনেরই সৈনিকেরা। আর ৭১-এ চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিনগুলিতে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নিয়েছিল— সম্প্রতি যে-সব রোজনামচা, স্মৃতিচারণ বা তথ্যবিবরণী প্রকাশিত হচ্ছে সেই লড়াইয়ের, পদে-পদে তার সাক্ষ্য। একটি দৃষ্টান্ত হিশেবেই উদ্ধৃত করি দিনাজপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুক্তি বাহিনীর লড়াইয়ের একটি দিনের কথা।

> সিদ্ধান্ত হয় ঈদের আগের দিন সবগুলো দল দু-ভাগে ভাগ হবে এবং সমবেত হবে দু-জায়গায়। নালাগঞ্জ আর গুয়াবাড়িতে। ছেলেরা তাদের নিজেদের মতো করেই ঈদ উৎসব পালন করবে।
>
> তবে নামাজ পড়বে একেবারে সীমান্তের ধার ঘেঁষে। গুয়াবাড়িতে সমবেত ছেলেরা ভারতীয় সীমান্তে উঁচু গড়ের পাদদেশে গিয়ে জামাত পড়বে। নালাগঞ্জে জামাত হবে আমগাছ তলায় পুকুরের পাড়ে।
>
> মুসলমান ছেলেরা যখন ঈদের জামাতে দাঁড়াবে, তখন হিন্দু ছেলেরা কাছাকাছি অবস্থান নিয়ে হাতিয়ার হাতে সতর্ক প্রহরায় থাকবে। হিন্দু সহযোদ্ধাদের দেয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে মুসলমান ছেলেরা নামাজ পড়বে। এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয় গুয়াবাড়িতে একরামুলের কাছে। সোনারবানে বকর ও শামসুদ্দিনের কাছে। নালাগঞ্জে মুসা আর চৌধুরীও সেভাবেই তৈরি হয়। হিন্দু ছেলেরা তাদের মুসলমান ভাইদের নামাজের সময় পাহারা দেবার দায়িত্ব পেয়ে যারপরনাই খুশি হয়ে ওঠে। ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এই যুদ্ধের মাঠে জীবনমরণের মাঝখানেই সবার বসবাস। এক ধর্মের মানুষ ধর্মীয় আচরণ পালন করবে, আর তাদের নিরাপত্তা রাখার জন্য ভিন্ন ধর্মের মানুষ হাতিয়ার হাতে পাহারা দেবে, আমার কাছে এ অভাবনীয় আর মহান মানবিক ঘটনা বলে মনে হয়। হিন্দু ছেলেরা সংখ্যায় বেশি না হলেও ঈদের জামাতের সময় তাদের স্বল্পসংখ্যক সদস্য দিয়েই তারা তাদের মুসলমান ভাইদের কীভাবে নিরাপত্তা বিধান করবে, তার পরিকল্পনায় মেতে ওঠে।

(মাহবুব আলম 'গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে', ২য় খণ্ড। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা। ১৯৯৩। পৃ ৩৯২-৩)।

ইতিহাসের ওই গৌরবজনক মুহূর্তে যে-সব রাজনৈতিক দলের পূর্ব-ইতিহাস খুব উজ্জ্বল নয় এমনকী তাদেরও চরিত্রবদল ঘটে, উত্তরণ ঘটে। রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রেও তা সত্য। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও। কমিউনিস্ট পার্টির মতো ছোটো দল, কিংবা মতের বিভিন্নতা নিয়ে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, যাঁদের পরিচিতির বিস্তার ততটা ছিল না, এ-সময়ে তাঁরা তাঁদের ওই অগ্রসর চিন্তার জন্যই প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। সব মিলিয়ে একটা ঐক্য গড়ে ওঠে। আর সেই ঐক্যের বড়ো জোরই ছিল সাম্প্রদায়িক ভাবনা থেকে মুক্তি—কেননা এই সাম্প্রদায়িকতাই তো মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল তাদের বাঙালি-আত্মপরিচয় থেকে।

কিন্তু এটাই সব সত্য নয়। পুরো বাস্তব নয়। ওই তুঙ্গ মুহূর্তেও, আপামর জনসাধারণ দূরে থাক, অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই চেতনার মুক্তি ঘটেছে, এমন বোধহয় বলা যায় না। বহু মানুষের মধ্যে ওই ঐতিহাসিক মুহূর্তের আলোড়ন স্পর্শ করলেও তাদের ভেতরকার জট দূর হয়নি। ভিতু মানুষ, পিছিয়ে-পড়া মানুষ, স্বার্থপর মানুষ, বিরোধী মানুষ আড়ালে পড়ে গিয়েছিল, কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়েছিল, এটুকু হয়তো বলা যায়। কিন্তু তাও কি সবসময়? স্বাধীনতার লড়াইয়ের দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে বৃত্তান্তকার লেখকেরা হানাদারদের সঙ্গে-সঙ্গে বলেন রাজাকারদের কথা, আলবদর ও আলশামসদের কথা, তাদের নৃশংস আচার-আচরণের কথা। তাদের দুষ্কর্মের তো সীমা ছিল না। প্রতিনিয়ত তারা চেষ্টা করেছে পাকিস্তানি চর হিশেবে মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করতে। তাদের শক্তি খর্ব হয়নি, ভালোই ছিল তারা সে-সময়ে। কিছু-কিছু লোক শাস্তি পেয়েছিল বটে, কিন্তু অনেকেই স্বাধীনতার পরে আড়াল থেকে সামনে এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে এবং নতুন পরিস্থিতিতে শুধু ক্ষমা নয়, প্রশাসনিক ক্ষমতাও পেয়েছে। কিন্তু সে-সব তো পরের কথা। এমনকী স্বাধীনতার লড়াইয়ের সৈনিকদের মধ্যেও দ্বিধা ছিল, সংশয় ছিল, প্রতিক্রিয়া ছিল। প্রগতিশীল বলে কথিত রাজনৈতিক দলের নেতা এবং কর্মীদের মধ্যে ছিল নানারকমের পিছুটান, অন্তর্কলহ। এরই মধ্যে এই জাগরণটাও সত্য। সব মিলিয়ে দল ও মানুষের আন্তরিকতা ও আত্মত্যাগও সত্য, মোহমুক্তিও সত্য—সঙ্গে-সঙ্গে সত্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির এই টিকে-থাকা।

এটা যে কতদূর সত্য তা টের পাওয়া গেল স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই। খুব গর্বের সঙ্গেই তো বলা হয়, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ

আন্দোলন।"[৪] কিন্তু স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ হাওয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্তম্ভ করেই বাংলাদেশ নামক যে-রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, অচিরেই দেখা গেল অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার এক-একটা প্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে যাচ্ছে। চোরা গহ্বরগুলির হাঁ ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। এমনকী মুজিবুর রহমানের মতো মানুষ যিনি তাঁর প্রাক্তন দ্বিধাকে কাটিয়ে এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছিলেন যোগ্য এবং সর্ববাদিসম্মত নেতা, ইতিহাসের প্রবাদপ্রতিম নায়ক, তাঁকেও পিছিয়ে আসতে হয়েছিল এক-পা এক-পা করে। তাঁর আওয়ামী লীগ তো সুসংহত বা শৃঙ্খলা-পরায়ণ পার্টি নয় কোনোসময়ই—যেটুকু সম্ভব হয়েছিল লড়াইয়ের দিনগুলিতে তাও যেন নড়বড়ে হয়ে গেল এখন। মুজিবুরের অসহায়তা, মুজিবুরের সংকট, মুজিবুরের নিরুপায় আপোস-চেষ্টা—সব আমরা দূর থেকেই লক্ষ করতে থাকি বেদনার্ত চিত্তে। মুজিব তো এপার বাংলাতেও হৃদয়ের মানুষ হয়ে উঠেছেন ইতিমধ্যে। একটু অবাকই হই—আমরা নিজেদের পছন্দমতো অজ্ঞ ব্যাখ্যায় ভেবেছিলাম, লড়াইয়ের জমিতে দুই দেশের যে-পরস্পরনির্ভরতা গড়ে উঠেছে, ঘটেছে যে-লেনদেন, তা অত সহজে ভুলিয়ে দেওয়া যাবে না। কিন্তু স্বাধীনতার পরে-পরেই আড়ালে-থাকা মৌলবাদীরা সামনে এসে পড়ল, গ্রাম ও শহরের সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনায়াসে তাতিয়ে তুলল—অরাজকতার মধ্যে সমস্ত আবহাওয়াটাই বিষিয়ে গেল। "বঙ্গবন্ধু সরকার যেসব সাম্প্রদায়িক দলকে বেআইনি ঘোষণা করে তারা তখন কাজ করার নতুন এক কৌশল অবলম্বন করেছিল! বেআইনি ঘোষিত এসব সাম্প্রদায়িক দল রাজনৈতিক ফ্রন্টের বদলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেই তাদের প্রচারণার অবলম্বন হিশেবে বেছে নিয়েছিল। প্রকাশ্য অধিবেশনের পরিবর্তে তারা গ্রামে গিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের খেপিয়ে তুলত।"[৫] বদরুদ্দীন উমরের কথায় জানতে পারি, ভারতবিরোধী জেহাদ আর সাম্প্রদায়িকতা তখন কীভাবে হয়ে উঠল সমার্থক।[৬] কিন্তু, মানতেই হবে, যে-কথা শওকত ওসমান বলেছেন মুজিবুর রহমান সম্পর্কে: "তাঁর অন্যান্য সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে", কিন্তু ধর্মসর্বস্বতা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার এই উত্তরণের চেষ্টায় তাঁর কাজ অবিস্মরণীয়, বিশেষত যখন জানি, "সাম্প্রদায়িকতার মারি-বীজে যে [পাকিস্তান] রাষ্ট্রের জন্ম এবং অস্তিত্ব নির্ভরশীল, সেখানে অসাম্প্রদায়িকতার চেতনাবন্যা বইয়ে দেওয়া কোনো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।" তাই, এর মাঝখানে ১৯৭৫-এ মুজিবের মর্মান্তিক মৃত্যু যখন ঘটল, ততদিনে উলটো হাওয়া বেশ ভালোভাবেই বইতে শুরু করেছে। শোনা যাচ্ছে হীনম্মন্যতার বিকারে ইতিহাসকেই অস্বীকার করার নতুন পালা।

মুজিবের মৃত্যুর পর পটবদলটা প্রায় হুড়মুড় করে ঘটে গেল। ধর্মের সঙ্গে আবার জড়িয়ে পড়ল রাষ্ট্র। ঐসলামিক রাষ্ট্রের যে-ঝোঁক থেকে সরে আসার চেষ্টা হয়েছিল,

তার দিকেই যেন ফিরে যাওয়ার নির্দেশ। জিয়া থেকে এরশাদ—মৌলবাদী শক্তির উত্থানের ইতিহাস। সংবিধানের বদল ঘটল—ধর্ম-নিরপেক্ষতা শব্দটি মুছে গেল। ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করা হল। ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা তুলে ধরার লোক তখনো ছিল না তা নয়—কিন্তু সেটা যতটা শহরের রাস্তাঘাটে, একুশের বইমেলায়, বাড়ির বৈঠকখানার কথায়-বার্তায় এবং মনন ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়, তা দেখে বোঝার উপায় নেই, ভেতরটা কত অনড় এবং সেখানে কোনো আঁচড়ই পড়ে না। প্রগতিবাদীদের কাজকর্মে যতটা চাকচিক্য বা সমারোহ তার বিস্তার ততটা নয়। বরং মৌলবাদীরা খুব সহজেই মানুষের মনের ওই নিশ্চল জায়গাটায় ঘা দিয়ে উলটো পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাদের।

আমরা তো আগেই শুনেছি, জাঁক করে বলা হয়, ১৯৬৪-এর পরে ১৯৯০-এর মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান বা বাংলাদেশ যাই বলি, কোথাও হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়নি। তাই কী? সেখানে অনেককাল থেকেই তো দাঙ্গার ভিন্ন অর্থ। পাকিস্তানি আমলে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী শুনেছি। ভাষা-আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার লড়াই পর্যন্ত বিস্তারিত সময়ে সকল আন্দোলনকারীরাই আক্রান্ত হতেন ঠিকই, এমনকী নিরীহ মানুষেরাও, কিন্তু তারও মধ্যে হিন্দু বাঙালিরা যে পশ্চিমিদের কাছে, রাজাকারদের কাছে প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাই তো সে-সময়ের বিবরণীতে পড়ি : লুঙি তুলে কীভাবে পরীক্ষা দিতে হত! হিন্দু নই, এটা প্রমাণিত করতে পারলে কীভাবে রেহাই পাওয়া যেত অনেক সময়। দাঙ্গা হয়নি, এই অতিকথাকে উড়িয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের লেখকেরাই। "ভারতে প্রবল দাঙ্গা হয় ; কিন্তু সেখানকার সংখ্যালঘুরা মুখ বুজে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচার সহ্য করেন না, রুখে দাঁড়ান কখনো-কখনো। কিন্তু বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে কোনো দাঙ্গা হয় না, এখানে সংখ্যালঘুরা উৎপীড়িত, লুণ্ঠিত হন একতরফাভাবে। রুখে দাঁড়াবার মতো সংগতি কিংবা শক্তি তাদের নেই।"[৮] বাংলাদেশে দাঙ্গা না-হওয়াটার অর্থ তাহলে এই! "প্রতিবেশী ভারতে প্রায় ফি-বছর যখন হিন্দু-মুসলিমে দাঙ্গা বাধে ও প্রাণহানি ঘটে সেখানে বাংলাদেশে ৬৪-এর পরে দাঙ্গার কোনো রেকর্ড নেই। সাধারণত মৃত্যু, বড়ো আকারের লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ না হলে তার সংবাদমূল্য দাঁড়ায় না বলে সাম্প্রদায়িকতার আর কোনো রূপ থাকতে পারে তা যেন সংখ্যাগুরু বুঝতে চায়নি বা বুঝতে পারেনি। ৪৭-এর পর থেকে এ অঞ্চলে [বাংলাদেশে] যে সাম্প্রদায়িকতা চলেছে আমি তাকে বলি রক্তপাতহীন সাম্প্রদায়িকতা...।"[৯] তবে সারা ভারতকে ধরলে এখানেও দাঙ্গার চরিত্র সর্বত্র এক নয়। বাংলাদেশের লেখকেরা যে-কথা বলেছেন তা মূলত ঠিক হলেও, এমনও দেখা গেছে এবারের দাঙ্গায়, ভারতের বহু জায়গায় মুসলমানেরা পড়ে-পড়ে মার খেয়েছে, রুখে দাঁড়াতে পারেনি।

তবে মনের পীড়নই সবচেয়ে দুর্বহ, যা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা ভোগ করেছেন দীর্ঘকাল তুলনাহীনভাবে। প্রতি মুহূর্তে হুমকির মধ্যে, অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে-থাকতে হিন্দুরা যখন দেখে, কীভাবে সব প্রত্যাশাকে চূর্ণ করে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দ তুলে দেওয়া হল সংবিধান থেকে, ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিশেবে গ্রহণ করা হল, তখন তাদের সেই নৈরাশ্যের পরিমাপ করা যায় না। কেউ-কেউ যথার্থই বলেছেন এইসব কাজের "মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া"র কথা—একদিকে "ধর্মের নামে রাজনীতি করে যারা এতদিন জনসাধারণকে শোষণ করেছে", তাদের "পুনর্বাসিত করা", অন্যদিকে মুসলমান ছাড়া আর যে-সব ধর্মাবলম্বী আছে তাদের নির্বাসিত করা।[১০]

হিন্দুদের দেশত্যাগের নানা ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক কারণের কথা বলা হয় বেশি করে। ভারতের অর্থনীতিও অবশ্য খুব সুবিধের মধ্যে নেই। কিন্তু তুলনায় কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এখানে বেশি, এরকম একটা ধারণা সংগতভাবেই গেঁথে আছে শুধু হিন্দুদের মনে নয়, মুসলমানদের মনেও—যে-কারণে যত দিন গেছে দেশত্যাগীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাও গেছে বেড়ে। হিন্দুদেরও অনেকেরই পশ্চিমবঙ্গে নোঙর আছে ঠিকই। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তারা চলে যেতে চায়। অর্থাৎ মানসিকভাবে তারা নাকি পরবাসী। এ অভিযোগ তো ভারতের মুসলমানদের সম্পর্কেও করা হয়। পুরোনো ঢাকার হিন্দু সেলুনেই শুধু কলকাতার রেডিও বাজে না, কলকাতার রাজাবাজারেও রাতভোর শোনা যায় করাচি রেডিও। কিন্তু তবু তো ব্যাপকভাবে মুসলমানদের দেশত্যাগের কথা শোনা যায় না। সে কি তাদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বভাবের জন্যই শুধু? না কি শত গোলমাল সত্ত্বেও ভারতের মুসলমানেরা সেই নিরাপত্তা শেষপর্যন্ত পেয়ে যান, যা বাংলাদেশের হিন্দুরা পাননি? ভারতের রাষ্ট্রীয় বাস্তবে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োগ এখনো সবটা ঝুটা নয়?

কথাটা উলটো করেও ভাবা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বা ভারতের রাস্তাঘাটে যে সুযোগ-সুবিধা ছড়িয়ে নেই, জীবনযাপন সেখানেও যে অতীব দুরূহ; তা জেনেও দেশত্যাগে উন্মুখ বা স্বীকৃত কেন বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘু? সবাইয়ের তো আর পূর্ব-পরিচিত আত্মীয় নেই ভারতে? আর সেই আত্মীয়ই বা কতখানি সমাদর করতে পারবে তাদের? পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে এই উদ্বাস্তুরা কী দুর্দশায় পড়ে সে-খবর কি পৌঁছোয় না তাদের কানে? এমনকী আর্থিক নিরাপত্তার ব্যাপারটা উপেক্ষা করেও কি তারা তাদের চিরচেনা অভ্যস্ত জায়গাতেই থাকা পছন্দ করত না, যদি সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চিতি থাকত কোনো-না-কোনোভাবে? একথা বারবার

বাংলাদেশের লেখকদের লেখাতেই পড়েছি—স্বাধীনতার লড়াইয়ের সময় এবং স্বাধীনতা অর্জনের পরের কয়েকটি বছর বাদ দিলে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা প্রায় সবসময় মনে করেছে, তারা ওই দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিশেবে ঘোষিত হবার পরে তো তা নিয়ে আর যেন কোনো তর্কই রইল না। সংখ্যালঘুর এই ভাবনার মধ্যে অতিরেক যদি কিছু ঘটে গিয়েও থাকে—তবু এই ভাবনাটা তো বাস্তব। সামাজিক আচরণ এবং রাষ্ট্রীয় আইন সেই ভাবনাকেই পাকা করে তুলেছে।

ফলে মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হয় এই সংখ্যালঘুকে প্রায় নিশিদিন। মৃত্যুর ঘটনা কম—সব রকম হিশেব থেকেই আন্দাজ করা যায়। কারণ লাঞ্ছনা প্রতিরোধহীন। আর তাই "রক্তপাতহীন দাঙ্গা" যেন থামে না কখনোই। অবিরল দেশত্যাগ ঘটেই যায়। এভাবে যে সমাধান সম্ভব নয় তা তারা হাড়ে-হাড়ে জানে—আহমদ শরীফের 'দয়া করে ভেবে দেখুন', বা পূরবী বসু-র 'ওরা যাবে না, কেন যাবে না' না-পড়েই জানে : সংখ্যালঘুদের "স্বঘরে, স্বভিটেয়, স্বগাঁয়ে, স্বদেশে, স্বরাষ্ট্রে, স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে"[১১]—না হলে "এ ধরণের দেশত্যাগ বাংলাদেশে পরিত্যক্ত হিন্দুদের আরও দুর্বল অসহায় করে তুলবে।"[১২] কিন্তু তবু যে এই নিষেধ তারা মানতে পারেনি তার কারণ কি এই নয় যে সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার জন্য বাংলাদেশের "এ প্রজন্মের মানববাদী তরুণ-তরুণী" যা করবে বলে প্রত্যাশিত ছিল, তা তারা করেনি?[১৩]

পশ্চিমবঙ্গের বা ভারতের মুসলমানদেরও নিশ্চয় সমস্যা আছে—আছে বিপন্নতার অন্য নানা রূপ। এবং তা তাদের জীবনকে দুর্বিষহও করে তোলে। তবু এ-ব্যাপারে উভয় দেশের মধ্যে মাত্রার একটা ভেদ আছেই—দীর্ঘ-পরীক্ষিত গণতন্ত্র ও সেক্যুলার জীবনধারার চর্চা, তার সমস্ত রকম ছিদ্র ও স্ববিরোধ সত্ত্বেও একটু ভিন্ন আবহাওয়া এনে দেয়ই। হয়তো মুসলমানদের দেশত্যাগ না করার সেটাই সবচেয়ে বড়ো কারণ। কিন্তু দেশত্যাগ না করেও মনের দিক থেকে পরবাসী হয়ে থাকাটা যদি সত্যি হয় ভারতের মুসলমানদের পক্ষেও, তাহলে তো বুঝতে হবে মূলগত সমস্যায় কোনো ভেদ নেই দুই দেশের এবং সে-সমস্যা থাকবেই যতদিন না পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানের বিচ্ছেদ দূর হয়, শুধু সচেতন শিক্ষিত মনে নয়, আপামর জনসাধারণের মধ্যে।

ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি, আত্মপরিচয়-আবিষ্কারের শক্তি, প্রতিবাদী শক্তি—বাংলাদেশের জন্মের আগে থেকে যার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছিল, যার পরিণতিতে একাত্তরের

মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ-রাষ্ট্রের উদ্ভব—সেই শক্তি কেন ক্রমশ দুর্বল, ক্রমশ ছিন্নভিন্ন ও দিশেহারা হয়ে গেল? আমরা তো দেখেছি, সংখ্যার বিচারে ততটা গ্রাহ্য না হলেও প্রতিবাদী শক্তি যখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনই প্রতিক্রিয়ার শক্তি, তার বিপুল অতিকায় শক্তি কীভাবে মুখ লুকিয়েছে। মুখ লুকিয়েছে, কিন্তু লুপ্ত হয়নি কখনোই, হয়তো ক্ষয়ও পায়নি তেমন। শুধু অপেক্ষায় ছিল বেরিয়ে আসার। স্বাধীনতার পরে যখন প্রজ্জ্বলিত আবেগ স্বভাবতই নিভে এল, যে-প্রশ্নের সমাধান হয়নি, সহজে হয় না, তা তীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিল (হয়তো ভারতীয় মুনাফালোভী বণিকদের অত্যুৎসাহও ইন্ধন জুগিয়েছিল), তখন আবার সেই চিরন্তন ধর্মান্ধতাই প্রকাশ পেল, মৌলবাদী শক্তিগুলোই সামনে হাজির হল। কিন্তু—সবই বুঝলাম—সচেতন প্রতিবাদী শক্তি কী করছিল? তার অস্তিত্বও তো অস্বীকার করা যায় না কোনোমতে? নিশ্চিন্ততা? স্বাধীনতার মুনাফা হাতে পেয়ে মধ্যবিত্তের ভোলবদল? ইতিহাসে আকস্মিকতার মূল্য একেবারেই নেই তা নয়। তবু, মুজিবের হত্যা, তাজউদ্দিন-নজরুল ইসলামের হত্যা, অসংখ্য দীপ্তিমান বুদ্ধিজীবীর হত্যা—এসব যে ঘটতে পারল তার জমি তৈরি হচ্ছিল আগে থেকেই, এবং এর মধ্যে প্রতিরোধ-শক্তির নিষ্ক্রিয়তা ও শৈথিল্যও চোখে পড়ে যায়।

একটা বড়ো কারণ নিশ্চয়ই রাজনৈতিক দলগুলির, প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের ক্ষয় এবং দুর্বলতা। যে-আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে টেনে এনেছিল ঐক্যের মঞ্চে—বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দিয়েছিল ভাষা—সেই দলের ব্যর্থতাও খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। দলাদলি, দলত্যাগ, অন্তর্কলহ, অতীতমুখিতা ইত্যাদি তাকে ক্রমশই অক্ষম করে তুলল। এমনকী আওয়ামী লীগের সমর্থকও বলতে বাধ্য হন : "আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিককালের রাজনীতির ধারাকে যদি ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দলটি মাঝে-মাঝে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে।"[১৪]

আগেই বলা হয়েছে, সংখ্যাগত জোর কমিউনিস্টদের কোনো সময়েই ছিল না, কিন্তু হয়তো নৈতিক কারণেই তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত। শুধু শহরের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই নয়, ১৯৮৭-তেও শুনেছি গ্রামাঞ্চলেও কমিউনিস্টদের প্রভাব একটু-একটু করে বাড়ছে। বরিশাল যেতে-যেতে দেখেছি স্টিমারঘাটের সর্বত্র বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পোস্টার, দেয়াল-লিখন। ট্রেনে যেতে-যেতে দেখেছি রেলকর্মী-ইউনিয়নের প্রচার ও প্রভাব। অনেকের মুখেই আশার কথা শুনেছি—এই প্রভাব বাড়ছে, বাড়বে। পর্যবেক্ষণ সত্যি কিনা জানি না, নিশ্চয়ই গোলমাল তত্ত্বে ও কার্যক্রমেও ছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক পালাবদল যেভাবে ফুৎকারে সব উড়িয়ে

দিল, তা কোনো হিশেবেই পড়ে না। অবশ্য, বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহাসিক উত্তরণে, দলগত অভিযানের সঙ্গে-সঙ্গে, হয়তো তার চেয়ে অন্তর্নিহিতভাবে শক্তিশালী ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংঘ, প্রতিষ্ঠান, এমনকী ব্যক্তির ভূমিকা। ছাত্র-আন্দোলনের প্রবলতার কথা তো সবসময় শুনেছি। বারবার ছাত্ররা ঐক্য ঘটিয়েছে, নিজেরাও অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে, অসম্ভব পরিস্থিতিকে বদলে দিয়েছে। কিন্তু সেই ছাত্রদলও ক্রমশ যেন ভেতরকার রোগে আক্রান্ত। লেখক ও শিল্পীরাও বিভিন্ন সময়ে যে-গৌরবময় ভূমিকা নিয়েছিলেন তা আজ শূন্যগর্ভ হয়ে উঠেছে।

আর তার জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে জামাতে ইসলাম এবং জামাতেরও বাইরে মৌলবাদের তাড়নায় বিভ্রান্ত মানুষ, সংখ্যায় যারা গরিষ্ঠ। জামাতের সঙ্গে গোঁড়া মৌলবাদীদের কিংবা মৌলবাদের এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের যে-ব্যবধান স্বাধীনতার লড়াইয়ের সময়ে কিংবা তার আগে-পরে কোনো-না-কোনোভাবে ছিল, সেই ব্যবধান দূর হয়ে যাচ্ছে—ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে ধর্মীয় অন্ধতা।

নিশ্চয়ই এই হয়ে-ওঠাটা সাম্প্রতিক ঘটনা এবং অনেকাংশে ভারতের ঘটনারই প্রতিক্রিয়া, বিশেষত বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে-পরে এটা আরো দ্রুত, আরো ব্যাপক হয়ে উঠেছে—কিন্তু তার বীজ বাস্তবে না থাকলে নিশ্চয় তা ঘটত না।

অর্থাৎ জমি তৈরিই ছিল, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গে ধর্মীয় মৌলবাদ তার দাঁত-নখ নিয়ে হামলে পড়ল। ভারতে মসজিদ ধ্বংসের দায় বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর কেন বর্তাবে, এই নিয়ে বাংলাদেশের লেখক-বুদ্ধিজীবীরা ঘটনার প্রায় অব্যবহিত পরেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলেছেন—এটা তাঁদের সৎ বিবেকেরই পরিচায়ক। কিন্তু সত্যিই কি তেমন আশ্চর্যের? শুধু বাংলাদেশ কেন, বিশ্বের যেখানেই মৌলবাদ প্রকাশ্য হয়েছে, তখনই যে-কোনো অছিলায় আক্রমণের লক্ষ্য হিশেবে বেছে নেওয়া হয় সংখ্যালঘুদের—তখন কি বিচার করা হয় কতটা দায় তাদের!

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময়টা বাংলাদেশের পক্ষে মারাত্মক। একাত্তরের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সব মূল্যবোধগুলো গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, ধর্মীয় মৌলবাদীরা আবার মঞ্চে ফিরে আসছে, সবই ঠিক। প্রত্যাশাভঙ্গের বেদনা বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে। কিন্তু লড়াই তো সত্যিই একেবারে থেমে থাকেনি। অনেক বিলম্বিত ও দুর্বলভাবে হলেও আবার প্রতিরোধ দানা বাঁধছে, মৌলবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সময় আসছে—'দেশদ্রোহী' গোলাম আযমের বিচারের জন্য ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির

ডাকা ৮ ডিসেম্বরের হরতাল সংগঠিত হচ্ছে, সাড়া জাগাচ্ছে—আর তখনই ৬ ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদের ঘটনা। "একাত্তরের নারী-ধর্ষণকারী ঘাতক দালালদে"র বিরুদ্ধে বিগত ন-মাস ধরে যখন আন্দোলন ক্রমশ তুঙ্গে উঠছে—তখনই সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। গভীর দুঃখে তাই বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা উচ্চারণ করেন—"হিন্দু মৌলবাদীরা [মুসলমান মৌলবাদীদের] সুযোগ করে দিল বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে"[১৫]—"ভারতের বাবরি মসজিদের ঘটনা জামাতিদের জন্য বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিল মানুষের দৃষ্টি ফেরানোর।"[১৬]

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে বাংলাদেশে যে-দাঙ্গা বাঁধানো হল—স্পষ্টতই তাঁরা বলেন সরকারি মদতেই তা তৈরি করা হয়েছে—তাতে দেখা গেল "মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ঠিক করেছে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিগুলিকে"—শুরু হয়েছে হয়তো হিন্দুর দোকান বা বাড়ি লুঠের মধ্য দিয়ে, কিন্তু অবশ্যম্ভাবীভাবে তা শেষ হয়েছে "স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ও হামলা"-য়।[১৭]

এই দাঙ্গার ব্যাপারে যে প্রস্তুত ছিল না প্রতিরোধী শক্তি, তার জন্য সমালোচনা-আত্মসমালোচনার অন্ত নেই। শিল্পী-সাহিত্যিক, ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক, প্রগতিমূলক কাজকর্মে লিপ্ত মানুষ—তাঁরা সবাই মিলেও দেশে সংখ্যাল্প নিঃসন্দেহে, কিন্তু সাধারণ মানুষ এখনো বিশ্বাস করে এই "মাইনোরিটিকে"ই, মৌলবাদীর ভয় এই "মাইনোরিটিকে"ই, কারণ "গণবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত" সেখানেই। ইতিহাসের এই ব্যাখ্যাতা সঙ্গে-সঙ্গে এও মনে করেন, সেই বিশ্বাস গৌরবান্বিত মাইনোরিটি ভঙ্গ করেছে। আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করতে গিয়ে বি-এন-পি জামাতের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, বাম রাজনীতিবিদরাও এক সময়ে শৈথিল্য দেখিয়েছেন এরশাদের ব্যাপারে, সাময়িকভাবে ও পরোক্ষভাবে হলেও। এই প্রসঙ্গে মাহমুদুর রহমান মান্না-র লেখা থেকে সামান্য একটু উদ্ধৃত করি : "ধর্মীয় অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দেয় সাম্প্রদায়িক দল ও শক্তিসমূহ এবং প্রায় সব প্রার্থী তাতে আত্ম- সমর্পণ করেন। আমি আওয়ামী লীগ বা বি-এন-পি-র কথা কেবল বলছি না। গত বছর যে-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তাতে বামপন্থী এমনকী কমিউনিস্ট দলগুলো পর্যন্ত (যারা সচরাচর নামাজটামাজ পড়েন না) নিয়মিত নামাজ পড়ে ভোটারের বিশ্বাস উৎপাদন করার চেষ্টা করেন যে, তাঁরাও ধর্ম মানেন। তাঁদের নির্বাচনী প্রচারে আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইত্যাদি ধর্মীয় বচনের আধিক্য এতই বেশি ছিল যে খোদ জামায়াতে ইসলামিকে পর্যন্ত কোথাও-কোথাও লজ্জা দিয়েছে তা।"[১৮] অথচ অভিযোগ এই, যে-কাজ করার দরকার তা তাঁরা

করেন না। প্রগতিবাদী অন্যায়ভাবে বরখাস্ত হলেও প্রতিবাদ নেই। ৭ ডিসেম্বরের দাঙ্গা বেঁধে গেলেও সুসংগঠিত মিছিল, মনে দাগ ফেলার মতো মিছিল, তার আয়োজন করতে সময় চলে যায়।

বাংলাদেশের যে-সংখ্যালঘু হিন্দুরা প্রতিদিন আরো সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে, তাদের কাছে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির এই সংহতি এবং প্রগতিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির এই অসংহতি ও দুর্বলতা কী মানসিক বিপর্যয় ও অসহায়তা আনতে পারে তা কল্পনা করা যায় না। এই পরিবেশে তারা তাই ক্রমশই অস্তিত্বহীন। তাদের কথায়-বার্তায়, লেখায় বা সাক্ষাৎকারে যে-নিরুপায়তার প্রসঙ্গ ওঠে বারবার তা অরণ্যে রোদন মাত্র। মৌলবাদীদের প্রতাপে তারা একরকম অভ্যস্ত হয়েই উঠেছিল, কিন্তু ভরসা ছিল যাদের ওপর তারা যখন অবসন্ন ও নিস্তেজ তখন তাদের আর কোনো পথ খোলা থাকে না।

হয়তো সংখ্যালঘুরা খানিকটা অভিমানভরেই মনে করেন, অনেকদিন ধরেই করেন, তাদের সমস্যা যতটা গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল, নানা কারণেই প্রগতির মানুষেরা কোনো সময়েই তা দেননি। ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সবসময়ই সরব থেকেছেন, কিন্তু সংখ্যালঘুদের জীবনযাপনের দুঃখ ও সমস্যার দিকে ঠিক আলাদা করে, ব্যক্তিগত বা সামাজিক স্তরে, মনোযোগ তেমন দেননি। এই বিপন্ন প্রতিবেশীদের সম্পর্কে সমবেদনা বা সহানুভূতির অভাব ছিল তা নিশ্চয় নয়—নানাভাবে তা ব্যক্ত করার চেষ্টাও করেছেন—কিন্তু কার্যক্রমের সক্রিয়তায় সেই ইচ্ছাকে ফলপ্রসূ করার জন্য তাকে কখনো সামনে আনেননি। এই অভিমান শুধু সংখ্যালঘু সাধারণ মানুষেরই নয়, রাজনীতি বা সমাজচিন্তায় অভিজ্ঞ ও বিদগ্ধ কর্মী মানুষও আজ অভিযোগ করেন : "সংখ্যালঘু সমস্যার ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তি প্রয়োজনীয় ভূমিকা না নেওয়ায় অসহায়ত্ব বোধ আরো বৃদ্ধি পায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে।"[১৯] কিংবা "নির্দোষ নিরীহ দরিদ্র একটি মানবগোষ্ঠী স্বাধীন বাংলাদেশে অন্যায়ভাবে যে-রকম নির্যাতিত হল তাতে এদেশের রাষ্ট্রশক্তির ওপরে ভরসা বা রাজনৈতিক দলগুলোর ওপরে আস্থা সজ্জন শুদ্ধশীল কোনো মানুষের আর থাকবার কথা নয়।"[২০]

প্রগতিবাদী শক্তির সমস্যাটা বোঝা যায় না তা নয়। মৌলবাদের দাঁত ও নখের কতটা জোর বাংলাদেশে, পূর্বপাকিস্তানের অনেক কিছুর ধারাবাহিকতা মুছে যায়নি যে-দেশে, তাকে তো তাঁরা জানেন জীবন দিয়ে। এমনকী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়েও হয়তো তাই কৌশলগত সাবধানতা বা সতর্কতা মেনে নিতে হয় অনেক সময় বা কখনো-কখনো আপোসও করতে হয় তাঁদের। সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ

উপলক্ষকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত সভাসম্মেলনকেও স্থগিত রাখতে হয় নামাজ পাঠের সময়। হয়তো সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে সক্রিয় সহানুভূতি প্রকাশের যে-শিথিলতা দেখি, তার পেছনেও এই কৌশলগত বাধ্যতাই। বাইরে থেকে তার সমালোচনা করারও হয়তো মানে হয় না। বাংলাদেশের পরিস্থিতি, বাংলাদেশের সুদূর ও নিকট অতীত, বাংলাদেশের মানুষের মনে ধর্মের আসন, বাংলাদেশের মোল্লা ও পেট্রোডলারের প্রতাপ ইত্যাদি পেছনে রেখে এইসব লড়াইকে অনেক কিছু ভেবে নিতে হয়, মেনে নিতে হয়। এই লড়াই কতটা কঠিন সেখানে, তা হয়তো আমাদের দেশ থেকে বুঝে নেওয়াও বেশ মুশকিল। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরের ঘটনাই যদি ধরা যায়—বাংলাদেশের লেখক ও সাংবাদিকেরা অনেকেই লক্ষ করতে পারেন, মসজিদ ধ্বংসের জন্য "ভারতের সুস্থ বিবেক আজ প্রতিবাদমুখর"[২১], কিন্তু পাশাপাশি একটি মুসলমান-প্রধান দেশে এই ধ্বংস কতদূর আহত করতে পারে সাধারণ মানুষকে, কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে-দেশে, এবং পটভূমি মনে রাখলে কোনো প্রতিক্রিয়াই যে বিস্ময়ের নয়, সেই সচেতনতা কিন্তু তেমন নেই ভারতের মানুষের। যে-কোনো দেশের সাম্প্রদায়িকতার সূত্রে অনেক কিছুই বিবেচনা করে নিতে হয় আরেক দেশের মানুষকে।

কিন্তু, বিশ্বের নানা ঘটনাবলির সাম্প্রতিকের দিকে লক্ষ করে কখনো-কখনো মনে হয়, এই সাবধানতা কদাচ জরুরি হলেও, একটা স্তরে তা ক্ষতিকরও হয়ে উঠতে পারে। অন্তত বাংলাদেশে তা হয়েছে বলেই মনে হয়। দীর্ঘ সময় ধরে হিন্দুদের অবিরল দেশত্যাগ দু-দেশের এবং দু-সম্প্রদায়ের দূরত্বকেই ব্যাপক করে না শুধু, বাংলাদেশের নিজস্ব ক্ষতিও হয়ে যায়। তার মানসিক নিঃস্বতা ঘটে, সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও স্বাস্থ্যের হানি ঘটে। আর সেই বিনাশ যখন নীরবে দেখে যাওয়া হয়, সাবধানতা বা কৌশল একেবারেই কাজে লাগে না—সব কিছুই তখন আয়ত্তের বাইরে।

এইরকম একটা সর্বনাশের সময় কিছুই হয়তো কাজে লাগে না, কিন্তু তসলিমা নাসরিনের লেখার দিকে তবু তাকাতেই হয়। তসলিমার 'লজ্জা' এবং 'ফেরা' নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যে-হইচই, তাতে আমার বাংলাদেশের অনেক বন্ধুই বিস্মিত এবং আহত। কারণটা বুঝতে পারি। এই বই দুটো কি বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা ভীতি বা নৈরাশ্যের সঞ্চার করবে না? তাঁদের আকাঙ্ক্ষা : দুই দেশের মানুষের মধ্যে জানাশোনা ও বোঝাপড়ার একটা বড়ো ক্ষেত্র তৈরি হোক। বস্তুত আমিও দেখেছি, বাংলাদেশে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন এমন অনেক পশ্চিমবঙ্গবাসী তসলিমার

বই বেরোনোর পর যেন কেমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। অথচ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তো জানি, এর উলটো পিঠটাও কতদূর সত্য সেখানে। অনেক কিছুই হয়তো অস্বস্তিকর এখন, কিন্তু তা বলে বাংলাদেশে গিয়ে যে-প্রীতিপূর্ণ আতিথেয়তা যে-কোনো পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিই পেয়ে থাকেন, তা তো আর মিথ্যে হয়ে যায় না। তসলিমার বই যদি দুই বাংলার মানুষের সেই সহজ প্রীতিকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে, তবে তা খুবই দুঃখের। বন্ধুরা বলেন, এই লেখা ভারতের হিন্দু মৌলবাদীদের হাতে অস্ত্র জোগাবে কিনা। সংশয় নেই, তা জুগিয়েছেও হয়তো। এবং এসব ভেবে দুশ্চিন্তা না করে পারি না।

পশ্চিমবঙ্গে তসলিমা নাসরিনের এই অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তায় আমাদের বাংলাদেশের বন্ধুরা কেন বিক্ষুব্ধ হন তার কারণ যেমন আমরা বুঝি, তার শরিকও হই একদিক থেকে, তেমনি আমাদের ওই বন্ধুদেরও বুঝতে হবে আমাদের কাছ থেকে—দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে শরণার্থীতে প্লাবিত এই ভূখণ্ড কী কারণে অস্থিরভাবে সাড়া দেয় বই দুটিকে কেন্দ্র করে। নিজবাসভূমে পরবাসী এই উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে তো তাদের পরোক্ষ তথ্যে জানতে হয়নি, শহরে বা গ্রামেগঞ্জে ছন্নছাড়া জীবনের মধ্যেই তারা জড়িয়ে আছে, কখনো কুলিকামিন হিশেবে, কখনো বাড়ির পরিচারক বা পরিচারিকা হিশেবে, কখনো-বা দুস্থ ভদ্রলোক হিশেবেই। এদেরকে ঠিক চিনিয়ে দিতে হয় না এদেশের মানুষকে। সীমান্ত এলাকা থেকে শুরু করে দূরবর্তী গ্রামশহরের রাস্তাঘাট পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ ও ঝুপড়ির ভিড়ে পশ্চিমবঙ্গের জীবন যে আজ বিপর্যস্ত, তার একটা বড়ো কারণ যে ভিটেহারা এই মানুষেরই 'অনুপ্রবেশ' ও দুঃসহ জীবন, তা এখানকার মানুষ জানে গভীর বেদনায় এবং হয়তো কখনো-কখনো ধৈর্যচ্যুত বিরক্তিতে। এদের মধ্যে কেউ-কেউ যে পশ্চিমবঙ্গেও টিকতে পারে না, তাদের চালান করা হয় দণ্ডকারণ্য বা রাজস্থান বা বিহার-উড়িষ্যার রুক্ষ জমিতে সে-কাহিনীও অজানা নয়।[২২] তসলিমার লেখনীর বেপরোয়া সহানুভূতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের আমূল নাড়া দেবে তাতে আর আশ্চর্য কী! শুধু সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অভিব্যক্তি বলে একে শনাক্ত করলে খুবই ভুল হবে।

পাশাপাশি ভাবি, যে-পরিবেশের চাপে বাংলাদেশের সহৃদয় প্রগতিশীলদেরও সাবধানী হতে হয়, কৌশলী হতে হয় এবং তার ফলে মূল লক্ষ্যটাই হারিয়ে যেতে বসে, সেই পরিবেশের মধ্যে উঁচু গলায় আপোসহীন তসলিমা যখন তাঁর বিশ্বাসের কথা, উপলব্ধির কথা বলতে পারেন কাউকে ভ্রূক্ষেপ না করে, তখন সাহিত্যের বিচারের বাইরে তাঁর সাহসই শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে আমাদের কাছে।

অতিশয়োক্তির কথা বলেছেন ওঁরা। ঠিকই তসলিমা যেভাবে বলেছেন সেভাবে

না হলেও বাংলাদেশের শুদ্ধ বিবেক—বাংলাদেশের অনেক অনেক মননশীল লেখক সংস্কৃতিকর্মী বা রাজনীতিজ্ঞ—কিছু করতে না পারুন, সংখ্যালঘুদের দুঃখের কথা বলেছেন, এখনো বলছেন। সংখ্যালঘুদের বিষয়ে তসলিমা-র এই যে সহমর্মিতা তার সঙ্গে তাঁর নারীবাদীর ভূমিকা জড়িয়ে গেছে যেহেতু, তাই এ-প্রসঙ্গে ভিন্ন চারিত্র্যের হলেও নারীমুক্তির আরো বহু শরিকেরই নাম স্বতই মনে চলে আসে। কিন্তু নাটুকে প্রচারের অভাবে সুফিয়া কামালের কথা, জাহানারা ইমামের কথা, মুশতারী শফী বা রোকেয়া রহমান কবীর বা নূরজাহান মুরশিদের কথা—এমনকী সাম্প্রতিককালে এসেও সেলিনা হোসেন, মালেকা বেগম, পান্না কায়সার, নাসিমা হক বা জাহানারা হকের কথা—আমরা এ-বঙ্গে ততটা জানি না। আর সত্যিই তো তসলিমা আছেন বলেই, কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধান বিরোধী-নেতা মহিলা বলেই (এ নিয়েও দেখলাম শিবনারায়ণ রায় একটি প্রবন্ধে আশা প্রকাশ করেছেন) শুধু মেয়েদের নাম করেই তো থেমে থাকা যায় না। আবু জাফর শামসুদ্দীন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শহিদুল ইসলাম, অনুপম সেন প্রমুখের ভূমিকা সম্পর্কেই বা আমরা কজন ওয়াকিবহাল এখানে? এমনকী 'লজ্জা'-র যে-কাহিনী তার আদল তো আমরা পাই শফি আহমেদ-এর সাংবাদিক-রচনায়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাস্তবেই।

তসলিমা নাসরিন বলেছিলেন সুরঞ্জন আর তার বাবা সুধাময় দত্ত-র কথা—শফি আহমেদ 'যে জীবন অধমের' গদ্য রচনাটিতে লিখেছেন এক সুধাংশুর কথা, তার পরিবেশের কথা, যেখানে সংখ্যালঘু শুধু আড়ালে মুখ লুকোতে চায়, শুধু গুটিয়ে থাকতে চায়। এই সুধাংশুর কথাই কি পড়েছি শামসুর রাহমানের কবিতায়? সুধাংশুর বাবা মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস মাস্টারি করতে-করতে বলতেন, "এই দেশটা আমাদের, আমরা যারা এখানে আছি সকলের।" সাংসারিক বিপর্যয় সত্ত্বেও, স্ত্রী ও মেয়ের সর্বনাশ সত্ত্বেও, ছেলেকে ডেকে বলতেন, "নিজের দেশ ছেড়ে যাবি না কোনোদিন।" সুধাংশুও তাই বিশ্বাস করত। কিন্তু এবারের দাঙ্গাতে সেই সুধাংশুকে তার দেশ ছাড়তে হল। উন্মাদপ্রায় বাবাকে পেছনে ফেলে রেখে। আবিষ্কার করল সে, কীভাবে "প্রতিদিন একটু-একটু করে গড়ে উঠেছে বিভেদের দেয়াল।", আর মৃত্যুঞ্জয় মাস্টার তাঁর পুরোনো ছাত্রদের নাম ধরে ডেকে-ডেকে বলেন, "আমার সব ছাত্ররা কোথায় গেল, এতদিন ধরে তাদের কী পড়িয়েছি, কী শিখিয়েছি! ওরা সব গর্তের মধ্যে ঢুকে থাকল।"[২৩] শফি-র এই রিপোর্টাজ বেরিয়েছিল ৮ জানুয়ারি ১৯৯৩। সে-বছরই ফেব্রুয়ারিতে যখন তসলিমা-র উপন্যাস 'লজ্জা' বেরোয় তখন বুঝতে অসুবিধা হয়নি, তসলিমাও আসলে বানিয়ে লেখেননি।

আরো বহু লেখা, বহু রিপোর্ট, বহু তদন্ত-বিবরণী সংকলিত হয়েছে—১৯৯০-এর

গণতদন্ত কমিশনের প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে শুরু করে ১৯৯৩-এর বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদের রিপোর্ট পর্যন্ত অনেক কিছুই—তাতে তো তসলিমা-র অবলম্বিত তথ্যেরই সমর্থন। আমরা 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ' প্রকাশিত বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের তথ্য ও দলিল সংক্রান্ত বইটি পড়েছি, পড়েছি শাহরিয়ার কবিরের 'বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার চালচিত্র' বইটিও, জেনেছি ঢাকা মানিকগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ শেরপুর কিশোরগঞ্জ চট্টগ্রাম ভোলা নোয়াখালি সিরাজগঞ্জের মতো আরো অনেক অনেক জায়গায় সংখ্যালঘুদের ওপর ব্যাপক অত্যাচারের বিবরণ। ৯৩-এর জুনে লেখা এবং 'পূর্ণতা' সাময়িকপত্রের আগস্ট-সেপ্টেম্বর ৯৩ সংখ্যায় প্রকাশিত শাহরিয়ারই আরেকটি লেখায় পেয়েছি ভোলা জেলায় সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচারের বিস্তৃততর বর্ণনা। তসলিমা সেদিক থেকে নতুন খবর দিয়েছেন এমন হয়তো নয়—কিন্তু যে-জ্বালায় তিনি লেখেন :

> খুব গোপনে এই দেশ কিন্তু বড়ো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। শেকড় উপড়ে চলে যাচ্ছে দেশের মানুষ। তারা আর ফিরবে না। শেকড়ের গভীর ক্ষত বুকে নিয়ে বেঁচে থাকা এই দুর্ভাগা দেশের দীর্ঘশ্বাস আমাদের গায়ে কি কাঁটার মতো বিঁধবে না? আমরা কি কোনও দিন দগ্ধ হব না অনুশোচনার তীব্র আগুনে?[২৪]

পশ্চিমবঙ্গবাসীকে এই উচ্চারণ গভীরভাবে ধাক্কা দেয়—তা তারা অন্যত্র হয়তো তেমন করে পায়নি।

শুধু এই বাচনের কৃতিত্বেই নয়, আমরা জানি, তসলিমার বই জনপ্রিয়তা পেয়েছে ব্যবসায়িক কারণে, অন্য নানাবিধ কারণেও। হয়তো যে-কথা বন্ধুরা বলেছেন, সাময়িকভাবে হলেও সাম্প্রদায়িক যারা তারা উৎসাহের খোরাকও পেয়েছে, হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভুল বোঝাবুঝি বা দূরত্ব বেড়েছে দুই দেশের মানুষের মধ্যে—কিন্তু তসলিমা যদি বিচ্ছেদের মূল সত্যকেই প্রকাশ করে থাকেন, তবে ক্ষতি যেটুকু তা তো আগেই ঘটেছে, উনি আর নতুন কী করবেন! বিবেচক নীরবতায় কতটুকু ক্ষতি এড়ানো গেছে? বরং সত্যকে জেনে এবং স্বীকার করে যদি কিছু করার সময় এখনো থেকে থাকে, সেদিকে এগোনোই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

মনে রাখতে হবে, এই ক্ষতি শুধু বাংলাদেশে ঘটেনি বা দূরত্ব রচিত হওয়ার এই দীর্ঘ বাস্তব শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতের পক্ষেও সত্য। দেশভাগের পরেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে-দাঙ্গা হয়েছে বারবার, তার ইতিহাস পড়লে জানতে বাকি থাকে না। ভারতবাসীও কি সচেতন সে-ইতিহাস সম্পর্কে? ইতিহাসের শিক্ষা কি তার কাছেও পৌঁছোয়? তা হলে ধর্মীয় মৌলবাদের পুনরুত্থান কেন

সাম্প্রতিককালে? আমরা কি তবে বাস্তবকে এড়িয়ে গিয়ে লাভবান হব কোনো-ভাবে? বাবরি মসজিদের ঘটনার পরে ভারতেও যে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল, অন্তত বেশ কটি জায়গায়, তাও আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ জানি। বোম্বাই ও সুরাটে মুসলমানদের ওপর বীভৎস ও মর্মান্তিক অত্যাচারের যে-বিবরণ দেবেশ রায়ের 'দাঙ্গার প্রতিবেদন'-এ আছে, তা অবিকল নেওয়া হয়েছে আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার বা আয়ার ব্রাউন বা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার রিপোর্ট থেকে। যদি প্রশ্ন করা যায়, ওই প্রতিবেদনে যে-ছবি ফুটে উঠেছে তা কি গোটা ভারতের চেহারা? তাহলে বলতে হবে, অবশ্যই তা নয়। বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের মুসলিম মৌলবাদীদের হাতে এই উপন্যাস কি খারাপভাবে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই? অবশ্যই আছে। কেউ-কেউ এখানেই সে-কারণে তসলিমা-র বইয়ের কথা তুলে দেবেশের উপন্যাস বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। সাহিত্যকৃতির দিক থেকে মেরু-ব্যবধান সত্ত্বেও হয়তো সাহিত্যের সামাজিক দায় প্রসঙ্গে বই দুটোর এই সামীপ্য আলোচিত হতেও পারে। এমনকী, সাহিত্যের বিচার সম্পূর্ণ বাদ দিলে, সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত ফজলুল বারী-র উপন্যাস 'নমস্কার বাংলাদেশ'-এর কথাও উঠতে পারে। কিন্তু তসলিমা স্বয়ং যে বলেছেন দেবেশের ওই উপন্যাসটি প্রসঙ্গে, নিজের 'লজ্জা' ইত্যাদি বই "ভারতের অসাম্প্রদায়িক লেখকদের প্রেরণা দিচ্ছে"[২৫], তাতে আর কিছু না হোক তসলিমার কাণ্ডজ্ঞান ও সাহিত্যবোধের অভাবই প্রমাণ করে—ভারতের আজিজুল হকের সঙ্গে এখানেই তাঁর মিল, যদিও দুজনে সম্পূর্ণ দুই বিপরীত প্রান্ত থেকে তুলনাটি করেছেন। যে-মানবিক আবেগের বশে দেবেশ রায় তাঁর প্রকরণের স্বভাবকে ডিঙিয়ে প্রায় নাটকীয় তীব্রতায় বাস্তবকে ধরতে চেয়েছেন এই উপন্যাসে, বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে হয়তো তাতে অতিরেক ঘটেছে এরকম অভিযোগও করতে পারেন কেউ। কিন্তু ইতিহাসের একেক আলোড়িত মুহূর্তে সেই অতিরেকই জরুরি হয়ে পড়ে ইতিহাসের সত্যকে তুলে ধরতে গেলে। স্বাভাবিক ও বিচক্ষণ কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায়, পৌঁছোয় না কারো কানে। তসলিমাও তাঁর সাহিত্যিক সাধ্য অনুসারে সেই ইতিহাসকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন, অতিরেকের অভিযোগ সেখানে টেকে না।

শুধু লেখককেই নয়, যে-কোনো সমাজকর্মী বা সংস্কৃতিকর্মীকেও এই অকপট স্বীকারোক্তি ও সত্য-উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে, কোনো কিছু ধামাচাপা দিয়ে নয়—যদি তাঁর লক্ষ্য হয় সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদের অপনোদন এবং সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর বিস্তার। বস্তুত এই বিচ্ছেদ মোচনের ভিন্ন-ভিন্ন চেষ্টা হয়েছে, একক বা সমবেত উদ্যোগও দেখা গেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ যে দূর হয়নি

তার কারণ কোনো সময়ই আমরা উভয় পক্ষেরই যা সত্য যা বাস্তব, তা যদি রূঢ় হয় তবু তাকে নিজের কাছে বা অন্যের কাছে খুলে দিইনি। হয় শুধু নিন্দা করেছি, না হয় নির্ভেজাল প্রশংসা। সবেরই পেছনে থেকেছে কোনো উদ্দেশ্য বা কৌশল।

রাজনৈতিক চেতনার আপেক্ষিক বিস্তারে পশ্চিমবঙ্গের মতো কোনো জায়গায় হয়তো এই সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর লক্ষ্যে কিছুটা এগোনো গেছে বলে আমরা মনে করেছি, যদিও বারবার, অন্তত বাবরি মসজিদের ঘটনার পরে, সেই নিশ্চিন্ততা টেকেনি। আর সারা ভারতের কথা যদি ধরি তবে তো সেটুকু আত্মপ্রসাদও জোটে না। বাংলাদেশেও সাংস্কৃতিক জাগরণে সাম্প্রদায়িক বিভেদের ক্ষেত্রে যে-মুক্তির আভাস পাওয়া গেছে বলে মনে করেছি তা মিথ্যে হয়ে যায় নানাবিধ রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে ও মৌলবাদী শক্তির তৎপরতায়। সংখ্যালঘুর অবিরল দেশত্যাগে কিংবা বাবরি মসজিদের ঘটনার পরবর্তী 'রক্তপাতহীন' দাঙ্গায় বোঝা গেছে সেই জাগরণ কতটা অগভীর, দাঙ্গা-পরবর্তী সরেজমিনে বোঝা গেছে দলবদ্ধ অবিচার কতটা প্রতিরোধবিহীন।

কেউ-কেউ বলেছেন, সংগতভাবেই বলেছেন, সংখ্যালঘুর দেশত্যাগ থেকে শুরু করে সাম্প্রদায়িকতার সব সমস্যাই তো একটা বড়ো সমস্যারই বহিঃপ্রকাশ, বিচ্ছিন্নভাবে তা বিচার্য নয়। যে-পরিস্থিতিতে ধনীদরিদ্রের বিভেদ বাড়তেই থাকে, জীবনযাপনের সব দিকেই সংকট ঘনিয়ে আসে, নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে, শুধু ধর্মীয় নয়, জাতিগত ভাষাগত অঞ্চলগত বিভেদ তুঙ্গে ওঠে—সাম্প্রদায়িকতা সেই পরিস্থিতিরই সৃষ্টি এবং সেই পরিস্থিতিকে বাঁচিয়ে রাখারই চক্রান্ত। এবং সেটা এদেশের-ওদেশের আলাদা ব্যাপার নয়—আমাদের উপমহাদেশের দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতাকে সেভাবে দেখলেই বোঝা যাবে কেন এদের মধ্যে এত মিল এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এদের টিকে-থাকা। হয়তো সে-কারণেই ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের কিংবা বাংলাদেশের তুলনায় ভারতের জমিতে সাম্প্রদায়িকতার মাত্রাভেদের আলোচনা অবান্তর। এমনকী সারা বিশ্বেই আজ যদি এই বিভেদের ও বিচ্ছিন্নতার বাস্তব প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে, তবে পৃথিবীর গভীরতর এই অসুখের আঞ্চলিক বিচার আমাদের কোনো পথ দেখাবে কিনা সন্দেহ।

রাজনীতি, অন্তত এতাবৎ অনুসৃত রাজনীতি, ব্যর্থ হয়েছে এই সমাধানে। হয়তো মানুষের ছোটো-ছোটো সমস্যা, যা সত্যিই ছোটো নয়, রাজনীতির সামান্যীকরণের ঝোঁকে হারিয়ে গেছে তার অন্তঃসার। সমস্যার ব্যক্তিগতকে সমষ্টির

নিয়মের কাঠামোয় দেখতে হয়ে সত্যি, কিন্তু সেই অভ্যাসে খণ্ডকে, মুহূর্তকে, তার সত্যকে উপেক্ষা করলেও তো চলে না। তারই একটি নির্মম উদাহরণ বোধহয় এই : বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর দৈনন্দিন দুঃখ ও দেশত্যাগের বেদনাকে বাদ দিয়েই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি আত্মসন্তুষ্ট থেকেছে। এবং আমাদের ভারতেও, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ও রাজনৈতিক আচরণের আপেক্ষিক পরিপক্কতা সত্ত্বেও, সেই সমাধান সম্ভব করতে পেরেছে এমন মনে হয়নি বাবরি মসজিদের ধ্বংস ও বি-জে-পি-র শক্তিবৃদ্ধির উদাহরণে।

রাজনীতিকে বাদ দিয়ে তবে কোন পরিত্রাণের দিকে মুখ তুলে তাকাবে দুই দেশের দাঙ্গাপীড়িত অসহায় মানুষেরা? কিংবা দাঙ্গাবিরোধী সচেতন মানুষেরা? হতাশা থেকে বাঁচায় যে-তারুণ্যের মুখগুলি তারা যদি রাজনীতি বা রাজনীতি-আশ্রয়ী কোনো সংগঠনকে আজ নির্ভরযোগ্য না মনে করে? অথচ বিভিন্ন সৃজনশীলতায় জড়িয়ে থাকে যে-মানুষ সে কি এত সহজে মেনে নেবে এই পরাজয়? আশা করা যাক : এই ব্যক্তিগত সৃজন ও কর্মময়তাকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে আছে যে-সব ছড়ানো মানুষ তাদেরকে ঘিরেই কালক্রমে বিকশিত হবে কোনো সহমর্মিতা ও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের সংহতি—রাজনৈতিক সংহতির চেয়েও যা দৃঢ় ও স্থায়ী—কেননা বাইরের কোনো নিয়মকানুনের শাসনে তা গড়া নয়, সৃজনের মুক্তিতেই তার নিশ্চয়তা। সেখানেই তো সম্ভব শিক্ষার যা প্রকৃত লক্ষ্য তা-ই : সাম্প্রদায়িকতাকে ছিন্ন করে মনুষ্যত্বের চর্চা ও বিস্তার, রুচির উদ্বোধন। শুধু শহরের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নয়, গ্রামীণ জীবনের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও তাকে চারিয়ে দেওয়া।

অন্তত বাংলাদেশে তো, আমরা জানি, তার একটা ঐতিহ্য আছে, যা গড়ে উঠেছিল ভাষা-আন্দোলন ও স্বাধীনতার আন্দোলনের সময় থেকে। রাজনীতির বাইরে, কিন্তু রাজনীতিকে আত্মস্থ করে বিভিন্ন ছোটো-ছোটো গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ যে-সংস্কৃতির চর্চা করে গেছে গান থিয়েটার আবৃত্তি সাহিত্য রচনা কিংবা নানামুখী কল্পনা ও মননের অনুশীলনে, তা ওইসব আন্দোলনকে শুধু পুষ্ট করেনি, একটা ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। আমরা তো শুনেছি ওইসব রক্তঝরা দিনে রবীন্দ্রসংগীত কীভাবে হয়ে উঠেছিল সংগ্রামের গান। রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা করেন যে-সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাঁরা তাঁদের গানের মধ্য দিয়েই লড়াইয়ের সৈনিক। সেই অর্জনের পথ আজও বন্ধ হয়ে যায়নি। সন্‌জীদা খাতুন তাই এখনো লিখতে পারেন কীভাবে "সুরের বেদনা লীলায়িত শিল্পে বিকশিত হয়ে প্রথাবিরোধী রুচির মানুষের জন্যে আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়।"[২৬] বাংলাদেশে অন্তত সাম্প্রদায়িকতামুক্ত

ভাবনার চেয়ে প্রথাবিরোধী রুচি আর কী হতে পারে? তাই তো একদিকে যখন বিদ্রূপাত্মক নিষেধাজ্ঞা শুনি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সংগীতের জগতে, রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলাল ও এমনকী নজরুলের 'হিন্দুত্বে'র বিরুদ্ধে[২৭]—প্রায় ঠিক তখনই ঢাকার তরুণতরুণীর দল ওয়াহিদুল হকের নেতৃত্বে সংগীতের পঞ্চ ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত-নজরুলকে অবলম্বন করে "বর্তমানের বিকৃত হাওয়ায়" সম্ভব করে তোলেন রুচির "সহজ উদ্ধার"।[২৮]

সংগীতের কথা নিতান্তই দৃষ্টান্ত হিশেবে বলা। মনন ও কল্পনার নানা প্রয়োগে এই রুচির সংগঠন বাংলাদেশের মানুষের মনকে অসাম্প্রদায়িক মুক্তবুদ্ধির চেতনায় পৌঁছে দিতে চাইছে, এমন দৃষ্টান্ত আরো মিলবে, এই ঘোর অন্ধকার সময়েও। এবং তার ক্ষেত্র যেমন অনেক, তেমনি ছোটো-ছোটো সাফল্যও অল্প নয়। এরকমই আরেকটি মনে পড়ে যাওয়া উদাহরণ হিশেবে বলা যায় : রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত পত্রিকা 'প্রাকৃত'-র পাতা ওলটাতে-ওলটাতে কোনো পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে হল, এরকম প্রবল রুচির অসামান্য পত্রিকাটি বাংলাদেশ থেকেই তো বেরিয়েছে। ঠিক যেমন ১৯৮৬ থেকে মুগ্ধ হয়ে আছে সে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত 'সুন্দরম্'-এ।

মননচর্চার বিষয়গত ও শৈলীগত বৈচিত্র্য তো নিশ্চয়ই, শিল্পসংস্কৃতির নানান সৃজনশীলতাতেও পাওয়া যায় শিক্ষা ও রুচির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তির অঙ্গীকার। তা হতে পারে নাটকে বা থিয়েটারে, চিত্রকলায় বা ভাস্কর্যে, কবিতায় বা গল্প-উপন্যাসে, বস্তুত যে কোনো মাধ্যমেই, অর্থাৎ যে-মাধ্যমগুলি এক ধরণের সজীবতা ও পরিণতি অর্জন করেছে বাংলাদেশে। অপেক্ষা করে থাকা যায়, রামেন্দু মজুমদার বা আলী যাকের কবে তাঁদের প্রযোজনায় শিল্পের শর্ত মেনেই আমাদের পৌঁছে দেবেন ওই লক্ষ্যে। জয়নুল আবেদিন বা কামরুল হাসানের দেশেই পাব নবীন চিত্রী ও ভাস্করদের কাছে ফর্মের স্বাধিকার মেনেও কন্‌টেন্টের ওই দায়। যে-দেশে শামসুর রাহমানের মতো কবি প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও এখনো মাথা নোয়ান না জীবনে বা কবিতায়, সে-দেশের অনুব্রতী কবিদের অস্তিত্বই তো সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জলন্ত প্রতিবাদ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শওকত ওসমান, আবু ইসহাক বা সত্যেন সেনের উত্তরসূরীরা এখনো নিয়োজিত বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি সমস্যার মুখোমুখি, যার নাম সাম্প্রদায়িকতা।

> সাম্প্রদায়িকতা চাইছে বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতে।...ডঃ আহমদ শরীফ তাদের কাছে মুরতাদ, কারণ প্রকাশ্যে তিনি ধর্মান্ধতার সমালোচনা করেন। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর

> বিরুদ্ধে প্রতিদিনই কিছু না কিছু লেখা হবে, কারণ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় এবং বাংলা একাডেমীতে থেকে জালেমদের কাছে তিনি মাথা নোয়াননি। ফয়েজ আহমদ, শামসুর রাহমান সবাই ভারতীয় দালাল, কারণ তাঁদের কবিতা, কর্মকাণ্ড সবই জামাতি ও পাকিস্তানি চেতনার বিরুদ্ধে। আরেক 'দালাল' সৈয়দ শামসুল হক, কারণ তিনি মুক্তিযুদ্ধের ওপর...দুটি অসামান্য কাব্য-নাটক ও উপন্যাস লিখেছেন। শুধু তাই নয়, কতটা জালেম হলে জাহানারা ইমামকে ক্ষমা করে জামাতি নেতারা বলতে পারে, একুশ বছর পর কোন মা কাঁদে তাঁর পুত্রের জন্য?[২৯]

এর বাইরেও রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির নানা ক্ষেত্রে ভাবনা ও কাজকর্মের বহুমুখী চেষ্টা তো আছেই। হয়তো কোনো অভাবিত স্তরেও তার অনুশীলন চলছে, আমরা যাকে রাজনৈতিক সংস্কারে উপেক্ষা করেছি। এখন তা নিয়ে নতুন করে ভাবনার বোধহয় প্রয়োজন এসেছে। একটি উদাহরণ হিশেবেই বলা যায়—বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যাকে বলা হয় এন-জি-ও বা নন-গভর্ণমেন্ট অরগানাইজেশন, সেগুলো গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিদেশী অনুদান বা সাহায্যের ওপর নির্ভর করে, এবং তাদের কর্মোদ্যোগকে সেখানকার প্রগতিবাদীরা সর্বদা সন্দেহের চোখেই দেখেছেন, যদিও বাহ্যত তাদের কাজকর্মের যে-চেহারা চোখের সামনে আসে—কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে শিক্ষা ও রুচির প্রসারের নানা উদ্যম—তাতে ওই সন্দেহের কারণটা হয়তো সরল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। অবশ্য এই সারল্য সবসময় বাঞ্ছিত নয়, পরিত্রাণও নয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে : এন-জি-ও-র কর্মোদ্যোগ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িকদেরও কেন আজ ভীত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে? তবে কি বুঝতে হবে, শিক্ষা ও রুচির প্রতিষ্ঠায় যে-কোনো প্রচেষ্টাই একদিন বিস্তারিত হয়ে অতিকায় মৌলবাদকেও ধ্বংস করে দিতে পারে, তা টের পেয়ে গেছে তারা? তবে কি পুরোনো রাজনৈতিক উদ্যোগ, ব্যাখ্যা বা প্রতিযোগিতা ছাড়াও সচেতনতার প্রসারে স্বাধীন ও আন্তরিক কোনো ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত সক্রিয়তা সাম্প্রদায়িকতার ভিত সুদ্ধ নাড়িয়ে দিতে পারে?[৩০]

বারবার সাম্প্রদায়িকতা বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারাকে ব্যাহত করলেও তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শেষপর্যন্ত কোনো ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। "সেই ধর্মনিরপেক্ষ সমন্বয়ধর্মী, মানবতাবাদী ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতা"-ই ছিল "১৯৭২-এর বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের প্রবল চালিকা শক্তি"। আজ যদি বাংলাদেশের জমিতে তা অবসিত হয়েও থাকে, সে-দেশেরই প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিক সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ গভীর বিশ্বাসে বলতে পারেন : সেই "সুমহান সমন্বয়ধর্মী সাংস্কৃতিক

ঐতিহ্যকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার এবং নতুনভাবে মূল্যায়ন করার, সংরক্ষণ ও লালন করার এবং সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব এই উপমহাদেশের জনগণের।"[৩১] আপাতত বাংলাদেশের মাটিতে আজ সাম্প্রদায়িকদেরই চলাফেরার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বেশি। কখনো হুংকার, কখনো ফিসফাস। আকাশে-বাতাসে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা মাথা কুটে মরছে। কিন্তু আমরা জানি, সেই বেদনাই প্ররোচিত করবে অসাম্প্রদায়িক মুক্তচিন্তার ভাবী নায়কদের—নতুন স্বপ্নের ওপর ভর করে নতুন বাস্তব রচনায়।

সূত্রনির্দেশ

১. 'সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যাবর্তন', আনিসুজ্জামান। 'ভোরের কাগজ', ১৬ ডিসেম্বর ৯২।

২. 'ঢাকা থেকে ফিরে, এখন'। 'প্রতিক্ষণ', এপ্রিল ৯৩।

৩. ১নং সূত্র।

৪. 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক', সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ। 'ভোরের কাগজ', ১২ ডিসেম্বর ৯২।

৫. 'ধর্ম ও রাষ্ট্র', রশীদ আল ফারুকী। অক্ষর, ঢাকা। ১৯৮৭। পৃ ৭৪।

৬. "এই সুযোগে অনেক প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি দল ও উপদল বামপন্থী মুখোশ পরে জনগণের চিন্তাকে সামগ্রিকভাবে অগণতান্ত্রিক পথে চালনা করার চক্রান্তে সূক্ষ্মভাবে নিযুক্ত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক আওয়াজ তুলে তারা জনগণকে ভারত-বিরোধী (অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে ভারত সরকার বিরোধী হলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জনবিরোধী) 'সংগ্রামে'র দিকে পরিচালনা করতে 'উদ্বুদ্ধ' করছে।...এসব কথার অর্থ এই নয় যে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে পর্যালোচনার সময় ভারতের কোনো সমালোচনা করলেই সেটা সাম্প্রদায়িক হয়ে দাঁড়াবে। তা কখনো হতে পারে না। এখানে শুধু এ কথাটাই একটি গণতান্ত্রিক দায়িত্ব হিশেবে স্মরণ রাখতে হবে যে, ভারতবিরোধী প্রচারণা অতি সহজেই সাম্প্রদায়িক প্রচারণায় পরিণতি লাভ করতে পারে এবং সেটা হলে তার রাজনৈতিক ফলাফল অগণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের হাতকে জোরদার করতে বাধ্য।" (বদরুদ্দীন উমর, 'বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার'। চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা। ১৯৮৯। পৃ ১০)।

৭. 'পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা', শওকত ওসমান। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা। ১৯৯০। পৃ ৭।

৮. 'ঘোর অমাবস্যায় দুটি আলোর সংকেত', শামসুর রাহমান। 'ভোরের কাগজ', ২৪ ডিসেম্বর ৯২।

৯. 'যুগ যুগ ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আপ্তবাক্য এখন অচল', আবুল মোমেন।

'ভোরের কাগজ', ১২ জানুয়ারি ৯৩।

১০. ৫নং সূত্র। পৃ ৬২।

১১. 'দয়া করে ভেবে দেখুন', আহমদ শরীফ। 'আজকের কাগজ', ১৮ ডিসেম্বর ৯২।

১২. 'ওরা যাবে না ; কেন যাবে না', পূরবী বসু। 'ভোরের কাগজ', ১৬ জানুয়ারি ৯৩।

১৩. ১১ নং সূত্র।

১৪. 'সাম্প্রদায়িকতা ও জামাত', মাহমুদুর রহমান মান্না। অনন্যা, ঢাকা। ১৯৯৩। পৃ ৭১।

১৫. 'বর্বরতার স্বাক্ষর', কে. এম. সোবহান। 'আজকের কাগজ', ১৩ ডিসেম্বর ৯২।

১৬. 'আমার মৃত্যুও যেন না হয় সেই বাংলাদেশে', মুনতাসীর মামুন। 'ভোরের কাগজ', ১৪ ডিসেম্বর ৯২।

১৭. 'স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য', আসাদুজ্জামান নূর। 'ভোরের কাগজ', ১৩ ডিসেম্বর ৯২।

১৮. 'সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা : সময়ের মুখোমুখি', মাহমুদুর রহমান মান্না। পূরবী বসু ও হারুন হাবীব সম্পাদিত 'বাঙালি'-তে (বেঙ্গল ফাউন্ডেশন. ঢাকা ১৯৯২) সংকলিত।

১৯. 'সংখ্যালঘু জীবনের সমস্যা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন', অজয় রায়। 'ভোরের কাগজ', ২৩ ডিসেম্বর ৯২।

২০. 'মানবাত্মা কাঁদে ধর্মের প্রহারে', হায়াৎ মামুদ। 'ভোরের কাগজ', ১৬ ডিসেম্বর ৯২।

২১. ১৫নং সূত্র।

২২. *The Marginal Man*, Prafulla Kr. Chakraborty. Luminere Books, Kalyani. 1990. p 434-5.

২৩. 'যে জীবন অধমের', শফি আহমেদ। 'আজকের কাগজ', ৮ জানুয়ারি ৯৩।

২৪. 'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য', তসলিমা নাসরিন। আনন্দ পাবলিশার্স সংস্করণ, ১৯৯৩। পৃ ৩৫।

২৫. 'ছোট ছোট দুঃখ কথা', তসলিমা নাসরিন। বাংলাদেশ সংস্করণ, ১৯৯৪।

২৬. 'তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে', সন্‌জীদা খাতুন। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা। ১৯৯৪। পৃ ৭৮।

২৭. 'সাংস্কৃতিক রাজনীতি এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের একুশ তত্ত্ব', ড. এস. এম. লুৎফর রহমান। 'দৈনিক ইনকিলাব', ২১ ফেব্রুয়ারি ৯৩।

২৮. আনন্দধ্বনি-র রূপায়ণ 'পঞ্চ ভাস্করের গান' উপলক্ষে প্রকাশিত ফোল্ডার। ৬ নভেম্বর ৯৩।

২৯. ১৬ নং সূত্র।

৩০. "বাংলাদেশে বেশ কিছুকাল ধরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এন-জি-ও-রা শিক্ষাবিস্তারের কাজে, মেয়েদের সংগঠিত করার কাছে এবং ঋণ দিয়ে সমবায়মূলক উদ্‌যোগের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের মধ্যে এক ধরণের আত্মনির্ভর গ্রুপ গড়ে তোলার কাজে বেশ সফলতার পরিচয় দিয়ে আসছেন।...এসব কাজের ফলে গ্রামের প্রথাগত নেতৃত্ব ও মহাজনী ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। সুতরাং এন-জি-ও-দের গড়া বহু বিদ্যালয় আক্রান্ত, লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয় ; বলা হয়, এন-জি-ও-রা ধর্মান্তরের কাজে লিপ্ত, তাদের বইপত্রে যা আছে তা ইসলামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।" (আনিসুজ্জামান, সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত উক্তি। রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ মে ৯৪)।

৩১. 'বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ', সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা। নভেম্বর ৯২। পৃ. ১৩১-১৩২।

'ভোরের কাগজ', 'আজকের কাগজ', 'দৈনিক ইনকিলাব'—সবই বাংলাদেশে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা। প্রথম দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলোর উৎস : শফি আহমেদ ও পূরবী বসু সম্পাদিত 'এখনো গেল না আধার/সংবাদপত্রে '৯২-এর সাম্প্রদায়িকতা' (সাহিত্য সমবায়, ঢাকা। ১৯৯৩) এবং অরুণ সেন ও মফিদুল হক সম্পাদিত 'ধ্বংসস্তূপে আলো/বাবরি মসজিদ রাম মন্দির বিবাদ' (প্রতিক্ষণ, কলকাতা এবং সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩)।

এই সংকলন দুটিতে এবং অন্যত্রও বাংলাদেশের সর্বস্তরের লেখকদের অজস্র লেখা থেকে প্রমাণিত হয়, এমনকী এবারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ও যে ত্বরিতগতিতে নিজেদের মনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাঁরা, তাতে নির্মম আত্মসমালোচনা ও গভীর ক্ষোভের মধ্য দিয়ে তাঁদের সৎ বিবেকের পরিচয়ই স্পষ্ট হয়েছে এপার বাংলার মানুষের কাছে। দুই দেশেরই ব্যাপক নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার মধ্যে হয়তো লেখকদের এক বিরাট অংশের এই তীব্র আত্মসচেতনতাই আলোর নিশানা। 'এখনো গেল না আঁধার'-এর সম্পাদকীয়তে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে তাই আমরা একমত : "সাম্প্রদায়িকতা—এই একটি বিষয় সাম্প্রতিককালে কী বিপুলভাবে দখল করেছে সংবাদপত্রের কলম"—বাংলাদেশের এতজন লেখক এগিয়ে এসেছেন নিজের-নিজের মতো করে প্রতিবাদ জানাতে—"তার একটি দলিল গ্রন্থাকারে থাকা উচিত"। কেননা এই দলিলই ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবে লেখকদের গৌরবময় ভূমিকার কথা। 'ধ্বংসস্তূপে আলো'-র বাংলাদেশের লেখকদের সংকলন-অংশটির সম্পাদক মফিদুল হক হাজির করেছেন সেখানকার "শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজনের ভাবজগতের পরিচয়" এবং পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের "চিন্তাশীল মহলে"র প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করে জানিয়েছেন—দুই বাংলার "ভাববিনিময় ছাড়া উপমহাদেশের অভিন্ন দানবের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে সফলতা আমরা আশা করতে পারি না।" এই ভাববিনিময়ের লক্ষ্যই তো আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধেরও।

রচনাকাল : ১৯৯৪

বাঙালির সত্তার নির্মাণ : ইতিহাসে ও সাহিত্যে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে ১৯৯৯-এর ফেব্রুয়ারিতে একটি আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়েছিল, এবং তার বিষয় ছিল—'বাংলাদেশ' ও 'বাঙালি'-র আত্মসত্তার নির্মাণ : ইতিহাসে ও সাহিত্যে'। 'বাংলাদেশ' ও 'বাঙালি' শব্দদুটিকেই উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছিল, এবং আমন্ত্রণলিপিতে, অপ্রয়োজনীয়ভাবেই হয়তো, ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছিল : 'বাংলাদেশ' বলতে দেশভাগের আগের ও পরের দুই বাংলাকে বোঝানো হচ্ছে এবং 'বাঙালি' বলতে দুই দেশের বাঙালিকে। আলোচনাচক্রের মূল ভাষণে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের একজন বাঙালির চোখে বাংলাদেশের বাঙালিকেই দেখতে চাওয়া হয়েছিল—এই পরিণামী স্বতন্ত্র পরিচয়ের ইতিহাসে এবং তাদের সাহিত্যের পাঠের অভিজ্ঞতায়। দুই দেশের বাঙালির দ্বৈত এবং অদ্বৈত প্রকাশ পাবে এই দেখায়, সেটাই ছিল প্রত্যাশা।

'বাঙালি' ও 'বাংলাদেশ' শব্দদুটি নিয়ে ১৯৭১—এর আগে পর্যন্ত আমাদের কোনো অসুবিধাই ছিল না। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পরও, আজ যাকে বাংলাদেশ বলি, তাকে বলা হত প্রথমে পূর্ববঙ্গ এবং পরে পূর্বপাকিস্তান। সেই সূত্রে বলা যেত ওখানকার বাঙালি পূর্ববাংলার বা পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি। কিন্তু ১৯৭১-এর পর পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙালির কাছ থেকে 'বাংলাদেশ' শব্দটি যেন বেদখল হয়ে গেল। রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় অর্থে যে-দেশকে 'বাংলাদেশ' বলা হচ্ছে এখন, তার বাইরে ঐতিহাসিক আবেগের টানে পশ্চিমবঙ্গকে আর 'বাংলাদেশ' বলা যাবে না। 'পশ্চিমবঙ্গ' সূত্রে কোনো লেখকের কলমের ডগায় 'বাংলাদেশ' শব্দটি স্বতই চলে আসতে চাইলে তাঁকে সংযত হতে হবে, নিষেধ আরোপিত হবে কথকের উচ্চারণে। 'বাঙালি' নিশ্চয়ই উভয় দেশের মানুষকেই বলা হয়, প্রসঙ্গ ধরে তাদের দেশীয় পরিচয় একরকমের বুঝেও নেওয়া যায়—কিন্তু 'বাংলাদেশ' এই অভিধার আর উদ্ধার নেই। এখন অবশ্য নানা ব্যাপারেই এক হওয়া সত্ত্বেও, দুই বাংলার বাঙালির ভিন্ন চারিত্র্য বা গড়ন আছে কিনা সে-কথাও উঠছে—তবে উভয় ক্ষেত্রেই 'বাঙালি' শব্দটি আমরা নিঃসংকোচে ব্যবহার করতে পারি।

'বাঙালি মুসলমান' এই জোড়াশব্দ নিয়ে ঝঞ্ঝাট কিন্তু অনেককালের। হিন্দুদের মুখে 'বাঙালি বনাম মুসলমান' এই বিন্যাস তো অনেককালের চেনা, শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উল্লেখ ছাড়াই। পরে জেনেছি, মুসলমানেরাও দীর্ঘকাল হিন্দু ও বাঙালি-র সমীকরণে অভ্যস্ত। বলা বাহুল্য, দুটোই এসেছে পরস্পরের প্রতি একই দূরত্ববোধ থেকে। যদিও দূরত্ববোধের কারণটা হয়তো ভিন্ন-ভিন্ন।

ইংরেজ-আগমনের পরের আধুনিক কাল থেকেই হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদটা সম্পূর্ণ হল, বলা যায়। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতি এবং তারই ফলে সর্বস্তরে পিছিয়ে-পড়াটা একই সঙ্গে ঘটতে থাকল মুসলমানদের জীবনে। অবশ্য কারণটা আরো মৌলিক—জন্মসূত্রে যারা প্রধানত ধর্মান্তরিত নিম্নবর্ণ হিন্দু, দরিদ্র খেটে-খাওয়া মানুষ, তাদের পিছিয়ে থাকাটা তো প্রায় প্রাগৈতিহাসিক। সেই পিছিয়ে-থাকার মনস্তত্ত্ব বহুকাল ভেতরে-ভেতরে কাজ করে গেছে। পক্ষান্তরে, ঠিক এভাবেই সুবিধাভোগী হিন্দুদের মধ্যে কাজ করেছে উঁচ্‌কপালেপনা—প্রতিবেশীর প্রতি তীব্র অবজ্ঞা।

মনের এই ব্যবধানই হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছিন্নতা, বিদ্বেষ, দাঙ্গা ও দেশভাগের কারণ। ইংরেজদের ইন্ধন জোগানো তো পরের ব্যাপার—কারণটা ছিল বলেই তাকে উশকে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। মুসলমানদেরও ছিল প্রবল প্রত্যাখ্যান হিন্দুদের সম্পর্কে, তাই হিন্দুদের থেকে আলাদা হওয়ার তীব্র আকুতিতেই 'বাঙালি' পরিচয় গ্রহণ করার কথা মনেই ওঠেনি তাদের—যেহেতু বাঙালি-পরিচয়টা ঐতিহাসিকক্রমে হিন্দুরা করায়ত্ত করেছে আগেই। হিন্দুদের প্রতিক্রিয়ার কারণও তা-ই—তারা 'বাঙালি' হলে মুসলমানেরা 'বাঙালি' হবে কী করে! এটা যে অনেকদিন পর্যন্ত এবং অনেক গভীরে চারিয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ আধুনিককালে এসেও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মুসলমানদের ভূমিকা আছে, অবদান আছে, তা দৃষ্টান্তসহ প্রমাণ করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন মুসলমান লেখকেরাই। তা হিন্দুদের বোঝাতে যেমন, তেমনি নিজেদেরকেও বোঝাতে।

দেশভাগের আগেও মুসলমানদের অনেকেরই মনে বিপরীত ভাব ছিল না তা নয়। ইতিহাস থেকে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মানসিকতা যেমন উনিশ শতকের হিন্দু জাগরণে ছিল, তেমনি ছিল পরবর্তীকালে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলমানদের জাগরণেও। কিন্তু আপামর জনগণের মনের দূরত্বকে কাজে লাগাল শাসক ইংরেজ এবং উভয় ধর্মের পান্ডারা।

এর পরিণতিতে যে-দেশভাগ তা-ই বরং শিক্ষা দিল বাঙালি মুসলমানদের, ফিরিয়ে আনল আত্মস্থতা। বোঝা গেল ধর্মের মিল-অমিল কিছুই না অন্য স্বার্থের

কাছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের শোষণের অভিজ্ঞতায় তারা বুঝতে পারল, জমিদার হিন্দু বা শাসক ইংরেজের চেয়ে কম ভয়ংকর নয় ধর্মীয়-অর্থে এই 'কাছের' মুসলমানেরা।

১৯৪৮ এবং ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবির্ভাব হল নতুন বাঙালি মুসলমানের। এর আগে বাঙালি পরিচয়টা ছিল যেন দ্বিধান্বিত ও অস্পষ্ট। এবার এই পরিচয়টাই হয়ে উঠল প্রধান—আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হল তাকেই প্রতিষ্ঠা করা। শুধু আবেগ নয়, সংযত বুদ্ধিও ছিল এর পেছনে। তাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর সত্ত্বেও উর্দুকে হঠানো নয়, তাদের দাবি ছিল উর্দু ও বাংলাকে একই সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা করা। ভাষা-আন্দোলন তখন-তখনই সাফল্য লাভ করেনি—কিন্তু এই ব্যর্থতাই জ্বালিয়ে দিল আগুন। এর পরেই নতুন একটা বড়ো লড়াই যে শুরু হল, সেটাই আসল কথা। অবশ্যই সেই লড়াইও খুব সহজ হয়নি। যে-ধর্মীয় জেহাদের মনটাকে এতদিন লালন করা হয়েছে, তাকে দূর করা কি সোজা? কিন্তু এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের নবীন চেতনা, তার ধর্মনিরপেক্ষ চেহারা ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকল। শুধু শহরে নয়, গ্রামেও। একান্ত গ্রামীণ আরজ আলী মাতুব্বরের মতো মানুষও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দিতে পেরেছিলেন।

এই নবীন সংগ্রামী বাঙালি মুসলমানদের হাতিয়ার হল বাংলাভাষা ও সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি (নাগরিক সংস্কৃতি এবং লোকসংস্কৃতি উভয়ই) এবং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য, হয়তো তার চেয়েও বেশি তাঁর গান অনুপ্রাণিত করল এই ভাষা-ভিত্তিক স্বাধিকারের আন্দোলনে। রবীন্দ্রনাথের যে-গান একবার এই শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ধ্বনিত হয়েছিল, সেই গানই ফিরে এল খণ্ডিত দেশের নতুন বেদনা ও লড়াইয়ের মুহূর্তে। রবীন্দ্রসংগীত আরো একবার হয়ে উঠল বাঙালি জাতির আত্ম-উদ্বোধনের উচ্চারণ।

এগুলোই যেমন এই নবজাগ্রত বাঙালির টিকে থাকার অস্ত্র, তেমনি পাকিস্তানি শাসকদের বা মৌলবাদীদের আঘাতও তাদেরই বিরুদ্ধে। তাই ফতোয়া শোনা গেল—বাংলা ভাষা বা বাংলা হরফ নয়, আরবি ভাষা আরবি হরফ ; বাঙালি সংস্কৃতি নয়, ইসলামি সংস্কৃতি ; রবীন্দ্রনাথ নয়, নজরুল। অর্থাৎ নজরুলকেও ভুলভাবে, অভিসন্ধি-মূলকভাবে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষে দাঁড় করানো হল। কিন্তু এই নতুন বাঙালি কোনো কিছুর পরোয়া না করে আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্র বাড়িয়েই চলল। বাঙালি সংস্কৃতির চিহ্ন বা অভিজ্ঞানগুলোকে অবলম্বন করেই নিজেকে ছড়িয়ে দিল। পয়লা বৈশাখে নববর্ষ, পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রজয়ন্তী, বসন্ত-উৎসব, বর্ষাবরণ, নবান্ন-উৎসব—

এ সমস্ত কিছু উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়েই তার প্রতিবাদ, বাঙালিত্বের পতাকা ওড়ানো। কেননা হিঁদুয়ানির কলঙ্ক লেপন করে মৌলবাদীরা সেগুলোকে বর্জনের ডাক দিয়েছে। বলা বাহুল্য, কোনোটার জয় একতরফা হয়নি, সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের এই লড়াই ক্রমশই পাকিয়ে উঠছিল।

রাজনীতির লড়াই, অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার লড়াইও চলছিল পাশাপাশি। মাতৃভাষার জন্য দাবি ও সংস্কৃতির আত্তীকরণের এই অভিযান অনিবার্যভাবে বাঙালিকে পৌঁছে দিচ্ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের রাস্তায়। ১৯৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়, ১৯৫৮-তে আইয়ুব খানের উত্থান, ১৯৬৬-তে শেখ মুজিবের ছয়-দফা দাবি, ১৯৬৯-এ ছাত্রসমাজের আন্দোলন ও তা থেকে বৃহত্তর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের জয় এবং ১৯৭১-এ পূর্ববঙ্গের মানুষের ওপর পশ্চিম-পাকিস্তানি সৈন্যের বর্বর আক্রমণ— এইসব ঘটনা ও দুর্ঘটনার ধারাবাহিকতায় মুখর সে-দেশের ইতিহাস। পশ্চিম-পাকিস্তানি শক্তির হিংস্রতার ধারাবাহিকতা এবং তার বিরুদ্ধে বাঙালির লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা। আর, এখানেই রাজনীতি ও সংস্কৃতির লড়াই এক হয়ে গেল ওপার বাংলায়। ছাত্রসমাজের গৌরবজনক ভূমিকার কথা বারবার বলা হয়েছে। এবং খুবই গুরুত্ব পেয়েছে সংস্কৃতিকর্মী ও লেখককর্মীদের সৃষ্টিশীলতা। দেশের মূল লড়াইয়ের সঙ্গে সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের লড়াই এতটা তাৎপর্যময় সম্পর্কে অন্বিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বোধহয় খুব বেশি পাওয়া যায় না বিশ্বে আর কোথাও। দুই দশক জুড়ে ওপার বাংলায় আবেগ কল্পনা ও মননের চর্চার যে-দায়কে কাঁধে তুলে নিয়েছিল বাঙালি, তার প্রায় প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও।

এভাবেই এগোতে-এগোতে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে যখন পৌঁছে গেল বাঙালি, তখন দেখা গেল তার শৌর্যেরও প্রকাশ। তাই মোটেই অসংগত মনে হয় না, আজ যখন সমকালীন ও উত্তরসূরি একই সঙ্গে প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, কিংবা তারই বীজ রোপিত হয়েছিল যে একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিতে তাকে নিয়ে কিংবা তার স্মৃতিবাহী শহিদ-মিনারকে নিয়ে। আমরা অনায়াসেই ছুঁতে পারি বাঙালির সেই স্পর্শকাতর জায়গাগুলিকে। সেই বাধাবন্ধহারা আবেগ এমনকী প্রকাশ পেতে পারে মুজিবুর রহমানকে নিয়েও—কারণ একাত্তরের যুদ্ধে বাঙালির যা কিছু প্রাপ্তি তা তো তাঁকে ঘিরেই—তিনিই হয়ে ওঠেন বাঙালির এই নতুন আত্মপ্রতিষ্ঠার পৌরাণিক পুরুষ। আর একাত্তরের স্মৃতিকথাগুলি যেন তারই পুরাণকথন।

একসময় 'মুসলমান' পরিচয়কেই প্রাধান্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান মেনে নিয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব, চেয়েছিল পাকিস্তান—আর এখন 'বাঙালি' পরিচয় আবিষ্কার করেই

ঘটাল এই মুক্তিযুদ্ধ, অর্জন করে নিল স্বাধীন 'বাংলাদেশ'। এ থেকেই বোঝা যায়, ১৯৭১-এর পর 'বাংলাদেশী' পরিচয়ে কেন তাদের এত অনীহা—এ যেন ভাষা-আন্দোলনে থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত গোটা ইতিহাসের মর্মার্থকেই অস্বীকার করা। তারা শুধু 'বাঙালি'—'বাংলাদেশের বাঙালি'।

ঠিক একই কারণে বাংলাদেশের বাঙালির সাহিত্যকে বলা হয় 'বাংলাদেশের সাহিত্য'। শুধু আমরা বলি তা নয়, বাংলাদেশেও দেখেছি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৭-পূর্ববর্তীকে 'বাংলা সাহিত্য' এবং ১৯৪৭-পরবর্তীকে 'বাংলাদেশের সাহিত্য' বলে চিহ্নিত করা হয়। সংগত কারণেই অনেকে এ বিভাজনে ঘোর আপত্তি জানিয়েছেন। ভাষা এক, সাহিত্যের ঐতিহ্য এক, দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইতিহাসও এক—তাকে আলাদা করা যায় কী করে? রাষ্ট্র আলাদা বলে সাহিত্যও আলাদা হবে? এই ঐক্যের ব্যাপারটা যেমন সত্যি, তেমনি এও তো ঠিক, দুটো দেশ আলাদা হয়ে যাবার পরে দুই দেশের মানুষের নিজস্ব তাগিদে ও গতিতে অনেক ওলোটপালোট হয়ে যায়, নানা দিক থেকেই অভিজ্ঞতার ভিন্ন জগৎ তৈরি হয়। এবং তা থেকে সাহিত্যের ধারার একটা আলাদা গড়ন তৈরি হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! ফলে কাছাকাছি হয়েও এখন দুই দেশের সাহিত্যের, ভিন্ন পটভূমি ও ভিন্ন বিষয়ের কারণে, যে-স্বাতন্ত্র্য সেটাও কম প্রাসঙ্গিক নয়। বিচার করে দেখলে এই দুই মনোভাবেরই যাথার্থ্য আছে। আর তাহলে তো সেই ভিন্নতার শুরু দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানের জন্ম থেকেই। আজ 'বাংলাদেশের সাহিত্য' বলতে যা বুঝি তা পূর্বপাকিস্তান-আমলের নানা আশঙ্কা, লড়াই বা পুরুষার্থের সূত্রেই গড়ে উঠেছে। সেদিক থেকে, নামকরণে যে-গোলমালই হোক, পূর্বপাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাহিত্য অবিচ্ছিন্ন এবং উভয়কে মিলিয়েই 'বাংলাদেশের সাহিত্য'।

কী সেই পটভূমি বা বিষয়গত অভিজ্ঞতা যাতে ভাষা ও ইতিহাস এক হওয়া সত্ত্বেও 'বাংলাদেশের সাহিত্য'কে আজ পৃথকভাবে শনাক্ত করতে পারি? পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশের কথা অনেকসময় বলা হয়ে থাকে, কিন্তু সেটার ওপর বেশি জোর দেওয়া বোধহয় চলে না। পশ্চিমবঙ্গেও তো অঞ্চলভেদে প্রকৃতির বৈচিত্র্য আছে, সাহিত্যে তার প্রতিফলনও ঘটে। সেদিক থেকে পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি অন্তত এখন মৌলিকভাবে আলাদা কিছু নয়। তবে নদী-খাল-বিলের প্রাচুর্যে কিছু বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই আছে এবং সে-কারণেই পদ্মা-যমুনা-মেঘনার দেশকে সাহিত্যের মধ্য দিয়েই হয়তো একটু ভিন্ন রঙে চেনা যায় কবিতায় বা উপন্যাসে বা গল্পে।

বাংলাদেশের মানুষজনও *সামগ্রিকভাবে এবং শেষপর্যন্ত* পশ্চিমবঙ্গের মানুষজনের থেকে আলাদা নয়। কিন্তু একটা বড়ো ব্যাপার হল, বাঙালি মুসলমান পূর্ববঙ্গের

জনসংখ্যার প্রধান অংশ। দেশভাগের পরে দেশত্যাগের পরিণামে অমুসলমানদের সঙ্গে এই আনুপাতিক ব্যবধান আরো বেড়ে গেছে। এক্সময় অখণ্ড বাংলায়, হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা সংখ্যাধিক হওয়া সত্ত্বেও, উপন্যাসে মুসলমানের জীবন বা সমাজ ছিল অনুপস্থিত, মুসলমান লেখকও প্রায় সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। সাহিত্য তারা নিজেরাও লেখেনি, পড়েনি—তাদের নিয়েও কেউ লেখেনি। কিন্তু বিশ শতকের বিলম্বিত জাগরণের পর ধীরে-ধীরে অবস্থা পালটাল। বাংলা সাহিত্যে যখন মুসলমানদের এই 'জীবন' বিষয় হিশেবে এল, মুসলমান লেখকেরা নিজেরাই কলম ধরলেন, তখন বাঙালি জীবনের একটি অজানা দিক—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চাঁদের অন্য পিঠ', যেখানে আলো পড়েনি, তা আলোকিত হল। দেখতে পেলাম, নতুন বিকাশোন্মুখ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের মানসিকতা, তার আশা আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ পূর্বপাকিস্তানের ও বাংলাদেশের সাহিত্যকে স্ফূর্তি দিয়েছে। তাদের গর্বিত স্বাতন্ত্র্যবোধ এনে দিয়েছে। বাঙালি মুসলমানের জীবন ও আবেগ দেশভাগের পরই যেন প্রথম ভাষা পেল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আবু ইসহাক বা শওকত ওসমান থেকে শুরু করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পর্যন্ত কিংবা তারও পরের উপন্যাসের পথ দিয়ে আমরা একটা দেশের অচেনা বাস্তবকে চিনতে পারব—এরকম একটা আশার জন্ম হল এপার বাংলার পাঠকের মনেও।

বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনই বোধহয় বাংলাদেশকে বা বাংলাদেশের সাহিত্যকে সবচেয়ে গৌরবান্বিত করেছে। মাতৃভাষার পক্ষে সারা বিশ্বেই অনেক বিক্ষোভ হয়েছে, কিন্তু বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের যে বিশালত্ব ও গভীর তাৎপর্য তা আর কোথাও দেখা যায় না। এই ভাষা-আন্দোলন নিয়ে অনেক প্রবন্ধ, গবেষণা, অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ হয়েছে। ভাষা-আন্দোলনের আগে পাকিস্তানবাদী প্রচার যেটুকু প্রবল হয়ে উঠেছিল, ভাষা-আন্দোলনের চাপে তা অনেকটাই প্রতিহত হল। ভাষা-আন্দোলনকে নিয়ে গান, কবিতা, কথাসাহিত্য বা নাটক লেখা হয়েছে। এটা শুধু তাৎক্ষণিক ব্যাপার নয়—এই আন্দোলনের পরেও সাহিত্যে তার প্রভাব রয়ে গেছে।

ভাষা-আন্দোলন অবশ্য বাহান্নতেই থেমে যায়নি। এই আন্দোলনই যেন আছড়ে পড়েছে একের পর এক অন্য আন্দোলনে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে। এই ইতিহাসেরও অসংখ্য দলিল আছে। বস্তুত 'বাংলাদেশের সাহিত্য'ই তো তার দলিল। এই সাহিত্য থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের মর্মান্তিক অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদের উজ্জ্বল ছবি আমাদের কাছে পৌঁছে যায়। কবিতা পড়তে-পড়তে আমরা পেয়ে যাই শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী, মোহাম্মদ রফিক, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ এবং আরো অনেকের প্রতিবাদী কবিতা।

উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌-র পরেও যে আছেন শহীদুল্লা কায়সার, শওকত ওসমান, শওকত আলী, সত্যেন সেন, জহির রায়হান, মাহমুদুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, কিংবা ছোটোগল্পে হাসান আজিজুল হক—যাঁদের স্বাতন্ত্র্য পূর্বপাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ, ৫২ থেকে ৭১ পর্যন্ত ইতিহাসের পটভূমিতেই শুধু সম্ভব, তার আবিষ্কারই বাংলাদেশের সাহিত্যপাঠের পাওনা। এমনকী বাংলা সাহিত্যের দুর্বলতম শাখা বলে কথিত নাটকের ক্ষেত্রেও দেখেছি আবদুল্লাহ্‌ আল মামুন বা সৈয়দ শামসুল হক, মামুনুর রশীদ বা সেলিম আল দীনের মতো নাট্যকারকে। এঁদের একাধিক নাটকে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা এবং তাকে ঘিরে আবেগ বিষয়গুণে অন্তত বিশিষ্ট হতে পেরেছে।

বাংলাদেশে পা দিয়েই পশ্চিমবঙ্গের কোনো পর্যটক সবচেয়ে অবাক হন যা দেখে, তা হল, জনজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাভাষার ব্যবহার। ফলে, সেখানে বাংলাভাষা যে সাহিত্যেও একটা পৃথক মর্যাদা পাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! শুধু সাহিত্য নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে চর্চার অনিবার্য মাধ্যম বাংলাভাষাই সেখানে। এর তুলনীয় অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে নেই। বাংলাদেশে নব্যশিক্ষিত মুসলমানদের আত্মপরিচয়-সন্ধান, বাঙালি হিশেবে আত্মবোধ, বাংলাভাষার জন্য মমতা—এ সবই এসেছে একই উৎস থেকে, একই অখণ্ড চেতনা থেকে। এবং সেটা বাংলাদেশের বাঙালিকে একটা তীব্র ও শুদ্ধ আবেগ এনে দেয়—যা তাঁদের সবরকমের সাংস্কৃতিক কর্মে বা সাহিত্যে টের পাওয়া যায়—তা সে থিয়েটারই হোক, কিংবা রবীন্দ্রসংগীত, কিংবা চিত্রভাস্কর্য। কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটকে তো বটেই। ঠিক এই মাত্রার আবেগ অন্তত এখানে যেন অবান্তর হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিকর্মের অনন্যতার আরো বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যায়, যে-কারণগুলোর জন্যই বাংলাদেশের সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত ও পঠিত হওয়ার যোগ্য। যেমন, বাংলাভাষার এই ব্যাপকতর চর্চার সূত্রেই হয়তো বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এক রকমের শিকড়-নামানো বাস্তবতা আছে বলে অনুভব করা যায়। উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার নিয়ে সেখানেও মতবিরোধ আছে, কিন্তু তবু ওই ডায়লেক্টের ব্যাপক ব্যবহার বহু সময়েই মাটির স্পর্শ এনে দেয়, হয়তো বৈদগ্ধ্যের একটা মৃত্তিকাসংলগ্ন ধরণও। এটা সেখানকার বহু কবিতা বা গদ্যরচনা বা সবচেয়ে বেশি নাটক ধরে-ধরেই দেখানো যায়।

এর পরের বৃত্তান্ত অবশ্য মর্মান্তিক। মুক্তিযুদ্ধ ছিল বিস্ময়, কিন্তু আরো বিস্ময়, কীভাবে কত তাড়াতাড়ি, মুক্তিযুদ্ধের যা-কিছু স্বপ্ন তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, যা-কিছু অর্জন তা অপহৃত হল। তাই তো কারো মনে হয় "অপহৃত বাংলাদেশ"।

কারো মনে হয় এই বাংলাদেশ শুধুই "পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়"। যে-আবদুল হক একাত্তরের বাঙালির বিস্ময়কর শৌর্যের কথা বলেছিলেন, তিনিই এখন নতুন 'বিস্ময়ে'র কথা শোনান : "সংগ্রামের পরে-পরেই বিধ্বস্ত বাংলাদেশে লুব্ধ বাঙালির অর্থলালসা ; আহত বাঙালির শরীর মাড়িয়ে, তার করুণ মিনতি উপেক্ষা করে তাকে লুণ্ঠন, বহুকাল যাবৎ লুণ্ঠিত বাঙালিকে পুনরায় লুণ্ঠন, যখন তার নিরাপদ হওয়ার কথা সেই সময়ে।" একেই তিনি বলেছেন বাঙালির "আত্মহত্যার প্রবণতা"। কবি নির্মলেন্দু গুণ শেখ মুজিবকে বলেন "এক আত্মঘাতী জাতির নেতা"।

স্বপ্নভঙ্গের বেদনা কত লেখায় যে প্রকাশ পায় তার যেন শেষ নেই। বাংলাদেশে বাঙালি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন শুধু ব্যর্থতাই সেই স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষদের চোখে পড়ে। কেউ নাগরিক মধ্যবিত্তের অধঃপতন নিয়ে চিন্তিত, কেউ শিক্ষাঙ্গনের কুৎসিত পরিবেশে ক্রুদ্ধ, কেউ সংখ্যালঘুর নিঃশব্দ দেশত্যাগে বেদনার্ত, আবার কেউ ফতোয়াবাজদের হাতে অসহায় নারীর নির্যাতনে বাক্‌রুদ্ধ। হাসান আজিজুল হকের মনে হয় : "অন্ধকারে, ক্রমাগত ধস নামছে, ছোটো হয়ে আসছে বাংলাদেশ, অন্ধকারে, বাতাসের ঝড়ের ঝাপটে জাহাজ ডুবে যাচ্ছে...।"

না কি কারোর মনে হতে পারে, এই আত্মসচেতনতা, এই আত্মগ্লানি এখনো যে টিকে আছে সেই বাস্তবই বলে দেয়—অন্ধকার নয়, আলোয় আলোয় মুক্তিই আসবে একদিন! এই ক্ষণে যখন মনে হচ্ছে, কোনোই আশা নেই, পরের ক্ষণেই কি শোনা যাচ্ছে না, ক্ষীণভাবে, হয়তো খুবই ক্ষীণভাবে, পরিত্রাণের সংকেত! রাজনীতি সমাজ সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই সেই ছোটো-ছোটো আলোর ইশারাই পাওয়া যায় বাঙালির একক ও যৌথ জীবনে—যদি আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সমগ্রের দিকে চোখ মেলে তাকাই। অন্তত অন্য বাংলার মানুষ হিশেবে তা টের পেতে অসুবিধা হয়নি আমাদের কারো-কারো। বিপদের, আশঙ্কার বা ব্যর্থতার দিকগুলো শনাক্ত করার মনটা এখনো যখন বেঁচে আছে, তখন তাকে নির্ভর করেই এগোনো যায়।

মাঝে-মাঝে কোনো কণ্ঠস্বরে হয়তো উগ্রতা ও অতিশয়োক্তি একটু বেশি প্রকাশ পায়, অস্মিতাবোধ বিচ্ছিন্ন করে দেয় সহযাত্রীদের কাছে থেকে, হয়তো এমনকী বিপথগামীও করে—কিন্তু তবু ওই উচ্চারণেও সাহসের দিক, প্রাণাবেগের দিক যেটুকু আছে তাতেই ভরসা রাখা যায়। মনে হয়, এই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের বাঙালির উঠে-আসার ছবিটি যে সত্য তা প্রমাণিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিকেও তা প্রেরণা জোগাবে।

এই নৈরাশ্য বা ক্ষোভ, সঙ্গে-সঙ্গে তা থেকে উত্তরণের মরিয়া চেষ্টা—ইতিহাসের এই অনিবার্যতা বাঙালিকে পরিণতিও দিয়েছে। অন্তত সহজ আশাবাদ থেকে। আর

সেটা সবচেয়ে প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে বাংলাদেশের সাহিত্যের সাম্প্রতিকেই। স্বাধীনতার পরের ওই সাহিত্যে (তা সে কবিতা, উপন্যাস-গল্প, নাটক, প্রবন্ধ যাই হোক) দু-তিনটি প্রধান সুর ঘুরে-ফিরে এসেছে :

১. একুশের চেতনা বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কীভাবে নষ্ট হয়েছে। যে-চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েছিল স্বাধীনতার মূল্যবোধ কীভাবে তা লাঞ্ছিত হয়েছে। মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক চেতনাকে অন্য চেহারায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলেছে। সেজন্যই তীব্র জ্বালা ও বিক্ষোভকে খুঁজে পাওয়া যায় শিল্পমাধ্যমের প্রতিটি ক্ষেত্রে। সাহিত্যের ভাষায় তো বটেই।

২. আবার, এরকম সংকটের মুহূর্তেও দেখছি, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও মাথা তুলেছে। বাংলাদেশে অন্তত এই প্রতিবাদের উৎস ভাষা-আন্দোলন এবং ভাষা-আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধে উত্তরণ। সেজন্যই আজকেও মাথা তুলে দাঁড়ানোর নাম 'একুশের চেতনা-কে ফিরিয়ে আনা', 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-কে ফিরিয়ে আনা'। সাহিত্যে সেই উচ্চারণ এখনো বাতিল হয়ে যায়নি।

৩. একটা নতুন লাভ অবশ্য এই : ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্দোলন ও মুক্তি-সংগ্রামের মূল্যায়নে যে একবগ্‌গা (বা ইচ্ছাপূরণের) দৃষ্টিকোণ ছিল, তার জায়গায় যেন একটা ভারসাম্য এল। সীমাবদ্ধতার দিক বা ত্রুটির কথাও বলা হল। তার মানে অবশ্য, বলা বাহুল্য, গৌরবের দিককে অস্বীকার করা নয়। আরো নানা ব্যাপারই এল। স্বাধীনতার মূল্যবোধের লাঞ্ছনার সূত্রেই খুব স্বাভাবিক ভাবে এল নারীত্বের অবমাননার কথা, বিভ্রান্ত যুবমানসের কথা। সাহিত্যের প্রচণ্ড আবেগের মুখোমুখি আজ দ্বন্দ্বজটিল আত্মসচেতন মন।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যেও তাই দেখতে পাই তার প্রারম্ভিক প্রতিবাদী চারিত্র্য এখনো হারিয়ে যায়নি। সৃজনশীল সাহিত্য বা মননশীল গদ্যরচনা, সবক্ষেত্রেই তা-ই। বাংলাদেশের বাঙালির জীবন ও সাহিত্য আমাদের এ-বঙ্গের মানুষের কাছে তাদের সমস্ত বিপদ আশঙ্কা বা ব্যর্থতা সত্ত্বেও—বাঙালির আত্মনির্মাণের স্বাতন্ত্র্য ও লড়াকু মেজাজকে এখনো সামনে নিয়ে আসে। বাংলাদেশ সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ চর্চা ও সাহিত্যপাঠের সার্থকতা সেখানেই।

রচনাকাল : ১৯৯৯

বাংলাদেশের সাহিত্য : চাঁদের অন্যপিঠের আলো

আবুল ফজল ছিলেন চট্টগ্রামের মানুষ—প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক শুধু নন, 'মুক্তবুদ্ধির চিরসজাগ প্রহরী'। এভাবেই পরিচিত তিনি বাংলাদেশে। দীর্ঘায়ু ছিলেন। একপ্রান্তে ১৯২৬-এর ঢাকা-কেন্দ্রিক 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র একজন হোতা, অন্যপ্রান্তে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা পার করে তিনিই গণ্য হয়েছিলেন উদার মানবতন্ত্রের এক পুরাণপুরুষ হিশেবে। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৌচির'। পড়ে রবীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন আবুল ফজলকে। "চাঁদের এক পৃষ্ঠায় আলো পড়ে না, সে আমাদের অগোচর, তেমনই দুর্দৈবক্রমে বাংলাদেশের আধখানায় সাহিত্যের আলো যদি না পড়ে তা হলে আমরা বাংলাদেশকে চিনতে পারব না, না পারলে তার সঙ্গে ব্যবহারে ভুল করতে থাকব।" বলা বাহুল্য, দেশভাগের অনেক আগে লেখা এই চিঠিতে বাংলাদেশ তো অখণ্ড বাংলা-ই। আর রবীন্দ্রনাথ "বাংলাদেশের আধখানা" বলতে পূর্ববঙ্গকেই বুঝিয়েছেন, আর যাদের চিনতে পারেননি বলে খেদ করেছেন তারা সেই পূর্ববঙ্গেরই মুসলমান। হিন্দু ও মুসলমানের বাস উভয় বঙ্গেই, তবু পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সম্পর্কে অপরিচয়ের কথাই যে বেশি করে মনে উঠেছে, তা তাঁর গোটা চিঠিটার প্রাসঙ্গিকতাতেই স্পষ্ট। তাঁর বলবার কথা ছিল, সাহিত্যের মধ্য দিয়েই মানুষকে চেনা যায়—"আধুনিক মুসলমান সমাজের সমস্যা ওই সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই জানতে হবে।" পূর্ববঙ্গের মুসলমান লেখকেরা যখন লেখা শুরু করবেন, তখনই পূর্ববঙ্গকে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানকে চেনা যাবে। রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠির পর অনেক জল গড়িয়ে গেছে। অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, আবুল ফজলের কথা বলতে গিয়েই, "চাঁদের আধখানার উপর সূর্যের আলো পড়ে না, এই উপমার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ যে কঠোর সত্যকে কোমল ভাষায় ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন, ইতিহাস তাকে আরো কঠোর ঘটনাবলির সাহায্যে সকলের দৃষ্টিগোচর করেছে। বাংলাদেশ এখন দুই আধখানা। বাঙালি জাতিও তাই।"

এই তীব্র আক্ষেপ বুঝে নিতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। পাকিস্তান-পর্ব ডিঙিয়ে পূর্ববঙ্গের নাম হয়েছে আজ 'বাংলাদেশ'। ইতিমধ্যে সহস্র বাধার মধ্য

দিয়েও সেখানে ঘটেছে স্বতন্ত্র এক জাগরণ। পূর্ববঙ্গের বা পূর্বপাকিস্তানের বা বাংলাদেশের মুসলমানদের থেকে প্রতিনিয়ত শুনেছি তাদের নিজের উচ্চারণ। কিন্তু যে-আগ্রহের কথা, জানা বা চেনার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তা কি ঘটেছে, আমরা যে বাকি আধখানার অধিবাসী তাদের কাছে? ঘটেছে বলতে পারলে খুবই খুশি হওয়া যেত, কিন্তু দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের ওই খেদ আজও সত্য। ঘটবার কথা কি ছিল না? পূর্ববঙ্গের বা বাংলাদেশের সাহিত্য কি তার যোগ্য নয়? এই জিজ্ঞাসাই আমার এই প্রবন্ধ রচনার মূলে। অনবরত দেখছি, বাংলাদেশের সাহিত্যের বিস্তার ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোনো খোঁজ না রেখেই পশ্চিমবঙ্গের লেখক-পাঠক অনায়াসে গজফিতে নিয়ে বলতে পারেন, সেখানকার সাহিত্য কতটা দুর্বল! নির্বিচার প্রশংসাও নিশ্চয়ই সে-সাহিত্যের প্রাপ্য নয়, এবং সেরকম তারিফে বাংলাদেশের লেখক-পাঠকেরাও সম্মানিত বোধ করেন না—কিন্তু যেটুকু ওই সাহিত্য অবশ্যই দাবি করতে পারে তা হল একই ভাষার প্রতিবেশী জনের কাছ থেকে স্বাভাবিক মনোযোগ। কিন্তু মনোযোগটা অনেকসময়ই কীরকম তার একটা উদাহরণ দিই। পশ্চিমবঙ্গের স্বনামধন্য বাক্‌চতুর এক লেখককে কোনো লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে বলতে শুনি : "ওদের কারোরই কিছু হয় না। গদ্যও নয়, কবিতাও নয়।" এরকম উদ্ধত বাচনেই সামান্য থেমে তিনি যোগ করেন, "আমি পড়িও না।" এর আগেই রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যে-কথা তিনি বলেছিলেন, তা এখানেও বলা যেতে পারত। "এগুলো যে পড়িনি বা পড়তে পারিনি, এতে তো আমার বিশাল সুবিধে হয়ে গেছে। প্রচণ্ডরকম অশিক্ষিত থেকে যাওয়ায়...।"(দ্র. 'অপর', জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৬)। ঠিক এতটা না হলেও, বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে বেদনাদায়ক উপেক্ষা কমবেশি আরো অনেকেরই—যে-কোনো মতমন্তব্য প্রকাশ করার জন্য তাদের কোনো শিক্ষারই দরকার পড়ে না। বরং সেটা তাদেরও "সুবিধে"।

এই বেদনাবোধ থেকেই কোনো-এক পত্রিকার আমন্ত্রণে একটি নিবন্ধ রচনা করতে উৎসাহী হয়েছিলাম বছর দেড়েক আগে—অন্তত বাংলাদেশের সাহিত্যের বিস্তার ও বৈচিত্র্য কিছুটা আভাসিত হোক এই প্রত্যাশায়। সেই লেখার, বলা বাহুল্য, লক্ষ্য ছিল ওই গর্বিত "প্রচণ্ডরকম অশিক্ষিত" পাঠকই শুধু নয়, আমাদের এপার বাংলার অনেক নিরীহ অন্যমনস্ক পাঠকেরাও। কিন্তু, পরে আবিষ্কার করি, নিবন্ধটি ওই পত্রিকার 'বাংলাদেশ সংস্করণে'ই শুধু ছাপা হয়েছে, আমার স্বদেশী পরিচিত পাঠকেরা তার অস্তিত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত। এখানকার পুনর্লিখনেও আমার সেই প্রাথমিক বেদনাবোধকেই এই প্রথম এ-বঙ্গের পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল।

১

'বাংলাদেশের সাহিত্য' বা 'বাংলাদেশের লেখক' এরকম কোনো পরিচয়সূচক অভিধা ব্যবহার করলে অনেকেই খুব গোঁসা করেন। বাংলাদেশের সাহিত্য আর পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য আলাদা নাকি? এপার বাংলার সাহিত্যকে বলব ভাষার নামে 'বাংলা সাহিত্য' আর ওপার বাংলার সাহিত্যকে বলব দেশের নামে 'বাংলাদেশের সাহিত্য'—তা-ই বা কেন?

একদিক থেকে কথাটা সত্যি হলেও, অন্যদিক থেকে অন্যকথাও ভাবা যায়, ভাবতেই হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবধানকে তো তুচ্ছ করতে পারি না, দুই দেশের ঘটনাস্রোত এক ধারায় চলে না। সাহিত্যে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিফলন পড়বেই। ভৌগোলিক মিল যেমন, তেমনি অমিলও কিছু-কিছু আছে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, মুসলমানপ্রধান ও হিন্দুপ্রধান দুই দেশে বাঙালিত্বের মিল সত্ত্বেও আচার-আচরণ বা বিশ্বাস-ভাবনার ক্ষেত্রে অমিলের দিকও একেবারে নেই, এমনই বা বলি কী করে? পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাগত প্রাধান্য তো একেবারে গোড়া থেকেই, সেই অখণ্ড বাংলার যুগেই। দেশভাগের পরে ওই প্রাধান্য আরো বাড়তেই থাকল। অথচ দীর্ঘকাল পর্যন্ত সাহিত্যে মুসলমানদের প্রায় কোনো উপস্থিতি নেই—লেখক হিশেবে নয়, বিষয় হিশেবেও নয়। মধ্যযুগের লোকায়ত সাহিত্যে, গানে ও গীতিকায়, মুসলমানদের দেখা পাই দুভাবেই। কিন্তু আধুনিক যুগে তো সাহিত্য মানেই শিষ্টজনের সাহিত্য, শিক্ষিতজনের সাহিত্য। তাও আবার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। আমরা জানি, ঐতিহাসিক মনস্তাত্ত্বিক নানা কারণে বাঙালি মুসলমানেরা সেই শিক্ষা প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তা ছাড়া সমাজের নিচুতলায় তাদের অবস্থান, কোনোরকম শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল না—আগেও না, পরেও না। আর তাই উনিশ শতক থেকে যে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম ও প্রসার, সেখানে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে কোনো মুসলমান লেখক নেই। তা নিয়ে অনেকে দুঃখ করেছেন—সংখ্যাগরিষ্ঠের উচ্চারণ যেখানে নেই, সেই সাহিত্য তো ভেতর থেকেই দুর্বল, অসম্পূর্ণ। বিশ শতকে এসে প্রথম সেই তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা অল্পস্বল্প নিতে শুরু করলেন মুসলমানেরা, জন্ম হল বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের, আর তখনই দেখা গেল তাঁদেরই কলমে তাঁদের জীবন প্রকাশ পেতে চাইছে। সেটা মুসলমানদের কাছেও খুব তৃপ্তির ব্যাপার। তাই তো দেখি, ১৯১৪ সালে যখন নজিবর রহমানের উপন্যাস 'আনোয়ারা' প্রকাশিত হল, কিংবা ১৯১৮-তে লেখা হল কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ্' (প্রকাশিত হয়েছিল বেশ পরে ১৯৩৩-এ), তখন ওইসব বই পৌঁছে গেল মুসলমানদের ঘরে-ঘরে—যারা একটু পড়তে পারেন তাঁদেরই কুলুঙ্গিতে। নজিবরকে অনুসরণ করে

আরো কোনো-কোনো মুসলমান লেখক তৈরি হলেন উপন্যাস লেখায়। এই নতুন ঘটনার স্বীকৃতি জুটল ব্যাপকতর সাহিত্যমণ্ডলেও। এমনকী রবীন্দ্রনাথ যে আবুল ফজলের উপন্যাস 'চৌচির' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেটা মনে হতেই পারে, সাহিত্যের কারণে যত না, তার চেয়ে বেশি একজন মুসলমান লেখকের লেখা বলে।

এরকম আরো বেশ কিছু বই বেরোতে থাকল দেশবিভাগের আগে। ১৯১৯-এ কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছিলেন পূর্ববাংলার চর-অঞ্চলের মুসলমান চাষিদের সরল জীবন ও সুখদুঃখ নিয়ে উপন্যাস 'নদীবক্ষে'। বিষয়ের কারণেই মনে পড়বে, বেশ কিছু পরে ১৯৪৫-এ হুমায়ুন কবীর লিখেছিলেন 'নদী ও নারী'। আবুল ফজল লিখেছিলেন অনেকগুলো উপন্যাস দেশভাগের আগে ও পরে। সবই যে একই ধরণের লেখা তা নয়। আবুল ফজলেরই বন্ধু এবং পরে শ্বশুর মাহবুব-উল-আলম মুসলমান সমাজের ভেতর থেকেই এনেছিলেন বৈচিত্র্যের স্বাদ তাঁর ছোটো উপন্যাস 'মফিজন'-এ—যে-লেখাটি অশ্লীল বলে অভিযোগ উঠেছিল, কিন্তু প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়।

দেশভাগের পরে মুসলমানের জীবন নিয়ে এই লেখালেখির যেন বিস্ফোরণ ঘটল। টের পাওয়া গেল মুসলমান লেখকদের আত্মপ্রত্যয়। অল্প সময়ের মধ্যে কত যে মুসলমান লেখক, এবং তাঁদের লেখায় মুসলমানদের জীবন ও ভাবনার কত যে বিচিত্র উদ্‌ঘাটন! তাদের জীবনের (গ্রাম ও শহরের, বিশেষত গ্রামেরই) বিন্যাস, ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কার, তাকে ছাড়িয়ে ওঠার প্রতিবাদী স্বর, চেনা-অচেনায় মেশা মানুষের মিছিল নানাভাবে ৪৭-পরবর্তী লেখার প্রায় শুরু থেকেই পাওয়া গেল। বাস্তবের বহু দিক, চরিত্র আঁকার নৈপুণ্য, দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য নিয়ে একটা নতুন জগৎই তৈরি হল যেন।

বাংলাদেশের নামে সাহিত্যের এই পরিচয়ের আরো অন্য যুক্তিও হয়তো আছে। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কথা কেউ বলতে পারেন। কিন্তু সেই বৈচিত্র্য তো পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেও আছে—পুরুলিয়া বা জলপাইগুড়ি বা সুন্দরবনের স্থানিক বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে থাকলেই কি আমরা সেই সাহিত্যকে আলাদা ভাবি? উভয়বঙ্গের প্রাকৃতিক অখণ্ডতার মধ্যেই তো সেরকম বৈচিত্র্য আমরা মেনে নিয়েছি। তবু, এও মনে-মনে থাকে সবসময়, পূর্ববঙ্গে নদনদীর সংখ্যা অনেক বেশি, নদীপ্লাবিত সমভূমি আরো বিস্তৃত, খালবিল ও জলাজমিতে পরিকীর্ণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বা সিলেটের উঁচুনিচু জমি ও ময়মনসিংহের জঙ্গল অনেকটাই অন্যরকম—সাহিত্যে তো এসবের ছাপ পড়েই। বাংলাদেশের সাহিত্যে—নাটক ও উপন্যাসের পটে চরিত্রে সংলাপে কিংবা কবিতার বাক্‌প্রতিমায়—সেই আঞ্চলিক বিশিষ্টতা, ভাষা ও ভঙ্গির টানে, এসে পড়ে। তবু, এ-কথা বলা চলে না, সে-কারণেই সাহিত্য আলাদা। বরং

সাহিত্যকে কোনো-না-কোনো দিক থেকে আলাদা মনে করলেই, সেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে অন্যভাবে খুঁজে নিতে চাই আমরা।

প্রকৃতই বাংলাদেশের সাহিত্য প্রবলভাবে আলাদা যে-কারণে, সে হল : ৪৭-এর পরে-পরেই ১৯৪৮-এর ভাষা-আন্দোলন থেকে সে-দেশের ঘটনাবলির যে-ছায়াপাত ঘটেছে সাহিত্যে তার কোনো তুলনা নেই কোথাও। অচিরে তীব্র হয়ে উঠল সেই আন্দোলন, কেননা বাঙালি মুসলমানেরা পাকিস্তানের প্রায় জন্মলগ্নেই বুঝেছিলেন, যে-দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর ভর করে উন্নত স্বাধীন জীবনের আশায় দেশভাগ তাঁরা চেয়েছেন তা কতটা অলীক এবং শেষপর্যন্ত তাঁদের পক্ষে বিপর্যয়। পশ্চিমি মুসলমান শাসকেরা তাঁদের ওপর উর্দু চাপানোর জন্য যে-ফতোয়া জারি করেছিল, সে তো কেবল ভাষার ব্যাপারে খবরদারিই নয়, তাঁদের বাঙালি-পরিচয়কেই অস্বীকৃতি জানানো। শুধু মাতৃভাষাকেই অস্বীকার নয়, সামাজিক অর্থনৈতিক সবরকম স্বাধীনতাকেই অস্বীকার। ফলে ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনে তাঁদের প্রগতির যাত্রা শুরু, একুশে ফেব্রুয়ারি তাঁদের কাছে সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। বাইরে থেকে মনে হয়, সেই আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল পশ্চিমের শাসকেরা। কিন্তু তা কি সম্ভব? ভাষা-আন্দোলনের থেকে যে-স্বাধীনতাস্পৃহা জন্ম নিল সে-দেশের বাঙালির মনে (ওঁরা তাকেই বলতে ভালোবাসেন 'একুশের চেতনা'), তা ধাপে-ধাপে একের পর এক অন্য আন্দোলনে আছড়ে পড়ল। ভাষা-আন্দোলন থেকে পৌঁছোলেন তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে—১৯৫২ থেকে ১৯৭১-এ। এই যে ইতিহাস এবং তা থেকে পাওয়া আবেগ ও অনুভব, এ একেবারে পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিরই নিজস্ব। এই ইতিহাস ও বোধই বাংলাদেশকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, তার সত্তাপরিচয়কে স্পষ্ট করেছে। তার রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সব ভাবনাকে ভিন্ন আকার দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিবরণে একাত্তর অবধি পাকিস্তানি আমল, কিন্তু অন্যদিক থেকে তখনই পাকিস্তানি দমনের বিরুদ্ধে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের গৌরবময় কাল। সে-সময়ের ছবিতে, গানে, সাহিত্যে সবকিছুতে তার সাক্ষ্য। ভাষা-আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ—এই ইতিহাস শিল্পের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে, সাহিত্যের পাতায়-পাতায়। জয়নুল আবেদিন বা কামরুল হাসান যে ছবি আঁকেন তার সঙ্গে এই ইতিহাস। ছায়ানট যে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে-গাইতে মিছিল করে তার সঙ্গে এই ইতিহাস। শামসুর রাহমানের কবিতায়, জহির রায়হানের উপন্যাসে, মুনীর চৌধুরীর নাটকে এই ইতিহাস। এই ইতিহাস জড়িয়ে আছে বলেই বাংলাদেশের শিল্পসাহিত্যকে স্বতন্ত্র বলে চিনতে পারি।

মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পর অল্প সময়ের মধ্যেই যখন মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধেরই বিপর্যয় ঘটল বাংলাদেশে, তখনই তো আগের ওই মুক্তিযুদ্ধের লড়াইটাকেই টিকিয়ে

রাখার দরকার হল। সে-লড়াই আরো জোরদার হল, আরো কঠিন, এবং অন্যমাত্রার। সাহিত্যসংস্কৃতির মানুষদের কাজে ও রচনায় আরো প্রখরভাবে ফুটে উঠল তাকে হারানোর শোক, তাকে ফিরে পাওয়ার দায়বোধ। তাই একাত্তরের পরের বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও ছেয়ে আছে সেই চেতনা—একুশের চেতনা, একাত্তরের চেতনা। বাংলাদেশের সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও এভাবে কি ছেয়ে থাকতে পারত?

তাহলে আমরা কোথায় দাঁড়াব? বাংলাভাষায় লেখা ওই সাহিত্য কি আমাদের নয়, তা পাঠ করে আমরা উদ্বেলিত হই না? সেই একাত্মতা সত্ত্বেও, ভুলি বা কী করে, ওই সাহিত্যের সঙ্গে জড়ানো নবজাগ্রত মুসলমানদের নতুন আত্মপরিচয়ের জোর, ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের বিদ্যুৎস্পর্শ, সংবাদ হিশেবে আগে জানলেও, সাহিত্যের ভাষায় তা অচেনার স্বাদ এনে দেয়! চেনা-অচেনার দ্বৈতেই আমরা আপন করে নিতে পারি এই সাহিত্যকে। তাই, দুটোই বোধহয় সত্যি। 'বাংলাদেশের সাহিত্য' বলে চিহ্নিত করলে আমাদের ক্ষোভ জন্মায়, আমাদের প্রতিবেশী ভাইবন্ধুকে যেন আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে। আবার যখন কেউ এক করে দেখতে চায়, তখন ভাবি, অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্যে এই ভাষা ও সাহিত্য যে-গৌরব অর্জন করেছে, তাকে তার স্বমহিমায় চেনার চেষ্টাতেই বরং প্রকৃত মর্যাদা দিতে পারব, একই ভাষার মানুষ হিশেবে নিজেরাও কৃতার্থ হব।

অবশ্য, সত্যের যে-পিঠ ঐক্যের, তার শরিক পশ্চিমবঙ্গ নয়। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা সাহিত্যের এই বিভাজনে অখুশি, তাঁদের আবেগের কোনো মূল্য নেই। তাঁরা মুখে বলেন একই সাহিত্য, কিন্তু ওপার বাংলার সাহিত্য সম্পর্কে প্রায় কোনো খোঁজই রাখেন না। এই উদাসীনতা বা অজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দিয়েই তাঁরা দুই বাংলার সাহিত্য যে আলাদা তা কার্যত প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন। আজ যদি পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মূলগত ঐক্যকে গ্রহণ করতে হয় কিংবা বিনিময়ের পথে মূল ধারার সত্যকেই চিনে নিতে হয়, তবে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের প্রকৃত আগ্রহের উদ্বোধন ঘটাতে হবে—এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

আগ্রহ জন্মানোর পথে একসময় মুশকিল ছিল অনেক—পাকিস্তান ও ভারত এই দুই রাষ্ট্রের দূরত্ব। পূর্বপাকিস্তানেই তো বাঙালি-পরিচয় একটা প্রবল বাধার মধ্যে ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির সঙ্গে কোনোরকম সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রশ্রয় ছিল না। একাত্তরের স্বাধীনতার পর সেই বাধা অনেকটাই দূর হয়েছে। হয়তো তা যতখানি স্বচ্ছ হওয়ার কথা ততটা হতে পারেনি—স্বাধীনতার পরেও তো খুব সুসময় যায়নি বাংলাদেশে। তবু, বলা যায়, দুই বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ক্রমশ পথ করে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বই বাংলাদেশে বরাবরই যেত, বাংলাদেশের

বই কলকাতায় বা ভারতের অন্যত্র নিয়মমাফিক আমদানির এখন কোনো বাধাই নেই। কিন্তু ব্যবসায়িক অনুমতি থাকলেই যে সুষ্ঠু বিনিময় ঘটে না, তার প্রমাণ বই লেনদেনের অসম অনুপাত। পশ্চিমবঙ্গের যত বই বাংলাদশে যায়, তার তুলনায় বাংলাদেশ থেকে এই আমদানির সংখ্যা খুবই সামান্য। বাংলাদেশের বইয়ের দাম বেশি এরকম কথাও উঠত একসময়, কিন্তু ক্রমশ সেই ফারাকটাও আর তেমন থাকছে না। ফলে একটাই কারণ এখন, বাংলাদেশের বই সম্পর্কে আগ্রহের অভাব। বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে কোনো গরজই নেই এখানকার পাঠকদের। এটা কি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পাঠকদের রুচির অহংকার? বাংলাদেশের মুসলমান লেখকদের বই, মুসলমান জীবনের ও অনুভবের বই পাঠের যোগ্য মনে করেন না তাঁরা? কিন্তু সেটা বলতে গেলেও তো সেই বই পড়তে হবে—একদা কোনো-এক সময়ে পড়েছেন বা আজ পড়ছেন বিস্তৃতভাবে, তারও তো প্রমাণ নেই। কেউ-কেউ তো বলেই ফেলেন, মুসলমান নাম (লেখকের বা চরিত্রের) মনে থাকে না। এর চেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িক উক্তি আর কী হতে পারে? তাঁরা কিন্তু শাদা চামড়ার বিদেশীদের নাম প্রায় নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারেন।

হয়তো অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। আগে জানার পরিধি দু-চারজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, আজ অধিকতর যোগাযোগের ফলে তার সংখ্যা বেড়েছে। এখানকার পত্রপত্রিকায় যাঁদের নাম নানাবিধ কারণে প্রচার পায় তাঁদের নাম জেনে ফেলা যায়, লেখা তেমন না পড়েও। কিংবা ওদেশের লেখকদের মধ্যে যাঁরা, সৈয়দ শামসুল হকের ভাষায় কলকাতা-চর্চা করেন, তাঁদের নাম পরিচিত হয়ে যায় কারো-কারো কাছে। তবু, বলতেই হয়, আমাদের পরিচয়ের সেই পরিধি যে খুবই ছোটো শুধু তা-ই নয়, নামের নির্বাচনও খুব এলোমেলো—কোনো কালানুক্রম, কোনো পরম্পরা নেই তাতে। হয়তো কোনো লেখকের অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা অন্যমনস্ক লেখা হঠাৎ পড়ে ফেলেই আমরা মতামত বা ধারণা তৈরি করে ফেলি। ধারাবাহিকভাবে একজন লেখকের লেখা, সব লেখা না হোক, প্রধান লেখাগুলো পড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। সেই আবহটাই এখনো সৃষ্টি হয়নি।

অথচ, আরেকটু বেশি খোঁজখবর রাখলেই এদেশের পাঠকদেরও আবিষ্কার করতে দেরি হত না, শুধু সংখ্যায় নয়, বৈচিত্র্যেও বাংলাদেশের সাহিত্য—গল্প-উপন্যাস বা কবিতা বা নাটক, সব বিভাগেই—মনোযোগ দাবি করে। অন্তত বাংলাভাষী হিশেবে গর্ববোধই করতে পারতেন সীমানার ওপারে বাঙালি লেখকদের সৃষ্টির প্রাচুর্যে ও বিস্তারে, হয়তো কখনো-কখনো গুণপনাতেও।

২

একটা ধারণা অবশ্য ঠিক, বাংলাদেশ এখনও, ঢাকা-শহর বা চট্টগ্রাম-শহর সত্ত্বেও, মূলত গ্রামপ্রধান—তাই খুবই স্বাভাবিক, বাংলাদেশের সাহিত্যে গ্রামের ছবি বা গ্রামের কথারই প্রাধান্য। বাংলাদেশের উপন্যাসের যাত্রাশুরু যে-তিনজন ঔপন্যাসিককে ভর করে, তাঁরা তিনজনই তাঁদের প্রবাদপ্রতিম উপন্যাসগুলি লিখেছেন গ্রামকে নিয়েই। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ লিখেছেন 'লালসালু', আবু ইসহাক 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' এবং শওকত ওসমান 'জননী'। এর সবগুলিই যে সমান মানের তা অবশ্যই নয়। বস্তুত ওয়ালীউল্লাহ্ তো বাংলাদেশের প্রথম ঔপন্যাসিক এবং শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক—এতই অসামান্য সেই লেখা যে তাঁর উপন্যাস হাতে নিয়েই বাংলাদেশের সাহিত্য-পরিক্রমা শুরু করলে উঁচুতারে বাঁধা হয়ে যায় পাঠকদের আগ্রহ। আর শওকত ওসমানের 'জননী' (যেটা লেখা হয়েছিল দেশভাগের কিছু আগে) এখন আর তত মন কাড়ে না। মাঝখানে আবু ইসহাক—মাত্র একটি উপন্যাসেই যিনি স্মরণীয়, গ্রামজীবনের ছবি আঁকার বিশ্বস্ততাতে। আপাতত তাই শিল্পগুণের ব্যাপারটা মাথায় না রেখেই বলা যায়, ওই তিনটি উপন্যাস থেকেই সে-সময়ের পূর্ববাংলার মুসলমানদের গ্রাম আমাদের চোখের সামনে অবিকল হাজির হয়। সেই গ্রামের দারিদ্র্য, সংস্কার ও কুসংস্কার, ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীদের আধিপত্য, নরনারীর, বিশেষ করে নারীর জীবনের অসহায়তা। গ্রামীণ বাস্তবকে রূপায়ণের এই ধরণটা সে-সময়ের এবং পরের অনেক উপন্যাস ও ছোটোগল্পেই পাওয়া গেছে। ওয়ালীউল্লাহ্ একটি শক্তিশালী নাটকও লিখেছেন 'বহিপীর' নামে। সে-পীর অবশ্য 'লালসালু'-র পীর নয়—সে অনেক রহস্যাবৃত। বরং 'লালসালু'-র মেজাজটা পাওয়া যায় শওকত ওসমান বা সরদার জয়েন উদ্দীন বা আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং আরো অনেকের গল্পে।

বেশ কিছু উপন্যাস পড়ি এ-সময়ে, যাদের ঠিক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু সেগুলো একেক জনপদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এবং তাদের মধ্যে ভৌগোলিক বা নৈসর্গিক বা নৃতাত্ত্বিক এমন নির্দিষ্টতা এসেছে যা অবশ্যই ওয়ালীউল্লাহ্ বা ইসহাকের উপন্যাসে ছিল না। যেমন, ধলেশ্বরী নদীর চরের মানুষদের নিয়ে কাজি আফসারউদ্দীনের 'চর ভাঙা চর', দক্ষিণবঙ্গের জেলেদের নিয়ে শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ', কিংবা কর্ণফুলী নদীর তীরের শ্রমজীবীদের নিয়ে আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী' ইত্যাদি। শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' বা 'কাঞ্চনমালা'-ও গ্রাম নিয়ে লেখা উপন্যাস, কিন্তু সেখানে ওই রূঢ় বাস্তব নয়, হালকা রোমান্টিক ধরণটাই লক্ষণীয়। ফলে গদ্যটাও অনেক শ্লথ, অন্যমনস্ক—ওয়ালীউল্লাহ্-র ঠিক বিপরীত। কিন্তু ক্রমশই দেখি, গ্রামের জটিলতার

চেহারাই প্রকাশ পাচ্ছে উপন্যাসে। তারও শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বোধহয় ওয়ালীউল্লাহ্-র 'চাঁদের অমাবস্যা' বা 'কাঁদো নদী কাঁদো'। একাত্তরের পরেও গ্রাম-নির্ভর উপন্যাসের এই ধারাটা অব্যাহত থাকে। বলা বাহুল্য, মাঝখানের সময়ের অভিজ্ঞতাও তাতে জড়ানো আছে এবং লেখকদের নিজের-নিজের ঝোঁক। যেমন, সৈয়দ শামসুল হকের 'দূরত্ব' বা 'আয়না বিবির পালা', আহমদ ছফা-র 'সূর্য তুমি সাথী', সেলিনা হোসেনের 'জলোচ্ছ্বাস' বা 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি', আবুবকর সিদ্দিকের 'জলরাক্ষস' বা 'খরাদাহ'। এসব উপন্যাসে বাস্তবতার স্থানিক চিহ্ন কিংবা নৈসর্গিক জলহাওয়া বেশ প্রকট—সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে দক্ষিণবঙ্গ, আবুবকরের উপন্যাসে খুলনা-বাগেরহাট, আহমদ ছফা-য় চট্টগ্রাম। ছোটোগল্পেও এই গ্রাম ও নিসর্গ সর্বব্যাপ্ত। সাহিত্যিক কারণে সবচেয়ে বেশি নাম করতে হয় হাসান আজিজুল হকের। তাঁর অধিকাংশ গল্পেরই পটভূমি গ্রাম—সমকালীন দুস্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম। সমকালীন বলেই দাঙ্গার কথা, সংখ্যালঘু ও শরণার্থীর কথা ফিরে-ফিরে আসে। বাস্তবেরই চাপে ও সংকেতময় নিসর্গ-বর্ণনায় প্রত্যেকটি মানুষ যেন রূপক হয়ে ওঠে তাঁর লেখায়—'শকুন', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'আমৃত্যু আজীবন', 'জীবন ঘষে আগুন' ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে।

লক্ষ করবার বিষয়, বাংলাদেশের নাটকেও গ্রামীণ জীবনের প্রতি এই পক্ষপাত। ওয়ালীউল্লাহ্-র 'বহিপীর'-এর কথা তো আগেই হয়েছে। আসকার ইবনে শাইখ একের পর এক নাটক লেখেন গ্রামই যার পটভূমি। জসীমউদ্দীনও নাটক লিখেছেন যাকে বলা হয়েছে লোকনাট্য, বলা বাহুল্য গ্রামই সেখানে সব। এমনকী সাঈদ আহমদের মতো নাট্যকার, যিনি পরিকল্পিতভাবেই অ্যাবসার্ড নাটক চিহ্নিত করে লেখেন, সেখানেও কুশীলব কিন্তু গ্রামীণ মানুষই। একাত্তরের পরে বাংলাদেশের নাটক যখন আকস্মিকভাবেই পরিণত শিল্পরূপ নিয়ে সামনে এল, তখনকার দুই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক ও সেলিম আল দীন গ্রামীণ জীবনকেই অবলম্বন করেছিলেন। সৈয়দ হকের কাব্যনাট্য 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'—সেখানে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে যাদের আওয়াজ শোনা যায় এবং যারা শোনে তারা সবাই গ্রামেরই মানুষ। আর সেলিম আল দীন তো 'কিত্তনখোলা' থেকে শুরু করে 'বনপাংশুল' পর্যন্ত সব নাটকেই গ্রামীণ জীবন, নিসর্গ ও মানুষেরই রূপকার। 'কিত্তনখোলা'য় মানিকগঞ্জ, 'হাত হদাই'-তে নোয়াখালির সমুদ্রতীর, 'বনপাংশুল'-এ ময়মনসিংহের জঙ্গল।

একেবারে গোড়ার যুগে সানাউল হক তাঁর 'তিতাশ' নামের দীর্ঘ কবিতায় একের পর এক টুকরো ছবিতে বলতে চেয়েছেন এই নদীই তাঁর "নিভৃত মনের নদী"। তাঁর মতো আরো অনেকের কবিতাতেই "নদী, শুধু নদী"। প্রায় একই সময় সৈয়দ আলী

আহসান লিখেছিলেন 'আমার পূর্ববাংলা'। তবে ভাষার আধুনিকতা সত্ত্বেও এও তো জসীমউদ্দীনেরই পথ ধরে চলা। পরে দীর্ঘ সময় জুড়ে আশরাফ সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, ওমর আলী—কিংবা আরেকটু সময় পার হয়ে আসাদ চৌধুরী, বেলাল চৌধুরী, রফিক আজাদ, মুহম্মদ নূরুল হুদা এবং আরো অনেকের মধ্যেই নিসর্গ ভিন্ন-ভিন্ন সুরে ও তাৎপর্যে হাজির হয়েছে। কিন্তু আলাদা করেই যাঁদের নাম করতে হয় তাঁদের মধ্যে প্রথম আল মাহমুদ। 'লোক লোকান্তর' থেকে, আরো বেশি 'কালের কলস' বা 'সোনালি কাবিন'-এ লোকায়ত বাংলাকে লোকায়ত শব্দের ব্যবহারে মূর্ত করেছেন। সবকটি ইন্দ্রিয় দিয়ে চেনা ও জানা এবং মাটির গন্ধ তাতে। কিন্তু মোটেই গ্রামীণ কবি নন। জটিল জীবনের সব অভিজ্ঞতাই তাঁর আছে এবং তা নিয়েই নিসর্গকে দেখেছেন বলেই তার বহু মাত্রা। ওই প্রথম তিনটি বই নিয়েই একসময় তিনি এ-বাংলারও মন কেড়েছিলেন। পরে আরো লিখেছেন। তাঁর যে-সব বৈশিষ্ট্য লুকোনো ছিল তা সামনে এসে পড়েছে। তা নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক। দু-দেশেরই সাধারণ পাঠক কিন্তু এখনও তাঁর অনুরাগী। আরেকজন কবিও আমাদের এই বঙ্গে ক্রমশ পরিচিতি পেয়েছেন। তিনি মোহাম্মদ রফিক। 'ধুলোর সংসারে এই মাটি' বইতে, তার চেয়েও বেশি 'কীর্তিনাশা'-য় 'গাওদিয়া'-য় ইশারাময় প্রাকৃতিক স্পন্দন প্রতীক হয়ে ওঠে, এই ভাঙাচোরা স্বদেশেরই প্রতীক। কিংবা 'মেঘে এবং কাদায়' বইতে দেখি জলে-ঝড়ে তোলপাড় কাদাজমির প্রান্তরে শুয়ে থাকা নগ্ন চাষির অস্তিত্বেই ধরা পড়ে সাময়িক ও চিরকালীন বাংলাদেশ। নিসর্গের এই তীব্রতা ধরা পড়েছিল আরো পরে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ-র কবিতাতেও। তাঁর প্রথম বইগুলো—'উপদ্রুত উপকূল' বা 'ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম' বা 'মানুষের মানচিত্র'—হাতে নিয়ে, মনে আছে, মুগ্ধ হয়েছিলাম এই বেপরোয়া বিশৃঙ্খল তারুণ্যের ভেতরে যে শক্তি আছে তাতে। ইন্দ্রিয়তাড়িত অস্থিরতা কখনো-কখনো আল মাহমুদ বা মোহাম্মদ রফিকের মতোই যৌনের দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু সেও তো বৃহত্তর সৃজনশীলতারই রূপক শেষপর্যন্ত। এই ভাষাকেও চিনি অবিরল লোকজ শব্দব্যবহারের নিপুণ সাহসে, গ্রামীণ আঞ্চলিক অভিজ্ঞতার দীপ্তিতে। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ-র প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ছিল খুলনার অন্তর্গত মিঠেখালি মংলায়। মোহাম্মদ রফিকেরও জন্ম ওই খুলনারই বাগেরহাটে। আল মাহমুদ অবশ্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার।

৩

তা বলে এ-কথা মনে করার কারণ নেই যে, বাংলাদেশের সাহিত্যে নাগরিক জীবনের প্রতিফলন একেবারেই অনুপস্থিত। ঢাকা কলকাতার চেয়ে পুরোনো, কিন্তু

ইংরেজ-আমল পর্যন্ত মফস্বল-শহর হয়েই ছিল। দেশভাগের পরই ধীরে-ধীরে মহানগর। ইতিমধ্যেই তো বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত বেশ আত্মস্থ হয়ে উঠেছে। উচ্চবিত্তদের উঁচুতে ওঠাও শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা-শহর তার অসম নগরস্থাপত্য নিয়ে, মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্তের সংঘাতময় সম্পর্ক নিয়ে বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। আবুল ফজলের 'জীবনপথের যাত্রী' বা 'রাঙ্গা প্রভাত'-এ ছিল মধ্যবিত্তের জাগরণের কথা। কিন্তু ক্রমশই অনিবার্যভাবে বড়ো হয়ে উঠল সমস্যা ও ক্লেদের কথা। ষাটের দশকেই পেতে শুরু করেছি দুই ভাইয়ের লেখা—আবু রুশ্‌দ-এর 'ডোবা হল দীঘি' বা 'নোঙর' বা 'অনিশ্চিত রাগিণী' এবং রশীদ করীমের 'উত্তম পুরুষ' বা 'প্রসন্ন পাষাণ'। কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে পড়া মধ্যবিত্ত মুসলমানের সংকট এর কোনো-কোনোটিতে। এর মাঝখানেই অবশ্য চিত্রিত হয়েছে আলাউদ্দিন আল আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র'-তে নাগরিক অবক্ষয়ের মধ্যে থেকেও সুস্থ জীবনবোধ অর্জনের লড়াই। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর বহু উপন্যাসে নগরজীবনের যে-অনিবার্য লক্ষণ বিচ্ছিন্নতা কিংবা যৌনবিকার, তার ছবি এঁকেছেন—তাঁর 'এক মহিলার ছবি' থেকে দুঃসাহসী 'খেলারাম খেলে যা' পর্যন্ত উপন্যাসে। নাগরিকতার নানা দিক ফুটিয়ে তুলতে মহিলা ঔপন্যাসিকদেরও এগিয়ে আসতে দেখা যায়—রাজিয়া খানের 'বটতলার উপন্যাস' বা রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষর' তারই উদাহরণ। নাসরিন জাহানের 'উড়ুক্কু'-তে এই নগরীর খাঁচাতে আটকে পড়া নারীর যন্ত্রণাই ভাষা পেয়েছে। বহুপ্রজ শওকত আলী যেমন গ্রাম নিয়ে লিখেছেন, তেমনি শহর নিয়েও। মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃসহ রুচিবিকার তাঁর 'পিঙ্গল আকাশ'-এ। হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাসগুলিতেও নাগরিক জীবনের যে-বৃত্ত আঁকা হয়েছে তার একটা নিজস্ব জায়গা আছে। তবে, এই সব কিছুকে ছাপিয়ে, ঢাকা-শহর তার অলিগলি, যানবাহন, নানা ধরণের মানুষজন, তার আন্দোলনের সদসৎ নিয়ে যত প্রবল ও বিশালভাবে হাজির আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই'-তে, তেমন আর বোধহয় কোথাও নয়।

কলকাতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কবিদের আসক্তির কথা আমরা জানি। এরকম ঢাকা নিয়ে বাংলাদেশের কবিদের লেখা কবিতাও যে আমরা কখনো-কখনো পড়িনি তা নয়। কিন্তু রবিউল হুসাইন সম্পাদিত 'কবিতায় ঢাকা' হাতে পাওয়ার আগে বুঝতেই পারিনি বাংলাদেশের কবিদেরও ঢাকা-সংলগ্নতা কতদূর। লেখেননি এরকম প্রায় কোনো কবিকেই পাওয়া যাবে না। সে-সব কবিতায় সময়ের বদলের সঙ্গে-সঙ্গে ঢাকার শোভা, ঢাকার বৈচিত্র্য, ঢাকার চারপাশ নানা রঙে ফুটে ওঠে। পুঙ্খানুপুঙ্খ আমরাও উপভোগ করি, ঢাকা যাদের অল্পই চেনা। ভাষা-আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ

পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনে স্পন্দিত ঢাকা, বুড়িগঙ্গার পাড়ের কিংবা অলিগলির পুরোনো ঢাকা, রিকশার শহর ঢাকা, মধ্যরাতের মায়াবী ঢাকা, বৃষ্টিভেজা ঢাকা—সবকিছুই টানে আমাদেরও। শামসুর রাহমানের কবিতা 'এ শহর', সৈয়দ শামসুল হকের দীর্ঘ কবিতা 'আমার শহর' পড়ে ফেলি। গ্রাম ও শহর নিয়ে তো এঁদের তেমন সংকট নেই—তাঁরা গ্রামকে ধরতে পারেন, শহরকেও। কিন্তু, ঢাকা যাঁদের অত ভালোবাসার নয়, যেমন আল মাহমুদ, তাঁদেরও কিন্তু ঢাকা নিয়ে লিখতে হয়—তাতে হয়তো বাধ্যতামূলক সহবাসের গ্লানিও থাকে। শহীদ কাদরী অবশ্য একান্তভাবে ঢাকা শহরেরই কবি—তাঁর কবিতা শহরের বুকে "ভাঙাচোরা ভায়োলিনের গান"। নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় ঢাকা রাজনীতি আর আন্দোলনের শহর। রফিক আজাদের ঢাকা ক্ষিপ্ত অপ্রসন্ন এক কবির শহর। বেলাল চৌধুরী সর্পিল গতির রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে ভিড়ের মধ্যে দিশেহারা। আর হুমায়ুন আজাদের কাছে শহর সেই প্রেমিক, যার ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে চান কবি। পরের যাঁরা সেই লুৎফর রিটনের 'ঢাকা আমার ঢাকা' কিংবা তসলিমা নাসরিনের 'ধূসর শহর' পড়তে-পড়তে মনে হয়, ঢাকা নিয়ে বাংলাদেশের কবিদের কথা কখনো শেষ হবে না।

৪

আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সাহিত্যের সঙ্গে ভাষা-আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাহিত ইতিহাস এমনই জড়ানো যে তার অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে কোনো গল্প বা উপন্যাস, কবিতা বা নাটক যেন লেখা হতেই পারে না। ভাষা-আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় যেমন প্রতিবাদ আছে, তেমনি আছে শহিদের মৃত্যুতে কিংবা আন্দোলনের সাময়িক ব্যর্থতায় সঞ্চারিত বিষাদ। একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ করেই কবিতা লেখা হয়েছে অনেক। আজও লেখা হয়। বাংলাদেশের পাঠক আজও স্মরণ করেন শামসুর রাহমানের 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', হাসান হাফিজুর রহমান বা আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ-র 'একুশের কবিতা', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'স্মৃতিস্তম্ভ', শহীদ কাদরী-র 'একুশের রক্ত', নির্মলেন্দু গুণের 'আমার জন্ম' এবং আরো অনেক। সরাসরি একুশকে নিয়ে যা লেখা হয়, তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি এসে যায় একুশের চকিত উল্লেখ, কবিতার উপমায় বা বাক্‌প্রতিমায়। সেরকমই প্রত্যক্ষভাবে ভাষা-আন্দোলনের পটভূমি নিয়ে লেখা হয়েছে মাত্র তিনটি উপন্যাসই—জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন', সরদার জয়েনউদ্‌দীনের 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' বা সেলিনা হোসেনের 'যাপিত জীবন', হয়তো এর সঙ্গে নাম করা যায় শওকত ওসমানের 'আর্তনাদ'-কেও—কিন্তু একুশের নিঃশব্দ ইঙ্গিতময় উপস্থিতি টের পাওয়া যায় আরো বহু বহু

উপন্যাসে। গল্পও লেখা হয়েছে অনেক। নাটকের ক্ষেত্রে তো জানি মুনীর চৌধুরীর 'কবর' আজ প্রায় প্রতীক।

এর পর দু-দশক ধরে একের পর এক আন্দোলন বাংলাদেশে—১৯৬৬-তে ছয় দফার আন্দোলন, ১৯৬৯-এ গণ-অভ্যুত্থান এবং সবশেষে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ। এইসব ঘটনাগুলো যখন ঘটছিল, তখনই হয়তো লেখালেখি খুব বেশি হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। তবু, আমরা জানি, মুক্তিযুদ্ধের বছরটিতেই লেখা হয়েছিল শওকত ওসমানের 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' এবং আরো কিছু-কিছু। ১৯৭৩-এ আনোয়ার পাশা-র 'রাইফেল রোটি আওরাত'। তবে, স্বাধীনতা লাভের পরের দশকগুলিতে, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ যখন ভূলুণ্ঠিত, তখনই প্রতিবাদ হিশেবে লেখকেরা হাতে তুলে নিলেন কলম। তখনই বাংলাদেশের সাহিত্যে যেন অনিবার্যভাবেই চলে এল মুক্তিযুদ্ধের এবং তার আগের আন্দোলনগুলোর প্রসঙ্গ। সেখানেও সবাই একরকমভাবে লিখেছেন তা নয়, ভাবনা ও বৈচিত্র্যও অনেক। 'আমার যত গ্লানি'-তে রশীদ করীমের সেই চেনা উচ্চমধ্যবিত্তের বুদ্ধিবিলাস ও আত্মরতির জগৎ, কিন্তু সেখান থেকেই একজন মানুষ বেরিয়ে এল মুক্তিযুদ্ধের ধাক্কায়। আহমদ ছফা-র 'ওঙ্কার'-এও তা-ই—আত্মসুখসন্ধানী পুরুষ যখন দেখে মিছিলের স্লোগানের সুরসংগতিতে তার বোবা স্ত্রীরও গলা ফুটছে, তখন উত্তরণ ঘটে তারও। রশীদ হায়দারের 'খাঁচা' উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্ত তার সমস্ত টানাপোড়েন ও সংকট পার হয়ে শেষপর্যন্ত বেরিয়ে আসে—খাঁচা থেকে টিয়েপাখি আকাশে উড়ে যায়। মাহমুদুল হকের 'জীবন আমার বোন' উপন্যাসের নায়কও সমাজবিচ্ছিন্ন রিরংসা-তাড়িত অস্তিত্বকে ঝেড়ে ফেলতে পারে, যখন সে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে দেখে সমস্ত পরিবেশই পালটে যাচ্ছে। সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড'-এ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায়, প্রস্তুত করে এমনকী বুড়িমাকেও যে নিজের জীবন উপেক্ষা করে নিজের মতো চালিয়ে যেতে পারে লড়াই, হয়ে উঠতে পারে সকলের মা। বাইরে থেকে দেখলে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে লেখা আখতারুজ্জামানের 'চিলেকোঠার সেপাই'-এরও তো একই থিম, কিন্তু সেখানে ওসমান নামের দ্বিধাদীর্ণ মধ্যবিত্ত মানুষটির বেরিয়ে আসার পেছনে হাতছানি আছে মজুর খিজিরের, যে তার প্রলেতারিয়েত অস্তিত্বের রূপকে বুজিয়ে দিতে পারে লড়াইয়ের ভেতরকার কালো গর্তগুলি।

সুতরাং, দেখতে পাচ্ছি, মুক্তিযুদ্ধের যে দীপ্র অভিজ্ঞতা ও গৌরবের অনুভব তা মূলত প্রকাশ পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পরের বছরগুলিতে, যখন পতনের অনুভবটাও সঙ্গে-সঙ্গে বেশি করে বাজছে। সৈয়দ শামসুল হকের 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী'

উপন্যাসে এক শিক্ষক শিক্ষাদানের মহান ব্রত পালন করতে গ্রামে গিয়ে টের পান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবান্বিত গ্রামটি এখন মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী কার্যকলাপের ঘাঁটি—শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার প্রতিজ্ঞা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বোমার প্রচণ্ড শব্দে ও ধোঁয়ায়। রিজিয়া রহমান 'একটি ফুলের জন্য' উপন্যাসে দেখান একাত্তরের পরাজিত শক্তিই কীভাবে আবার নতুন ক্ষমতা নিয়ে ফিরে এসেছে, আর তার মুখোমুখি একসময়ের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা হতাশায় ডুবে যাচ্ছে। 'অপেক্ষা' উপন্যাসে শওকত আলী দেখান বেকার যুবকেরা কীভাবে বসে-বসে ভাবছে : "বারো বছর আগে খামোকা কেন যে মানুষ নতুন কিছু আশা করে বসেছিল, আর সেই আশার জন্যে জীবন বাজি ধরে নিঃস্ব হয়ে গেল।" নাসরিন জাহানের 'যখন চারপাশের বাতিগুলো নিভে আসছে' উপন্যাসে দেখি : একটি হিন্দু মেয়ে যে যুদ্ধের সময়ে পাকসেনাদের হাতে ধর্ষিত হয়েছিল, যুদ্ধের পরেও স্বাধীন দেশে তাকে একইভাবে ব্যবহৃত ও লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে। আর সাম্প্রতিকতর শহীদুল জহিরের উপন্যাস 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'-তে মুক্তিযুদ্ধের সময় জনতার রোষে নিঃশব্দে পাড়া ছাড়তে হয়েছিল যে-রাজাকারকে, সে কীভাবে সশব্দে ফিরে আসে মুক্তিযুদ্ধের পরে। হাসান আজিজুল হক গল্পের পর গল্পে লিখেছেন স্বাধীনতা-উত্তর দেশের শুধুই অপচয় ও ব্যর্থতার কাহিনী।

কবিতাতেও শুনি সেই আর্তনাদ। শামসুর রাহমান একসময় স্বপ্ন দেখতেন, "নতুন নিশানা উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক/এই বাংলায়/তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।" তাঁকে পরে বলতে হয়; "বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে বনপোড়া একটি হরিণী।" সিকদার আমিনুল হকের নিজেকে মনে হয় "একা এই স্বপ্নহীন খঞ্জ"। মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় শুনি, "অর্থহীন জন্ম, অর্থহীন স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন,/সংগ্রামী বাহুর মরচেপড়া পেশী, লাঙ্গলের ফলা করাল বানের তোড়ে ফেটে পড়া/নদীর পাঁজরে/ অন্ধকার,/ঘুটঘুট্যা রাতচেরা স্বদেশী দীর্ঘশ্বাস।" মহাদেব সাহা-র গলায় শুনি, "আমি ছিন্নভিন্ন, কাঁটায় কাঁটায় বিদ্ধ ও বিক্ষত।" নির্মলেন্দু গুণ বলেছিলেন, "১৯৭৫-এ আমি হারিয়েছি আমার প্রতীক, শৌর্যবীর্যধারা, অন্ধকারে। তারপর থেকে ভিতরে ভিতরে একা,/গৃহহারা।" ১৯৭৫-এ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল। সমস্ত শোক, সমস্ত ক্রোধ যেন বাংলাদেশে ওই একাত্তরের স্বপ্নভঙ্গেরই উদ্‌গীরণ।

নাটকের তো একটা স্থায়ী বিষয়ই মুক্তিযুদ্ধ, কিন্তু সেখানেও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইটাই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে সব নাটকে—আবদুল্লাহ আল-মামুন বা মামুনুর রশীদ বা মমতাজউদ্‌দীন আহমদের একের পর এক নাটকে। সেলিম আল দীনের 'কেরামতমঙ্গল'-এর কেরামত তো স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের

সমস্ত নরক-অভিজ্ঞতা পার হয়ে আজ লাঞ্ছিত যিশু। সৈয়দ হক 'নূরলদীনের সারাজীবন'-এ কৃষকনেতার ব্যর্থতার ঐতিহাসিক উপমাতেই মুক্তিযুদ্ধেরও ব্যর্থতাকে ধরতে চান। কিন্তু ব্যর্থতার এই সচেতনতা বাংলাদেশের সব লেখকের সব রচনাতেই মুক্তির সোপান, যে-কথা নূরলদীনের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল তার বন্ধু আব্বাস : "ধৈর্য সবে—ধৈর্য ধরি করো আন্দোলন/লাগে না লাগুক, বাহে, এক দুই তিন কিংবা কয়েক জীবন।"

৫

শুধু সমকালীনকে নয়, কোনো-কোনো লেখায় মহাকাব্যিক বিস্তারে বড়ো সময়কে কিংবা ছোটো সময়েরই বড়ো আয়তনকে দেখানোর চেষ্টাও হয়, দেশ ও কালকে উন্মোচিত করার লক্ষ্যে। সে-রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের সাহিত্যে প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই দেখা গেছে। এমনকী কবিতা, যার হয়তো আজ খণ্ড কল্পনাতেই ছড়িয়ে যাওয়া থেকে নিস্তার নেই, সে-ক্ষেত্রেও বারবার বড়ো করে বাঁধবার প্রয়াস দেখি। পূর্বপাকিস্তানি যুগে শুরু হয়েছিল ফররুখ আহমদের সিন্দবাদ-পর্ব থেকে, কিন্তু 'হাতেম তায়ী' তো পেছনের দিকে যাওয়া, আজ আমাদের কারোর ঔৎসুক্য থাকার কথা নয়। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ-র 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' বা 'বৃষ্টি এবং সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা' বা 'আমার সময়', এগুলো শুধু আকারেই বড়ো নয়, দেখার ভঙ্গির মধ্যেই অন্য অভীপ্সা আছে। সৈয়দ শামসুল হকের 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা' এরকমই স্মৃতিবাহিত সময়ের কথা। মোহাম্মদ রফিকের 'কপিলা', যেখানে বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও মানসিক বাস্তব আর সত্যকে ঘিরে গেঁথে তোলা হয়েছে একটা 'বড়ো' কবিতা, সেখানে রূপকথার স্বপ্ন আর বাস্তব জীবনের স্বপ্ন মিলেমিশে গেছে প্রকরণের নিরীক্ষায়। কয়েকটির নাম এলোমেলো করা হল, এরকম আরো অনেক প্রয়াসই আছে বুঝতে পারি।

নাটকের ক্ষেত্রে এই মহাকাব্যিক স্বভাব প্রসঙ্গেও সেলিম আল দীনের নামই ওঠে। 'কিত্তনখোলা' থেকেই সেলিম প্রত্যেকটি নাটকে লোকায়ত জীবনের বিস্তার ঘটান। দু-এক বছর আগে প্রকাশিত 'বনপাংশুল'-এ আরণ্যক প্রকৃতি এবং মান্দাই বা কোচদের জীবনযাপনের জগৎ। এখানেও মধ্যযুগীয় আঙ্গিককে ভর করে তিনি এই মানুষদের ধর্ম ভাষা নৃতত্ত্ব বা অর্থনীতিকে সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের মুখোমুখি করিয়ে দেন। আর আমাদেরও অভিজ্ঞ করে তোলেন পৌরাণিক বন্ধন ভেঙে বেরিয়ে আসা কোচনারীর আত্মপ্রত্যয়ের বিষয়ে।

তবে, বলাই বাহুল্য, বড়ো মুঠোতে জীবন ও অভিজ্ঞতাকে ধরার সবচেয়ে গ্রাহ্য

দৃষ্টান্ত উপন্যাসেই। বাংলাদেশে তা বরাবরই চর্চিত হয়েছে—এটাও তার সাহিত্যের একটা আলোচনার যোগ্য বৈশিষ্ট্য। পঞ্চাশের দশকে শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' ও 'আলম নগরের উপকথা' বেরিয়েছিল। তখনই বোঝা গিয়েছিল তাঁর কলম ভিন্ন জাতের। ইতিহাস ও উপন্যাসের মেলবন্ধনের ধারাতেই পেয়েছি আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান', শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক', রিজিয়া রহমানের 'বং থেকে বাংলা' ইত্যাদি। 'সংশপ্তক' কলকাতা ও ঢাকার বৃহৎ পটভূমিতে বাঙালি-অস্তিত্বের কথা। 'বং থেকে বাংলা' বাঙালির ইতিহাসকে আশ্রয় করে উপাখ্যান। ইতিহাস-অবলম্বনে আরো উপন্যাস আছে—তার মধ্যে বিখ্যাত শওকত আলী-র 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' আর সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন'। শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম বাঙালির ইতিহাসের, তার অতীত ও বর্তমানের সমগ্রকে ভাবনায় রেখে একটি উপন্যাস লিখে গিয়েছিলেন 'কাঞ্চনগ্রাম' নামে। মৃত্যুর পর সেটি প্রকাশিত হল। নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' অনেকাংশে তাঁর প্রেরণা। এইসব বৃহদাকার উপন্যাসগুলির কোনো-কোনোটি হয়তো তেমন সুখপাঠ্য নয়, কিন্তু তাতে তাদের মর্যাদাকে অস্বীকার করা যায় না।

সমকালীন জীবনকে নিয়ে এপিক উপন্যাস লেখার সাহসী চেষ্টা করেছেন শওকত আলী তাঁর 'দক্ষিণায়নের দিন', 'কূলায় কালস্রোত', 'পূর্বরাত্রি পূর্বদিন' এই ত্রয়ীতে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পটভূমিতে প্রকৃতি ও মানুষজনের দ্বৈতে বিপ্রদাশ বড়ুয়া যে- উপন্যাস লিখেছেন 'শ্রামণ গৌতম' এবং 'সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা' নামে, এখানে তা-ও উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অচেনা বৌদ্ধ জীবন এবং দ্বিতীয়টিতে সেখানকারই সমুদ্রচরের চাষিদের জীবনের অনুপুঙ্খ। তবে এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে স্মরণীয় বোধহয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা'। গ্রাম নিয়েই লেখা। 'চিলেকোঠার সেপাই'-তেও গ্রাম এসেছিল সম্ভাবনা ও আশাভঙ্গ নিয়ে, তবু সেটা তো মূলত শহরেরই কাহিনী। সেই গ্রামই কি গভীরভাবে চলে এল 'খোয়াবনামা'-য়, নৈরাশ্যের নতুন জমিতে? শুধু গ্রাম বললেই সব বলা হয় না—চলে এল অতীত, ইতিহাসের উজ্জ্বল এবং অনুজ্জ্বল বিভিন্ন ঘটনার সূত্রে মানুষ, কিংবা মানুষের সূত্রেই ইতিহাস। অবশ্য গ্রামও যে পরিত্রাণ তা নয়। সেখান জমির সঙ্গে সংলগ্ন চাষি আছে, কিংবা জলের সঙ্গে সংলগ্ন জেলে—তাদের দারিদ্র্য আছে, স্বপ্ন আছে, যৌবন আছে এবং ইতিহাসের পর্ব-পর্বান্তরের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের পরিবর্তন ও অ-পরিবর্তন সবই আছে। এখানেও তাই আখতারুজ্জামানের দেখা-তে নিশ্ছিদ্র ইতি বা নেতিই নয় শুধু, ইতি-নেতি জড়ানো সমগ্রই উঠে এসেছে উপন্যাসের জগতের মানুষগুলির ভিন্ন-ভিন্ন বাচনে। আর তার ফলে হয়তো একমাত্র তাঁর লেখাতেই বাংলাদেশের সে-সময়ের বদ্ধতা

থেকে অন্য ইতিহাসের এবং সারা দেশে ছড়ানো অনেক মানুষের জগতে মুক্তি পাওয়া যায়, এরকম মনে হয়েছিল কারো-কারো।

৬

যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখানেই ফিরে যাওয়া যায় তাহলে। আশা করি বোঝা গেছে ইতিমধ্যে, বাংলাদেশের সাহিত্যের বিস্তার ও বৈচিত্র্যের দিকে নজর টানবার জন্যই এই প্রতিবেদন। অবশ্য, এত কথার পরও, সব ঠিকমতো বলা হয়েছে তা নয়। পেছনে একবার ফিরে তাকিয়েই ধরা পড়ে যায়, হাসান হাফিজুর রহমান বা সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্ বা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মতো আরো অনেক প্রবীণ কবিদের নাম আমি করিনি। আবদুল মান্নান সৈয়দ, ফরহাদ মজহার, আবুল হাসান, খোন্দকার আশরাফ হোসেন বা আবিদ আজাদ—প্রত্যেকেই এত ভিন্ন-ভিন্ন স্বর এনেছেন কবিতায় যে বৈচিত্র্যের আলোচনায় তাঁদের কথা অবশ্যই আসা উচিত ছিল। কী করে ভুলি মঞ্জু সরকারের 'তমস' বা 'আবাসভূমি', কিংবা আহমদ ছফা-র 'গাভি বিত্তান্ত' বা 'পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ', কিংবা মাহমুদুল হকের 'অনুর পাঠশালা'—উপন্যাসগুলো সম্পূর্ণ অজানা অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডে আমাদের নিয়ে যায়! শুধু 'অনুর পাঠশালা' নয়, মাহমুদুল হকের প্রত্যেকটি উপন্যাসে—'নিরাপদ তন্দ্রা', 'কালো বরফ', 'খেলাঘর', 'মাটির জাহাজ' যাকেই ধরি—নিষ্ঠুর বাস্তবকে ঘিরে স্মৃতির তাড়না যে-রহস্যময়তায় নিয়ে যায়, তার তুলনা উভয় বঙ্গেই নেই। অথচ এই অতুলনীয় ঔপন্যাসিককে আমরা এখানে কজন জানি! নাট্যকার সেলিম আল দীন যে এখনো থেমে নেই, তাঁর নতুন পরিক্রমার সাক্ষ্য যে পাওয়া যাচ্ছে তাঁর নতুন নাট্যোপাখ্যান 'প্রাচ্য'-তে, সে-খবরটুকুও আমাদের কাছে পৌঁছোয় না। আর সাম্প্রতিকদের কথা তো উঠলই না। সুতরাং, মেনে নেওয়াই ভালো, সব লেখকের কথা বলা হয়নি, সব বইয়ের কথাও নয়, যা বলা হল তা-ও খণ্ডিত। বাংলাদেশের সাহিত্যের এ কোনো পরিক্রমা নয়, কালপরম্পরা খোঁজার চেষ্টাও হবে বৃথা, সাহিত্যগত গুণাগুণের প্রশ্নও লক্ষ্যের বাইরে। শুধু ওপারের সাহিত্য সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণার অন্তত একটি প্রত্যাহৃত হলেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলে মনে করা যাবে। ভুল ধারণাটি এই : বাংলাদেশের সাহিত্যে বিষয়ের ও রূপাবয়বের সেই প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য নেই যা দিয়ে সেই লেখা আমাদের নিঃসংশয় আগ্রহের কেন্দ্রে পৌঁছোতে পারে।

রচনাকাল : ২০০১

নববর্ষ উৎসব জাতীয় উৎসব, বাংলাদেশে

কেউ-কেউ হয়তো জানেন, বাংলাদেশে, বিশেষত ঢাকা শহরে পয়লা বৈশাখের নববর্ষ উৎসব কী ব্যাপক সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এরকম তুলনীয় ব্যাপার আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বা কলকাতা শহরে কল্পনাই করা যায় না। সম্প্রতি এখানেও কিছু-কিছু আয়োজন বা উদ্যোগ শুরু হয়েছে, কিন্তু তা কখনোই বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে পারে না। কারণটা নিশ্চয়ই এই, বাঙালি-আত্মপরিচয় নিয়ে গর্ব বা বোধ সেখানে যে ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় রূপ পেয়েছে তা এখানে ঘটেনি। কিংবা বলা যায়, যা একদা ছিল তা এখান থেকে ক্রমশই উধাও হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও সেই শঙ্কা দেখা দিচ্ছে না একেবারে তা নয়—এ বিষয়ে অনেক খেদ ও আত্মধিক্কার উচ্চারিতও হয়—কিন্তু বাঙালি-সত্তার বহিঃপ্রকাশের দিক থেকে মৌলিকভাবে একটা তফাত অবশ্যই আছে, এখনও।

উৎসব তো চিরকালই মানুষের জীবনে থাকে, থাকবে। দুর্গাপূজা নিয়ে হিন্দু বাঙালির কিংবা ঈদ নিয়ে মুসলমান বাঙালির সার্বজনীন আনন্দোল্লাস অনেককালের ব্যাপার। সেটা বিশেষ-বিশেষ ধর্মকে কেন্দ্র করে পালিত হলেও, তা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালিকেই চিরকাল স্পর্শ করেছে জানি—তবু শেষ পর্যন্ত একে বাঙালি জীবনের জাতীয় উৎসব বলে গ্রহণ করতে বাধা থাকেই। অথচ, অনেক দুর্ভাগ্যজনক বদল সত্ত্বেও, এখনও তো হিন্দু-মুসলমান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বাঙালিকে নিয়েই তো দুটি দেশ। তাই, বাংলাদেশে নববর্ষ উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানেরা সকলে একসঙ্গে মিলে যখন মাতে, তখন এর একটা অন্য তাৎপর্য বা মহিমা খুঁজে পাওয়া যায়। ক্রমশই বাংলাদেশে নববর্ষ সেই মাত্রা পাচ্ছে, বাংলাদেশে অন্য নানাবিধ সংকট সত্ত্বেও, পয়লা বৈশাখ পালনের যে প্রবল উৎসাহ তা কিন্তু একটুও ক্ষয় পায়নি। পয়লা বৈশাখ হয়ে উঠছে সেখানে প্রধান জাতীয় উৎসব—এবং সবচেয়ে বড়ো কথা—ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় উৎসব।

বাংলাদেশের এই উৎসবের কথা কানে শুনেছি আগেই, কিন্তু ১৯৯৭-এ সুযোগ হল চোখে দেখার। এতই অভিভূত হওয়ার মতো এই অভিজ্ঞতা যে ঠিক তার পরের বছরেও ওই উপলক্ষেই সস্ত্রীক যাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারিনি।

এখনও তার রেশ হয়ে গেছে মনের মধ্যে। আমি জানি, যাঁদেরই পয়লা বৈশাখে ঢাকায় থাকার সুযোগ অন্তত একবারও মিলেছে, তাঁরা একই রকম অনুভব করেছেন। আমার সেই তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাই হাজির করেছিলাম কোনো এক দৈনিকে। আরেকবার নিবেদন করতে ভরসা পেলাম এই কারণে যে, এই উৎসবের গৌরব ও উজ্জ্বলতা কোনো বিশেষ বছরের নয়, আজও প্রতিটি পয়লা বৈশাখের দিনে তা অম্লান।

কলকাতায় কর্মরত আমাদের এক বাংলাদেশের বন্ধু বিদেশবাসের অনেক সুখদুঃখের বিবরণ দিতে গিয়ে সেদিন বলছিলেন, এই দেশে এসে তাঁর সবচেয়ে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হয়েছিল পয়লা বৈশাখের দিন। ঢাকার পয়লা বৈশাখ মাথায় রেখে তিনি বেরিয়েছিলেন কলকাতার রাস্তায়। প্রায় সারা শহর ঘুরেও এই দিনটি যে আলাদা, তার কোনো আভাসই পেলেন না। টিভির প্রাতঃকালীন প্রোগ্রাম কিংবা দৈনিক পত্রিকার ক্রোড়পত্রের বাইরে পয়লা বৈশাখের কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। অথচ, এই দিনটি তাঁরা কীভাবে কাটান, কী হয় ঢাকা শহরে বা সারা বাংলাদেশেই, তা তো অনেকটাই জেনে এলাম এবারে বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়ে। ফলে, বুঝতেই পারছি, কীরকম হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন বন্ধুটি। জনে-জনে প্রশ্ন করেছেন, নববর্ষ কি প্রতিবার এভাবেই কাটে আপনাদের?

সত্যিই পেছন ফিরে তাকিয়ে ভাবি, কলকাতায় বা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে পয়লা বৈশাখ এর চেয়ে আলাদা কীভাবেই বা পালিত হত! বছরের প্রথম দিনটি নিয়ে তথ্যমূলক অনেক লেখা পড়ি। আকবরের আমল থেকে চালু হলেও, লৌকিক জীবনে এর ব্যবহার নাকি আঠারো শতকের আগে নয়। আকবরের আমলে, না শশাঙ্কের আমলে, না কি অন্য কোনো সময়ে এর শুরু—তা নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। উনিশ শতকে রাজনারায়ণ বসু বিলিতি কায়দায় পয়লা বৈশাখ চালু করার চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত কিন্তু, নগরজীবনে অন্তত, বাঙালির নববর্ষ সামাজিক ঘটনা হিশেবে দাঁড়াতে পারেনি। তুলনায় পয়লা জানুয়ারি বরং অনেক ধরেছে বাঙালিকে। ইঙ্গবঙ্গ-সমাজেই শুধু নয়, মফস্বলের নিরীহ বাঙালিকেও ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রে ক্যাসেটের বিলিতি বাজনার তালে-তালে নাচতে দেখি। শুধু ছেলেছোকরারাই এরকম করে তা নয়, বড়োদের মধ্যেও কেক-পেসট্রি কেনার ধুম পড়ে যায়। পার্ক স্ট্রিটের রাস্তায় বাঙালি সাহেবদের ভিড়ে হাঁটা যায় না। কিন্তু পয়লা বৈশাখ তো শুধু বাঙালির! ভারতীয়ত্বের লোভে আমরা আর এখন শুধু বাঙালি হয়ে থাকতে

চাই না। আর পয়লা জানুয়ারি? সে তো এখন আন্তর্জাতিক! এই দুই টান কি আমাদের কম-বাঙালি করে ফেলেছে?

অন্তত বাংলাদেশে গিয়ে যে তা-ই মনে হয়, সে-কথা অনেকেই বলেন। রাস্তাঘাটে পোস্টারে-হোর্ডিংয়ে বাংলাভাষার ব্যবহার, কথায়-বার্তায় বাংলা বুলি, সামাজিকতার বিভিন্ন স্তরে বাঙালিয়ানার চিহ্ন—ওখানে পা দিলেই তার মাহাত্ম্য টের পাওয়া যায়। তবে, পয়লা বৈশাখের দিন বাঙালির এই নববর্ষ যে সম্পূর্ণ আলাদা চেহারা নিয়ে হাজির হয় সেখানে, তাতে দুই বাংলার এই তফাতটা যেন বড়ো বেশি স্পষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দুই বাংলায় বাঙালি-পরিচয়টা যে ভিন্ন খাতে বইছে, তাতে সন্দেহ থাকে না। ও দেশের বাঙালিরা হয়তো আমার এই উচ্ছ্বাসে একটু বিব্রত হবেন, কেননা ওখানেও সব কিছু তো এক জায়গায় থেমে নেই, ওখানেও এই বাঙালিত্বের ক্ষয় নিয়ে তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, মেকি বাঙালিত্ব নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছেন, বাঙালি-সত্তার পুনরুদ্ধারের কথা নানাভাবে ভাবছেন—তবু, আমাদের চোখে অন্তত, এই বাঙালিয়ানা এখনও যেভাবে যতটুকু টিকে আছে, সেখানেই দেখতে পাই, তা আমাদের বড়ো একটা ধাক্কা দেয়, নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে একটু হতাশা এনে দেয়।

পয়লা বৈশাখ নিয়ে ঢাকা বা বাংলাদেশে এখন যে-সমারোহ, তার ইতিহাসও অবশ্য খুব পুরোনো নয়। দুই বাংলা তো একসময়ে একই ছিল, অন্যরকম হবেই বা কেন! উভয় বাংলাতেই সেটা ছিল মূলত গ্রামীণ উৎসব। মেলা—চৈত্র সংক্রান্তির কিংবা বৈশাখের মেলা—নতুন কাপড় পরা, গুরুজনকে প্রণাম করা—এর বাইরে কী আর এমন! এই গ্রামীণতা স্পর্শ করত শহরকেও। সেই সঙ্গে সেখানে দোকানে-দোকানে হালখাতা, নতুন বইয়ের প্রকাশ, কখনো-কখনো কোনো পাড়ায় প্রভাতফেরি। আর বাড়িতে-বাড়িতে চর্বচোষ্য দ্বিপ্রাহরিক ভোজ। সেদিন আমরা বাড়ির ছোটোরা খাওয়ার শেষে এক খিলি পান খাওয়ার অনুমতি পেতাম। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র ছিল না। নিতান্তই বিচ্ছিন্ন এক-একটা কাজ। সমবেত সামাজিক কোনো উদ্যোগ টের পাওয়া যেত না। এমনকী রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনেও পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের যে-খবর পাওয়া যেত, সেও তো সমস্ত দেশের বিচারে বিচ্ছিন্ন প্রয়াসই।

নববর্ষ সমবেত মানুষের উৎসব হয়ে উঠল সাম্প্রতিককালে। এবং সেটাও দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানে। রাজনৈতিক কারণ ছিল একটা বড়ো। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন থেকে পূর্বপাকিস্তানে শুরু হয়ে গিয়েছিল বাঙালি মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। বদরুদ্দীন উমর তাকেই বলেছিলেন বাঙালি মুসলমানের 'স্বদেশ

প্রত্যাবর্তন'। এখন সে আগে বাঙালি, তারপর মুসলমান। সেই শিকড়-সন্ধানেরই তাড়নায় তারা আঁকড়ে ধরে বাংলাভাষা, রবীন্দ্রনাথের গান কিংবা পয়লা বৈশাখ। সকলেই একইভাবে ভাবে, তা নয়। মুসলমান-পরিচয়ই যাদের কাছে এখনও প্রধান, তারা এই বাঙালিয়ানার অভিযানকে মনে করে পাকিস্তানি চেতনার পরিপন্থী। এই যে উৎসবে মেতে ওঠা, আলপনায় বা প্রদীপে বা শঙ্খধ্বনিতে একটা নান্দনিক জগৎ তৈরি করা—এই সবই তাদের মতে হিন্দুদের অনুকরণ। পয়লা বৈশাখ পালনও হিঁদুয়ানি ছাড়া আর কী! কিন্তু যে-বাঙালির মনে একেবারে ভেতর থেকে সাড়া জেগেছে, তারা তা মানবে কেন? তাদের কাছে এটা তো কোনো ধর্মীয় অনুপ্রেরণা নয়—সম্প্রদায়-বিভেদের বাইরে একান্ত বাঙালি মনেরই আত্মপ্রকাশ। ক্রমশ তাই জনপ্রিয় হয়ে উঠল এই সব উৎসব। পশ্চিম-পাকিস্তানের দাপটে পূর্বপাকিস্তান তো নানাদিক থেকেই তখন জর্জর। শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও পরাধীনতার সাক্ষ্য পাওয়া গেল, ষাটের দশকে যখন সামরিক শাসনের চাপে এই সব উৎসব-অনুষ্ঠানের ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হল।

কিছু আগে থেকেই মৌলবাদী ভ্রূকুটি টের পাওয়া যাচ্ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে। তাকে সোজাসুজি অগ্রাহ্য করেই বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হল ১৯৬১-র রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ। আর তার অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হল একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, যার নাম 'ছায়ানট'। রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের কর্মোদ্যোগই ছিল এই সংগঠন-পরিকল্পনার উৎসভূমি। ছায়ানট অতঃপর শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই নয়, দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে কোন বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল, তার ইতিহাস অনেকেরই জানা। আপাতত সে প্রসঙ্গ থাক। কিন্তু ছায়ানটের জন্মদিনটিও কীভাবে ছোট্ট একটি অনুষ্ঠান থেকে ছড়িয়ে পড়তে থাকল, কীভাবে একটি বিরাট উপলক্ষ হয়ে উঠল, সে-কথা আজকের দেশব্যাপী পয়লা বৈশাখ উৎসবের সময় খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হয়। সন্দেহ নেই, ছায়ানট বাঙালি জাতিকে একটা উৎসব দিয়েছে—এরকম উৎসব বাঙালির জীবনে এভাবে কখনোই ছিল না।

ছায়ানট-এর প্রতিষ্ঠাতাদের একজন সন্‌জীদা খাতুন—আজও সেই সংগঠনের প্রধান প্রেরণা। এই বছর তাঁর কাছাকাছি থাকার সুবাদে জানতে পারি, বারবার সাংবাদিকরা তাঁকে ফোন করে জানতে চাইছেন—ছায়ানটের নববর্ষ কীভাবে এত বড়ো হল। হয়তো অসংগত নয় এই প্রশ্ন, কিন্তু একটু ভুল এম্‌ফ্যাসিসও এসে যায় না কি? তাই ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হন সন্‌জীদা খাতুন। তাঁকে বলতে শুনি—এটা ছায়ানটের 'আবিষ্কার' মনে করলে ভুল হবে—জাতি এরকমই একটা কিছু চেয়েছিল,

ছায়ানট সেই ইচ্ছাটাকেই পূরণ করেছে মাত্র—নিজের দায়িত্বটুকু পালন করেছে। এই ছোট্ট কথাতেই পরিপ্রেক্ষিতটা স্বচ্ছ হয়ে যায়।

একুশে ফেব্রুয়ারি বা রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের মতোই পয়লা বৈশাখও শুধু বিচ্ছিন্ন একটি উপলক্ষ নয়, তারা জড়িত হয়ে থাকে জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে, পূর্ববঙ্গের বা পূর্বপাকিস্তানের বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে। ১৯৬৩-র পয়লা বৈশাখ ছায়ানটের জন্ম, আর ১৯৬৮-র পয়লা বৈশাখ থেকে রমনার বটমূলে তাদের অনুষ্ঠানের শুরু। অচিরে রমনার এই বটমূল—হয়তো অশ্বত্থকেই ভুল করে বট বলা হয়েছে, তাতে আর কী এসে যায়—এই বটমূল এবং তার অনুষ্ঠান শুধু আর ছায়ানটের নয়, সমস্ত আত্মসচেতন বাঙালির তীর্থক্ষেত্র।

সন্দেহ নেই, আজকের এই নববর্ষ নাগরিক মানুষেরই উৎসব। গ্রামের সাবেকি উৎসবের যে ধরণ, তা এখনও টিমটিম করে আছে হয়তো, কিন্তু মফস্বল শহরেই বরং আজ ঢাকা-উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে। এর মধ্যে সফিস্টিকেশন আছে, হয়তো সেই সূত্রে নানাধরণের বাড়াবাড়ি। এর মধ্যে এখনও হিন্দুত্ব খুঁজে পান যেমন কেউ, তেমন কেউ খানিকটা উষ্মাভরেই বলেন, গরিব মানুষের স্থান কোথায় এখানে! একজন লেখক তো বলেছেনই, গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে-বিচ্ছিন্নতা, তাকে আড়াল করার হাস্যকর চেষ্টা—"চিরকালের খাঁটি বাঙালি" হওয়া নয়, "এক সকালের মেকি বাঙালি সাজা"! কথাগুলো যে বাইরের দিক থেকে একেবারে ভুল, তা হয়তো নয়। কিন্তু, কেন এই কথাগুলো? অন্য বড়ো উদ্যমে যা করছি না বা করতে পারছি না, তার সমাধান একটা উৎসবের মধ্যে হয়ে যাবে, তা কি হতে পারে? বরং ভিন্‌দেশের লোক বলেই হয়তো আমরাই বুঝতে পারি, বাংলাদেশের এই নববর্ষ উদ্‌যাপনে শহুরে সংস্কৃতির মধ্যে আবহমান গ্রামীণ নববর্ষের মিলনের একটা রেশ খুঁজে পাওয়া যায়, গ্রামীণ স্বভাব হয়তো নাগরিক পদচারণাতেও থেকে যায়, যা আমরা এই বঙ্গে অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছি। বুঝতে পারি, বাংলাদেশের নববর্ষকে ইসলাম-বিরোধী বলে চালানোর যে চেষ্টা আগে হয়েছিল, আজও হয়—সেই নববর্ষকেই দিনে-দিনে বাংলাদেশের সবচেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ কাঁধে-কাঁধ-মেলানো মানবিক মিলনোৎসবে পরিণত করে বাংলাদেশের বাঙালি তার যোগ্য জবাব দিচ্ছে।

বাংলাদেশে গিয়েছিলাম নিতান্তই ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে। কিন্তু যখন আবিষ্কার করলাম, ব্যক্তিগত উপলক্ষের দিনগুলির পাশে পয়লা বৈশাখও পড়েছে, তখন পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম। এত শুনেছি বাংলাদেশের এই নববর্ষ উৎসবের কথা—এবার সেই দিনটিতে থাকা যাবে, এটা সৌভাগ্য বলেই মনে হয়েছিল।

দিনকতক আগে থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছিল, ঢাকা শহর যেন কীসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে! এর আগে একুশে ফেব্রুয়ারিতে একাধিকবার গিয়েছি, তার সঙ্গে মিল আছে অনেকটা, আবার কোথায় যেন আলাদাও। দৈনিক খবরের কাগজগুলিতেও অনেক আগে থেকেই নববর্ষকে ঘিরে লেখা বেরোচ্ছে। সন্‌জীদা খাতুনের বাড়িতে বসেই টের পাই, ছায়ানটের ছেলেমেয়েদের নিয়ে জোর রিহার্সাল চলছে। আজ এখানে, কাল ওখানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট নববর্ষের সকালে শোভাযাত্রা বের করবে। সেই শোভাযাত্রায় থাকবে অনেকগুলো বিশালাকার মুখোশ। রাতদিন যা তৈরি করছে ছাত্ররা, শিল্পীরা। কদিন ধরেই উৎসবের ভাব। তৈরি মুখোশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে গাছে। চারপাশে ছড়িয়ে আছে কাগজ, রঙ। জয়নুল আর্ট স্কুলের ছোট্ট ঘরে নানা আকারের বাঘ, পেঁচা ও সিংহ জড়ো করে রাখা হয়েছে। বেশ জোরালোভাবে ক্যাসেট চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেই ভিড়-হট্টগোলের মধ্যে মুখ নিচু করে মুখোশ তৈরির কাজ করে যাচ্ছে চারুকলা ইনস্টিটিউটের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী। খবর পেলাম, ২০ ফুট উঁচু ১২টি মুখোশ নাকি তৈরি করা হয়েছে—মানুষের আকারে। শোভাযাত্রা যখন শুরু হবে, তখন দেখা যাবে ওই মুখোশগুলোও হেঁটে চলেছে। এ ছাড়া বাঘ, পেঁচা ও সিংহের মুখোশ থাকবে অজস্র। এবং আড়াই হাজারের বেশি মুকুট—তা পরে হাঁটবে ছেলেমেয়েরা। এই সবই তৈরি হচ্ছে চারুকলা ইনস্টিটিউটের অঙ্গনে কয়েকদিন ধরে।

চৈত্র-সংক্রান্তির রাতে ছিলাম ধানমণ্ডিতে। খাওয়াদাওয়ার পর মধ্যরাতে ঘুরতে বেরোই। আমাদের নেতা ছিলেন টুনুদা—ছায়ানটের প্রাচীন উদ্যোগীদের একজন। সেটাও একটা বড়ো সৌভাগ্যই বলতে হবে। চারুকলা ইনস্টিটিউটের কিছু ছাত্র তখন সবে কাজ শেষ করে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে উদ্দাম নেচে চলেছে। আমরা সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকি। আধো-আলো আধো-অন্ধকারে মূর্তিগুলি শোয়ানো। অন্যদিকে, কিছু ছাত্র তখনও সজাগ—চেষ্টা চলছে বড়ো-বড়ো কয়েকটি মূর্তিকে ঠেলাগাড়ির ওপর দাঁড় করানোর। বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ে, চোখে ঘুম নেই, তাদের চিৎকারে আবহাওয়া সরগরম। বাকিরা বোধহয় শুতে গেছে। সকাল থেকেই তো আবার শুরু হবে।

রমনার বটমূলে গিয়ে দেখি তখনও ছায়ানটের কাজ চলছে। মঞ্চের কাজ শেষ, কিন্তু রিহার্সাল শেষ হয়নি। যন্ত্রীরা কে কোথায় বসবে তার পরিকল্পনা নিয়ে মগ্ন পার্থ তানভীর নভেদ। বাদ্যযন্ত্র, মাইক, লাউডস্পিকার স্তূপ করে রাখা। টেকনিশিয়ানরা জোরালো আলো জ্বালিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

গাড়ি করে একটা চক্কর দিয়েই বুঝতে পারি আরও ছোটোখাটো যেসব অনুষ্ঠান হবে আগামীকাল, তার প্রস্তুতি চলছে। কোথাও আলপনা দিচ্ছে মেয়েরা, কোথাও স্টল তৈরি করার জন্য বাঁশ পুঁতছে ছেলেরা। রাত ১২টা ১ মিনিটেই নাকি শুরু হবে কারো-কারো উৎসব—যেমন টি এস সি-র সড়কদ্বীপে হবে মুক্তধারা সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে বাউল গান ও আবৃত্তি। সকালে বাহাদুর শাহ পার্কে জয়বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট, শাহবাগের 'মোড়ে নবগীতিকা শিল্পীগোষ্ঠী, মোহম্মদপুরে রেণুকা ললিতকলা কেন্দ্র—অনুষ্ঠানের অন্ত নেই। শিশু একাডেমী—নজরুল একাডেমী, বাংলা একাডেমী—সকলেই পালন করবে নববর্ষ ভোরবেলায়। বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠান তাদের নিজেদের প্রাঙ্গণের বটমূলে। সবারই আয়োজন টের পাওয়া যায় এই মধ্যরাতেও।

রাত শেষ না হতেই ফিরতে হল, কারণ আবার শুরু হবে পদযাত্রা।

পয়লা বৈশাখের ভোর। গাড়িঘোড়া বন্ধ—রমনা আর সোওরাওয়ার্দি উদ্যানের আশপাশের সমস্ত এলাকায়। তার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা ইনস্টিটিউট, শহিদ-মিনার, ছাত্র-শিক্ষক-কেন্দ্র, পাবলিক লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম সমস্তই পড়ে। এই সমস্ত এলাকাটাই হল নববর্ষের মঞ্চ। ধানমন্ডি থেকে নিউ এলিফেন্ট রোডের মোড় পর্যন্ত এসেই রিকশা ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে থাকি। হাঁটতে-হাঁটতেই শুনি চারপাশে থেকে ভেসে আসছে গান। রাস্তা জুড়ে হেঁটে চলেছে নানা বয়সের মানুষ। তবে তরুণ-তরুণীরাই বেশি। মেয়েদের পরনে রঙিন শাড়ি, ছেলেদের ধপধপে শাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। কোনো-কোনো রিকশায় চার-পাঁচজন মেয়ে এক সঙ্গে উঠে বসে অদ্ভুত একটা নকশা তৈরি করেছে। সবারই গন্তব্য রমনার দিকে। শিরশিরে হাওয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছে ভেতরটা। একেবারেই গরম পড়েনি এবার।

কিছুক্ষণ পরেই কানে ভেসে এল সানাইয়ের সুর। রমনার বটমূলেই এসে পড়লাম তা হলে। অশ্বত্থ বা বট যা-ই বলি, তার নীচে বিশাল ছড়ানো মঞ্চ। বিভিন্ন বয়সের গায়কেরা সেই মঞ্চ জুড়ে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি স্তরে বসে আছে। মেয়েদের পরনে হালকা-গেরুয়া শাড়ি (এবারে তাই, প্রত্যেকবার একই থাকবে এমন কথা নেই), ছেলেদের শাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। সামনে যত দূর চোখ যায়, অর্ধবৃত্তাকারে শ্রোতারা শান্ত বসে আছে। নতুন যারা আসছে, তারা নীরবে জায়গা খুঁজে নিচ্ছে। বাহুমূলে ছায়ানটের ব্যাজ জড়ানো স্বেচ্ছাসেবকেরা সাহায্য করছেন। সামনে মেয়েরা। ঠিক কতজন লোক আসছে, তা বোঝার উপায় নেই। কারণ, রমনার মাঠ এখন গাছগাছালিতে ভর্তি। চোখ আটকে যায় দূরের গাছে। ততদূর

অবধি মানুষ। পরিধির বাইরে হেঁটে-হেঁটে সেই গাছ অবধি পৌঁছোলেই দেখি গাছের আড়ালে আবার নতুন জমি, সেখানেও মানুষ ঠিক একইভাবে বসে আছে। রমনার মাঠের একদিকে টানা চলে গেছে লম্বা দিঘি, তারও ওপারে মানুষেরা শান্ত বসে আছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মাইকে গানের সুর ভেসে আসছে। নিরিবিলি বসে শুনতে চান এই ভঙ্গিতে তাঁরা আগে এসেও বসে পড়েছেন দিঘির ধারে-ধারে। রাস্তার দিকে চোখ পড়লেই দেখা যায়, তখনও লোক আসার বিরাম নেই। যেন মিছিল করে লোক আসছে। সব একাকার হয়ে গেছে। তারই মাঝে-মাঝে মেলা। একসময় মেলা একদিকে আড়াল করা ছিল। এখন জনস্রোতে মিশে গেছে। চুড়ি, খেলনা, রঙিন কাপড় বা তৈজসপত্রের মেলা। পান্তাভাত খাওয়ার স্টল সারি- সারি। এই একটা ব্যাপার জড়িয়ে গেছে বটমূলের এই উৎসবের সঙ্গে। বিচিত্র তাদের সজ্জা, বিচিত্র আহ্বান। কেউ-কেউ ছড়ায় বা পোস্টারে সাজিয়েছে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরাও শখ করে স্টল বানিয়েছে। মেয়েরা বঙ্গ ললনার ইমেজ তৈরি করে, সাবেকি ঢঙে লালপেড়ে শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে স্টলের সামনে। সব মিলিয়ে একটা হুল্লোড়, একটা রগড়। কেউ-কেউ আমোদ খুঁজে পান, কেউ-কেউ একটু চটে যান।

এদিকে রমনার বটমূলে সানাই থামিয়ে শুরু হযে যায় তবলা লহরা। তবলা লহরার পর একের পর এক গান। কোনো ঘোষণা নেই কোনো ভাষণ নেই, কোনো করতালি নেই—শুধুই গান, একটার পর একটা গান। রবীন্দ্রনাথের অতুলপ্রসাদের দ্বিজেন্দ্রলালের নজরুলের এবং আরো অনেকের। কখনো একক, কখনো সমবেত। সেই গানে কখনো ভোরের মৃদুমন্দ হাওয়া কীসের যেন হর্ষ বয়ে নিয়ে আসে, কখনো প্রভাতে উচ্চারিত কারো নামে হৃদয়ের শতদল ফুটে ওঠে, আলোকময় আলোর আবির্ভাবে নয়নের আঁধার দূর হয়, আর তখনই অন্ধজনকে আলো এবং মৃতজনকে প্রাণ দেওয়ার আকুতি জানানো যায়। এত বড়ো গানের অনুষ্ঠানই তো বিরল ব্যাপার (কে যেন বলছিলেন, এত বৃহৎ গানের অনুষ্ঠান কি আর কোথাও হয়?)—তার ওপর যে অসম্ভব প্রশান্তিতে ও তন্ময়তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এত মানুষ সেই গান শোনে—এই দৃশ্যের মুখোমুখি হওয়াটাও এক স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা। ঢাকার এক বন্ধুর সঙ্গে জমায়েতের এই প্রকৃতিটাকে বোঝার জন্যই হাতড়ে-হাতড়ে ঘুরে বেড়াই—দাঁড়ানো ভিড়ের মধ্য দিয়ে, মেলার মধ্য দিয়ে, গাছের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি বাঁকে-বাঁকে দৃশ্য বদলে যায়। তরুণ-তরুণীরা হাতে হাত দিয়ে শুনছে, দম্পতিরা বাচ্চাদের নিয়ে এসেছে, বন্ধুরা গাছে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কত রকমের সজ্জা, কত রকমের পোশাক—লোকের যেমন বিরাম নেই,

তাদের ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যেরও অন্ত নেই। ঢাকায় বহু বন্ধু আমার—প্রায় সকলকেই এক-এক জায়গায় আবিষ্কার করি। 'শুভ নববর্ষ' বলে তারা প্রীতি সম্ভাষণ করে—একটু অনুবাদের গন্ধ থাকলেও, ভালো লাগে। একুশে ফেব্রুয়ারিতেও জমায়েত দেখেছি বাংলা একাডেমীর বইমেলায় কিংবা শহিদ-মিনারের সামনে—গা শিরশির করেছে ভাইয়ের রক্তে-রাঙানো গানে। কিন্তু গানে-গানে ভরা এই ভুবনে অন্য প্রীতিস্নিগ্ধ অনুভূতি।

রাস্তায় নেমে পড়ি একসময়। রমনার মাঠের আশপাশে। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র-শিক্ষক-কেন্দ্র, সোওরাওয়ার্দি উদ্যান, শিল্পকলা একাডেমী, সেগুনবাগিচা—সমস্ত তল্লাট জুড়ে আনন্দমুখর জনতার স্রোত। হাতে ডুগডুগি বাজছে। মাথায় মুকুট। ছেলেদের মেয়েদের অনেকের মাথায়। হ্যাঁ, মুকুটই, শাদামাটা কাগজের টুপি নয়। তাতে লেখা 'স্বাগত ১৪০৪' কিংবা 'নববর্ষ ১৪০৪' কিংবা আরো কত কী! আগের দিন দেখেছি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে নববর্ষে বই কেনার আহ্বান জানিয়ে টুপি ছড়ানো হচ্ছে—তা পরেও ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ কেউ-কেউ।

তার ওপর এ বছর ঠিক আগের দিনই আই সি সি ট্রফির ফাইনালে জয়ী হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেট দল। তার আনন্দও মিশে গেছে এবারের নববর্ষের আনন্দের সঙ্গে। দুদিন আগেই সেমিফাইনালে জয়ী হওয়ার পর ঢাকার রাস্তায় যে একটু বেসামাল ফুর্তি দেখা গিয়েছিল, যা নিয়ে অনেক আত্মধিক্কার ও নিন্দাবাদ শোনা গেছে, সেই অসভ্যতার ছিটেফোঁটাও নেই আজ। ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে কি নববর্ষের রুচির হাওয়া লেগেছে সেখানেও? মানিক মিয়া এভিনিউতে বিজয়োৎসব হবে, তার জন্যও ছুটবে অনেকে। কিন্তু তার আগে তো অন্য মিছিল। চারুকলা ইনস্টিটিউটের মিছিল। ইনস্টিটিউটের ছাত্রদেরই আয়োজিত মিছিল, কিন্তু তাতে যোগ দেয় সর্বস্তরের মানুষ—লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ নাগরিক মানুষ। সহযোগীর ভূমিকা নেয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট তো আছেই। চারুকলা ইনস্টিটিউটের বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিদেশীরাও নেমে পড়ে এই মিছিলে। এ বছরে দক্ষিণ কোরিয়া ও ডেনমার্ক থেকে যে-সব ছাত্ররা ঢাকায় পড়তে এসেছে, তারাও প্রবল উৎসাহে শামিল হয়েছিল মিছিলে। অগুনতি মানুষ। রাস্তায় অপেক্ষা করে থাকে আরো লক্ষ মানুষ। ছায়ানটের অনুষ্ঠান শেষ হলে ভেঙে পড়ে শ্রোতারা পথের ধারে।

আগেই বলেছি, কয়েকদিন যাবৎই চলছিল এই মিছিলের আয়োজন। ঐতিহ্যের পথ ধরে নববর্ষের যে-আধুনিক উৎসব সৃষ্টি করেছে ছায়ানট, তাতেই নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে চারুকলা ইনস্টিটিউটের এই মিছিল। যে-বিরাট মুখোশ তৈরি

করে ছাত্ররা, তাতেও অভিনবত্ব আনা হয় বছর-বছর। এক-একবার এক-এক দিকে ঝোঁক। জন্তু-জানোয়ার আর পাখি তো থাকেই, তদুপরি এবার মানুষের ঢ্যাঙা মূর্তি। গাড়ির ওপর বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে করতালি দিয়ে বা গান গাইতে-গাইতে চলে মানুষ। মুকুট মাথায়, মুখে বাঁশি বা হাতে ডুগডুগি। মিছিলের শেষে মুখোশগুলি নিলামে বিক্রি করা হয়, পরের বছরের উৎসবের তহবিল তৈরি হয়।

ঢাকাতেও তরুণীরা এখন শালোয়ার-কামিজই পরে মূলত। কিন্তু এদিন মিছিলে কিংবা মিছিলের বাইরে, মাঠে-রাস্তায়, সর্বত্র, তারা রঙিন শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একা-একা তেমন নয়, দলবদ্ধ হয়ে। হাতে হাত দিয়ে। অনেকেরই আটপৌরে ঘরোয়া রীতিতে শাড়ি পরা। কারো তাঁতের শাদা খোল, লাল পাড়। কারো তসর বা গরদ। ছেলেরাও কম যায় না। অনেকেই সিল্কের জামা পরেছে। দু-একজন তসরের ধুতি পরাও দেখলাম। মেয়েদের অনেকেরই মাথায় সিঁদুর এবং হাতে শাঁখা। সবাই যে হিন্দু তাও নয়। প্রসাধন হিশেবেই পরেছে। কট্টরপন্থীরা নিশ্চয়ই চটে যায় এতে, হিঁদুয়ানির প্রভাব খুঁজে পায়। কিন্তু এতে এই তরুণ-তরুণীদের মজার কমতি হয় না, শখ হিশেবেই এই চিহ্ন বহন করে তারা হিন্দুত্বের অনুষঙ্গকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়।

অবশেষে এসে পড়ে চারুকলা ইনস্টিটিউটের মিছিল। সমস্ত রাস্তা জুড়ে আনন্দিত নরনারী প্রায় নাচের ছন্দে এগিয়ে চলে। বিরাট-বিরাট মুখোশগুলো, পশুপাখি বা মানুষের মুখোশগুলো, আনন্দের বার্তা বহন করে এগোয়। আচ্ছা, এর সঙ্গে কি ঢাকার একদাখ্যাত জন্মাষ্টমীর মিছিলের অনুষঙ্গ আছে কোথাও? তাজিয়া নিয়ে মিছিল তো হয় মহর্‌রমেও! বেশিদূর এই ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না নিশ্চয়ই, কারণ এর লৌকিক চরিত্র এতই স্পষ্ট যে তাকে অন্য কোনোভাবে চেনাই যায় না।

এবার কি একটু বেশি ফুর্তি? অভিজ্ঞ বন্ধুরা জানান, ভিড় একটু সরে গেছে ক্রিকেটের বিজয়োৎসবে। ভালোই হয়েছে, না হলে একটু অসহনীয়ই হয়ে ওঠে নাকি। জানি না, আমি তো দেখছি লক্ষ লক্ষ মানুষের এই জমায়েত, এর চেয়ে আর বড়ো কী হতে পারে? তবে উন্মাদনা যে বেড়েছে তা বন্ধুও স্বীকার করলেন। তাঁদের চোখে-মুখে উদ্বেগশূন্য প্রশান্তি। শুধু নববর্ষ উৎসবের জমায়েতে বা মিছিলেই নয়, সেই শান্তি তো খুঁজে পেয়েছি এবারে ঢাকায় এসেই। নতুন সরকার, মুজিবুর রহমানের পুনরুত্থান, মুক্তিযুদ্ধের চর্চা নতুন করে আবার আস্থা এনে দিয়েছে অনেকের মনে। আবহাওয়াটা বোধহয় পালটাচ্ছে। দ্বিতীয় বছরে তা আরো স্পষ্ট হয়েছে। পয়লা

বৈশাখেও কি তার রেশ পড়বে না? আগেই তো শুনেছি, এই উৎসবগুলি আরো রঙিন হয়ে ওঠে, সুস্থতার দিকে, সামাজিক-রাজনৈতিক পটবদলের সঙ্গে- সঙ্গে। উলটোটাও হয়। মৌলবাদী নখ যখন বেশি ধারালো হয়ে ওঠে, তখন এই উৎসবগুলি প্রতিবাদেরই নির্ঘোষ। সেদিক থেকে এবারের নববর্ষে দুটি তাৎপর্যই আছে। কারণ, অল্প আগেই শুরু হয়েছে মৌলবাদীদের তৎপরতা—স্বাধীনতার যুদ্ধের সপক্ষে জ্বালানো 'শিখা চিরন্তন'-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। তাছাড়া শুভ পরিবর্তনের সম্ভাবনাগুলো তো আছেই। এরই মধ্যে বাংলাদেশের নববর্ষ নতুন-নতুন ভাষা খুঁজে নেয়।

মিছিল চলে গেলে সোওরাওয়ার্দি উদ্যানের দিকে এগোই। সারা ময়দানে ছেলে-বুড়োর ভিড়—গুচ্ছ-গুচ্ছ বসে আছে। তারই মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো অনুষ্ঠান নববর্ষের। উদ্যানের ভেতরে কিংবা ধারে। দু-একটিতে কিছুক্ষণ বসি। গান, ভাষণ, নববর্ষের প্রতিজ্ঞার উচ্চারণ। ঢাকায় ছাত্র-শিক্ষক-কেন্দ্র তরুণ-তরুণীদের একটা বড়ো মিলবার জায়গা। সেখানে তো সর্বক্ষণই মনে হয় উৎসব। পয়লা বৈশাখের দিন কী হবে তা তো আন্দাজই করা যায়—কেন্দ্রের সামনের চায়ের দোকানে কিছুক্ষণ বসি। সোওরাওয়ার্দি উদ্যানেও শুধু চৌকি পেতে অনেক অস্থায়ী দোকান—সেখানেও পান্তাভাত এবং আরো কিছু। নানারকমের খাবার চারদিকেই ছড়ানো। সাজপোশাক আর বাঁশি-ডুগডুগির পাশে তা না থাকলে চলবে কেন?

বেলা গড়ায়। এ সময়ে গরমের যে-তাপ থাকার কথা, এ বছর তা নেই। মেঘের ছায়াতেই তাই ঘুরে বেড়াই। তবু ক্লান্ত হই। কোনো-কোনো বন্ধুর বাড়িতেও পান্তাভাতের আয়োজন। সাংকেতিক ভাষার আমন্ত্রণ বুঝতে না পেরে 'মিস' করি। শুনেছি বুড়িগঙ্গায় বাইচ প্রতিযোগিতা হয়। কিন্তু ভিড় ঠেলে কী করে পৌঁছোব সেখানে?

বিকেল এবং বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। দৈনিক পত্রিকাগুলির ঢাউস বিশেষ সংখ্যা। এ ঠিক আমাদের মতো নয়। আমাদের শারদীয় সংখ্যার মতোই সেখানেও লেখক-শিল্পী সবাই হাজির। পত্রিকাতে নববর্ষের অনুষ্ঠানের তালিকার ওপর চোখ বোলালেই টের পাই সারাটা দিন শহর জুড়ে কত জায়গায় কত রকমের অনুষ্ঠান হচ্ছে। সাধ্য নেই সেগুলোতে যাওয়ার। চারুকলা ইনস্টিটিউটের কাজ কিন্তু মিছিলেই শেষ নয়, বিকেল থেকে সেখানকারও বকুলতলায় শুরু হবে বাউলগান, নাটক, পুতুলনাচ। বাউলগান ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটির সেগুন বাগিচার কার্যালয়েও। চৈত্র-সংক্রান্তির সন্ধেতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কবিতাপাঠের আসর, ঢাকার সাহিত্য-সংস্কৃতি-কেন্দ্রে নববর্ষ নিয়ে সেমিনার, বৌদ্ধবিহার প্রাঙ্গণে বৌদ্ধ শিশু-কিশোরের মেলা এবং শিল্পকলা একাডেমীতে ফটোগ্রাফ প্রদর্শনী। নববর্ষের দিনও ফটোজার্নালিস্ট

অ্যাসোসিয়েশনের প্রদর্শনী 'রূপসী বাংলা'। শিল্পকলা একাডেমীতে তারপরেও আলোচনা ও গান। সন্ধেবেলায় জাদুঘর প্রাঙ্গণে গান। কোথাও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শাড়ির মেলা। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী নববর্ষের দিনেই 'শ্রেষ্ঠ বাঙালি ১৪০৩' আখ্যায় ভূষিত করে বেগম সুফিয়া কামাল ও রণেশ দাশগুপ্তকে।

ঢাকার এই মেজাজ ছড়িয়ে পড়ে মফস্বল শহরেও। জানতে পারি চট্টগ্রামে, রাজশাহীতে, বরিশালে, ফরিদপুরে, যশোরে, খুলনায়, নোয়াখালিতে সর্বত্র পয়লা বৈশাখের উৎসব আয়োজিত হয়েছে। চট্টগ্রামের ফুলকি আয়োজিত অনুষ্ঠানে সহজেই মন চলে যায়। যশোরে পৌর-উদ্যানে উদীচীর অনুষ্ঠান, চারুপীঠের 'আনন্দ শোভাযাত্রা'। নোয়াখালিতে শিল্পকলা একাডেমীর অনুষ্ঠান। মনে হয় যেন সবেতেই আমি আছি।

এই হল বাংলাদেশের নববর্ষ। প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই এর আধুনিক রূপের শুরু—বিরুদ্ধতার মধ্যেই প্রবল হয়ে উঠেছিল উৎসব। বাংলাদেশের নাটকের অতিপরিচিত মানুষ আলি যাকের সুন্দর বলেছেন, "যখনই মনে হয়েছে স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে সরকার... তখনই আমরা দেখেছি পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে আরও বেশি মানুষ ভিড় করে এসেছে। আমরা তো প্রায়ই বলাবলি করতাম, এবারে রাজনৈতিক আবহাওয়া যেমন উত্তপ্ত, ভিড়ের ঠ্যালায় আর পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে যাওয়া যাবে না।" আজ যদি কিছুটা স্বস্তি ও প্রত্যাশা এসেও থাকে, উৎসবের এই প্রতিবাদী মর্মার্থটা অত সহজে হারিয়ে যাবে না।

রচনাকাল : ১৯৯৭

গানের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশ

আমার কাছে এটা খুবই অবিস্মরণীয় যে, যাঁর বা যাঁদের সাহচর্যে বাংলাদেশকে প্রথম চিনেছিলাম তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের মানুষ। তাঁদের সম্বন্ধসূত্রেই কাছাকাছি আসতে পেরেছি বাংলাদেশের একমুঠো তারুণ্যে দীপ্ত ছেলেমেয়ের—তাদের শিরায় রবীন্দ্রসংগীত, তাদের জীবনযাপনে রবীন্দ্রসংগীত, ধ্যানজ্ঞান রবীন্দ্রসংগীত। তাদের গান শুনেছি হাঁটতে-হাঁটতে, মহড়ায়, ঘরে একান্তভাবে, কিংবা কখনো ঘরোয়া আসরে। ঢাকায়, রাজশাহীতে, ফরিদপুরে। বন্ধুত্বের সুবাদে, প্রীতির বশে তারা এ-বঙ্গেও এসেছে। একক বা দলবদ্ধভাবে গানে-গানে ভরিয়ে দিয়েছে সময়।

পরে এই মুগ্ধতা শুধু পরিচিতের সীমাতেই আটকে থাকেনি। বাংলাদেশের গানের ক্যাসেট পেয়েছি অজস্র। তার কোনো-কোনোটি কলকাতা থেকেই বেরিয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পীরা অনুষ্ঠানে গান গাইতেও এসেছেন। ক্রমশ বেশ কয়েকজন এ-বঙ্গের মানুষের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছেন—মানে-মর্যাদায় আলাদা হয়ে উঠেছেন। আস্তে-আস্তে, সব মিলিয়ে, শুধু গান শোনাই নয়, বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীত চর্চার গোটা ইতিহাস ও তার বাস্তব যেন হাজির হয়েছে চোখের সামনে।

'বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীত' : এই অভিধায় অবশ্য একটু মুশকিলে পড়তে হয়। ১৯৪৭-এর আগে তো একই দেশ, একই ঐতিহ্য। সাতচল্লিশের পর কীভাবে সেই সংগীত আলাদা হল? এর যে সামাজিক পট ও পরিবেশ তা অবশ্যই আলাদা। দেশভাগ ও পূর্বপাকিস্তানের জন্ম, মুসলিম মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের জাগরণ, ভাষা-আন্দোলন, স্বাধীনতার আন্দোলন—এই ইতিহাসের পরম্পরার সঙ্গে সেখানকার গানগাওয়াটা অনেক সময়ই এমন জড়ানো যে সেটাই এই ভূখণ্ডের রবীন্দ্রসংগীতকে একটা পৃথক অবস্থানে নিয়ে যায় হয়তো। কিন্তু তা থেকে কোনোরকমের নান্দনিক পার্থক্যও কি সূচিত হয়? রবীন্দ্রসংগীতের গাওয়ার ধরণ কি আলাদা হতে পারে?

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। টেপরেকর্ডারে যখন কোনো গায়কের গান শোনাই, বন্ধুরা যেন বাংলাদেশের গান বলে আলাদা করে কিছু চিনতে পারেন। বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের তা নিয়ে জাঁক করতে শুনি—আমাদের ওখানে

এটা এরকম গাওয়া হয় না, কিংবা এরকমভাবে গাওয়া হয়! সেটা ঠিক কী, ওই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা যা বলেন তা অবশ্য অস্পষ্ট সাহিত্যিক বুলি। শান্তিনিকেতনের গান, কলকাতার গান—এ নিয়ে পার্থক্য করা হত একসময়। সেরকমই কি বলা যায় 'বাংলাদেশের গান'? শান্তিনিকেতনের গান, কলকাতার গান থেকে যা আলাদা।

এ ধরণের বিভাজন, সন্দেহ নেই, খুব গোলমেলে। সত্যিই কি বাংলাদেশে সবাই একরকম গান করেন? ইফ্‌ফাত আরা খান আর রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার গান কি এক? পাপিয়া সারোয়ার আর মিতা হক? কিংবা সাদী মুহম্মদ আর মহিউজ্জামান চৌধুরী? আবার এও ঠিক, এরই মধ্য থেকে কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ যদি এ-বঙ্গের শ্রোতাদের কানে পৌঁছোয়, তবে কি তাকে অগ্রাহ্য করতে পারি? উচ্চারণের, উপস্থাপনার, আবেগের একটা সাধারণ মিল কি একেবারেই থাকতে পারে না তাঁদের গানে?

থাকতেও পারে। পূর্বপাকিস্তানের ভেতরকার লড়াই, বাংলাদেশের জন্ম, নতুন গড়ে-ওঠা মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী, নতুন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বাংলাভাষাকে নতুনভাবে চেনার অন্য আয়োজন, বাঙালি জাতিসত্তার নতুন উপলব্ধি ও তার প্রতিষ্ঠা—এই সমাহৃত পরিবেশে যদি রবীন্দ্রসংগীতের পুনরাবিষ্কার ঘটে থাকে, অনুভবে স্বাতন্ত্র্যে নতুন কণ্ঠস্বর শোনা যায়, নতুন উৎসাহ ও সেই সূত্রে নতুন উচ্চারণ—তা শুধু রবীন্দ্রসংগীতকে একটা অন্য জমিই দেয় না, হয়তো শিল্পগত বা নান্দনিক একটা বৈশিষ্ট্য বা অনন্যতাও এনে দিতে পারে, যাকে বলা যায় 'বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীত'।

অন্তত এ কথা বলা যায়, বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে যত আলোড়ন গত কয়েক দশকে ঘটেছে, যত ভাবনার উত্থানপতন, বিতর্ক ও বিনিময়, তা পশ্চিমবঙ্গে হবার কোনো কারণ ঘটেনি। এ সবের একটা চমৎকার বিবরণী পাই ওয়াহিদুল হকের 'রবীন্দ্রসংগীত : পূর্বধারা' প্রবন্ধে। তিনি তাতে বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীতের এই নবজন্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন অখণ্ড বাংলায় বিশ শতকের গোড়ায় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রসংগীতের যে-ভূমিকা ছিল তার।

বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীতের এই ইতিহাসের শুরু ১৯৪৭-এর পর থেকে। তখন অবশ্য আমরা তাকে বলতাম পূর্বপাকিস্তান। রবীন্দ্রসংগীতের কর্ণধারেরা অনেকেই (তা সে অনাদিকুমার দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন মজুমদার বা শান্তিদেব ঘোষ যিনিই হোন) পদ্মার ওপারের মানুষ হলেও তাঁদের চর্চা মূলত শান্তিনিকেতন বা কলকাতাকে ঘিরে এবং একান্তভাবে হিন্দুদের মধ্যে। মুসলমান গায়ক গোড়ার যুগে কাউকে প্রায় খুঁজে পাওয়াই যায় না। দেশভাগের পর ছবিটা পুরো পালটে গেল। ওয়াহিদুল হক বললেন, "বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিচারে রবীন্দ্রসংগীত

প্রধানত প্রায় সর্বতোভাবে যেন, মুসলমানের গান।" এই পরিবর্তনকে মাথায় রেখেই তাই বলা হয়েছে : "পূর্ববঙ্গে অবশ্যই নতুন কিছু একটা ঘটেছে।"

দেশভাগের আগে শুধু পূর্ববঙ্গে কেন, পশ্চিমবঙ্গেরই বা কটা শহরে বা গ্রামে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা ছিল? কলকাতা ছাড়া? কলকাতাতেই বা কতটুকু? শান্তিনিকেতনের বাইরে হাতে গোনা যায় এমন গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানই ছিল কলকাতায়। তা ছাড়া বাড়িতে গিয়ে গান শেখানোর জন্য ছিলেন গৃহশিক্ষক। রবীন্দ্রসংগীত সীমাবদ্ধ ছিল বড়ো শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যেই শুধু। সুতরাং কলকাতা বা শান্তিনিকেতন থেকে আরো দূরে পূর্ববঙ্গের—গ্রামে তো প্রশ্নই ওঠে না—মফস্বল শহরে কতটুকু থাকতে পারে এই চর্চা? মধ্যবিত্ত বলতে তখন যাঁদের বোঝাত, তাঁরা সবাই হিন্দুসমাজের অন্তর্গত। তাই রবীন্দ্রসংগীতের চলও ছিল একান্তভাবে হিন্দুদের মধ্যে। তবে এককভাবে নয়—আরো পাঁচটা গানের (যথা কীর্তন, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল বা আধুনিক) সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও। শেখাতেন গৃহশিক্ষকেরা, কিংবা গ্রামোফোন বা রেডিও-র সাহায্য নিয়েও শেখা চলত। সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথের গানই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল এমনও বলা যায় না। জসীমউদ্‌দীনের বাল্যকালের কথা পড়ি তাঁর জীবনস্মৃতিতে। ফরিদপুরের গ্রামের কথা। গ্রামের মেয়েরাও তখন থিয়েটারের গান গাইত, এবং তারই মধ্যে আবার কখনো গেয়ে ফেলত, 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ও-পারে'। তবে, জসীমউদ্‌দীন লেখেন, "তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথের গান তত প্রচলিত হয় নাই। রজনী সেনই মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের মন আকর্ষণ করিয়া আছেন।"

দেশভাগের আগে পূর্ববঙ্গের মুসলমান-সমাজে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচলন ছিল না, এ-কথা সাধারণভাবে সত্য হলেও কিছু-কিছু ব্যতিক্রমী কাহিনী শুনি না তা নয়, বিশেষত স্মৃতিচারী কোনো-কোনো রচনায় বা সেকাল নিয়ে লেখা গল্প-উপন্যাসে। শৈলজারঞ্জন মজুমদারের 'যাত্রাপথের আনন্দগান'-এ পড়ি : তিনি ১৯৩২-এ শান্তিনিকেতনে গিয়ে দিনেন্দ্রনাথের কাছে চোদ্দটি গান শিখে সেই গান নিয়েই সে-বছর নেত্রকোণায় ফিরে মে মাসে রবীন্দ্রজয়ন্তী করেন। এর আগে থেকেই অবশ্য নেত্রকোণায় প্রতিবছর পঁচিশে বৈশাখে জন্মোৎসব হত। "তখনকার দিনে মেয়েরা প্রকাশ্য মঞ্চে গান করত না। নেত্রকোণায় রবীন্দ্রজয়ন্তীতে মেয়েরা গাইলেন। 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে' গানটি একবার একটি মেয়েকে দিয়ে করিয়েছিলাম। তার জন্য খুব সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। নেত্রকোণা থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক তো বলেই বসল একটি অবিবাহিত মেয়ের মুখে এমন একটি অশ্লীল

গান দিয়ে আমি নাকি ভালো করিনি। শুনে গুরুদেব বলেছিলেন—তুমি করেছ কী? তোমার যে গলা কাটেনি! শুধু হিন্দু মেয়েরা নয়, মুসলমান মেয়েও রবীন্দ্রজয়ন্তীতে গান করতেন কিন্তু।" শৈলজারঞ্জনের কাছ থেকেই শুনি ময়মনসিংহ শহরে প্রতি বছরেই রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালনের খবর।

সন্‌জীদা খাতুনের 'অতীত দিনের স্মৃতি' বইটিতে পাই তাঁর বাল্যকালের কাহিনী। বাবা কাজী মোতাহার হোসেনের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন : "ভোরবেলাকার একটি আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা ছিল—আব্বুর গান শুনে ঘুম থেকে জাগা।" কাজী মোতাহার হোসেন যেমন 'বড়ি বড়ি আঁখিয়া শ্যাম কি সখি' গাইতেন, শ্যামাসংগীত গাইতেন, ডি-এল-রায় গাইতেন, তেমনি গাইতেন 'মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি'। খুঁজলে এরকম খবর হয়তো আরো পাওয়া যাবে। তবে মুসলমানদের মধ্যে তখন বিত্তের কারণে, শিক্ষার কারণে যে-মানসিক আবহাওয়া ছিল তাতে সে-সংখ্যা যে খুবই কম হবে, তা তো বোঝাই যায়। কলকাতা বা পদ্মার এপারের বাংলাতেও গায়কদের মধ্যে মুসলমানদের নাম প্রায় পাই-ই না। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনে প্রথম যে-মুসলমান শিক্ষার্থী গান শিখতে গিয়েছিলেন, তাঁর নাম আবদুল আহাদ। জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণে আবদুল আহাদ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন :

> আজ আমার মনে পড়ে সেই পুরোনো দিনের কথা, সেদিন সারা মুসলিম সমাজ থেকে একমাত্র আমি রবীন্দ্রসংগীত শিখতে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম, সেটা ছিল ১৯৩৮ সাল, সেদিন সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল একজন মুসলমান ছাত্র রবীন্দ্রসংগীত শিখতে এসেছে। সেইদিনে শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে গান ভেসে বেড়াত। সেদিন আমার কোনো অসুবিধা হয়নি, সবাই আপন করে নিয়েছিল আমাকে, আমার পরম সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ চারটি বছর তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে।

আবদুল আহাদ ছিলেন পাবনার মানুষ, রাজশাহীর একসময়ের ছাত্র। কিন্তু শান্তিনিকেতনের শিক্ষা শেষ করে তিনি কলকাতার গানের জগতে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। দেশভাগের পর স্থায়ীভাবে চলে আসেন ঢাকায়। এ ছাড়াও ওয়াহিদুল হকের বিবরণীতে পাই বেশ কয়েকজন অবিস্মরণীয় সংগীতজ্ঞের কথা, যাঁরা পূর্ববঙ্গের মফস্বল শহরগুলিতেও "মূলধারার রবীন্দ্রচর্চা" চালিয়ে যাচ্ছিলেন—যেমন কুমিল্লা-র পরিমল দত্ত, চট্টগ্রামের সৌরীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত, ময়মনসিংহ-র বিজয় ভট্টাচার্য, সিলেটের রাসবিহারী চক্রবর্তী। তাঁরা সবাই যে শুধু রবীন্দ্রসংগীতের মানুষ ছিলেন তা নয়—

কেউ-কেউ ধ্রুপদী সংগীতের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার, এঁরা সকলেই হিন্দু। ১৯৩৯-এ ঢাকা-বেতার শুরু হল এবং ক্রমশ তাকে কেন্দ্র করেও অল্পস্বল্প কিন্তু নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীতের যে-চর্চা শুরু হয়েছিল গোপাল দাশগুপ্তের প্রযোজনায়, সেখানে শিল্পী হিশেবে যাঁদের নাম পাই—যথা তপতী দাম, অণিমা দত্ত, নীলিমা দত্ত, করুণা গুপ্ত, শীলা মিত্র, ঝুনু ভৌমিক প্রমুখ—তাঁরাও প্রত্যেকে হিন্দুই। এই তথ্য যাঁর কাছ থেকে পাচ্ছি সেই রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, "ঢাকা বেতারে, ঢাকা শহরে তথা পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে প্রথম রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী লায়লা আর্জুমান্দ বানু—দেশবিভাগের আগে অপর কোনো মুসলমান শিল্পী ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেননি।"

২

বাংলা ভাগ হওয়ার পরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দুরা দলে-দলে দেশত্যাগ করে চলে গেলে শূন্যতার সৃষ্টি হল পূর্ববঙ্গে, অথচ রাষ্ট্রিক কারণে নাগরিক-ব্যাপারে শিক্ষিতের প্রয়োজন তো তখন আরো বেশি। সেই অভাব কিছুটা পূরণ হল পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা শিক্ষিত মুসলমানদের দিয়ে, তবে কিছুটাই। শুরু হল গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার ঝোঁক সেখানেও। ফলে যে নাগরিক মধ্যবিত্ত মানস খুব ক্ষীণভাবে হয়তো ছিল পূর্বপাকিস্তানের মুসলমান সমাজে, তা এবার বেড়ে উঠতে থাকল। দেশভাগ হয়েছিল জাতিপরিচয়ের বদলে ধর্মীয়তার উপর ভর করে, কিন্তু দেশভাগের পর অনিবার্য নিয়মে মুসলমানদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে গেল ওই বাঙালি জাতিসত্তারই আবিষ্কার। ঘটে গেল বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানের অভ্যুত্থান। তার একটা বড়ো অবলম্বন ছিল, আমরা জানি, মাতৃভাষা বাংলার জন্য স্বাভাবিক টান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা। গানের আবেদন আরো ছড়ানো ও স্বতঃস্ফূর্ত বলেই হয়তো সেই নির্ভরতা রবীন্দ্রসংগীতের প্রসারের মধ্যে টের পাওয়া গেল বেশি করে। রবীন্দ্রসংগীত আরো একবার হয়ে উঠল একটি জাতির আত্ম-উদ্বোধনের উচ্চারণ।

পরপর অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। আবদুল আহাদ ঢাকা বেতারকেন্দ্রে যোগ দিলেন। এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথের গান শেখাতে শুরু করলেন। ব্যাপারটা যে কতখানি যুগান্তকারী তা বুঝতে পারা যাবে তাঁর কথা শুনলেই।

> আমি যখন রেডিওতে সংগীতশিক্ষার আসরে গান শেখাতাম সেটা ছিল ১৯৪৮ সাল, তখন রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ না করে রবীন্দ্রসংগীত শেখাতাম কারণ রবীন্দ্রনাথের নাম করলে সে সময়ে রেডিওতে সংগীত শিক্ষা বন্ধ

হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এইভাবে আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রচার করার চেষ্টা করেছি।”

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে হুসনা বানু খানম ঢাকার আজিমপুর কলোনিতে রবীন্দ্রসংগীত শেখার স্কুল খুললেন—সেটাই নাকি প্রথম স্কুল। এবার আমরা গায়ক হিশেবে নাম পেয়ে গেলাম আরো অনেকের। আবদুল আহাদ আর হুসনা বানু খানমের নাম তো আগেই শুনেছি—নতুন করে পেলাম শাজাহান হাফিজ, আফসারী খানম, সুলতান আলম, হামিদুল হক এবং আরো অনেকের নাম। আমাদের কাছে তো এঁরা প্রায় সকলেই নাম, শুধু নাম। কিন্তু ইতিহাসের এই নামাবলি থেকেও একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : রবীন্দ্রসংগীত আর শুধু হিন্দুদের গান নয়, মুসলমানদেরও গান, আপামর বাঙালির গান।

ব্যাপারটা, বলাই বাহুল্য, মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না পাকিস্তানি কর্তাদের। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতিতে তো তাদের বিশ্বাস থাকার কথা নয়, তাই তারা রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুত্বের আবরণে ঢেকে রাখতে চায়, মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায় সেই সংস্পর্শ থেকে—ফলে আবদুল আহাদকে রবীন্দ্রসংগীত শেখাতে হয় রবীন্দ্রনাথের নাম গোপন করে। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বকে ডিঙিয়ে ইতিমধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা ধীরে-ধীরে দানা বাঁধছে পূর্বপাকিস্তানে, প্রধানত শহরকেন্দ্রিক হলেও তা কমবেশি ছুঁতে পারছে গ্রামকেও। বাহান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাতের কথা তো আমরা জানিই। ১৯৫৪-তে আওয়ামী লীগের জয়ে বোঝা গেল হাওয়াটা কোন দিকে বইতে শুরু করেছে।

এই পরিবেশেই পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘বুলবুল একাডেমী’। ভারতে এবং পরে পূর্বপাকিস্তানে বুলবুল চৌধুরীর ব্যক্তিগত শিল্পদক্ষতা ও তাঁর নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক মিশনের ইতিহাস তো কিংবদন্তি। সেই বুলবুল চৌধুরীর নামেই ‘বুলবুল একাডেমী’। একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই অবশ্য বুলবুল চৌধুরী মারা গেছেন। ‘বুলবুল একাডেমী’র কার্যক্রম ছিল বহুমুখী। এবং বুলবুল চৌধুরী নিজে যেহেতু নৃত্যশিল্পী ছিলেন, তাই তাঁর নামাঙ্কিত এই প্রতিষ্ঠানের একটা বড়ো কাজ যে নৃত্যকে কেন্দ্র করেই হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের চর্চায় ও প্রসারে ‘বুলবুল একাডেমী’র আগে আর কোনো সংগঠন এত ব্যাপক ও প্রবলভাবে কাজে নেমে পড়েনি। তাদেরই আহ্বানে ৫৬-তে শান্তিনিকেতন থেকে ‘শ্যামা’ নিয়ে এলেন শান্তিদেব ঘোষ।

ইতিমধ্যে আরো অনেককে পাচ্ছি। কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে এবং চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছিলেন কলিম শরাফী। কলকাতার গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে

নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন তিনি, সে তো আমরা জানি। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ পড়েছি 'স্মৃতি অমৃত' বইতে। সেই কলিম শরাফী যখন দেশভাগের পরে এখানে চলে এলেন, তখন পূর্ববাংলার রবীন্দ্রসংগীতের জগতে একটা অন্যমাত্রা যুক্ত হবে তা আশা করা অসংগত ছিল না। ঢাকার পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে কলিম শরাফীর প্রথম আবির্ভাব—তিনি গাইলেন 'আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে, যখন বৃষ্টি নামল'। ওয়াহিদুল হক লিখলেন, "একটি, একটি মাত্র গানে তিনি বাংলাদেশের সংগীতের মান ও মানচিত্রকে যেন দিলেন বদলে।" এছাড়াও পাই অরো অনেককে—মাহবুব হাসান, মালেকা আজিম, ফরিদা বারী, মনিমুন্নেসা, ফজলে নিজামী, মালকা পারভীন বানু—নামের যেন শেষ নেই। তাঁরা কেউ ঢাকার, কেউ এসেছেন মফস্বল থেকে। এবং অবশ্যই সন্‌জীদা খাতুন। যাঁকে ঘিরে শুরু হল অন্য এক যুগ।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে সন্‌জীদা যখন প্রতিষ্ঠা করলেন স্বল্পমেয়াদি ও ছোটো সংগঠন 'গীতালি' এবং পূর্বপাকিস্তানে প্রথম আয়োজন করলেন শারদোৎসবের, ততদিনে কিন্তু 'বুলবুল একাডেমী' বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। কলিম শরাফী স্থায়ীভাবে ঢাকায় এসে 'বুলবুল একাডেমী'তে যোগ দিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে এলেন ভক্তিময় দাশগুপ্ত। পরে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আতিকুল ইসলাম। শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ১৯৫৯-এর পাশ-করা ছাত্র আতিকুল।

'বুলবুল একাডেমী'র একটা বড়ো কাজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ স্থাপন। আরও ঠিক হবে বললে, পশ্চিমবঙ্গের গায়কদের নিয়ে আসা ঢাকায়। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য নিয়ে যে শান্তিদেব ঘোষ এসেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে, তার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। ১৯৫৬-৫৭-য় দেবব্রত বিশ্বাস ও সুচিত্রা মিত্র এসেছিলেন তাদেরই আমন্ত্রণে। পরে 'বুলবুল একাডেমী'র নিজেদের প্রযোজনায় 'শ্যামা' 'চণ্ডালিকা' 'চিত্রাঙ্গদা' সব আয়োজনই হয়েছে। পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীতের প্রসারের কাজ তো বটেই। বেশ কয়েকজন গায়ক বা সংগীতজ্ঞ বেরিয়েছেন এখান থেকে। আমরা শুনেছি কলিম শরাফীর ছাত্রী ছিলেন ফাহ্‌মিদা খাতুন। ভক্তিময় দাশগুপ্তের আনিসুর রহমান। তা ছাড়াও ছিলেন আরো অনেকে। 'বুলবুল একাডেমী'র এই ভূমিকা পরবর্তীকালেও অক্ষুণ্ণ ছিল। আতিকুল ইসলাম একাডেমীর রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষণের ভার কাঁধে তুলে নিয়ে মনে করেছিলেন : বড়ো শিল্পী তৈরি করাটা প্রধান নয়—উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তেরও বাইরে সাধারণ মানুষের কাছে রবীন্দ্রসংগীতকে পৌঁছে দেওয়াই কাজ। এই দায় মেনে নিয়েই আতিকুল ইসলাম ব্যস্ত থেকেছেন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত—যদিও জাহেদুর রহিম,

হামিদা হক, কাদেরী কিবরিয়া বা পাপিয়া সারোওয়ারের মতো গুণীরাও তাঁরই ছাত্র ছিলেন।

যাই হোক, দেশভাগের পরে প্রথম পর্বে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এটাই—মুসলমানদের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের প্রসার। কিন্তু তার বাইরে পূর্ববঙ্গের রবীন্দ্রসংগীতচর্চার আলাদা কোনো তাৎপর্য আছে কি? ওয়াহিদুল হক বলেছেন :

> একষট্টির আগে দুই দেশের রবীন্দ্রসংগীতের বড়ো কোনো তফাত ছিল না। ছোটো যে পার্থক্য ছিল তা হল পূর্ববঙ্গে নতুন সব মানুষ রবীন্দ্রসংগীত গাইছে, শুনছে।...বাঙাল—মানে প্রধানত পূর্ববঙ্গে মুসলমান বাঙালির জন্যে সবই নতুন, সবই তাজা। তাই অপক্ব কিন্তু সজীব।

ইতিমধ্যে সমাজ ও রাজনীতির হাওয়া পালটে যাচ্ছে, হয়তো প্রধানত শহর এবং শিক্ষিত নাগরিক মানুষের মধ্যেই, কিন্তু একটা দেশের পরিবর্তনের দিক থেকে তার গুরুত্বও তো কম নয়। ভাষা-আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা-আন্দোলন পর্যন্ত এই উত্তরণে, অন্তত বাংলাদেশে, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের ভূমিকা অপরিসীম। সংস্কারমুক্তি, সেকুলার ভাবনা, উদার মানবিকতা ইত্যাদি সবকিছুর প্রসারে রাজনীতিকে নির্ভর করতে হয় শিল্পসাহিত্য আর সংগীতনাটকের সক্রিয়তার ওপর। সবাই যে তা সবসময় স্বীকার করেন তা নাও হতে পারে, কিন্তু পেছনের দিকে তাকিয়ে সেটাই টের পাওয়া যায়। রবীন্দ্রসংগীতও সেদিক থেকে সমাজ ও রাজনীতির ওই পরিবর্তনে একটা প্রধান সূচক—নিয়ন্ত্রক না হোক, সমান্তরাল। এর যে কতখানি জোর ছিল, তা বোঝা যায় উলটো দিক থেকে। পাকিস্তানি শাসকদের কাছে, আমরা দেখেছি, প্রায় প্রথম থেকেই বড়ো শত্রু বলে গণ্য হয়েছে এই নবজাত বাঙালিয়ানা এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রসংগীত।

অন্য দিকে রবীন্দ্রসংগীতের এই প্রতীকী অবস্থানও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আত্মসচেতন বাঙালির কাছে—এই সংগীতের ভাষা তাদের আন্দোলনের ভাষা, আবেগের ভাষা, আত্মউন্মোচনের ভাষা। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের হাতিয়ার। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তাদের কাছে তাই সবচেয়ে জরুরি হয়ে উঠল আঘাত করা রবীন্দ্রসংগীতকে। সেই সত্যটাই স্পষ্ট হয়েছে ১৯৬১-তে। আগেই বলা হয়েছে, ১৯৬১ পর্যন্ত আসল ব্যাপার ছিল রবীন্দ্রসংগীতের চর্চার সূচনা ও প্রসার—"নতুন সব মানুষ রবীন্দ্রসংগীত গাইছে" এই ঘটনাটুকুই। তার যে গভীর তাৎপর্য তা তো রইলই।

কিন্তু প্রশ্ন এই : ১৯৬১-তে বড়ো ব্যাপার এমন কী ঘটল, যার ফলে রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকার এই মোড়ফেরা? ১৯৬১ থেকে নতুন পর্ব কেন? ৫৮-র পর থেকেই আইয়ুবের আমলে পাকিয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক সংঘর্ষ, ৬১-তে তা

আরো তীব্র হতেই পারে। কিন্তু আসল ঘটনা—১৯৬১-তে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ। এটাই একটা বড়ো উপলক্ষ হতে পারে একটা দেশের সাংস্কৃতিক উন্মোচন ও আত্মবিস্তারের। কীভাবে পূর্বপাকিস্তানে রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর উৎসব একটা মহৎ সংগ্রামের সূচনা হয়ে উঠল, তার ইতিহাস শোনাও রোমাঞ্চকর।

৩

১৯৬১-তে কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গে, হয়তো অল্পবিস্তর সারা ভারতেই, আমরা যখন মহা সমারোহে রবীন্দ্রশতবর্ষের উৎসব পালন করছি, তখন কিন্তু জানতামই না, আমাদের প্রতিবেশী দেশে সেই একই উপলক্ষ এর চেয়েও বেশি কোনো তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। রবীন্দ্রশতবর্ষ পালনের আয়োজনের গোড়া থেকেই পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা ভ্রুকুটি করেছিল, কারণ আমরা তো জানি, পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়া থেকেই 'হিন্দু কবি' রবীন্দ্রনাথ তাদের চক্ষুশূল। রেডিওতে শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তের গানও গাইতে হয় অনেক সময়, কার গান তা গোপন করে। অথচ, তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কীভাবে মানুষের মনে গিয়ে পৌঁছোয় তা বিস্ময়ের। সরকারি অপছন্দকে অগ্রাহ্য করেই আয়োজন তবু চলতেই থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবের বাড়িতে ছোটোখাটো সভা হয়। বিচারপতি মাহবুব মুর্শেদকে সভাপতি এবং অধ্যাপক খান সারওয়ার মুর্শেদকে সম্পাদক করে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের কমিটি তৈরি হয়। খুব মাথাভারী সংগঠন পাকিস্তানি কর্তাদের ভড়কে দেওয়ার জন্য। আসল কাজ তো করবে ঢাকার সংস্কৃতিকর্মীরা। কোনো ব্যক্তি, কোনো দল বাদ নেই—সকলে এসে যোগ দিলেন। সাংস্কৃতিক ঐক্যের একটা সমুজ্জ্বল চেহারা পাওয়া গেল। আবদুল আহাদ, 'বুলবুল একাডেমী'র আহমদ হোসেন এবং আরো অনেকের নাম শুনি পরিচালক হিশেবে। কিন্তু এগারো দিন ধরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে একনাগাড়ে যে-অনুষ্ঠান হল, তার পেছনে ছিলেন ভক্তিময় দাশগুপ্ত আর আতিকুল ইসলাম।

এগারো দিনের অনুষ্ঠানের সূচিটা হাতে পেলে খুব ভালো লাগত। আমাদের এখানে পার্কসার্কাস ময়দানের সূচির সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখাও যেত। শুধু বিবরণীতে পড়ি : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনের ভেতরে গাদাগাদি করে বসলে হাজার বারো শো লোক ধরে। বাইরে নাকি আরো হাজার চার-পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকত। আরো পড়ি : সেই একটানা এগারো দিনের অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়েছে সাড়ে তিনশো গান, অভিনীত হয়েছে চারটি নাটক এবং তিনটি নৃত্যনাট্য।

তা ছাড়া আলোচনাসভা, আবৃত্তি-অনুষ্ঠান, রবীন্দ্রচিত্রপ্রদর্শনী ইত্যাদি তো ছিলই। গান গেয়েছেন প্রায় একশো শিল্পী, কোরাসে গলা মিলিয়েছেন একসঙ্গে সত্তর জন। এরকম একটা অনুষ্ঠান যে হতে পারল তা বিস্ময়কর। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় বিরূপতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এবং সে-কারণেই এটা আর নিছক একটা আনন্দ-অনুষ্ঠান হয়ে থাকেনি—যে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ পাকিস্তানের সামরিক শাসনের পর্বে আসন্ন হয়ে উঠছে, তারই মুখবন্ধ। তুলনায় সরকারি দাক্ষিণ্যে পুষ্ট কলকাতার জন্মোৎসব, যতই সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত হোক, বোধহয় আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া কিছুই নয়। ওয়াহিদুল হকের লেখায় পড়ি, ভক্তিময় দাশগুপ্ত আর আতিকুল ইসলাম ছাড়া, নাম না থাকলেও এগারো দিনের এই অনুষ্ঠানের যে-কর্মযজ্ঞ তার পেছনে ছিলেন সন্‌জীদা খাতুন—"প্রথমে তাঁর ডাক পড়েনি, শেষেও বুঝি না, তবু যখন দেখলেন এ বিরাট যাত্রায় তরী টালমাটাল, ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষা করলেন সন্‌জীদা খাতুন।"

কী ফলাফল এই উৎসবের? সন্‌জীদা খাতুনই জানান একটি প্রবন্ধে, "রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর সফল উদ্যোগ সংস্কৃতিপ্রাণ মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস এনে দিল।" ওয়াহিদুল হকের ভাষায় : "বাংলাদেশ এক লাফে যেন কোথায় চলে গেল।" শুধু ঢাকার নয়, আরো অনেক জেলা বা মহকুমা শহরের শতবার্ষিকী এক ধাক্কায় বাংলাদেশের অনেক মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীতকে পৌঁছে দিল। ব্যাপকভাবে শুরু হল রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া, গান শোনা। অন্যদিকে, বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীতচর্চা অন্য এক ধরণের পরিণতি পেল—রবীন্দ্রসংগীতের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হল। কিন্তু, সবচেয়ে বড়ো কথা, দেশের রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক বাস্তবের সঙ্গে এমন একটা গভীর সম্পর্ক তৈরি হল, যার ফলে একদিকে সেই রাজনৈতিক সচেতনতা ও সংগ্রাম যেমন আলাদা এক মাত্রা পেল, তেমনি অন্যদিকে রবীন্দ্রসংগীতও সমৃদ্ধ হল অন্য এক তাৎপর্যে।

আরো খুচরো লাভ নিশ্চয় হয়েছিল—যেমন, সংগীত-উপস্থাপনার রুচি ও সাংগঠনিক কাজকর্মের তৎপরতা, কিংবা নতুন-নতুন শিল্পীর আবির্ভাব। বিশেষ করে বলতে হয়, জাহেদুর রহিম ওই উৎসবে শ্রেষ্ঠ গায়ক হিশেবে গণ্য হয়েছিলেন। এ সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী হিশেবে জাহেদুর রহিম ও ফাহ্‌মিদা খাতুনের কথা বলেছেন অনেকেই।

৪

তবে শতবার্ষিকীর সবচেয়ে বড়ো অবদান বোধহয় 'ছায়ানট' নামের প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। হয়তো সমান্তরালভাবে 'ঐকতান'-এর কথাও উঠবে—ফারুকুল ইসলামের

'ঐকতান', যার সঙ্গে ভাই আতিকুল ইসলামও একসময়ে জড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু, শৈল্পিক কৃতিত্বে তো বটেই, সামাজিক দায় পালনের কারণেও ছায়ানট-এর গুরুত্ব অনেক বেশি। শতবার্ষিকীর পরে-পরেই ওই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন উদ্যোগী নবলব্ধ আত্মবিশ্বাসকে হারাতে চাইলেন না। তাঁরা জয়দেবপুরের বনভোজনে মিলিত হয়ে ঠিক করলেন, স্থায়ী সংগঠন গড়বেন। আর এইভাবেই জন্ম হল 'ছায়ানট'-এর, ১৯৬২-তে। সুফিয়া কামাল, সাঈদুল হাসান, মোখলেসুর রহমান, ফরিদা হাসান, সাইফুদ্দীন আহমেদ, মীজানুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, সন্‌জীদা খাতুন এবং আরো অনেকের 'ছায়ানট'। ক্রমশই বড়ো হতে থাকা এই সংগঠনে বিভিন্ন পর্বে আরো অনেক গায়ক, সংগীতজ্ঞ, সংগঠক এসেছেন—সব মিলিয়ে সে এক ইতিহাস।

কিছুকাল আগে 'বুলবুল একাডেমী' প্রতিষ্ঠিত হয়ে তখনও কাজ করে যাচ্ছিল—শতবার্ষিকীর সময় তো বটেই। কিন্তু 'বুলবুল একাডেমী'র সঙ্গে 'ছায়ানট'-এর তফাতটা টের পাওয়া গেল প্রথম থেকেই। 'বুলবুল একাডেমী' সংগীতের অনুশীলনে ও প্রচারে অসামান্য ভূমিকা পালন করে গেছে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের সমাজ ও রাজনীতির পটটা এতই পালটে গেল যে শুধু সেইটুকু কাজ করেই যেন চরিতার্থতা নেই। আন্দোলনে ও সংগ্রামে মুখর হয়ে উঠল সময়। 'ছায়ানট' সেই পরিবর্তিত সময়ের সংগঠন। তাকে তাই আরো বেশি দেশসচেতন কালসচেতন হতেই হয়েছে।

'ছায়ানট', 'বুলবুল একাডেমী'র মতো, শুধু রবীন্দ্রসংগীতের প্রতিষ্ঠান নয় কিন্তু। বস্তুত 'ছায়ানট'-এর কাজ শুরুই হয়েছিল পুরোনো বাংলাগানের চর্চা দিয়ে। তার সঙ্গে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। প্রধানত রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সংগীতের পরম্পরা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা গোড়া থেকেই ছিল।

'ছায়ানট' ১৯৬২-তে প্রতিষ্ঠিত হলেও, আসল কাজ শুরু হয় ১৯৬৩-তে সংগীত বিদ্যালয় পত্তনের মধ্য দিয়ে। 'ছায়ানট'-এর উদ্যোগে রমনার বটমূলে পয়লা বৈশাখের উৎসব আশ্চর্য জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এ ছাড়াও নানা উপলক্ষে নানা উৎসব তো আছেই। বসন্ত-উৎসব, শারদোৎসব, বর্ষামঙ্গল। মৌলবাদীদের মুখে হিঁদুয়ানির অভিযোগ উঠবে, সে তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ১৯৬২-র প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অর্থসংগ্রহ, ১৯৬৪-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় সাধ্যমতো প্রতিরোধ, ১৯৬৫-র যুদ্ধের সময়ে বাইশে শ্রাবণের কথা মনে রেখে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে সদলবল যাওয়া, ১৯৬৭-র নিষেধাজ্ঞার আবহাওয়ায় রবীন্দ্রমৃত্যুবার্ষিকী পালন—এই সব কিছুর মধ্যেই যে-চেতনা কাজ করছিল, সেটাই 'ছায়ানট'-এর নিজস্ব। ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের

সময় যখন বেতার-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া বন্ধ, তখনও 'ছায়ানট'-এর শিল্পী একক ও দলবদ্ধভাবে গেয়ে গেছেন যেখানেই ডাক পড়েছে।

দেশ ও কাল সম্পর্কে এই দায় 'ছায়ানট'-এর ওপর বর্তেছিল বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে, সংগীতের নান্দনিক দিক বা রুচির দিক সম্পর্কে তাদের অবহেলা বা অসতর্কতা ছিল। ঠিক উলটো। শুদ্ধভাবে গাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই গানের পরিবেশনের যে-পরিকল্পনার দিক—তা সে মঞ্চ-সাজানো, গায়কদের বসার পদ্ধতি ও ভঙ্গি, যন্ত্রানুষঙ্গের বন্দোবস্ত, প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ রচনা বা এমনকী আমন্ত্রণলিপি ছাপানো—তার সবকিছুতেই বুদ্ধি ও রুচির ব্যবহার লক্ষ করবার মতো। 'ছায়ানট'-আয়োজিত 'শ্রোতার আসর' তো প্রায় গল্পকথা। শিল্পের দায় এবং সময়ের দায়, এই বিপরীতকে মেলানোর লক্ষ্য রেখে কোনো সংগীতপ্রতিষ্ঠান যে এগোতে চাইছে, সেটাই একটা অতুলনীয় ব্যাপার।

'ছায়ানট'-এর কর্মকাণ্ডের সাফল্যের একটা স্পষ্ট প্রমাণ—বিভিন্ন পর্বে শাসকশক্তির বিরুদ্ধতা ও ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। সরকারি আর্থিক সাহায্যের প্রার্থী না হয়েও নির্দেশ এসেছে আয়ব্যয়ের হিশেব দাখিল করার কিংবা সহ্য করতে হয়েছে গোয়েন্দা বিভাগের খবরদারি। 'ছায়ানট'-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে রেডিও-টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটিকে অপদস্থ করার বা ভেঙে দেওয়ার। কিন্তু সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে 'ছায়ানট' শুধু অটুট থেকেছে তাই নয়, ক্রমশই জনপ্রিয় হয়েছে, পূর্ববাংলার বাঙালি-মানসে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

•

১৯৬৭-র নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটা একটু বিস্তৃত করে বলা দরকার—কেননা এর মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে সংঘাত সেখানে তুঙ্গে উঠেছিল। আমরা জানি, ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় থেকেই তো রবীন্দ্রসংগীতের ওপর খড়্গ নেমে এসেছে। গ্রামোফোন-ডিস্কও এর আগে যে দু-একটা বেরোচ্ছিল, বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৬৭-র ২৩ জুন পাকিস্তানের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন ফতোয়া দিলেন : "পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রসংগীত।" ২৪ জুন তা খবরের কাগজে ছাপা হল। পরদিন ২৫ জুন এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে উনিশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিলেন। স্বাক্ষর ছিল মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদিন থেকে শুরু করে মুনীর চৌধুরী, সিকানদার আবু জাফর, আহমদ শরীফ, নীলিমা ইব্রাহিম, শামসুর রাহমান, আনিসুজ্জামান, শহীদুল্লাহ কায়সার পর্যন্ত অনেকের। তাতে বলা হল :

সরকারি মাধ্যম হতে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার হ্রাস বা বর্জনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি।...তাঁর সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা আর তীক্ষ্ণতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে।

শুধু ঢাকায় নয়, এই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল চট্টগ্রামে, রাজশাহীতে, খুলনায়, দেশের সর্বত্র। শুধু ব্যক্তি নয়, প্রতিক্রিয়া টের পাওয়া গেল পূর্বপাকিস্তানের সমস্ত সাংস্কৃতিক ও সাংগীতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে—'বুলবুল একাডেমী', 'ছায়ানট', 'ক্রান্তি', 'সৃজনী', 'ঐকতান', 'স্পন্দন' সবার মধ্যে। সকলের প্রতিবাদকে সংহত করে গঠিত হল সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ কমিটি। নাগরিক সমাবেশ, বিক্ষোভ, মিছিল ইত্যাদি চলতে থাকল। সবাই একদিকে ছিল এরকম মনে করলেও ভুল হবে। পাকিস্তানের এই রবীন্দ্রসংগীত-বিরোধিতাকে সমর্থন করবার লোকেরও অভাব হল না। বের হল পালটা মানুষ বা সংস্থার পালটা বিবৃতি। সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন বিষিয়ে উঠতে থাকল।

এই প্রতিকূলতার মধ্যেই ১৯৬৭-র বাইশে শ্রাবণ পালিত হল ঢাকায়। এই আয়োজনটাও ছিল একটা প্রতিবাদ, রবীন্দ্রবিরোধীদের মুখের উপর জবাব। তিনদিন ধরে অনুষ্ঠান চলেছিল সেই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনেই, যেখানে শতবার্ষিকীর ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান হয়েছিল। 'ছায়ানট', 'বুলবুল একাডেমী' বা 'ঐকতান'-এর শিল্পীদের গান, কবিতাপাঠের আসর, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য—সব মিলিয়ে উৎসাহে ভরপুর। এই ব্যাপক উদ্দীপনার কারণে সরকার পরিস্থিতিটা মেনে নিতে বাধ্য হল ঠিকই, কিন্তু নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেনি তারা কখনোই। আর সাতষট্টির ওই আন্দোলন সংস্কৃতিকর্মীদের জোগাল অফুরন্ত বল ও আত্মবিশ্বাস।

সাতষট্টির ঝড় চূড়ান্ত রূপ নিল ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে। শুধু রাজনীতির দিক থেকে নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও দুই প্রবল প্রতিপক্ষ মুখোমুখি। রাজনীতির সর্বমান্য নেতারাও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গুরুত্বটা বুঝতে পারছেন এবং এমনকী রবীন্দ্রসংগীতের মর্যাদার কথা বলছেন কমবেশি। আর এটা তো ঠিক, আঘাতটা যত না রবীন্দ্রনাথের উপর, তার চেয়ে বেশি রবীন্দ্রসংগীতের বিরুদ্ধে। তাই ফতোয়াটা হয়ে দাঁড়ায়—রবীন্দ্রবর্জন নয়, রবীন্দ্রসংগীত বর্জন। কারণ শাসক-শক্তি ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছে রবীন্দ্রসংগীতের প্রসারের মধ্য দিয়েই ধর্মীয় মৌলবাদের যে-তত্ত্ব তারা লালন করছে তার সর্বনাশ, এই সংগীতই কোনো আগল না-রেখে উদার মনুষ্যত্বকে পৌঁছে দেবে আপামর মানুষের হৃদয়ে ও মগজে।

ওয়াহিদুল হক বলেছিলেন, "সাতষট্টির আন্দোলনের সবচাইতে স্থায়ী ফসল 'আমার সোনার বাংলা' গানটির যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা।" আর যত দিন যাচ্ছে, রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও গণ-অভ্যুত্থান প্রবল হয়ে উঠছে, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ সংহত হচ্ছে, ততই বিভিন্ন সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে ওই গানটি গাওয়া যেন অনিবার্য হয়ে উঠছে। সত্তরের শুরুতে, তখন ইয়াহিয়ার আমল, 'আমার সোনার বাংলা' গানটি নিয়ে গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরি হল—"কলিম শরাফীর ব্যবস্থাপনায়, আবদুল আহাদের পরিচালনায়, সন্‌জীদা খাতুনের বাসায় তাঁরই যত্ন-আত্তিতে খাটুনিতে তৈরি"। সম্মেলক গানটিতে অংশ নিয়েছিলেন জাহেদুর রহিম, অজিত রায়, ইকবাল আহমদ, ফাহ্‌মিদা খাতুন, জাহানারা ইসলাম, হামিদা আতিক, নাসরীন চৌধুরী এবং আরো কেউ-কেউ। সর্বত্র বাজতে থাকে এই গান—স্বাধীনতা অর্জনের আগে পর্যন্ত সর্বত্র। ১৯৭১-এ ওয়াহিদুল হক, আতিকুল ইসলাম প্রমুখ তৈরি করেছিলেন 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ'—তাঁদেরও গলায় ছিল সবসময় 'আমার সোনার বাংলা'। ছাত্ররা তো এই আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকায়—তারা তোলপাড় ইকবাল আহমেদের রবীন্দ্রসংগীতে। ইকবাল তো তাদেরই একজন। তাদেরও আবেগ 'আমার সোনার বাংলা' নিয়ে উত্তাল। এর পর ১৯৭১-এ সত্যিই যখন স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল, তখন কাউকে বাছাই করতে হয়নি, কোনো মতভেদ-মতান্তর হয়নি, অপ্রতিরোধ্যভাবেই যেন এই নির্বাচন উঠে এল—বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা'।

স্বাধীনতার লড়াই যখন শুরু হল, তখনও রবীন্দ্রসংগীত কীভাবে সেখানকার বহু মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়েই ছিল তা লক্ষ করবার মতো। ওই লড়াইয়ের তিনটে ছবি আমাদের কাছে আজ স্পষ্ট—দেশের ভেতরে থেকে লড়াই ; সীমান্ত এলাকায় ঘাঁটি করে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার লড়াই ; এবং ভারতে বা পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী হিশেবে থেকেও যেটুকু দায় তার পালন—অনেকের কাছে সেও তো একরকম লড়াই-ই। বিদেশের মাটিতে যাঁরা বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় এই পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের অনেকেরই অস্ত্র ছিল রবীন্দ্রসংগীত। গানের যে অজস্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁরা এদেশের মানুষের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তার প্রধান সূচি ছিল রবীন্দ্রনাথের গানকে ঘিরেই। কিন্তু, জানতে পেরে বিস্মিত হই, যাঁরা গেরিলা থেকে সম্মুখ-যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরও কারো-কারো সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল এই রবীন্দ্রসংগীত। আলংকারিক অর্থে নয়, একেবারে খাঁটি বাস্তব-অর্থে। ওয়াহিদুল হক যে বলেছিলেন, "এই ঘোর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ডামাডোলে রবীন্দ্রসংগীত তার অষ্টাদশ মূর্তি নিয়েই যেন সংগ্রামের গানে পরিণত—মারমুখী মানুষ, কিন্তু কণ্ঠে তার রবীন্দ্রসংগীত"—সেটাই যেন অন্য মানে পেয়ে

যায় যখন মুক্তিযুদ্ধের বিবরণী থেকে জানতে পারি, একেবারে প্রথম পর্যায়ে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স-এর প্রত্যাঘাত হানার মুহূর্তটি স্থির করা হয়েছিল রবীন্দ্রসংগীতের একটি কলি ব্যবহার করে—'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান'। কিংবা যখন মাহবুব আলমের 'গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে' এই দু-খণ্ডের বৃহদাকার বইটির পাতা ওলটাই। সে-বইয়েরই এলোমেলো কিছু উদ্ধৃতি দিই দিনাজপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক গেরিলা কমান্ডারের "প্রতিদিনের যুদ্ধকথা"র দিনলিপি থেকে।

১. আমরা ক-জন যুবক স্থির তাকিয়ে আছি মাটিতে আঁকা বুধন মেম্বারের বাড়িসহ তার আশেপাশে চিহ্নিত শত্রুবাহিনীর অবস্থানের দিকে।...এইসময় হঠাৎ করে কে যেন গেয়ে উঠল, 'আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো'—সম্বিৎ ফিরে পেতেই দেখলাম, পিন্টু ভরাট গলায় গান ধরেছে। তার সেই গানের সুরে মুহূর্তে সরব করে তোলে পরিবেশ। (১ম খণ্ড, পৃ ৯৪)

২. মাঝবয়েসী গায়ক ভদ্রলোক আমাদের সমাদরে বসান মেঝেয় পেতে রাখা মাদুরের ওপর। দুলু বলে, ওস্তাদ গান শুনব, এনাদের ধরে এনেছি সরাসরি যুদ্ধের মাঠ থেকে।...তিনি আমাদের দিকে তাকান, বলুন কী শুনবেন? সংগীতরসিক পিণ্টু ঝটপট বলে, রবীন্দ্রসংগীত, আপনার যা খুশি। ওস্তাদ তাঁর তানপুরাটা অতিযত্নে টেনে নেন কোলের ওপর। তারপর তাঁর ভরাট সুরেলা গলায় গান ধরেন, 'তুই ফেলে এসেছিস কারে মন, মনরে আমার'। (১, পৃ ২৫৬-৫৭)

৩. নালাগঞ্জের খালের পাশে একাকী বসে সীমান্তের ওপারে ধাবমান মানুষের ঢল দেখে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল মন। পিণ্টুর উদাত্ত গলায় গান—'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী, ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে...'। (১, পৃ ২৯০)

৪. গাঁও-গেরামের খেটে-খাওয়া পরিবারের ছেলে সদস্যদের নিয়ে গড়ে তোলা আমাদের মুক্তিবাহিনী।...নির্দেশ পাওয়া মাত্র ৮-১০ জন ঝাঁপিয়ে পড়ে খেতের মধ্যে।...চাঁদের আলো-আঁধারির ভেতরে আমরা রাস্তার ওপর প্রায় নুয়ে পড়া বাঁশঝাড়ের নীচে বসে থাকি। বিড়ি টানি। গল্প বলি। পিণ্টু-দুলুর গলা মেশানো রবীন্দ্রসংগীত শুনি। সময় বহতা নদীর মতো দ্রুত এগিয়ে যায়। কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না। কেবল অন্ধকারে দুজনের হাত কেটে যায় কাঁচির আঘাতে। (১, পৃ ৩৩৫)

৫. প্রায় চার মাস পর আবার সেই আমাইদিঘিতে এসেছি।...সবাই জানতে চায় যুদ্ধ সম্পর্কে। চায় শুনতে অপারেশনের গল্প।...অফিসিয়ালি ছুটি নিয়ে এসেছি, এখন যুদ্ধ নেই, দায় নেই, দায়িত্ব নেই, নির্ভার মুক্ত লাগছে এখন নিজেকে।...অতএব আমাইদিঘি থেকে শিলিগুড়ি, সেখান থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুরের উদ্দেশে গাড়ি ধরি।...মনের গভীর থেকে ভেসে আসে ভালোলাগার এক অনাবিল অনুভূতি। এই অবস্থায় দুলু গান ধরে, 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' ওর গানের সাথে গলা মেলাই আমরা। সারাটা পথ কেটে যায় একই গানের কলি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে গাইতে। (২, পৃ ৩৭-৩৮)

৬. পাকবাহিনী কাল আসতে পারে। যদি না আসে দু-একদিনের মধ্যে আসবেই।...দেখা যাক কী হয়। আমরা সোনারবানের আশেপাশেই থাকব। ওরা সোনারবানের দিকে আসতে চাইলে আবার যুদ্ধ বাঁধবে ওদের সাথে। আজকের মতোই আমরা প্রতিহত করব ওদের আবার। সোনাবানে ওরা ঢুকতেই পারবে না কোনোদিনই। পিন্টু গুনগুনিয়ে গান গাইছে। তার সেই প্রিয় গান, আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো।... (২, পৃ ৭৫)

৭. প্রস্তাবটা কানে যেতেই সপ্রতিভ পিন্টু যেন কিছুটা লজ্জারাঙা হয়ে যায়।... তারপর বলে, আমি তো রাস্তার গায়ক। খোলা আকাশের নীচে ছাড়া তো আমার গান গলা থেকে বেরোয় না। কী গান গাইব বলেন?...উৎসাহ পেয়ে ও তখন গান ধরে, 'খোলো খোলো দ্বার।' পিন্টুর দরাজ গলার গান ভেসে বেড়ায় বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন এই নিভৃত পল্লীর আকাশ বাতাস জুড়ে। রণাঙ্গন এখান থেকে অনেক দূরে। সবকিছু হারিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে আসা একদল ভেঙেপড়া মানুষের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে বসে পিন্টু গান গেয়ে চলে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে। সবাই বসে থাকে নীরবে। তন্ময় হয়ে শোনে তার গান। (২, পৃ ৩১৮)

৮. মুক্তিবাহিনীর অবস্থান নদীর এপারে থাকলেও, তাদের তো ভয় নেই। মুক্তিবাহিনী এসেছে তাদের মুক্তি দিতে। তারা রাজাকার নয়, পাকবাহিনীও নয়। তাই তারা নিঃশঙ্কচিত্ত, ভয়হীন। পাশ ফিরে দেখি, পিন্টুর চোখে মুগ্ধতার আবেশ। গুনগুন করে সে গান গেয়ে যায় অনেকটা আপনমনেই, ও আমার দেশের মাটি...। আর আমি আমার নোট বইটা বের করে নদীর তীরে বসে দেখা এই চমৎকার ছবিটা ধরে রাখি এইভাবে। (২, পৃ ৫৫৩)

নিশ্চয়ই এটা সর্বাঙ্গীণ অভিজ্ঞতা নয়, সব গেরিলা বাহিনীতেই পিণ্টু-দুলু ছিল না—কিন্তু একটি ক্ষেত্রেও তো অন্তত এরকম ঘটেছিল, যেখানে উৎসাহী গায়কের গানে সহযোদ্ধারা, যুদ্ধের সময় গ্রামের বিহ্বল মানুষেরা অনুপ্রেরণা পেয়েছে। এই যুদ্ধেই আর অন্য কোথাও এরকম ঘটেনি, তা-ই বা বলি কী করে? সব দলে তো মাহবুব আলমও ছিলেন না ছবি ধরে রাখার জন্য।

৫

স্বাধীনতা-লাভের পর প্রথম কয়েকটা বছর অস্থির ও অনিশ্চিতভাবে দিনগুলি কাটছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী স্বাভাবিক উৎসাহে বাংলাদেশে সফরে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সফর। তিনি অবশ্য দেশের টানে শুধু বেড়াতেই যাননি, বেশ কিছুকাল ছিলেন সেখানে এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছেন অনেককে—যেটা স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীতকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে বলে অনেকেই মনে করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চার সংগঠনগুলির কোনো-কোনোটি নতুন উদ্যমে ও পরিকল্পনায় কাজ শুরু করেছিল। তার মধ্যে অবশ্যই 'ছায়ানট' প্রধান। তাদের গানের স্কুল বা বিদ্যায়তনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে। দেশীয় সংস্কৃতির চর্চার তাগিদে লোকসংগীতের বিভাগ খোলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ রজনীকান্ত ও নজরুলের গান তো ছিলই, এবার সেই সঙ্গে লোকসংগীত। খুবই সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রম এবং সেই সঙ্গে ছিলেন যোগ্য শিক্ষকেরা। স্বাধীনতার পরে কলিম শরাফী রবীন্দ্রসংগীত বিভাগে কিছুদিন গান শিখিয়েছেন। 'ছায়ানট'-এর প্রাক্তন ছাত্ররাও পরে এখানে শিক্ষকতা করেছেন এবং এর প্রশাসনিক কাজে যুক্ত থেকেছেন। সব মিলিয়ে বেশ একটা ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে। আবদুল আহাদের মতো প্রবীণ ব্যক্তিরাও 'ছায়ানট'-এর সঙ্গে বরাবর যুক্ত থেকেছেন। আবার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে জাহেদুর রহিমের মতো নবীনেরা। তা ছাড়া ওয়াহিদুল হক এবং সন্‌জীদা খাতুন তো 'ছায়ানট'-এর মূল প্রেরণা বটেই।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালেও 'ছায়ানট'-এর কৃতির যেন শেষ নেই। রবীন্দ্রসংগীতের পাশে-পাশে সব ধরণের গানের চর্চা—তা সে উচ্চাঙ্গ সংগীত, যন্ত্রসংগীত যাই ধরি না কেন। একাধিক রবীন্দ্র-গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য প্রযোজিত হয়েছে। এপার বাংলার যেসব শিল্পীরা বাংলাদেশে গিয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই ছিলেন 'ছায়ানট'-এর আমন্ত্রিত। ১৯৭৫-এ 'প্রিয় গান' নিয়ে বলার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ওপার

বাংলার শামসুর রাহমান এবং এপার বাংলার শঙ্খ ঘোষ। ১৯৭৪-এ 'সংস্কৃতি : উনিশ শো চুয়াত্তর' শিরোনামে সেমিনার আয়োজিত হয়েছে। বইতে ছাপা হয়েছে। সে-বছরই পঁচিশে বৈশাখে ঢাকার সংগঠন-নিরপেক্ষভাবে প্রায় সব রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী শিলাইদহে গিয়ে অনুষ্ঠান করলেন—শিল্পবোধের সঙ্গে ঐক্য ও সৌহার্দ্য বোধের মিলন সম্ভব হল।

কিন্তু ঠিক এর পরপরই রবীন্দ্রসংগীতের জগতে দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। আতিকুল ইসলাম ও জাহেদুর রহিমের মৃত্যু। ১৯৭৫-এর দেশব্যাপী রাজনৈতিক দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়েই যেন ঘটল। মুজিবুর-হত্যার সঙ্গে-সঙ্গে দেশের যে পট-পরিবর্তন হয়েছিল, তাতে ধীরে-ধীরে মৌলবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, আবার প্রশ্ন উঠছে রবীন্দ্রসংগীতের 'হিন্দুত্ব' নিয়ে। একটু থমকে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকর্মীরাই এবার অন্য একটি হাতিয়ার নিয়ে প্রতিবাদী হলেন। সেই প্রতিবাদের নাম 'জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন'।

১৯৭৫-এ জাহেদুর রহিমের মৃত্যু। ১৯৮০-তে তাঁরই স্মৃতিতে তৈরি হল 'জাহেদুর রহিম স্মৃতি পরিষদ্'। পরিষদের প্রধান কর্মসূচি ছিল রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা। প্রথমে সেই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছিল ঢাকাকে কেন্দ্র করে। পরের বছর ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীকে কেন্দ্র করে। ১৯৮১-র ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কেন্দ্র মিলনায়তনে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা ও সম্মেলন। এইভাবেই তৈরি হল স্থায়ী সংগঠন 'জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ্'।

প্রথম বছর থেকেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের রবীন্দ্রসংগীতের সমস্ত মানুষজন। কলিম শরাফী তো ছিলেনই—তিনিই 'জাহেদুর রহিম স্মৃতি পরিষদে'র আহ্বায়ক। ভাবনার এবং মতামতের বিনিময়ের কথা জোর দিয়ে বললেন তিনি সম্মেলনে। রবীন্দ্রসংগীত-চর্চা নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করলেন সন্‌জীদা খাতুন। সংবর্ধনা জানানো হল কুমিল্লার প্রবীণ রবীন্দ্রসংগীত-সাধক পরিমল দত্তকে। দু-দিন ধরে সম্মেলনে গাইলেন : ঢাকা-র আফসারী খানম, মালেকা আজিম খান, হামিদা হক, জাহানারা ইসলাম, অনুপ ভট্টাচার্য, মাহমুদা খাতুন, নাসরীন শামস, নায়লা খান, আজিম সিদ্দিকী, অজিত রায়, ইফ্‌ফাত আরা খান ; খুলনা-র সাধন সরকার, দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, আকরাম হোসেন ; ময়মনসিংহ-র সুমিতা নাহা, ফাহ্‌মিদা খাতুন ; চট্টগ্রামের আইরিন সাহা, বিলকিস বানু, মিহিরকুমার নন্দী ; রাজশাহীর শামসুজ্জামান, আবদুল খালেক। পরিমল দত্ত আর আবদুল আহাদ, কলিম শরাফী

আর ওয়াহিদুল হক আর সন্‌জীদা খাতুন তো ছিলেনই। দীর্ঘ এই তালিকাটি উদ্ধৃত করা হল, কারণ এই সম্মেলনের আয়োজন যে প্রথম থেকেই কতদূর ছড়ানো তা আন্দাজ করতে পারা যাবে।

রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছিল, তার মূল কথাই ছিল, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা ও প্রসারের বাধাগুলো দূর করা এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বেরিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ যে সমগ্র বাঙালি জাতির কবি তা অনুভব করা।

দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সম্মেলন প্রত্যেকটিই হয়েছিল ঢাকা শহরে—যথাক্রমে ১৯৮২, ৮৩ এবং ৮৪-র জানুয়ারিতে। শিল্পসংস্কৃতির বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন একে-একে যুক্ত হয়ে পড়েছেন এর সঙ্গে। ঢাকার—ঢাকার কেন বাইরেরও—নাটকের দল, আবৃত্তির দল, গানের দল সকলেই হাজির এক মঞ্চে। ক্রমশ এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের সংস্কৃতির জগতের প্রায় সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। পঞ্চম সম্মেলন থেকে জায়গারও বদল হল—আর শুধু ঢাকা নয়, বাইরেও হবে এক-একবার। এর পর থেকে তাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেল, কোনো বছর ঢাকায় হলে পরের বছর হয় বাংলাদেশের অন্য কোনো শহরে। এইভাবেই ১৯৮৫-তে চট্টগ্রামে, ১৯৮৭-তে খুলনায়, ১৯৯০-এ বরিশালে, ১৯৯২-এ সিলেটে এবং ১৯৯৪-তে কুষ্টিয়ায় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রতিযোগিতাটাই একটা বড়ো ব্যাপার। এর মধ্য দিয়েই 'রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন পরিষদে'র আন্দোলন—আন্দোলনই তো বলব একে—বিস্তৃত হয়ে পড়ল সারা দেশে। প্রথমে জেলাওয়ারি প্রতিযোগিতা এবং তারপর সফলদের নিয়ে চূড়ান্ত কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা। এর নিয়মাবলি তৈরি হল এবং গঠনতন্ত্র। প্রতিযোগিতার সঙ্গে-সঙ্গে প্রশিক্ষণ-শিবিরের ব্যবস্থা হল অন্তত চারটি জায়গায়—বরিশাল, যশোর, কুষ্টিয়া এবং সিলেটে। ওয়াহিদুল হক তার পরিচালনার ভার নিলেন।

'জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন' থেকে প্রতি বছর একটি বই বেরোয়—'সংগীত সংস্কৃতি' এই নামে। আকারে ছোটো—কিন্তু পরিকল্পনায়, সম্পাদনায়, অঙ্গসজ্জায় এবং অন্তর্গত লেখাগুলোর বিষয়গুণে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র এবং অনন্য। সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত এবং সেই সূত্রে সংস্কৃতির নানা বিষয় নিয়ে কত যে লেখা বেরিয়েছে 'সংগীত সংস্কৃতি'-তে তা বলার নয়। শুধু গান নয়, সেই গানের সঙ্গে জড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কত জিজ্ঞাসা ও অনুভব—দীর্ঘ তার লেখকতালিকা আর বিষয়তালিকা। রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনের বিভিন্ন জেলা পরিষদের কার্যবিবরণী, সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচি বা প্রতিযোগিতার ফলাফল ইত্যাদির খোঁজ তো পাওয়া

যাবেই—সেই সঙ্গে কোনোবার হয়তো বেরোল প্রাণের আলোকে রবীন্দ্রসংগীতের বিচার নিয়ে আবু জাফর শামসুদ্দিনের প্রবন্ধ, কোনোবার সমকালের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক নিয়ে ওয়াহিদুল হক, কিংবা বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীতের গতিপ্রকৃতি নিয়ে মুক্তি মজমদারের "কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা", আজকের সামাজিক পটে রবীন্দ্রনাথের স্থান সম্পর্কে আলী আনোয়ার, আধুনিক মানসে রবীন্দ্রসংগীতের স্থান নিয়ে আনিসুর রহমান কিংবা রবীন্দ্রসংগীতে সুর-বাণী তালের দ্বন্দ্ব-মিলন সম্পর্কে সন্‌জীদা খাতুন। কোনোবার 'কেন রবীন্দ্রনাথ?' আবার কোনোবার 'আমার সময় ও রবীন্দ্রনাথ'—এই ধরণের নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে একসঙ্গে অনেকের লেখা—যেমন শামসুর রাহমান, মালেকা আজিম খান, আবুল মোমেন, সনৎকুমার সাহা, নাজিম মাহমুদ, করুণাময় গোস্বামী এবং আরো অনেকে। লক্ষণীয়, শুধু লেখালেখিতেই নয়, এর সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং আজও আছেন সংগীত-জগতের ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি অন্য ক্ষেত্রের মানুষজনও—যেমন সৈয়দ শামসুল হক, আনিসুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম, হায়াৎ মামুদ, মুস্তাফা পান্না, রামেন্দু মজুমদার, আতাউর রহমান, আবুল হাসনাত, শফি আহমেদ, মফিদুল হক। এই দীর্ঘ নামাবলির উল্লেখ করতে হল, কারণ এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়, সংগীত সম্মিলন পরিষদ্ কীভাবে নিজের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যেতে চাইছে সবসময়—কীভাবে জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন হয়ে উঠেছে সারা দেশকে আলোড়িত করতে পারে এমন একটি ঘটনা, এমন এক জাগরণ—কীভাবে এর মধ্যে ঘটে যায় তুলনাহীন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার। সৃজনশীলতার এই সংঘবদ্ধ উদ্যমের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে এমন আয়োজন স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশেও আর কখনো ঘটেছে বলে মনে হয় না।

এই রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনকে কেন্দ্র করেই নতুন-নতুন গায়কের নাম পাই, যাঁরা এসেছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতি পেয়েছেন এমন অনেকের নাম দেখি প্রতিযোগিতার পদাধিকারীর তালিকায়।

৬

এ কথা মনে করার কারণ নেই, জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনের বিস্তারের ফলে এককভাবে যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা করেছিলেন, তাঁদের কাজ থেমে গেল। তাঁরা নিজেদের কাজ তো করছিলেনই, সঙ্গে-সঙ্গে জাতীয় সম্মেলনের কর্মযজ্ঞে নিজের-নিজের সাধ্যমতো সহায়তা করছিলেন অবশ্যই। এ ব্যাপারেও বোধহয় সবচেয়ে অগ্রসর 'ছায়ানট'। 'বুলবুল একাডেমী'র গান শেখানোর কাজ বন্ধ হয়নি, তাঁরাও শরিক হয়েছেন সম্মেলনে। ফারুকুল ইসলামের 'ঐকতান'-এর

কথাও তো আমরা জানি। বরং বলা যায়, এই জাতীয় সম্মেলনের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে একক আরো কোনো-কোনো প্রতিষ্ঠান সংগীতচর্চার যে-কাজ করছিলেন, তা ওই বড়ো উদ্যোগকে সাহায্যই করছিল। কলিম শরাফী-র 'সংগীত ভবন'-এর কথা আমরা শুনেছি, কিংবা সাদী মুহম্মদের 'গীতাঞ্জলি'। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে-সংগঠনের কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়েছিল, তার নাম 'আনন্দধ্বনি'। 'আনন্দধ্বনি'-র কৃতি আর মর্যাদা যে অন্যদের থেকে আলাদা তার সবচেয়ে বড়ো কারণই হল এর পেছনে আছেন ওয়াহিদুল হক স্বয়ং। বাংলাদেশে, এমনকী তার আগে পূর্বপাকিস্তানের আমলেই, রবীন্দ্রসংগীতের কথা বললেই যাঁর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হবে, তিনি ওয়াহিদুল হক।

ওয়াহিদুল হকের পরিচয় দিতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। তিনি রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষক, তত্ত্বজ্ঞ, সংগঠক। 'মঞ্চের গায়ক' যাকে বলে তা হয়তো তিনি কখনোই নন, কিন্তু তাঁর গান যাঁরা শুনেছেন, তাঁরাই জানেন, সুর ও বাণীর সমন্বয়ের কী গভীর বোধ কাজ করে তাঁর গায়কিতে। তাঁর গলায় 'বেদনায় ভরে গিয়েছে' কিংবা 'বড়ো বেদনার মতো' কিংবা 'ডেকো না আমারে ডেকো না' শুনতে পাওয়াও একটা বিরল অভিজ্ঞতা। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে তাঁর অজস্র লেখা ও কথালাপে স্পষ্ট হয়, বাংলাদেশে এই সংগীতকে বাঙালির আত্মপরিচয় ও দেশকালের প্রাসঙ্গিকতায় বিধৃত করার সাধনাই করে চলেছেন তিনি আজীবন। এই 'ভিশন' দুইবাংলা মিলিয়েই দুর্লভ। ওয়াহিদুল হকই ছায়ানট-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষক ও পরিচালক। রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনেরও প্রেরণা।

সঙ্গে-সঙ্গে 'আনন্দধ্বনি' একেবারে তাঁর নিজের গড়া সম্পদ। 'আনন্দধ্বনি'-কে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি বাংলাদেশের অন্য জেলা-শহরেও। নবীন গায়কেরা তৈরি হয়েছেন, তাঁর কাছাকাছি এসেছেন। এবং গান গাওয়ার প্রাণময় আত্মপ্রকাশেও যে কতখানি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছেন তাঁরা, তা তাঁদের সম্মেলক-গানগুলিতে এত বেশি ধরা পড়ে। সে-কারণেই হয়তো রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনে কিংবা বিভিন্ন ক্যাসেট-উদ্যোগে 'আনন্দধ্বনি'-র বারবার ডাক পড়ে। তা সে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারের ক্যাসেট-শ্রদ্ধার্ঘ্য 'বিশ্ববীণারবে'-তেই হোক কিংবা ১৪০০ সাল উপলক্ষে জামিল চৌধুরীর উদ্যোগে প্রকাশিত 'আজি হতে শতবর্ষ' বা করুণাময় গোস্বামীর উদ্যোগে প্রকাশিত সংগ্রহ, যেখানেই হোক। আমরাও কলকাতায় ১৯৯২-এর আগস্টে রবীন্দ্রসদনে বসে শুনেছি 'আনন্দধ্বনি'-র আলেখ্য 'শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে'—কলকাতার মানুষ অভিভূত হয়েছেন তাদের একক ও সম্মেলকে—গান থেকে গানে ভেসে যাওয়ার শৈল্পিক সমগ্রতায়। 'আনন্দধ্বনি'

এবং বিপ্লব বালা-র ছোটো কিন্তু পরিপূরক সংগঠন 'কণ্ঠশীলন'-কে জড়িয়ে ওয়াহিদুল হকের বৃহৎ নান্দনিক অভিযানের আভাস পেয়েছিলাম বাংলাদেশে প্রথম গিয়েই এবং তা আচ্ছন্ন করেছিল আমাকে।

ওয়াহিদুল হক কখনো শান্তিনিকেতনে গান শেখেননি, কিন্তু শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ। তিনি নিজেকে বলেন, শৈলজারঞ্জন মজুমদারের "অযোগ্য একলব্য"। লক্ষ করবার ব্যাপার, শুধু ওয়াহিদুলই নন, বাংলাদেশের গোড়াকার রবীন্দ্রসংগীত-সাধকেরা প্রায়ই সবাই শান্তিনিকেতনের শিক্ষাধারায় লালিত। আবদুল আহাদ যে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন তা আমরা আগেই জেনেছি। আতিকুল ইসলামও শিখেছেন শান্তিনিকেতনে, শৈলজারঞ্জনের একান্ত ভক্ত ও ঘনিষ্ঠ এই ছাত্র। সন্‌জীদা খাতুন শান্তিনিকেতনে গান শিখতে যাননি, অন্য বিষয়ে পড়তে গিয়েছিলেন—কিন্তু শান্তিনিকেতনের আকাশবাতাস আর তার গান তাঁর গানকেও তৈরি করেছে, এমন বললে হয়তো ভুল হবে না। শৈলজারঞ্জনের তিনিও কাছাকাছির মানুষ। এরকম আরো বহুজনকেই পাওয়া যাবে। শৈলজারঞ্জন যেমন আলোড়িত করেন বাংলাদেশের অগ্রণী গায়কদের, তেমনি নিজেও বলেন অন্যদের, "বাংলাদেশের মানুষের উপর আমার অনেক ভরসা। বাংলাদেশের মন রবীন্দ্রনাথের দিকে অনেক নির্ভরশীল। রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ এখানে খুব উজ্জ্বল।" শান্তিনিকেতন ও শৈলজারঞ্জনের প্রভাবেই হয়তো এই দুরূহ ব্যাপারটা ঘটেছিল—ওয়াহিদুল ও সন্‌জীদার নানা সময়ের ভূমিকায় রবীন্দ্রসংগীতের যে একটি ধারা গড়ে উঠছিল বাংলাদেশে, তাতে দেশ ও কালের অঙ্গাঙ্গিতায় তৈরি বোধের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল শৈলজারঞ্জনের শিক্ষায় পাওয়া শুদ্ধতার প্রতি সম্মান। হয়তো অদীক্ষিতের কাছে এটাই স্পষ্ট হয় এইভাবে যে শৈলজারঞ্জনের প্রধান দুই শিষ্য কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলিমা সেন যে বাংলাদেশে মহা-আদৃত এবং সেখানকার বিভিন্ন বয়সের বা প্রজন্মের অনেকের কাছেই আদর্শ হিশেবে গণ্য, সেটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়।

সন্‌জীদা খাতুনও বলেন বাংলাদেশের সাধনা "রবীন্দ্রসংগীতের একলব্য সাধনা"। 'তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে' বইতে বলেছেন, "রবীন্দ্রসংগীতের চর্চায় আমাদের হতে হয় একলব্যশিষ্য।" কারণ, রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-শিষ্যদের কাছ থেকে শিখবার সুযোগ তো অনেকেরই ছিল না, বাংলাদেশে নিরুপায় অবলম্বন ছিল শুধু স্বরলিপি এবং রেকর্ড বা ক্যাসেট। তাই এখানে ঝোঁকটা অনেকসময়ই অনুকরণের হতে চায়—তখন কেউ কলকাতার অমুকের মতো, কেউ শান্তিনিকেতনের তমুকের মতো। শিক্ষণের সমস্যা নিয়ে ক্ষোভ ওয়াহিদুল হকেরও। কিন্তু এরই মধ্যে প্রথম থেকেই,

আমরা জানি, কেউ-কেউ উঠে এসেছেন তাঁদের গৌরবময় স্বকীয়তা নিয়ে, কারোর সঙ্গে উপমিত না করেই যাঁদের একান্তভাবে চেনা যায়।

তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তো সন্‌জীদা খাতুন নিজেই। আমরা যখন সেই গোড়ার যুগে লংপ্লেয়িং রেকর্ডে একটি-দুটি করে গান শুনতাম কলিম শরাফী, হামিদা হক, কাদেরী কিবরিয়া, পাপিয়া সারোয়ার, ফাহ্‌মিদা খাতুন, নাসরীন শাম্‌স, সেলিনা মালেক, মালেকা আজিম খান বা জাহেদুর রহিমের সঙ্গে সঙ্গে সন্‌জীদা খাতুনের— তখন থেকেই তাঁর বিশিষ্টতা আমাদের চেনা ছিল। কিন্তু এখন একক-ক্যাসেটে বা সামনে বসে তাঁর অজস্র গান শুনতে-শুনতে টের পাই, রবীন্দ্রসংগীতের জগতে একটা স্বতন্ত্র জমি নিয়ে তিনি কীভাবে আলাদা হয়ে আছেন। গভীর মগ্নতা এমনভাবে ফুটে ওঠে তাঁর গানে যেন শ্রোতা অনায়াসে এই অনুভবে পৌঁছে যান, এ গান এক মহাকবির রচিত সংগীত। রবীন্দ্রময় অস্তিত্ব দিয়েই যেন তাঁর গান গাওয়া— লড়াকু সংগঠকের যে-জীবন তিনি যাপন করেছেন, তাও যেন মিশে থাকে তাঁর ওই সুরের মগ্নতায়। একের পর এক অসংখ্য গান তিনি অবলীলায় গেয়ে চলেন তাঁর ক্লান্তিহীন গলায়, নম্র কোমল স্বরে, ঘরোয়া ভঙ্গিতে, প্রতিটি শব্দ ও সুরের চলাফেরার অভ্রান্ত দিশায়। কিন্তু সুরের বিস্তারের মধ্যেও বড়ো হয়ে ওঠে ওই মগ্নতা, যেখানে কবিতা ও গান একাকার। এ গান আয়োজনের বা সমারোহের নয়, এ যেন জীবনযাপনের দৈনন্দিনেরই সঙ্গী। স্বাধীনতার লড়াইয়ের সময় 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে' শুনে বিষ্ণু দে-র উচ্ছ্বাসের কথা আমরা পড়েছি আর আজ 'আবার এরা ঘিরেছে মোর মন' শুনতে-শুনতে যখন 'তব নীরব বাণী হৃদয়তলে/ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে' পেরিয়ে 'নিয়ত মোর চেতনা পরে রাখো'-তে পৌঁছোই, তখন তাঁর তন্ময় অনুভব স্পর্শ করে আমাদেরও—এতই অমোঘ সেই সুরময় উচ্চারণ। আবার তার পাশেই ঝরঝরে গলায় যখন তিনি গাইতে থাকেন 'শরৎ-আলোর কমলবনে' বা 'ঝরা পাতা গো', তখন তাঁর গাওয়ার স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর হয়ে ওঠে আমাদের মন।

সন্‌জীদা খাতুনের আগের দু-একটি গান শোনার অভিজ্ঞতা থাকলেও ব্যাপক ও গভীরভাবে চিনতে পারছি এখনকার ক্যাসেটের সুযোগেই। ঠিক যেমন আরো অনেকেরই। ফাহ্‌মিদা খাতুনের 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না'-র আর্তি কিংবা 'শ্রাবণের পবনে আকুল'-এর বিষণ্ণতা কিংবা 'এ কী সুগন্ধহিল্লোল বহিল'-র উল্লাস অনুভব করতে-করতেই বুঝতে পারি অলংকরণে ও সুরের সঞ্চালনে কতই সমৃদ্ধ তাঁর গান। উদাত্ত সুরেলা গলা তাঁরও বড়ো সম্পদ। কিশোরী ইফ্‌ফাতের কথা শুনেছি সন্‌জীদা খাতুনের লেখায়। গানও শুনেছি 'এরা পরকে আপন করে' যখন

তাঁর গোড়ার যুগের আত্মপ্রকাশ। এখন পরিণত ইফ্‌ফাত আরা খানের ঈষৎ ধরা গলায় 'তোমারি মধুর রূপে' কিংবা 'স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে' কিংবা 'মম দুঃখের সাধন' শুনি, আর তাঁর ওই শব্দকে ভেঙে-ভেঙে গাওয়ার ভঙ্গি গভীরতায় এক নান্দনিক স্বাদ এনে দেয়। ফ্লোরা আহমেদের সতেজ খোলা গলায় যেন পদ্মাপাড়ের বাতাসের ছোঁয়া। পোশাকি নয় একটুও, যেন শিল্পকে বর্জন করেই তাঁর শিল্প। স্মরণীয় হয়ে থাকার মতোই গান করেন তিনি, এ কথা জানেন যাঁরা তাঁর 'অমল ধবল পালে' বা 'দীপ নিভে গেছে মম' শুনেছেন। স্মরণীয় পাপিয়া সারোয়ারের গানও—তাঁর 'কতবার ভেবেছিনু' বা 'খেলার সাথী বিদায়' মনে গেঁথে যায়। রাখী চক্রবর্তীর কথা ওয়াহিদুল হকের লেখা থেকে জেনেছিলাম আগেই, কিন্তু এবার তাঁর 'মন্দিরে মম কে আসিলে হে' নতুন ক্যাসেটটি হাতে পেয়ে যেন বিস্ময়ে চমকে উঠি—'সখী, ভাবনা কাহারে বলে' শুনতে-শুনতে মনে হয় প্রবাসী এই নারীর কণ্ঠে এখনো বাংলাদেশ অক্ষয় হয়ে আছে। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা দু-বঙ্গেই এখন খুব পরিচিত ও জনপ্রিয়। গান গাইতে শুরু করেছিলেন সুরে ভরা স্বচ্ছন্দ গলায় সহজ এক স্ফূর্তি নিয়ে। ক্রমে আরো অনুশীলনে এখন সুদক্ষ পরিপূর্ণ শিল্পী তিনি। যন্ত্রানুষঙ্গের অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁর 'রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে' কিংবা 'ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী' কিংবা 'মধু গন্ধে ভরা' কিংবা এরকম আরো অনেক গানই শ্রোতাকে মোহিত করে।

এরকম হয়তো নাম করা যায় আরো অনেকেরই। তাঁরা কেউ 'ছায়ানট'-এর কেউ 'বুলবুল একাডেমী'র ছাত্রী ছিলেন, কেউ সরাসরি শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনেই পাঠ নিয়েছেন। আমাদের এ-বঙ্গেও তাঁদের কাউকে-কাউকে আলাদা করে জানতে শুরু করেছেন রবীন্দ্রসংগীতের নিষ্ঠাবান রসিকেরা।

নতুনদের মধ্যে মিতা হক এভাবেই তাঁর গানে সচকিত করে তুলেছেন এখানকার শ্রোতাকে। উচ্ছলিত সুরের স্রোতস্বিনী হয়ে ঝরে-ঝরে পড়ে তাঁর রবীন্দ্রসংগীত। কণ্ঠসম্পদে অতুলনীয় মিতাও—তারসপ্তকে গাওয়া গানে নিখুঁতভাবে স্পর্শস্বর কি টপ্‌পার সূক্ষ্মতম অলংকরণও অনায়াসে ছাপ ফেলে। নিপুণ সতেজ লয়ের প্রয়োগে, সুরে ভরপুর প্রতিটি স্বরক্ষেপণে মিতা হকের প্রতিটি গানে শ্রোতাদের গভীর তৃপ্তি। *'হেমন্তে কোন বসন্তেরই বাণী', 'দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা', 'কে বলেছে তোমায়* বঁধু', 'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী'—কত নাম করব তাঁর গানের ওই বৈচিত্র্যের!

বাংলাদেশের আরেক দীপ্তিময়ী নবীন গায়িকা লাইসা আহমেদ লিসা—তাঁকে ঘিরে অনেকের অনেক প্রত্যাশা। রাজশাহীর মেয়ে লিসা, এখনো স্নাতকোত্তর স্তরে বিজ্ঞানের ছাত্রী। উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিমও আছে। বারো বছর বয়সে জাতীয়

রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন। তারপর আর কখনো ফিরে তাকাননি। নিরন্তর অনুশীলনে ও চর্চায় লিসা এখন পরিণত—বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীতের সেরা গায়কদের একজন। লিসা যখন তাঁর ওই অসামান্য রেওয়াজি গলায় গান ধরেন, শুদ্ধ সুরের সঙ্গে মাধুর্যের মিলন ঘটান, মাধুর্যের সঙ্গে তন্ময় গাম্ভীর্যের—সবমিলিয়ে শ্রোতা শুধু তো অভিভূতই হতে পারেন। লিসা-র কোনো রেকর্ড বা ক্যাসেট বেরোয়নি। যা শুনেছি তা ঘরোয়া বা প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের গান। শোয়েব এবং তাঁর বন্ধুদের ধন্যবাদ, তাঁদের গড়া 'শ্রবণ'—ছায়ানট-এর 'শ্রোতার আসরে'র উত্তরসূরি 'শ্রবণ'—লিসা এবং মিতার একক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এখনো কানে যেন বেজে চলেছে লিসা-র 'আজি কমলমুকুলদল খুলিল', 'হৃদয়নন্দনবনে', 'চিত্ত পিপাসিত রে' কিংবা 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' গানগুলি, আর আন্দাজ করতে থাকি কী অভিঘাতই না তা তৈরি করেছিল শ্রোতার হৃদয়ে।

লিসা 'আনন্দধ্বনি'-রও ছাত্রী। সেখানে তাঁর যোগ্য সঙ্গী লোপা আহমেদ, ইলোরা আহমেদ শুক্লা, তানিয়া মান্নান এবং আরো অনেকে। এঁদের প্রত্যেকের গান আমি ঘরোয়া আসরে শুনেছি এবং গানের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশকে খুঁজে নিয়েছি।

পুরুষকণ্ঠেও শুনেছি মহিউজ্জামান চৌধুরী, আবদুল ওয়াদুদ, নীলোৎপল সাধ্য, পার্থ তানভীর নভেদ, বুলবুল ইসলাম বা মইনুদ্দিন নাজিরের গান। এঁরা সকলেই নিজের-নিজের সাংগীতিক চারিত্র্যে ও সামর্থ্যে যে-কোনো শ্রোতাকে আবিষ্ট করে রাখবেন। মহিউজ্জামান তাঁর গলার সতেজ দার্ঢ্যে এ-বাংলাতেও নজর কেড়েছেন, সে তো আমরা জানি। বুলবুল হঠাৎ-হঠাৎ যখন মেজাজ পান, তখন তাঁর সুরময় কণ্ঠের গাওয়া আমাদের শিহরিত করে। বেশ মনে আছে 'গভীর রজনী নামিল' বা 'আমি আছি তোমার সভায়' কীভাবে আমাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল শিল্পসম্ভোগের অন্য জগতে।

আমি জানি, অনেকের নামই অনুচ্চারিত রইল। এ তো শুধু তথ্য পরিক্রমা নয়, নিজস্ব অভিজ্ঞতার উচ্চারণ। তাতে ফাঁক থাকবেই, ব্যক্তিগত পক্ষপাতও। অনেকের গান শুনবার সুযোগ পাইনি, সে ক্ষতি তো শ্রোতা হিশেবে আমারই। তা ছাড়া এরকম অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা বাংলাদেশে পায়ে-পায়ে। যেমন রাজশাহীতে গিয়ে শুনেছিলাম লিসা-র বন্ধু ও অনুজদের গান, এক ঘরোয় আসরে—অনির্বচনীয় সেই অভিজ্ঞতা—তা কি বলা গেল! বরিশালের উদীচী-র ঘরে মহিলা পরিষদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন এমন একটি গ্রামের মেয়ে গাইলেন গান। একেবারে অন্য রকমের গলা। ফরিদপুরে বেড়াতে গিয়েও কতরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে-সব টুকরো অভিজ্ঞতা তো বাদই রইল।

তা ছাড়া, 'ছায়ানট'-এর কর্মোদ্যোগের কথা স্মরণ করতে গিয়েই দেখেছি, রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে অন্যান্য বাংলা গানের চর্চাও কীভাবে তাদের সাংগীতিক বোধের সম্পূর্ণতার অনুকূল হয়ে উঠেছিল। সেই সচেতনতা এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। তাই তো ওয়াহিদুল হকের নেতৃত্বে এই সেদিনও ঢাকায় হতে পারে 'আনন্দধ্বনি'-র রূপায়ণ 'পঞ্চ ভাস্করের গান'—সুমন চৌধুরী, নীলোৎপল সাধ্য ও তানিয়া মান্নান গাইতে পারেন রজনীকান্ত, মিতা ও লিসা দ্বিজেন্দ্রলাল, শুক্লা অতুলপ্রসাদ। আর সেই অনুষ্ঠানের বাইরে অহরহ শুনে ফেলা যায় ময়নার কিন্নর-কণ্ঠে নজরুল। রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে মিলিয়েই যেন এই পরিমণ্ডলের নির্মাণ।

৭.

১৯৮৬-তে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত রাজশাহীর রবীন্দ্রসংগীত-মেলার আলোচনাসভায় ওয়াহিদুল হক বলেছিলেন, "যত রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আছেন, প্রত্যেকের লক্ষ্য হওয়া উচিত যে নীলিমা সেনের গলায় যা শুনতে পাই, যেটা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় শুনতে পাই, যার ধারক বাহক আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শৈলজারঞ্জন মজুমদার, এই যে তাঁদের কণ্ঠে অন্য রকম শোনা যায়, কেন শোনা যায়? কি সেই জিনিশটি? এটার খোঁজ করার, এটার চর্চা করার দরকার।" আলোচনাচক্রে প্রদত্ত ভাষণের আক্ষরিক অনুলিপি বলেই হয়তো শুধু বাক্যগঠনের শিথিলতাই নয়, তাঁর মতামতের মধ্যেও যে জুলুম প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে, তা নিশ্চয়ই ওয়াহিদুল হকের অভিপ্রেত ছিল না। কারণ, যাঁরা তাঁকে গভীরভাবে জানেন তাঁরাই বলতে পারবেন, রবীন্দ্রসংগীতের শুদ্ধতা বিষয়ে তাঁর অতি-সতর্কতা কখনো তাঁকে ওই একদেশদর্শিতায় নিয়ে যেতে পারে না। তাঁর মতামতের পেছনে অন্য যে গভীর বোধ কাজ করে সেটা কখনোই ওই অত সহজ-সরল উক্তিতে ব্যাখ্যাত হতে পারে না। তবে এটাও ঠিক, এমন মনে করার কারণ নেই যে, বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষণ বা গায়নপদ্ধতি নিয়ে সকলে একই রকম ভাবছেন। ভাবলে সেটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে মনে করাও যেত কিনা সন্দেহ। বরং দেখতে পাই : শিক্ষণের সমস্যা, অনুকরণের সমস্যা, শ্রোতা ও পরিবেশের সমস্যা, রুচিবিকারের সমস্যা, এইসব নিয়ে লেখালেখিতে নানারকমের অভিজ্ঞতা ও ভাবনাই প্রকাশ পাচ্ছে।

তর্কটা বোধহয় প্রথম উঠেছিল রাজশাহীর রবীন্দ্রসংগীত-মেলাতেই। তাতে জাহানারা বেগম বলেছিলেন শুদ্ধভাবে গাওয়া বলতে কী বোঝায় এবং সে-ব্যাপারে শিক্ষকের দায়িত্ব কতটুকু। যশোরের গোলাম মোরশেদ আরো স্পষ্ট করে বললেন,

"বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত শিখতে গেলে বা শেখাতে গেলে অনুশীলনের প্রয়োজন।" বস্তুত এই শুদ্ধতার কথা আরো নানা বক্তার আলোচনাতেই উঠেছিল। তার উত্তরে সনৎকুমার সাহা একটু উষ্মা প্রকাশ করেই বললেন :

> এর আগেই দুজন বক্তা বলে গেছেন যে বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চার প্রসার ঘটছে। এবং আশার কথা, আরো ঘটবে। কিন্তু সেই সঙ্গে যাঁরা প্রকাশ্যে গান গেয়ে শোনান, তাঁদের অনেকের গান গাওয়ায় বেশ কিছু গরমিল যেন ঢুকে যাচ্ছে। যদি অজস্র ঢোকে, এবং কোথাও যদি বাধা না পায়, তবে সেটা নিশ্চয়ই আশঙ্কার কথা।...রবীন্দ্রসংগীতের চর্চায় আরো নিষ্ঠা, আর প্রকাশ্যে গাইবার বেলায় আরো বেশি সতর্কতা, এটা যাঁরা গান করেন, গান শেখান, তাঁরা যদি আন্তরিকভাবে মেনে চলেন, তবে আমরা যারা গান জানিনে, কিন্তু শুনি, শুনতে ভালোবাসি, অনেকটা ভরসা পাই, তাঁদের ওপর নির্ভর করতে পারি। অযোগ্যতা যদি থাকে আমাদেরই, তবে সেটাও বুঝে উঠতে পারি।
>
> কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতকে এভাবে শুদ্ধতার আবরণ পরিয়ে একটা জায়গায় রেখে তার পারফেকশনকে যদি আমরা দেখতে চাই, তবে উলটো দিক থেকে কিছুটা বিপত্তি আবার যেন না এসে যায়। ...রবীন্দ্রসংগীত তার তথাকথিত শুদ্ধতা নিয়ে কোটরবাসী হোক, এটা আমরা কেউই চাইব না। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রসংগীতের চর্চাটা যদি সাধারণভাবে সবার কাছে উন্মুক্ত থাকে, এবং সবার যদি সাধারণভাবে শেখার প্রাথমিক সুযোগটুকু থাকে, যে শেখার সঙ্গে রবীন্দ্রভাবনার চর্চাও মিশিয়ে নেওয়া যায়, যাতে গানের পুরো রূপটা আমরা চেতনায় ধারণ করতে পারি, তা হলে হয়তো আমরা যা চাই, তার একটা দিক অনেকখানি রক্ষা হয়। সেখানে কে কতটা শুদ্ধ গাইলেন কি গাইলেন না এ নিয়ে আমরা খুব একটা চুলচেরা হিশেব করতে চাইব না।...
>
> একটা প্রশ্ন ওঠে, রবীন্দ্রসংগীত কি কোনো একটা বৃত্তের মধ্যে আটকে থাকছে? তাঁরা কি সমাজের একটা বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থান থেকে এই রবীন্দ্রসংগীত শেখার এবং শেখানোর আগ্রহটা বোধ করেন? প্রশ্নটি কিন্তু ভাববার। একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়।

দীর্ঘ উদ্ধৃতি, কিন্তু এ থেকে বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীত-আলোচনার ধরণ ও গতিপ্রকৃতিটাও টের পাওয়া যায়। সঙ্গে-সঙ্গে সনৎকুমার সাহার অনুভবের মধ্যে যে সত্য এবং বিপদ দুটোই পাশাপাশি থাকে তার কথাও। তবে কি আর তিনিও

জানেন না, রক্ষণশীলতার খপ্‌পর থেকে উঠে আসার জন্য যে-স্বাধীনতা তিনি চাইছেন, তা রবীন্দ্রসংগীতকে কোন গাড্ডায় নিয়ে যেতে পারে! তাঁর ভাষণ পড়তে-পড়তেই মনে হয় তিনি জানেন, অবশ্যই জানেন। উদ্ধৃত অংশের শেষ অনুচ্ছেদটিতে চোখ বোলালেই বোঝা যায়, এরই সঙ্গে জড়িত আরো বড়ো প্রশ্ন নিয়ে তিনি ভাবছেন—রবীন্দ্রসংগীত শেখার ও শোনার পরিমণ্ডল নিয়ে। এইসব জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। অথচ ওই প্রশ্নের বা সংশয়ের জবাব না পেলেও তো চলে না।

আমরা শুধু অবাক হই, রবীন্দ্রসংগীতের বড়ো ভূমিকা সম্পর্কে এখনো এমন কথাবার্তা বাংলাদেশেই হতে পারে। তাই তো ১৯৯৫-তে জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনের চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশনে ওয়াহিদুল হক 'সংস্কৃতি প্রতিবেদন'-এ বলতে পারেন, ভাষা-আন্দোলন বা ষাটের সাংস্কৃতিক আন্দোলন পার হয়ে দরকার এখন নতুন আন্দোলন—"আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক সংকটকে মোকাবেলা করার জন্যে... ভাষা-আন্দোলনের নবতম পর্যায়, তৃতীয় তরঙ্গ।" ভাষা-আন্দোলন, এমনকী ষাটের "সংগীতভিত্তিক" সাংস্কৃতিক আন্দোলনও ছিল সদর্থে রাজনৈতিক—"উপলক্ষটি সাংস্কৃতিক, পোশাকটি সাংস্কৃতিক", কিন্তু লক্ষ্য "পাকিস্তানিতার মুখোশ উন্মোচন করে তার প্রত্যাখ্যান নির্মাণ"। কিন্তু এই নতুন আন্দোলনের লক্ষ্য কী হবে? শুধু রবীন্দ্রসংগীতের মানুষকে নয়, "সংস্কৃতিকর্মে লিপ্ত এবং সংস্কৃতিমনস্ক সকল জনের মহামিলনক্ষেত্র রচনার প্রারম্ভিক উদ্‌যোগ"। শুধু রবীন্দ্রসংগীতে বদ্ধ থাকা নয় ঠিকই, কিন্তু "রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী, শিক্ষক ও প্রেমীই প্রথম হোতা এই যজ্ঞের"। কারণ এখনো একথা সত্য : "দেশের জন্য রবীন্দ্রনাথকে পাওয়াটা জরুরি, তার আরম্ভটা তাঁর গান দিয়ে হলে ফলটা ব্যাপক এবং নিশ্চিত উভয়ই হয়।" কারণ "বাঙালির হাতে এখন সমাজে প্রত্যাবর্তনের সবচাইতে কার্যকর ও তাৎপর্যময় উপায় রবীন্দ্রসংগীত।"

ওয়াহিদুল হকের প্রতিবেদনের এই অসামান্য বোধও যে তর্কাতীত হয়নি, সেই সম্মেলনের মঞ্চেই তাকে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে, তাও সুস্থতার অপর পিঠ বলে মনে করতে পারেন কেউ। ড. আনিসুর রহমান "সংস্কৃতি প্রতিবেদনের ওপর মন্তব্য" করতে গিয়ে যা বলেন তাতে মনে হয় "ভয়ানক রবীন্দ্রভক্ত হয়েও" তিনি রবীন্দ্রসংগীতকে ওয়াহিদুলের মতো ওই ভূমিকায় দেখাটাকে বাস্তব বলে গণ্য করছেন না। তিনি মনে করেন, রবীন্দ্রসংগীতের প্রকৃত স্বীকৃতি অল্পসংখ্যক শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে এবং তার বাইরে যে-জনপ্রিয়তা তা সাংগীতিক কারণে নয়। এই সংগীতের উপরই যেহেতু পাকিস্তানি আঘাত পড়েছিল, তাই এটাই হয়ে উঠল

প্রতিবাদী অবলম্বন। তার মানে এই নয় যে "রবীন্দ্রনাথের গানকে জনগণ তাদের নিজেদের গান হিশেবে গ্রহণ করে ফেলে" কিংবা "রবীন্দ্রসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রভাষাই জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাষা হিশাবে গণসমর্থন পেয়ে গেল।" এরকম ভাবনা, আনিসুরের মতে, "শিক্ষিত মধ্যবিত্তের...অহং", নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করা। তারই বশে তাঁরা রবীন্দ্রসংগীতের গায়নপদ্ধতিতেও উচ্চারণের একধরণের রেজিমেন্টেশন আনতে চান এবং তার ফলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে এই গান। আনিসুর রহমান গাওয়ার ও উচ্চারণের শুদ্ধতার বাতিকের বদলে রবীন্দ্রসংগীতকেও সংস্কৃতির বা রবীন্দ্রসংস্কৃতির সৃষ্টিশীল বিকাশের অঙ্গ করে তুলতে চান।

আমরা উভয়ের মতই শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনি। কেননা সত্য এবং হয়তো বিপদ দু-জায়গাতেই আছে। এবং উভয়ের মত ঠিক পরস্পরবিরোধী কিনা কিংবা উভয়ের মধ্যে একটা পরিপূরকতা আছে কিনা ভাবতে-ভাবতেই মতবিনিময়ের এই জগতের প্রতি আকৃষ্ট হই, যা বাংলাদেশেই সম্ভব হয়েছে। তাই ওয়াহিদুল হক যখন 'শৈলী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মনের ভিতর বাড়ছেন; বাড়ছেন দেশের ভিতর' এই নামের এক প্রবন্ধে বলেন, "তবু কী করে যে রবীন্দ্রনাথের নাম পৌঁছেই যায় এদেশের সর্বত্র এবং গান প্রবেশ পায় কোটি মানুষের জীবনে।...ভবিষ্যতের পথ কাটায়।"—তখন অতিশয়োক্তি সত্ত্বেও তাঁর এই উচ্ছ্বাসের প্রকৃত অর্থ বুঝতে ভুল হয় না আমাদের। আবার, আনিসুর রহমান যখন রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে আপামর মানুষের বিচ্ছেদের কথা বলে বাস্তবের অন্য রূপের কথা তোলেন, এবং কী করে সেই বিচ্ছেদ দূর করা যায় অন্য সৃজনশীলতায় তা নিয়ে চিন্তিত হন, তখন তাঁর সেই উক্তির মাত্রাও চিনে নিতে পারি আমরা। ওয়াহিদুল হক কি জানেন না বাস্তবের জটিল চেহারাটা! আনিসুর রহমান ঠিকই দেখেছেন, পাকিস্তানি আঘাত পেয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ একসময়ের অবলম্বন, কিন্তু তিনি কি এও জানেন না, শুধু পাকিস্তানি আমলে নয়, আজও অন্যভাবে কেন রবীন্দ্রনাথের উপর, রবীন্দ্রসংগীতের উপরই এই আঘাত! অতিরেক নিয়ে তাঁর যে খুচরো আপত্তি তার ধাক্কায় হারিয়ে যেতে চায় না তো সৃজনের মর্মমূল থেকে উচ্চারিত কোনো সত্য? বাস্তববাদী ও স্বপ্নদ্রষ্টাকে মেলানো যায় না এক জায়গায়? সুতরাং উভয়েরই বিদ্রূপটা শেষপর্যন্ত অবান্তর ঠেকে। কারণ, আমরা জানি, আনিসুর রহমানও ওয়াহিদুল হকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে উচ্চারণ করতে পারেন, বাংলাদেশের মানুষ হিশেবেই—"রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিলাস নয়, আমাদের বাঁচবার মন্ত্র।" ঠিক যেমন ওয়াহিদুলেরও আপত্তি থাকার কথা নয় আনিসুরের এই উচ্চারণে : "'আমার সোনার বাংলা' গানটি যেমন জাতির এক মহালগ্নে বিশেষ তাৎপর্যময় হয়ে এসেছিল, আজকে 'মা কি

তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে' এ গান কি তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ নয়? এই গানটি কি আমাদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নবতর পর্যায়ের গান হবার যোগ্য নয়? সম্মিলন পরিষদ কি এই গানটি নিয়ে 'আমার সোনার বাংলা'-র মতোই আবার রাস্তায় নামবে না, দেখাবে না কি রবীন্দ্রসংগীত সত্যিই জাতির বর্তমান সংকটেও পথ দেখাতে পারে, যেমন দেখিয়েছিল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে, জাতিকে ঠিক তেমনি প্রেরণা দিয়ে যোগযুক্ত করতে পারে এক মহাসংকল্প নিয়ে জাতীয় আত্মপ্রকাশের জন্য।"

৮

এই তবে বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীতের আলাদা পরিচয়, তার স্বাতন্ত্র্যের আসল জায়গা, যার অনুসন্ধানেই শুরু হয়েছিল এই রচনা। অন্য কোনো বহিরঙ্গ সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য বা প্রকরণ দিয়ে তাকে শনাক্ত করা যাবে না। কারণ, সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, সে-বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত নয় এ-বঙ্গেও। যান্ত্রিক শুদ্ধতা নয়, যে-শুদ্ধতা গায়কের স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতার হানি ঘটায় না, তার অনুকূল চর্চা দুই বঙ্গেই কমবেশি আছে। তার লঙ্ঘনও আছে দুই বঙ্গেই। আমরা যাকে সার্থক গান বলি, তার একই উৎস, একই পরম্পরা। কিন্তু তবু যে দুটো আলাদা জগৎ মনে হয়, তার কারণ বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীতের পেছনে যে-ইতিহাস বা প্রেক্ষিত আছে, যার ভেতর দিয়ে এইমাত্র লঘু পরিক্রমা করলাম আমরা, তা-ই তাকে আলাদা মহিমা দিয়েছে। এই ইতিহাস বা প্রেক্ষিত সম্পর্কে প্রত্যেকে যে সমানভাবে সচেতন তা নিশ্চয় নয়। কিন্তু সেখানকার শিক্ষায় ও চর্চায় সেই ইতিহাসের ও বাস্তবের উপস্থিতি আছে। যাঁদের অবদানে এই চারিত্র্য রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষণের মধ্যেই নিহিত, তাঁরা তো আছেনই—সঙ্গে-সঙ্গে রোজকার বাস্তব নবীন শিক্ষার্থী বা গায়ককেও সচেতন বা অসচেতন যেভাবেই হোক প্রতিনিয়ত এই শিক্ষাই দিচ্ছে।

ওয়াহিদুল হক একদা বলেছিলেন, "রবীন্দ্রচর্চার বৈরী পরিস্থিতিই আমাদের ভিতরে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজনকে ঘনিয়ে তুলে তাঁকে অনেক সত্য করে ডেকে আনে।" সেই সঙ্গে "এ-কথা এড়িয়ে গিয়ে কোনো উপকার নেই যে পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একই লোক নন। পশ্চিমবঙ্গে 'রবীন্দ্রচর্চা' চলেছে তো বেগে, স্বাধিকারে এবং বহুকাল ব্যেপে। তার পরিবেশও বরাবর যথেষ্ট অনুকূল, আটক তো নেই কোনো তার। তাতে করে রবীন্দ্রনাথ সেখানে সাহিত্য-অধ্যাপক সংগীতশিল্পী নাট্য-নির্দেশক চিত্রপরিচালকের তালুকদারির অধীনে সোনার খনিতে উন্নীত।"

পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাতে বেশ খটকা লাগে, হয়তো একটু ঠাট্টাও মিশে আছে। আর তাকে আমরা অস্বীকারই বা করি কী করে? উত্তরাধিকার ভেঙে-ভেঙে আমরা কি জাঁকিয়ে তুলিনি রবীন্দ্রব্যাবসা? পেশাদারিত্বের নিশ্চিন্ততায় কি হারিয়ে যায়নি প্রেরণার খরস্রোত? আমাদের বাধা বা "আটক" নেই কোথাও ঠিকই, কিন্তু সে কি নির্বাধ আলো? না কি আসলে আমাদের আলোও নেই, অন্ধকারও নেই! "কারোরই কোনো আশা নেই/অথবা তা এত কম, যে কোনো নিরাশা নেই।"

আর বাংলাদেশের অন্ধকার যেন ঘুচতেই চায় না। মৌলবাদের ছায়া ঘিরে থাকে সবসময়—পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে বিকল্প মানুষকে। আরো নানা বাধা—রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সবরকমের। সেই অন্ধকারই কি সৃষ্টিময়? রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রসংগীত তাই এত তীব্রভাবে প্রাসঙ্গিক সেখানে এখনো। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতে যে পুরুষার্থ বিকিরিত হয়, সুর ও বাণীর অদ্বৈতে যে সৌন্দর্যের জগৎ নান্দনিক চেতনাকে শানিত করে, তাকে প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ সেখানে এখনো জীবন্ত। রবীন্দ্রসংগীত সে-কারণেই তাদের অনেকেরই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক বেশি।

সংযোজন

১৯৯৫-এ লেখা প্রবন্ধটির পর অনেককাল পার হয়ে গেছে। বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে আমাদের পরিচিতিও বিস্তারিত হয়েছে। যাদের উদীয়মান বলা হয়েছিল, তাঁরা অনেকেই এখন প্রতিষ্ঠিত। যেমন, বুলবুল ইসলাম বা লাইসা আহমেদ লিসা এবং তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অদিতি মহসিন, শামা রহমান, আজিজুর রহমান তুহিন, নীলাঞ্জনা চৌধুরী আর আরো অনেকের নাম। ক্যাসেট বা সিডি-র সাহায্যে তাঁদের গান শোনার সুযোগও বেড়েছে। সে-সময়ে যাঁরা আড়ালে ছিলেন, তাঁদের কেউ-কেউ হয়তো এখনো আড়ালেই, তবু ওই সিডি-র মারফতেই তাঁদের গলার সাংগীতিক ঐশ্বর্য এখন জানতে পারছি। যেমন, চট্টগ্রামের শীলা মোমেনের। 'ফুলকি'র সাংগঠনিক ব্যস্ততা তাঁর নিজস্ব গায়নভঙ্গিকে কেড়ে নেয়নি।

সন্‌জীদা খাতুন ইতিমধ্যে কলকাতায় একাধিক একক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেখানকার রবীন্দ্রমুগ্ধ শ্রোতাদের কাছে আরো বেশি পৌঁছেছেন। ফাহ্‌মিদা খাতুনের সিডি-ও বেরিয়েছে এবং বেরোচ্ছে একাধিক কলকাতা থেকেই। ইফ্‌ফাত, রেজোয়ানা আর মিতার দিগ্বিজয় তো চলছেই।

নতুন ও পুরোনো বহু শিল্পীরই সক্রিয়তা, আর সেই সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে কথাবার্তা, এমনকী তর্কপ্রবণ আলোচনা এখনো চলছে বাংলাদেশে—সব খবর সবার কাছে পৌঁছোয় এমন বলা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জি

১. জীবনকথা। জসীমউদ্‌দীন। গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা। ১৯৭১।
২. যাত্রাপথের আনন্দগান। শৈলজারঞ্জন মজুমদার। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। ১৯৮৫।
৩. চেতনাধারায় এসো। ওয়াহিদুল হক। মুক্তধারা, ঢাকা। ১৯৮৫।
৪. গানের ভিতর দিয়ে। ওয়াহিদুল হক। বইঘর, চট্টগ্রাম। ১৯৮৫।
৫. রবীন্দ্রসঙ্গীত : পূর্বধারা। ওয়াহিদুল হক। 'সুন্দরম্' পত্রিকা, ১৯৮৬-৮৭। মুস্তাফা নূরউল সম্পাদিত 'আবহমান বাংলা' গ্রন্থে সংকলিত।
৬. চির নূতনের ডাক। নাজিম মাহমুদ সম্পাদিত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় রবীন্দ্রসংগীত মেলায় (১৯৮৬) আলোচিত প্রবন্ধ ও ভাষণের সংকলন। ১৯৮৮।
৭. আসা যাওয়ার পথের ধারে। আবদুল আহাদ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৮৯।
৮. অতীত দিনের স্মৃতি। সন্‌জীদা খাতুন। প্রজাপতি প্রকাশন, ঢাকা। ১৯৯৩।
৯. তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে। সন্‌জীদা খাতুন। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা। ১৯৯৪।
১০. রবীন্দ্রনাথ, : বিবিধ সন্ধান। সন্‌জীদা খাতুন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৯৪।
১১. সঙ্গীতসংস্কৃতি। জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ্ প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৯৯৫। ওয়াহিদুল হকের প্রতিবেদন ও তার ওপর ড. আনিসুর রহমানের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশের থিয়েটার বাংলাদেশের গর্ব

প্রবন্ধের শিরোনামটি ঢাকার প্রধান এক নাট্যদলের পোস্টার থেকে নেওয়া। সত্যি এ-কথা বলার অধিকার তাদের আছে। বাংলাদেশের যে-সব দিক একজন প্রথম-পরিচয়ের মানুষকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে, তার মধ্যে বাংলাদেশের থিয়েটার নিশ্চয়ই থাকবেই। একদিক থেকে হয়তো বেশি করে উল্লেখ করা যায় থিয়েটারেরই, কারণ এ একেবারে মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশ-পর্বের নিজস্ব। অর্থাৎ নাট্যরচনা ও থিয়েটারের যে-গৌরব আলাদা করে নজর কাড়ে, তার শুরু একাত্তরের বাংলাদেশের জন্মের পরে। প্রায় একই সঙ্গে কয়েকটি অসাধারণ সমর্থ নাট্যগোষ্ঠী ('নাগরিক', 'আরণ্যক', 'থিয়েটার', 'ঢাকা থিয়েটার' ইত্যাদি), কয়েকজন প্রতিভাধর নাট্যনির্দেশক (আলী যাকের, মামুনুর রশীদ, আবদুল্লাহ আল-মামুন, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, জামিল আহমেদ প্রমুখ) আর ক্ষমতাবান অভিনেতা (ফেরদৌসী মজুমদার, আসাদুজ্জামান নূর, আবুল হায়াৎ, শিমূল ইউসুফ প্রমুখ) এবং সর্ব-অর্থে মৌলিক নাট্যকার (সৈয়দ শামসুল হক ও সেলিম আল দীন) বাংলাদেশের থিয়েটারকে যে-অনন্যতা দিয়েছে, তা সাম্প্রতিক ও সমকালীন।

অথচ একটা বড়ো কৌতুকের দিকও আছে। ঢাকা বা বাংলাদেশের অন্যান্য শহরে স্থায়ী ভালো মঞ্চ নেই বললেই চলে। সামান্য যে-কয়েকটিতে কাজ চালানো হয়, তা বেশ নিচু মানের। সে-সব মঞ্চের কোনো বিস্তার বা গভীরতা নেই, দর্শকাসনও আরামহীন ও অপ্রতুল। আধুনিক ব্যবস্থাপত্র বলতে যা বোঝায় তার প্রায় কিছুই নেই। ঢাকা-র মহিলা সমিতি মিলনায়তন বা গাইড হাউস মঞ্চে যাওয়ার অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা অবশ্যই হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছেন। মফস্বলে টাউন হলে বা বাঁশ বেঁধে মঞ্চ তৈরি করে কিংবা অনুরূপ অস্থায়ী ব্যবস্থায় নাটকাভিনয় হয়। কোথাও হয়তো ছোটোখাটো স্থায়ী মঞ্চও আছে, কিন্তু সে-ও উৎফুল্ল হওয়ার মতো নয়। মঞ্চের এরকম দীন অবস্থা, কিন্তু এই থিয়েটারে যাঁরা দর্শক হিশেবে বা অভিনেতা-নির্দেশক হিশেবে আসেন, তাঁরা কিন্তু মোটেই দীন নন। টিকিটের হার হিশেবে আনলেই বোঝা যায় (প্রায়ই ৫০ বা ১০০ টাকা)। কিংবা থিয়েটারের উদ্যোক্তাদের ঠাটবাট দেখলে আমরা অবাকই হই।

ওখানেও এর কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না তা নয়। একাধিক আড্ডায় শুনেছি একই রসিকতা—কলকাতায় বাসে-ট্রামে ঝুলতে-ঝুলতে এসে শিল্পীরা শীততাপনিয়ন্ত্রিত আধুনিক মঞ্চে অভিনয় করেন, আর ঢাকায় তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ঠান্ডা ঘর বা গাড়ি থেকে বেরিয়ে ঢোকেন ওই ভ্যাপসা গরম অন্ধকূপে। অনেকদিন ধরে, প্রায় মঞ্চ-থিয়েটারের গোড়ার যুগ থেকেই, তা নিয়ে খেদপ্রকাশ বা স্থায়ী মঞ্চের জন্য আবেদন বা দাবি জানানো চলে আসছে—কিন্তু অবস্থার কোনো বদল হয়নি (হয়তো সুরাহা এখন কিছু হবে—ঢাকা সিটি করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে 'ঢাকা মহানগর মঞ্চ' দর্শকদের জন্য উদ্বোধনের অপেক্ষায় এবং শিল্পকলা একাডেমীর চত্বরে 'জাতীয় নাট্যশালা'র মঞ্চ অনেকদিন ধরেই নির্মীয়মাণ—কিন্তু না আঁচালে বিশ্বাস নেই)।

এটাই বরং বিস্ময়ের যে, এরকম করুণ অবস্থাতেও, একাত্তর-পরবর্তী স্বাধীন দেশে, অন্য অনেক নৈরাশ্য ও পতন সত্ত্বেও, জাঁক করার মতো নাটক সেখানেই লেখা হল এবং তার মঞ্চরূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলেই। এই মুগ্ধতাই প্ররোচিত করে ঢাকা-র এবং সেই সূত্রে ওই অঞ্চলের, যাকে আমরা একদা পূর্ববঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তান বলতাম, আজ তার নবজন্মের পর বলি 'বাংলাদেশ', তার নাট্য-ঐতিহ্যকে জানতে এবং চিনতে। কেননা তা হলেই হয়তো আরো স্পষ্ট হবে এই নতুন থিয়েটার ঠিক কোথায় স্বতন্ত্র এবং অনন্যপূর্ব।

১

এই ঐতিহ্যকে যাঁরা প্রাচীন বা মধ্যযুগ পর্যন্ত নিয়ে যেতে চান—বস্তুত বাংলাদেশেরই দুজন নাট্য-ব্যক্তিত্ব জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সেটাই—তাঁদের জবানিতে জানতে পারি, এর প্রকাশ বিভিন্ন গ্রামীণ লোকনাট্যে এখনো আছে, ক্ষীণভাবে হলেও। সেই লোকনাট্যগুলির (যেমন যাত্রা-পালা, পাঁচালি, গীতিকা ইত্যাদির) পীঠস্থান হিশেবে পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলির কথা লোকসংস্কৃতির ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেছেন।

ইওরোপীয় রীতি প্রভাবিত নাট্যকলার স্বতন্ত্র ধারা ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য ছোটো শহরে শুরু হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি, অর্থাৎ কলকাতার কিছু পরে। বয়সে প্রাচীনতর হলেও ঢাকা তো তখন ছোটো মফস্বল শহর। ইংরেজ-শাসনের প্রথম পর্বে ঢাকায় সাহেবরা নিজেদের মধ্যে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করে ১৮৫৭ সালে, বলা বাহুল্য ইংরেজি ভাষায়। বিস্ময়করই বলতে হবে, ঠিক সমকালেই (১৮৫৬-৫৭) বাঙালিদের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল বরিশাল শহরে—এক

বছর আগে লেখা দুর্গাদাস করের 'স্বর্ণশৃঙ্খল' নাটক। আর ১৮৬১-তে ঢাকায় বাঙালির প্রথম মঞ্চস্থ নাটক 'নীলদর্পণ'।

এ-সময়ই 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' থেকে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা-র বিভিন্ন নাট্য-সংস্থার কথা শুনি। উনিশ শতকে, ষাটের দশকের গোড়ায়, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'। এক দশকের মধ্যেই আরো একটি নাম পাওয়া যায়—'পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ'। রঙ্গভূমি ও নাট্যসমাজের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক পরিষ্কার নয়। দুটো একই প্রতিষ্ঠান, অথবা পরিপূরক ও ঘনিষ্ঠ। ইংরেজিতে তাদেরই বলা হয়েছে 'ইস্টবেঙ্গল ড্রামাটিক হল'। নাট্যোদ্যোগের একেবারে সূচনাপর্বে এই 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' বা 'পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ' বা 'ইস্টবেঙ্গল ড্রামাটিক হল'-এর একটা বিরাট ভূমিকা ছিল।

উনিশ শতকের সত্তর আর আশির দশকে পূর্ববঙ্গের থিয়েটারের ক্ষেত্রে একটা প্রবল উদ্দীপনা তৈরি হয়েছিল বলেই মনে হয়। তাই তো 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' বা 'পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ' ছাড়াও একের পর এক নাম শুনি : 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার', 'নবাবপুর এমেটিয়ার থিয়েটার কোম্পানী', 'তাঁতিবাজার এ্যামেচার থিয়েটার', 'নবাবপুর ইলিশিয়াম থিয়েটার', 'সনাতন নাট্যসমাজ', 'ক্রাউন থিয়েটার' ইত্যাদি। 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'-র ভবনটি ভেঙেই তৈরি হয়েছিল 'ক্রাউন থিয়েটার'। এরপর বিশ শতকের প্রথমে পৌঁছোই 'লায়ন থিয়েটার'-এর পর্বে। শুধু ঢাকায় নয়, ঢাকা-র বাইরে বিক্রমপুর পাবনা টাঙ্গাইল নেত্রকোণা রাজশাহী কুমিল্লা দিনাজপুর বগুড়া যশোর ময়মনসিংহ রংপুর ফরিদপুর বা চট্টগ্রামের বিভিন্ন শহর ও গ্রামেও এই ইওরোপীয় আদর্শের মঞ্চনাটক ও থিয়েটার ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ঢাকায় এই উৎসাহ এতটাই সঞ্চারিত হয়েছিল যে উনিশ শতকের সত্তরের দশকেই টিকিট বিক্রি করে সপ্তাহের নির্দিষ্ট কয়েকদিন পেশাদারি অভিনয়ের ব্যবস্থাও সম্ভব হয়েছিল (অবশ্য বেশিদিন তা টেকেনি)। এই সময়েই যে কলকাতা থেকে 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' ও 'ন্যাশনাল থিয়েটার' এবং আশির দশকে 'স্টার কোম্পানী' ও 'বীণা থিয়েটার' ঢাকায় এসে মহাসাফল্যে অভিনয় করতে পেরেছিল, তাতে প্রমাণিত হয়, পরিবেশ কতটা অনুকূল ছিল থিয়েটারের পক্ষে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে সেই উদ্দীপনা কিছুটা স্তিমিত হয়ে গেল বলেই মনে হয়। তবু, এই সময়ে ঢাকা-র থিয়েটারের জগতে দুটি লক্ষণ বেশ চোখে পড়ে। প্রথমত, পাড়ায়-পাড়ায় বিভিন্ন মহল্লার নামে অনেকগুলো নাট্যদল বা ড্রামাটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ও সক্রিয়তা—যেমন 'উয়ারী ড্রামাটিক ক্লাব', 'টিকাটুলি ড্রামাটিক ক্লাব', 'আর্মানীটোলা ড্রামাটিক ক্লাব', 'গেণ্ডারিয়া ড্রামাটিক ক্লাব', 'ফরাশগঞ্জ ড্রামাটিক ক্লাব' ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, স্কুল-কলেজে, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর

বিভিন্ন ছাত্রাবাস বা হল-এ (যেমন ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, সলিমুল্লা মুসলিম হল ইত্যাদিতে) বিভিন্ন উপলক্ষে নাটকাভিনয়ের আয়োজন। বস্তুত, ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই হলগুলি তৈরি হয় এবং তখন থেকেই তাদের কেন্দ্র করে অভিনয়ের শুরু।

আরো একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। এতকাল পূর্ববঙ্গে যে-নাট্যোদ্যোগ তার প্রায় সবটাই মূলত হিন্দু মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অভিনয় বা নির্দেশনা বা আনুষঙ্গিক কাজকর্মে তাঁরাই অংশ নিতেন। মধ্যযুগ পর্যন্ত যে দেশজ নাট্যক্রিয়ার কথা বলা হয়, তাতে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই ভূমিকা ছিল। কিন্তু এই ইওরোপীয় মঞ্চনির্ভর থিয়েটারের আয়োজনে তো বিত্তবানদের, বিশেষ করে মধ্যবিত্তেরই সক্রিয়তা থাকা সম্ভব। উনিশশতকী আধুনিকতার উন্মেষ এবং সেই মধ্যবিত্ত-চেতনার সূত্রপাত হিন্দুদের মধ্যেই অনেক আগে ঘটেছে। মুসলিম মধ্যবিত্তের বিলম্বিত জাগরণ অনেক পরে শুরু হয়েছে। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অনেক ক্ষেত্রেই ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ছিল হিন্দু মধ্যবিত্তেরই কর্তৃত্ব। নাটক বা থিয়েটারের ক্ষেত্রে তা-ই হবে, সে তো খুবই স্বাভাবিক।

বিশ শতকেও দেখতে পাওয়া যায়, শুধু ঢাকায় নয়, পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত জেলায়, মফস্বল শহর বা বর্ধিষ্ণু গ্রামেও এই থিয়েটার পৌঁছে যাচ্ছে। একদিকে এই ছড়িয়ে পড়াটা যেমন ঠিক, তেমনি ঢাকা শহরে, অন্তত গত শতকের সত্তর-আশি দশকের স্ফূর্তির তুলনায় নাট্যজগৎ যেন একটু ম্লান হয়ে পড়েছে, এও লক্ষ করেছেন অনেকে। আগের যুগে নাচ গান প্রভৃতি হালকা বিনোদনের মধ্য দিয়ে যে-পেশাদারিত্বের লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল, তা চলে গেল। এখন, পাড়া বা অফিস বা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক অপেশাদার অনিয়মিত শৌখিন (বা কখনো-কখনো বলা যায় হুজুগে) নাট্যচর্চাই যেন প্রাধান্য পেল। এমনকী ঢাকার বহু নাট্যমঞ্চ সিনেমা হলে রূপান্তরিত হল। পেশাদার কোনো নাট্যগোষ্ঠী নেই, স্থায়ী কোনো মঞ্চ নেই, নতুন কোনো উৎসাহ নেই। ব্যতিক্রমী দিক শুধু একটাই বলা যায়, উর্দু নাট্যচর্চা বেশ জমে উঠেছিল ঢাকায় এবং ইসলামি চেতনা সম্পন্ন বা উপাদানসংবলিত কিছু-কিছু নাটকও লেখা হয়েছিল।

নাট্য-ব্যাপারে এই উৎসাহহীনতার একটা কারণ নিশ্চয়ই এই : নতুন কিছু ঘটছে না বা ঘটানো যাচ্ছে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, যে-নাটকগুলি অভিনীত হত, তার মধ্যে কোনো স্বকীয়তা বা নিজস্বতা ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় কলকাতার চালু নাটকগুলিরই অনুসরণ। নাট্যজগৎ সেই সময়, আগেই বলা হয়েছে, হিন্দুরাই মূলত অধিকার করে রেখেছিল—কেউ-

কেউ বলেছেন ঢাকার রক্ষণশীল মানসিকতার হিন্দুরা। তাই পৌরাণিক নাটক, বিশেষত মনোমোহন বসু-র নাটক, কলকাতার মতো এখানেও সবচেয়ে সমাদরে অভিনীত হতে দেখা যায়। গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল, কিংবা তারও আগের মধুসূদন বা দীনবন্ধুর নাটকের অভিনয়ও। এ ছাড়া কলকাতার জনপ্রিয় ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্করের নাটক কমবেশি। স্থানীয় নাট্যকারেরাও ছিলেন, কিন্তু তাঁদের নাটক প্রায়শই কলকাতার নাটকেরই প্রায় হুবহু অনুকরণ। পূর্ববঙ্গেরই নাট্যকার ব্রজগোপাল দাস এ-সব লক্ষ করেই বলেছিলেন : "পাশ্চাত্যের নকল থিয়েটারের পীঠভূমি কলকাতা। আর কলকাতার নকলের পীঠভূমি ছিল ঢাকার থিয়েটার। এ ব্যাপারে এখানে মৌলিকত্ব বলতে কোনো কিছুই ছিল না।" তবু, এরই মধ্যে উল্লেখ করার মতো ঘটনা, ১৮৭১-এ কুষ্টিয়ায় মীর মশররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ'-এর অভিনয়।

এই শতকের চল্লিশের দশকে কলকাতা-কেন্দ্রিক থিয়েটারের জগতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব। পূর্ববঙ্গের জেলা-শহরগুলিতে, ঢাকায় তো বটেই, সমাজ ও রাজনীতি সচেতন গণনাট্য আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছোল। ঢাকা বা পূর্ববঙ্গের মানুষদের নিজস্ব তাগিদ তো ছিলই। কলকাতার গণনাট্য সংঘ ১৯৪৫-এ বরিশালে এসে 'নবান্ন' অভিনয় করে গেল। ওরই কাছাকাছি কোনো সময়ে যশোরে স্থানীয় উদ্যোগে তার অভিনয়ও হল। তার আগেই ১৯৪৩-এ 'ঢাকা থিয়েটার্স' নামের নাট্যদল ব্রজগোপাল দাসের 'মেশিন ও মানুষ' নাটকাভিনয় করে নতুন ভাবনার পরিচয় দিয়েছিল। অল্প কিছু পরে তারাই রণেশ দাশগুপ্ত-র সমাজসচেতন একাঙ্কিকা 'আমন ধান' আর 'ওরা ঘর বাঁধতে চায়' মঞ্চস্থ করে। কিন্তু এও তো কলকাতার নাটকের ধারাতেই চলা। কলকাতার মামুলি সেকেলে নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি এইসব ব্যতিক্রমী নাট্যপ্রয়াসের ক্ষেত্রেও কলকাতারই অনুবৃত্তি। ঢাকা বা পূর্ববঙ্গের নিজস্বতার চিহ্ন তখনও পাওয়া যায়নি কোনো।

আগেই বলা হয়েছে, ১৯৪৭ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বলতে হিন্দুদেরই বোঝাত এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মের মতোই নাটক রচনায় বা প্রযোজনায় তাঁদেরই ছিল অগ্রণী ভূমিকা। ইতিমধ্যে, বিশ শতক থেকে (হয়তো আরো সঠিক হবে উনিশ শতকের শেষভাগ বললে) বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তার অল্পস্বল্প শুরু হয়েছিল, মুসলমান শিক্ষিত সংস্কৃতিসচেতন মধ্যবিত্তের সংখ্যা ধীরে-ধীরে হলেও বাড়ছিল—কিন্তু তবু দেশভাগের আগে পর্যন্ত তাঁদের সংখ্যা সামগ্রিক

বিচারে খুবই নগণ্য। নাট্যচর্চায় তাঁদের কোনো ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। দেশভাগের পর হিন্দু মধ্যবিত্তরা বিপুলভাবে যেমন ক্রমশই পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে গেছে, তেমনি তার জায়গা বেশ খানিকটা পূরণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগন্তুক মুসলমান মধ্যবিত্তেরা। দেশের ভেতরে গড়ে-ওঠা এবং বাইরে থেকে আসা, দুই মিলে মুসলমান মধ্যবিত্ত ক্রমশই একটা শক্তিশালী আকার ধারণ করল। আসকার ইবনে শাইখের লেখায় পড়েছি সাতচল্লিশের আগের হিন্দু নাট্যব্যক্তিত্বেরা কীভাবে ভারতে চলে গেলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে থিয়েটারের শিক্ষা ও উপকরণও প্রায় উধাও হয়ে গেল। আর তার জায়গায় কলকাতার নাট্য-অভিজ্ঞতা নিয়ে ঢাকায় এলেন নূরুল আনাম খান, আবদুল মজিদ, নূরুল ইসলামের মতো ব্যক্তিরা। পূর্বপাকিস্তানের থিয়েটারে এই নবজাগ্রত মুসলমানেরাই ক্রমশ স্বাবলম্বী বা স্বনির্ভর হয়ে উঠলেন। 'বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা' বইতে ড. মুহম্মদ মজিরউদ্দিন বাঙালি মুসলমানের নাট্যচর্চার আদিকথা বিশদভাবে বলেছেন। ১৯৫০ নাগাদ ঢাকার মঞ্চে "উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতিমনা অপেশাদার বাঙালি মুসলমান নাট্যানুরাগী"র প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটল, এরকম দাবি করা হয়েছে।

যে-ঢাকা এতকাল বস্তুত একটা মফস্বল শহরের ধরণ-গড়ন নিয়েই ছিল, এই প্রথম সেই শহর মহানগরী হওয়ার দিকে ঝুঁকল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষাকেন্দ্র হিশেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠল। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরেই সে-সময়ে ভাষা-আন্দোলন ও পরবর্তী রাজনৈতিক সংগ্রাম যেমন উত্তাল হয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উদ্যোগেরও প্রসার ঘটছিল। থিয়েটার বা সামগ্রিকভাবেই নাট্যচর্চা তার মধ্যে একটি। বিভিন্ন ছাত্রাবাস বা হলকে কেন্দ্র করে যে-নাট্যানুষ্ঠানের কথা আগেই বলা হয়েছে তারও বিস্তার ঘটল।

১৯৫১-তে 'ডক্টরস ক্লাব' তাঁদের 'বিজয়া' নাটকের প্রযোজনায় "প্রথম মহিলা-পুরুষ মিলিত শৌখিন নাট্যাভিনয়" করে। ওই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সংস্কৃতি সংসদ' বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' মঞ্চস্থ করে, হাবিবুল হকের প্রযোজনায়। ১৯৫২-তে শরফুল আলমের উদ্যোগে হাবিবুল হকের নামে গঠিত হয় 'হাবিব প্রোডাকসন্স'—সে-সময়ে সবচেয়ে বেশি নাটকের প্রযোজনা যাদের কৃতিত্ব। ১৯৫৩-য় কার্জন হলে রংপুর জেলা সমিতি হাজির করে 'ছেঁড়াতার' এবং তাতে পুত্রকন্যা সহ অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দীন।

সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে অবশ্য তখনো দেখা যায়, কলকাতার প্রচলিত ও জনপ্রিয় নাটকগুলিই বেশি অভিনীত হচ্ছে। তার মধ্যে যথারীতি চেনা ঐতিহাসিক এবং বোধহয় ততোধিক চেনা সামাজিক নাটকগুলিই ঘুরেফিরে আসে। সে-সময়ের

অভিনয়ের তালিকায় রবীন্দ্রনাথ (বিশেষ করে 'চিরকুমার সভা') আর শরৎচন্দ্র (বিশেষ করে 'বিজয়া'), তারাশঙ্কর (বিশেষ করে 'দুই পুরুষ' বা 'দ্বীপান্তর') এবং সেই সঙ্গে শরদিন্দু, বনফুল, পরশুরাম বা প্রমথনাথ বিশী-র নাটকগুলির উল্লেখ দেখি বারবার। কলকাতাকে অনুসরণ করে বিধায়ক ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত কিংবা তুলসী লাহিড়ীর নাটক (তাঁর 'পথিক' বা 'ছেঁড়াতার') শুধু ঢাকায় নয়, মফস্বল-শহরেও মঞ্চস্থ হচ্ছে ব্যাপকভাবে। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'শাজাহান', 'টিপু সুলতান' বা 'সিরাজদ্দৌলা' যে বিশেষ প্রাধান্য পায়, তার কারণ, শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমে যেমন, তেমনি নাটকেও কখনো-কখনো মুসলিম আত্মসচেতনতা বা পাকিস্তানি দেশাত্মবোধে কোনো-কোনো নাট্যকার বিশেষভাবেই আক্রান্ত হন। সে-সব নাট্যকার বা নাটকের নাম হয়তো ইতিহাসের পাঠকেরাই শুধু মনে রেখেছেন। আকবরউদ্দীনের 'সিন্ধুবিজয়' বা 'সুলতান মাহমুদ' বা 'আযান'-এর কথা, ইব্রাহিম খাঁ-র 'কামাল পাশা' বা 'আনোয়ার পাশা'-র কথা, কিংবা শাহাদাৎ হোসেনের 'সফররাজ খান' বা 'আনারকলি'-র কথা তাঁরা ছাড়া আর কে-ই বা জানেন এখন! এরকম ইসলামি দেশাত্মবোধক নাটক আরো অনেকই লেখা হয়েছে পাকিস্তানি পর্বে, অচিরে তা হারিয়েও গেছে।

তা বলে কলকাতার পদানুসারী বিনোদন-নাটক এবং পাশাপাশি ইসলামি ঐতিহ্যের নাটক—এই দুই ধরণই চলছিল এমন নয়। পাকিস্তানি আমলের গোড়া থেকেই (বস্তুত দেশভাগের কিছু আগে থেকে) নাট্যকার হিশেবে কয়েকজনের নাম পেয়ে যাচ্ছি, যাঁরা অখণ্ড নাট্যধারাকে বহন করেও ওই ভূখণ্ডের স্বতন্ত্র পরিচয়কে অন্তত বেশ কিছুটা তুলে ধরেছেন। শুধু নাট্যরচনাই নয়, প্রযোজনা অভিনয় এবং সর্বাঙ্গীণ নাট্যকর্মেই জড়িত তাঁরা—মঞ্চাভিনয়ে জনপ্রিয়ও তাঁদের নাটক। তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম অন্তত নিঃসংকোচে করা যায়—নুরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ ও মুনীর চৌধুরী। পাশাপাশি হয়তো আরো অনেক নামই এসে যাবে (যেমন আনিস চৌধুরী, ওবায়েদুল হক, বজলুর রশীদ, কল্যাণ মিত্র প্রমুখ), কিন্তু এঁরা তিনজনই প্রধান। এরই সঙ্গে সাহিত্যের অন্য শাখাতেও কৃতির সাক্ষ্য রেখেছেন এমন বেশ কয়েকজনকে নাটকের চর্চাতেও কমবেশি মগ্ন হতে দেখি। কেউ প্রধানত কবি, কেউ গল্পকার বা ঔপন্যাসিক—কিন্তু নাটকেও তাঁরা তাঁদের সৃজনক্ষমতাকে প্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে আবুল ফজল, জসীমউদ্দীন, শওকত ওসমান, সিকান্দার আবু জাফর, সৈয়দ আলী আহ্সান, আলাউদ্দিন আল আজাদের নাম অবশ্যই করতে হয়। তবে সবাইকে ছাড়িয়ে শিল্পগুণে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উচ্চার্য তিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্।

২

পাকিস্তানি আমলের ওই ত্রয়ীর মধ্যে নুরুল মোমেন বয়সে কিছু বড়ো (জন্ম ১৯০৮)—মুনীর চৌধুরী এবং আসকার ইবনে শাইখ সমবয়সী (উভয়েরই জন্ম ১৯২৫)। কিন্তু নাট্যরচনা ও প্রকাশনার দিক থেকে তাঁরা তিনজনই খুব কাছাকাছি। তিনজনেরই প্রথম নাটক দেশভাগের অব্যবহিত আগে রচিত, কিন্তু তাদের অভিনয় এবং তাঁদের পরবর্তী বিকাশ পূর্বপাকিস্তান-পর্বে। আরো স্মরণীয়, এঁরা তিনজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন (নুরুল মোমেন ছিলেন আইন-এর অধ্যাপক, আসকার ইবনে শাইখ পরিসংখ্যানবিদ্যার, মুনীর চৌধুরী ইংরেজির) এবং তাঁদের নাট্যোদ্যোগের কেন্দ্র ছিল ওই বিশ্ববিদ্যালয়ই। কোনো-কোনো নাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভিনয়ের জন্যই লেখা। এটা আরো অনেকের ক্ষেত্রেই এ-সময় ঘটেছে। বয়ঃকনিষ্ঠ আনিস চৌধুরী-র (জন্ম ১৯২৯) একাধিক নাটক, বিশেষ করে বহু-অভিনীত 'মানচিত্র' ছাত্রদের অভিনয়ের কথা মনে রেখেই লেখা।

নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৪-এ, কলকাতার 'শনিবারের চিঠি'তে। নাটকটি প্রকাশ হওয়া মাত্রই উভয়বঙ্গেই খুব প্রশংসিত হয়। ফর্মের দিক থেকে অভিনব, অন্তত সে-যুগের বিচারে। একটিই মাত্র চরিত্র, একটিই দৃশ্য—তাতেই পঞ্চাঙ্কের আভাস। বাংলায় এরকম লেখা আগে হয়নি। কোনো-কোনো বিদেশী নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নাট্যকার। "গ্রিক ট্র্যাজেডির চিরাচরিত সময়, স্থান ও ক্রিয়ার ঐক্যত্রয়ের আঙ্গিক ঠিক রেখে চতুর্থ ঐক্য অর্থাৎ চরিত্রের একত্ব সংযোগ করে একটা পরীক্ষা"-র কথা নিজেই বলেছেন তিনি ভূমিকায়। শুধু তা-ই নয়, থিমের দিক থেকেও ক্রিস্টোফার মার্লো-র 'ডক্টর ফস্টাসে'র কথা উঠেছে—ফস্টাস যেমন তার আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল, তেমনি 'নেমেসিস'-এর একক চরিত্র শিক্ষক সুরজিত নন্দী সুলতাকে স্ত্রী হিশেবে পেতে নিজের নীতিবোধকে বিসর্জন দিয়েছে শ্বশুরের নীতিহীনতার কাছে। এই তুলনা পাঠককে বা শ্রোতাকে আবিষ্কার করতে হয়নি বা ভূমিকায় নাট্যকারকে বলে দিতে হয়নি—সুরজিতের উক্তির মধ্যেই আছে তার উল্লেখ : সেই নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন যন্ত্রণাবিদ্ধ নায়কের আত্ম-উপলব্ধি। এরকম একটা চরিত্র সৃষ্টি করা যেমন নুরুল মোমেনের কৃতিত্ব, তেমনি এর সঙ্গে চল্লিশের দশকের স্বদেশে যে দুর্ভিক্ষ ও চোরাকারবারিতে ঘেরা বাস্তব তাকে তুলে ধরাতেও তাঁর সাফল্য। কিন্তু 'নেমেসিস' যে-সার্থকতা এনেছিল, তা অবশ্য পরবর্তী নাটকগুলিতে দেখা যায়নি। 'নেমেসিস' ট্র্যাজেডি, কিন্তু পরে দেখা গেল তাঁর ঝোঁক কমেডির দিকে। তাঁর লেখা প্রহসনগুলি—'রূপান্তর', 'যদি এমন হতো', 'আলোছায়া', 'শতকরা আশি', 'যেমন ইচ্ছা তেমন' ইত্যাদিতে অন্য স্বাদ পাওয়া যায়।

মুনীর চৌধুরী-র খ্যাতি 'কবর' নাটকটির জন্য, কিন্তু তার আগেই 'রাজার জন্মদিনে' ১৯৪৬-এ মঞ্চস্থ হয়েছিল। এরকম আরো কয়েকটি কৌতুকনাট্য তিনি লিখেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য। শুধু তাঁরই বিখ্যাত রচনা নয়, বাংলাদেশের নাট্যজগতে প্রায় কিংবদন্তি এই 'কবর'। লেখা এবং প্রথম অভিনয় ১৯৫৩-য় (তারপর ছাপা হয় ১৯৫৫-তে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সংস্কৃতি সংসদে'র উদ্যোগে প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় ১৯৫৬-তে এবং বই হয়ে বেরোয় ১৯৬৬-তে)। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন যে নাটকটির প্রেরণা এ-কথা প্রায় সকলেই জানেন (এটা খুবই আশ্চর্যের যে বাহান্নর-র ভাষা-আন্দোলন নিয়ে গান বা কবিতা অনেক রচিত হলেও দুটি-একটি উপন্যাস, এবং নাটক বোধহয় একটিই, লেখা হয়েছে)। ১৯৫৩-র একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দী রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে লিখলেন আরেক রাজবন্দী মুনীর চৌধুরী। লণ্ঠনের আলোয় তার অভিনয় হয়েছিল কারাগারেই। প্রেরণা হিশেবে একটি বিদেশী নাটকের ('বারি দি ডেড') নাম করা হয়, রিয়েলিজম ও সুররিয়েলিজমের মেলবন্ধনে নাট্যরীতিও বেশ সাহসী ও অভিনব—কিন্তু স্বদেশের যন্ত্রণাময় সমকালীনকে প্রকাশ করাই যে লক্ষ্য তা অস্পষ্ট থাকেনি। 'কবর'-কে বলা হয় প্রথম প্রতিবাদী নাটক বাংলাদেশে—কেউ-কেউ এমনকী 'নীলদর্পণ' ও 'নবান্ন'-র ধারাবাহিকতাতেই দেখতে চান একে। বিদেশী নাটকের ছায়া থাকলেও এর মৌলিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। এ ধরণের নাটকে যে উঁচু গলা শোনা যায় তার জায়গায় সূক্ষ্ম অনুভবের প্রকাশই লক্ষণীয়। এইসব নানা কারণেই 'কবর'-এর আসন বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসে আলাদা। মুনীর চৌধুরী তারপর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আরো কয়েকটি নাটক লিখেছেন এবং অভিনীতও হয়েছে সঙ্গে-সঙ্গে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরেই মূলত) —যেমন 'রক্তাক্ত প্রান্তর', 'চিঠি', 'মর্মান্তিক' কিংবা 'দণ্ডকারণ্য'। এর কোনোটা পূর্ণাঙ্গ, কোনোটা একাঙ্ক, এবং বিভিন্ন মেজাজের। তবে কৌতুকময়তা বোধহয় তাঁর সব নাটকেই প্রধান উপাদান, এমনকী 'কবর'-এও। 'মানুষ' বা 'নষ্টছেলে'-র মতো রচনায় মানবিক আদর্শের টানটাও খুব জোরালো। 'দণ্ডকারণ্য' (১৯৬৫-তে লেখা) একেবারে ভিন্ন জাতের রচনা—তা নিয়ে অনেক কথাবার্তাই হয়েছে। কেউ-কেউ সেখানে অ্যাবসার্ড নাটকের প্রভাবও খুঁজেছেন। কৌতুক এবং অদ্ভুতের রস 'দণ্ডকারণ্য'-য় খুব বেশি—তাঁর প্রায় সব নাটকের মতোই। কিন্তু, সন্দেহ নেই, মুনীর চৌধুরীর একটা বড়ো ঝোঁক যে অনুবাদ ও রূপান্তরের দিকে, তা তাঁর রচনাপঞ্জির দিকে তাকালেই বোঝা যায়—সেখানে শেক্‌সপিয়র, বার্নার্ড শ এবং আরো অনেকেই আছেন। সব মিলিয়ে বলা যায়, পূর্বপাকিস্তানের বাংলা নাটককে মর্যাদা দিয়েছেন তিনি, আলোড়ন

তুলেছেন ছাত্র ও সহকর্মীদের নাট্যসংস্কৃতিতে—যদিও অনেক নাটক লেখার সময় তিনি পাননি। মুক্তিযুদ্ধের শহিদ হিশেবেই তাঁকে মাঝপথে থেমে যেতে হয়।

বরং তাঁর সহযোগী আসকার ইবনে শাইখ, দীর্ঘতর জীবনের কারণেই অন্তত, নাটক লিখেছেন সবচেয়ে বেশি। ১৯৪৭-এ বেরিয়েছিল তাঁর নাটক 'বিরোধ'—বোধহয় সেটাই তাঁর প্রথম। শাইখের লেখাতেই পড়েছি, ১৯৪৯-এ ফজলুল হক হলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'বিরোধ' অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল এবং সকলের তারিফ পেয়েছিল "মুসলমান সমাজ নিয়ে একজন মুসলমান নাট্যকার রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটক" বলেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে যে-নাটকগুলো সে-সময়ে মঞ্চস্থ হত, তার প্রায় সবকটির সঙ্গেই নিবিড়ভাবে জড়িত থাকতেন তিনি—এমনকী গাঁটের পয়সা খরচ করতেন তার পেছনে। এরপর চল্লিশের দশকে 'বিদ্রোহী পদ্মা', পঞ্চাশের দশকে 'বিল বাওড়ের ঢেউ', 'তিতুমীর', 'রক্তপদ্ম' 'প্রচ্ছদপট', 'অনেক তারার হাতছানি', 'লালন ফকির'-এর মতো নাটক একের পর এক লিখে গেছেন আসকার ইবনে শাইখ। নামকরণ থেকেই টের পাওয়া যায়, গ্রামীণ জীবন ও অভিজ্ঞতাকে তুলে আনার দিকে তাঁর প্রবণতা। নাটক হিশেবে সেগুলো হয়তো ততটা উজ্জ্বল নয়, কিন্তু নাট্যসংগঠক হিশেবে তাঁর কৃতিত্ব তাতে ম্লান হয় না—ছাত্রদের নিয়ে নাট্য-শিক্ষা, নাট্য-আলোচনা, নাট্য-প্রয়োগ ইত্যাদিতে তাঁর একটা বড়ো ভূমিকা ছিল দীর্ঘকাল।

সাহিত্যগুণ হয়তো বেশি পাওয়া গেছে নাটকের আংশিক সময়ের লেখকদের হাত থেকেই বরং, যাঁরা প্রত্যেকেই সমধিক পরিচিত কবি বা কথাকার হিশেবে। কয়েকজনের কথা অবশ্যই বলা যায়। আবুল ফজলও লিখেছেন বেশ কয়েকটি একাঙ্কিকা, নিজেরই বিখ্যাত উপন্যাস 'সাহসিকা'-র নাট্যরূপ 'প্রগতি' কিংবা ইসলামি জাতীয়তাবাদ প্রচারের ধারাতেই নাটক 'কায়েদে আজম'। জসীমউদ্দীন তাঁর নিজের কাব্যস্বভাবে পঞ্চাশের দশক জুড়ে লিখেছেন কয়েকটি লোকনাট্য—যেমন 'পদ্মাপার', 'বেদের মেয়ে', 'মধুমালা' বা 'পল্লীবধূ'। শওকত ওসমান ঔপন্যাসিক, কিন্তু সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্যায়ে ছিলেন নাট্যরচনায় সমানই তৎপর। ১৯৪৫-এ 'তস্কর ও লস্কর' লিখে তিনি সকলের নজর কেড়েছিলেন। মনে পড়ে যাবে, ঠিক একবছর আগে নুরুল মোমেন লিখেছিলেন 'নেমেসিস'। দুটি নাটকেরই নায়ক শিক্ষক এবং চল্লিশের দশকে পরিচিত সামাজিক দুর্নীতি ও অবক্ষয়ই বিষয়। অবশ্য হয়তো আর কোনো মিলই নেই। শওকত ওসমানের নাটকে সামাজিক ব্যঙ্গের থিম ফিরে-ফিরে আসে। ১৯৪৯-এ লেখা 'কাঁকরমণি' বা 'আমলার মামলা'-র নাম এ-প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। ১৯৫২-তে প্রকাশিত তাঁর 'বাগদাদের কবি' অবশ্য ভিন্ন জাতের

লেখা। আর ১৯৬৮-তে প্রকাশিত হয় 'ক্রীতদাসের হাসি'—বিখ্যাত উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন রামেন্দু মজুমদারের সঙ্গে মিলিতভাবে। কবি ফররুখ আহমদও ১৯৫১-তে লিখেছিলেন সামাজিক ব্যঙ্গনাট্য 'রাজা-রাজড়া' এবং ১৯৬১-তে কাব্যনাট্য 'নৌফেল ও হাতেম' : পুঁথি সাহিত্যের নাট্যরূপ। আরেকজন কবি সিকান্দার আবু জাফর পঞ্চাশের দশক থেকেই নাটক লিখেছেন—কিন্তু জনপ্রিয় হয়েছে 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' (১৯৬১-তে অভিনীত), যদিও আজ মনে হয়, তার চেয়েও স্মরণীয় 'মহাকবি আলাওল', দুটি রূপকনাটক 'মাকড়সা' ও 'শকুন্ত উপ্যাখ্যান'। সবকটিই ষাটের দশকে লেখা। 'শকুন্ত উপ্যাখ্যান' বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে তার আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যের কারণে—পাখির জগতে সমকালীন মানবজীবনের অভিজ্ঞতা আরোপিত হয়েছে যেখানে। শেষপর্যন্ত শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে শান্তিময় পরিণতির আশা প্রকাশ করে শেষ হয়েছে এই নাটক। কবি সৈয়দ আলী আহ্সান জাপানি নো-নাটকের আঙ্গিকে লেখন 'মুশতরী' ও 'কোরবানী'। উপন্যাসে বা গল্পতেও যিনি খ্যাত সেই আলাউদ্দিন আল আজাদ ষাটের দশকে যে-নাটকগুলি লিখেছেন, তার নাম 'ইহুদির মেয়ে', 'মায়াবী প্রহর', 'ধন্যবাদ' ইত্যাদি। 'ইহুদির মেয়ে' কাব্যনাট্য—এটি লেখা হয়েছে কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দী থাকা অবস্থায়, আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষের খবর কাগজে পড়তে-পড়তে, জেনেসিসের আখ্যানভাগ স্মরণ করে (তাঁর নিজেরই জবানিতে)। এই নাটকের অনেকগুলি হয়তো পাঠের জন্যই লেখা এবং অনেকাংশে গৃহীতও হয়েছিল সেভাবে—কিন্তু তথ্য হিশেবে জানতে পারি এর কোনো-কোনোটি শুধু ঢাকায় নয়, মফস্বলেও মঞ্চস্থ হয়েছিল।

এমনকী সাহিত্যগুণে সবচেয়ে বরণীয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র নাটকগুলিও, অল্প হলেও, অভিনীত হয়েছে। উপন্যাসের মতো নাটকরচনাতেও ওয়ালীউল্লাহ্ অতিশয় কৃপণ। চারটি নাটক লিখেছেন—তার মধ্যে একটি ছোটোদের জন্য। মাত্র তিনটি উপন্যাসেই তিনি যেমন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, তেমনি ওই চারটি নাটকই বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে তাঁকে অসামান্য মর্যাদা দিয়েছে। উপন্যাসের মতোই নাটকগুলিও একেবারে স্বতন্ত্র—একটির সঙ্গে আরেকটির মিল নেই। এগুলি মোটামুটি ষাটের দশকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত। 'বহিপীর'-এর প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৯৬১-তে, 'ড্রামা সার্কল'-এর উদ্যোগে। তখনই সকলেই লক্ষ করেছিলেন, নাটকটির বিষয় পরিকল্পনা সংলাপ সবই এত বিস্ময়করভাবে আলাদা ও আধুনিক অন্যদের তুলনায়। হয়তো খানিকটা সামাজিক নাটকই বলা যায়, কিন্তু দুই প্রজন্মের দ্বন্দ্বকে অভিনব শিল্পকুশলতায় হাজির করা হয়েছে। প্রত্যেকটি চরিত্রই আশ্চর্য বাঙ্ময়। পীর এখানেও আছে, কিন্তু এ একেবারে অন্য পীর, বহিপীর, প্রায় বিবেকের

ভূমিকা পালন করে। বৃদ্ধ পীর তো মিলতে পারে জমিদারের সঙ্গেই। আর তার অনিচ্ছুক স্ত্রী তাহেরা উধাও হয়ে যেতে পারে জমিদারপুত্র হাশেম আলীর সঙ্গে। সাধারণত সামাজিক নাটকে যে চেনা আদল পাওয়া যায় তা থেকে দূরে—ইঙ্গিত, রহস্য নানার্থ ব্যঞ্জনায় নাটকটি অনেকগুলো মাত্রা এনে দেয়। নতুন ও পুরোনোর দ্বৈতে প্রতিমুহূর্তে যেন রূপকের বিন্যাস ঘটতে থাকে। 'বহিপীর'-এর আঙ্গিক-চাতুর্য মুগ্ধ করে পাঠককে, দর্শককেও। বাকি দুটি নাটক 'উজানে মৃত্যু' ও 'তরঙ্গ ভঙ্গ' প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৬৩ ও ১৯৬৪-তে। দুটিকেই বিভিন্ন অভিধায় চিহ্নিত করেছেন সমালোচকেরা—কেউ বলেছেন অ্যাবসার্ড নাটক, কেউ বলেছেন এক্সপ্রেশনিস্ট বা অভিব্যক্তিবাদী নাটক। সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই—আধুনিক বিদেশী নাটকের প্রভাব যে নাট্যকারের চিন্তায় গভীরভাবে রয়েছে তাতে কোনো সংশয় থাকে না। ওয়ালীউল্লাহ্-র 'চাঁদের অমাবস্যা'-কে বলা হয়েছিল বাংলাভাষায় লেখা বিদেশী উপন্যাস। 'চাঁদের অমাবস্যা' সম্পর্কে ঠিক এ-কথা বলা যায় কিনা তা নিয়ে সংশয় হয়তো উঠতে পারে, কিন্তু একাঙ্কিকা 'উজানে মৃত্যু' যে খানিকটা তা-ই, তা নির্ভয়ে বলা যায়। গ্রামবাংলাই পটভূমি, কিন্তু তিনটি চরিত্রের (নৌকাবাহক, শাদা পোশাকের মানুষ আর কালো পোশাকের মানুষ) অন্তহীন কথাবার্তায় জীবন ও মৃত্যুর লড়াই এবং নৈরাশ্যের পরিণতি যে-ভাষায় ফুটে ওঠে তা ইওরোপীয় আধুনিক নাটকের পাঠকদের চেনা। তবু 'উজানে মৃত্যু' রচনার স্বকীয়তায় ওয়ালীউল্লাহ্‌রই। সেটা আরো স্পষ্ট 'তরঙ্গভঙ্গ'-তে। বিচারালয় ও জেলখানার দৃশ্যভাগে স্বামীসন্তান-হত্যার অভিযোগে অভিযুক্তা ভিখারিনী এবং অসহায় যন্ত্রণাবিদ্ধ জজের ভূমিকা, বস্তুত অন্য সব চরিত্রেরই ভূমিকা কিমিতির রহস্যে আবৃত—পশ্চিমি দর্শনের ছায়াপাতও স্পষ্ট টের পাওয়া যায়—তবু এই জটিলতা এবং বহুমাত্রিকতাকে সম্পূর্ণ বিদেশী বলা যাবে না। বরং মনে হবে, দারিদ্র্য ও কুসংস্কার লাঞ্ছিত বাংলাদেশের বাস্তবের ওপর দাঁড়িয়েই যে এই জটিল মননির্ভর শিল্পটি গড়ে তোলা হয়েছে, সেই অভিনব নিরীক্ষা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র নিজস্ব। এই দুরূহ নাটকটিও পরবর্তীকালে, একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশে, শুধু পঠিত ও আলোচিতই হয়নি, অভিনীতও হয়েছে। ১৯৭৮-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় নাট্যোৎসবে 'তরঙ্গভঙ্গ' হাজির করেছিল বগুড়া নাট্যগোষ্ঠী। এর আগের কোনো অভিনয়ের খোঁজ পাইনি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র নাটকগুলি যখন প্রকাশিত হচ্ছিল, অর্থাৎ ষাটের দশকের প্রথমার্ধ, তখনই আরেকজন নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটেছিল, যিনি নানা দিক থেকেই তাঁর সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর নাম সাঈদ আহমদ। যে-তিনটি নাটকের জন্য তাঁর

খ্যাতি—'কালবেলা', 'মাইলপোস্ট' ও 'তৃষ্ণায়'—সেগুলোর মধ্যে প্রথম দুটি অবশ্য অভিনীত হয়েছিল রচনার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই, প্রকাশকাল বরং অনেক পরে। 'কালবেলা'-র চরিত্রগুলি চর-এলাকার মানুষ। পটভূমি ৬১-র চট্টগ্রামের ঘূর্ণিঝড়। তাদের কথাবার্তা আপাতভাবে অসংলগ্ন। প্রায় ঘটনাবিহীন দৃশ্যগুলিতে—যেখানে কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো উত্তর নেই—প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ও ধ্বংসের মুখোমুখি পরম নির্বেদে "তারা মরণেরই মৃত্যু ঘটায়"। পুরোহিতের বার্তা শোনার জন্য যে-অপেক্ষা দিয়ে নাটক শুরু হয়েছিল, সেই অপেক্ষাই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা—তা "চেতনার রেশ রেখে যায়", "ব্যাপ্ত করে বোধের দিগন্তকে'। 'মাইলপোস্ট' নাটকে দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে "শুধু নিরন্নের হাহাকার নয়, মানবাত্মার সংকটের এক তীব্র আর্তনাদ" (উদ্ধৃতিগুলো সবই নাট্যকারের শিরোনামহীন ভূমিকা থেকে)। সাঈদ আহমদের এই নাটকদুটিকেও 'অ্যাবসার্ড নাটক' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বস্তুত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র চেয়ে পশ্চিমি প্রভাব এখানে আরো আকাঁড়া। নাটকটির নির্দেশনা যিনি দিয়েছিলেন সেই বজলুল করিম বলেছেন স্যামুয়েল বেকেট, ইউজিন আয়নেস্কো ও জাঁ পল সার্ত্র-এর কথা। সাঈদ আহমদ নাকি ওই পশ্চিমি অস্তিত্ববাদী দর্শনের জগতেই বিচরণ করেন। অথচ, দেখা যাচ্ছে, নাটকদুটিরই আশু প্রেরণা সমকালীন পূর্ববঙ্গের অভিজ্ঞতা। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র সঙ্গে সাঈদ আহমদের তফাত এখানেই যে, ওয়ালীউল্লাহ্-র নাটকের ওই বৈদেশিক প্রকরণভঙ্গিতে স্বদেশের অভিজ্ঞতা নিজের থেকেই বেরিয়ে আসে, সাঈদের নাটকে দূরত্বটা সমস্ত বাতাবরণেই। পটভূমির উল্লেখ প্রক্ষিপ্ত হয়েই থাকে, তা নাটকের সঙ্গে যেন মিশে যায়নি। অবশ্য এটা হয়তো লেখারই নিজস্ব ভঙ্গির ব্যাপার। তাই এ-কথা পড়ে আমরা পুরোপুরি অবাক হই না, সাঈদ আহমদ দুটি নাটকই নাকি প্রথমে ইংরেজিতে লিখেছিলেন—পরে তাঁর বন্ধুরা বাংলায় অনুবাদ করে দেন। শিল্পের ভাষার অনিবার্যতার প্রশ্ন যে সেখানে ওঠেনি সেটা নাটকটির ভাব ও প্রকরণের দূরত্বেরই আরেক প্রমাণ।

তবে একটা কথা ঠিক, গতানুগতিক বা নিছক শৌখিন থিয়েটারের বাইরে নিরীক্ষামূলক বুদ্ধিবাদী নাটকের যে-ধারা তৈরি হচ্ছিল পাকিস্তানি আমলে, তার বড়ো অবলম্বন, নুরুল মোমেন বা মুনীর চৌধুরীর পরে, এই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও সাঈদ আহমদ-ই। তা ছাড়া বাংলাভাষার ক্ল্যাসিকস (যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রধান) বা বিদেশী নাটকের সক্ষম অনুবাদ ও রূপান্তর তো ছিলই। নাট্যচর্চায় এই আত্মসচেতনতা অর্জনের দিক থেকে কতকগুলো ঘটনা আগে থেকেই ঘটেছে এবং পরেও তার অনুবর্তন হয়েছে—যেমন বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার সূত্রে

১৯৫১-তে 'সংস্কৃতি পরিষদে'র গঠন, ১৯৫৬-য় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক উৎসব, ১৯৫৭-তে ঢাকায় কলকাতার 'বহুরূপী'র সফর ও শম্ভু মিত্রের সাহচর্য, ১৯৬১-তে দেশব্যাপী রবীন্দ্রজন্মোৎসব ও নাট্যমৌশুম, ১৯৬৪-তে বাংলা একাডেমীর নাট্যমৌশুম ও ছ-দিন ব্যাপী নাট্যসাহিত্য ও নাট্যশিল্পের সেমিনার, নাট্য একাডেমী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, ইত্যাদি।

এই সূত্রেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৫৬-তে 'ড্রামা সার্কল'-এর প্রতিষ্ঠা। গ্রুপ-থিয়েটার নামটি তখনও বোধহয় চালু হয়নি, কিন্তু তারই আভাস এনে দেয় 'ড্রামা সার্কল'। ঢাকায় স্বাধীনতা-পরবর্তী নাট্যচর্চার পূর্বসূরি এই নাট্যগোষ্ঠীই। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে-দুজন তাঁরা হলেন মকসুদুস সালেহীন ও বজলুল করিম। বজলুল করিম পাশ্চাত্য আধুনিক নাট্যপদ্ধতির অনুরাগী ছিলেন, পারঙ্গমও ছিলেন। 'ড্রামা সার্কল' প্রযোজিত প্রধান নাটকগুলির নাম পরপর স্মরণ করলেই দেখা যাবে, পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ ও শৌখিন নাট্যচর্চার বাইরে আধুনিক ভাবনায় তাঁরা কতটা সজাগ—১৯৫৮-তে 'রক্তকরবী', ১৯৬১-তে 'তাসের দেশ' আর 'রাজা ও রানী' এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র 'বহিপীর', ১৯৬২-তে সাঈদ আহমদের 'কালবেলা'। এ ছাড়াও অজস্র বিদেশী নাটকের অনুবাদ তাঁদের প্রযোজনা-তালিকায়—এসকাইলাস, সফোক্লিস থেকে শুরু করে বার্নার্ড শ বা আর্থার মিলার। শুধু নাটক-নির্বাচনেই নয়, প্রয়োগের দিক থেকেও ইওরোপীয় থিয়েটারের আধুনিক প্রকরণ কিছু-কিছু এসেছে তাঁদের উদ্যোগেই। বজলুল করিম প্রমুখের ইওরোপ-বসবাসের অভিজ্ঞতা এ-প্রসঙ্গে মনে আসে। তবে তাঁদের শিক্ষাদীক্ষার বা অনুশীলনের সবটাই কাজে লেগেছে এমন বলা যাবে না। তার কারণ স্থায়ী ও উপযুক্ত মঞ্চের যে-অভাবের কথা বারবার উঠেছে তার তো সুরাহা হয়নি। তবে, এই সঙ্গে, 'ড্রামা সার্কল'-এর বাইরেও আগে-পরে বা সমকালীন ভিন্নধর্মী বুদ্ধিবাদী নাটকের যে-প্রচেষ্টা হচ্ছিল তাও বিস্মৃত হবার নয়। যেমন, ১৯৬১-৬২ নাগাদ সৈয়দ আলী আহ্সানের নেতৃত্বে, যদিও সরকারি উদ্যোগে, গঠিত হয়েছিল 'ড্রামা সিজন কমিটি'—তার অন্যতম কাজই ছিল 'নাট্য-মওসুম'-এর আয়োজন। বাংলা একাডেমীর ছোটো মঞ্চে অভিনীত হয়েছে মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর', সিকান্দার আবু জাফরের 'শকুন্ত উপাখ্যান' এবং আসকার ইবনে শাইখের একাধিক নাটক। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী' তো ছিলই, ছাত্র-অভিনেতা রামেন্দু মজুমদারের নেতৃত্বে—মুনীর চৌধুরী বা শাইখ ছিলেন তার উপদেষ্টা। শাইখেরই উদ্যোগে সংগঠিত 'সাতরং নাট্যগোষ্ঠী' মঞ্চে নামিয়েছিল সাঈদ আহমদের 'মাইলপোস্ট'। পরবর্তীকালের অনেক নাট্যকর্মীদের নাম খুঁজে পাওয়া যাবে এইসব উদ্যোগে—যেমন রামেন্দু মজুমদার, আতাউর

রহমান, আবদুল্লাহ্ আল-মামুন, জিয়া হায়দার প্রমুখ। পাকিস্তানি আমলের একেবারে উপান্তে ছিল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যচক্র'—যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আজকের সেলিম আল দীন, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, সালেক খান, রাইসুল ইসলাম আসাদ, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

দেখতে-দেখতে পাকিস্তানি পর্বের গণবিক্ষোভ ও গণ-অভ্যুত্থান মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে পৌঁছোল। নাট্যরচনা ও থিয়েটারও একটা বৃহত্তর পটভূমি খুঁজে পেল। সেই সময়টিতে বহু পথ-নাটক অভিনীত হয়েছে। 'উদীচী গোষ্ঠী' হাজির করেছিল 'শপথ নিলাম' ও 'রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য'। 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ'-এর পথ-নাটক 'ভোরের স্বপ্ন' এবং 'পারাপার গোষ্ঠী'-র 'পোস্টার'। সবকটিই ১৯৭১-এ প্রযোজিত, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের বছরে। ওই বছরই চট্টগ্রামে রচিত ও বিপুল জনসমাবেশে অভিনীত হয়েছে মমতাজউদ্দীন আহমেদের 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ১৯৭২-এ তাঁরই 'বর্ণচোরা'। কোনো-কোনোটিতে বিদেশী নাটকের ছায়াও পড়েছে। সহজেই আন্দাজ করা যায়, এরকম বহু পথ-নাটকই রচিত হয়েছে এই সময়ে। পথ-নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এগুলো সময়োপযোগী ভাবেই উঁচুগলা, উত্তেজক। পরে অবশ্য মমতাজউদ্দীন মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকাতে স্বস্থ নাটক লিখেছেন—যেমন 'বিবাহ' বা 'কী চাহ শঙ্খচিল'। এরকমই মুক্তিযুদ্ধের নাটক লিখেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ, জিয়া হায়দার, এমনকী নীলিমা ইব্রাহিম। এরই মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে ১৯৭৬-এ লেখা সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'—মুক্তিযুদ্ধের বিষয় বা উপলক্ষকে ছাপিয়ে গেছে যার আবেদন। কিন্তু সে তো পরের পর্ব—বাংলাদেশের নাটক যখন সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।

৩

১৯৭২-এ, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পরে-পরেই, সেখানকার নাট্যচর্চা এক বিস্ময়কর ব্যাপ্তি, সমারোহ ও মাত্রা নিয়ে যেন নতুনভাবে পথপরিক্রমা শুরু করল। একসঙ্গে তৈরি হল অনেকগুলো নাট্যগোষ্ঠী, সঙ্গে পেলাম বহু নাট্যনির্দেশক, অভিনেতা, কলাকুশলী এবং নাট্যকার। বিস্ময় শুধু সংখ্যাগত প্রাচুর্যের কারণেই নয়, তাঁদের কৃতির মহিমার জন্যও। নাট্যোৎসাহী দর্শকদের সংখ্যাও ধীরে-ধীরে বাড়তে লাগল। অনেকদিন পরে আবার দর্শনীর বিনিময়ে তাঁরা থিয়েটার-হলে ঢুকতে রাজি হলেন, যদিও মঞ্চের দুরবস্থা আগের মতোই। কেন ঘটল এই উজ্জীবন? কিছু-কিছু ব্যাখ্যা খোঁজা যেতে পারে। এই সময়েই তো সচেতন নাট্যকর্মী ও দর্শকেরা মুক্তিযুদ্ধের

আদর্শে অনুপ্রাণিত। হয়তো শুধুই সরলভাবে নয়, কারণ স্বাধীনতার পরের অভিজ্ঞতা খুব সুখের ছিল না। পরিব্যাপ্ত অরাজকতা, মুজিবুর রহমানের মৃত্যু, গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির উত্থান সবকিছু মিলে স্বাধীনতার মূল্যবোধ ধুলোয় লুণ্ঠিত। তাই তখনই তো আবার সময় স্বাধীনতার বোধকে ফিরিয়ে আনার জন্য নতুন লড়াইয়ের। স্বাধীনতা-উত্তর নতুন থিয়েটারের মানুষেরা যাঁরা এই লড়াইয়ে শরিক, থিয়েটারই হয়েছিল তাদের হাতিয়ার। দর্শকেরাও ছিলেন এই লড়াইয়ের সঙ্গী। এই কারণেই কি স্বাধীনতা অর্জনের আত্মগৌরব এবং তার পুরুষার্থকে হারানোর বেদনা থেকে উঠে আসার প্রস্তুতি নাট্যকর্মী ও দর্শকদের মধ্যে একটা সম্মিলিত উৎসাহের সঞ্চার করেছিল? তা ছাড়া, এও ঠিক, পূর্ববর্তী নাট্যচর্চার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, তার সবকিছু নস্যাৎ করার মতো নিশ্চয়ই নয়, এর মধ্য থেকেই পূর্বসূরিদের কোনো-কোনো প্রয়াস অনুপ্রাণিতও করেছিল হয়তো। সবশেষে বলা যায়, এই নাট্যকর্মীদের অনেককেই সঞ্জীবিত করেছিল দেশবিদেশের অভিজ্ঞতা—কলকাতা থেকেই হয়তো শুরু, পরে ইওরোপের বহু জায়গাই ছিল তার উৎসভূমি। কিন্তু, সর্বোপরি বুঝতে পারি, এই কারণগুলির একটি বা সবকটি যদি সত্যি হয়ও, সবাইকে ছাপিয়ে নিশ্চয়ই প্রধান ভূমিকা নাট্যকর্মীদের ব্যক্তিগত প্রতিভাই—একসঙ্গে তার আবির্ভাব ও সমাবেশ কোনো রহস্যময় আপতিকতাতেই ব্যাখ্যাত হতে পারে শুধু।

এই ঘটনা যাঁরা ঘটালেন, তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের নাট্যচর্চার সঙ্গে অল্পস্বল্প জড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু তখন তাঁরা বয়সে খুবই তরুণ। অনেকেরই পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রায় সকলেই মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন ছাত্র, প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই সূত্রে তাঁরা কলকাতায় গেছেন এবং কমবেশি থেকেছেন। অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে কলকাতার তৎকালীন, অর্থাৎ ১৯৭০-৭১ এবং তার কিছু পরের থিয়েটার দেখেছেন এবং তাঁর রসগ্রহণ করেছেন। কলকাতায় তখন শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'বহুরূপী', 'পি-এল-টি' ও 'নান্দীকার'-এর যুগ। আরো অনেক দলই ছিল, যারা কলকাতায় নিয়মিত অভিনয় করে চলছিল বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে। তাদের কারো মুখে শোনা যায়, ভালো করে ভালো নাটক করার প্রতিজ্ঞা। কেউ-বা শ্রেণীসচেতন জঙ্গি রাজনৈতিক নাটক বেছে নিয়েছে। অন্য কেউ পাশ্চাত্যের নাটকের অনুবাদে বা রূপান্তরে মনোযোগী, কিন্তু প্রায় সবার ক্ষেত্রেই লক্ষ করা গেছে অসামান্য প্রকরণচাতুর্য, থিয়েটারি কলাকৌশলের দক্ষতা, আধুনিকতার বিভিন্ন ধরণ। বিশেষ করে যে-তিনজন নাট্যপ্রধানের কথা বলা হল, তাঁদের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ কলকাতার থিয়েটারের হাওয়াতেই ছিল। আগন্তুক তরুণেরা সব ব্যাপারেই

যে মুগ্ধ ছিলেন তা নয়, সমালোচনাও ছিল। তবু, কলকাতার এই থিয়েটার যে তাঁদের আলোড়িত করেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এটা তাঁরা নিজেরাই কবুল করেছেন তাঁদের বিভিন্ন লেখায় বা আলোচনায়। বিজয় অর্জিত হওয়ার পর তাঁরা ফিরলেন ঢাকায়। শুধু কলকাতা থেকেই নয়, আত্মগোপনের বিভিন্ন জায়গা থেকে। মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত, বিশেষত থিয়েটারের সূত্রে পূর্বেই পরিচিত এই যুবকদের একটু স্বতন্ত্র করে রেখেছিল থিয়েটারের টানই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে কিছু অনুশীলন, কিছু নিরীক্ষা ও ভাবনার পর তাই তাঁদের প্রশ্ন উঠল মনে, বিশেষ করে স্বাধীনতার অবমাননার পরিণামে আরো বেশি করেই উঠল, কী করবেন এই নতুন পরিস্থিতিতে! থিয়েটার-ই যেন তার জবাব। একসঙ্গে অনেকগুলো গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেল যেন বিদ্যুৎগতিতে। কিংবা আগের তৈরি দলই নতুন জোশ পেল। বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় তৈরি হল এক অভূতপূর্ব আলোড়ন।

প্রতিষ্ঠার দিক থেকে 'নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়' সবচেয়ে পুরোনো। ১৯৬৮-তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জিয়া হায়দার ও আতাউর রহমানের নেতৃত্বে। ১৯৭১-এর পরে যোগ দিলেন আলী যাকের, তাঁর কলকাতার অভিজ্ঞতা নিয়ে। এবং আরো অনেকেই। অচিরেই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল 'নাগরিক'। দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখানো, আবার অনেকদিন পরে, তারাই চালু করল। 'নাগরিক'-এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবার। প্রথমত বিদেশী নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তর নির্ভরতা। তাদেরই অবলম্বন মলিয়ের ('বিদগ্ধ রমণীকুল'), আলবের কামু ('ক্রস পারপাস') , এলবি ('এই নিষিদ্ধ পল্লীতে'), স্যামুয়েল বেকেট ('গডোর জন্য প্রতীক্ষায়') ইত্যাদি এবং সর্বোপরি ব্রেশট ('সৎ মানুষের খোঁজে', 'দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা', 'মোহনগরী', 'গ্যালিলিও', 'মাদার কারেজ')। এর অনেকগুলিই রূপান্তর এবং বোধহয় রূপান্তরেরও চেয়ে কিছু বেশি, যেমন শেক্‌সপিয়রের 'হ্যামলেট' অবলম্বনে 'দর্পণ' বা চিলি-র নাট্যকার অ্যারিয়েল ডর্ফম্যান অবলম্বনে 'মুখোশ'। এখানেও হয়তো কলকাতার প্রভাবই কাজ করেছে। আমরা তো জানি, ন্যাচারিলিস্টিক নাট্যধারার প্রতি অনীহাতেই একসময় পশ্চিমবঙ্গের থিয়েটার বিদেশী নাটকের দিকে তাকিয়েছিল। 'বহুরূপী', 'লিট্‌ল থিয়েটার', 'নান্দীকার' থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক পর্যন্ত যোগ্য নাটকের অভাবেই এই মুখাপেক্ষিতা। বৈদেশিক অনুপ্রেরণার নাট্যচর্চাতেই যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে চেয়েছিল কলকাতার থিয়েটার। বাংলাদেশের নাট্যজগতে তুলনীয় কাজটিই করতে চেয়েছে 'নাগরিক'। 'নাগরিক'-এর আলী যাকের এবং আতাউর রহমান, মনে আছে, একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, কেন এবং কীভাবে কলকাতার নাটক তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল—প্রকরণগত বুদ্ধির

চর্চা কেন জরুরি মনে হয়েছিল। 'নাগরিক'-এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, তাদের উদ্যোগের যৌথ চরিত্র। আতাউর রহমান, আলী যাকের, আসাদুজ্জামান নূর, আবুল হায়াৎ, সারা যাকের—এঁরা প্রত্যেকেই অসাধারণ অভিনেতাই শুধু নন, সেই সঙ্গে প্রত্যেকেই অনুবাদ বা রূপান্তর করেছেন, পরিচালনা করেছেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাট্যকর্মের সূত্রে সৃজনশীলতায় অংশ নিয়েছেন। বিদেশী নাটকে 'নাগরিক'-এর পক্ষপাত, কিন্তু সেটাই সব নয়। সঙ্গে-সঙ্গে বহুমুখী বিচিত্রতার দিকে ঝোঁক। বলেছেনও তাঁরা : "নাটক প্রযোজনায় আমরা বিচিত্রতায় বিশ্বাসী। বিশেষ কোনো মতবাদ বা দর্শনে বিশ্বাসী নই বলে বিশেষ ধরণের নাটকে আমাদের আগ্রহ শূন্য।" তাই তো ১৯৭২-এ তাদের শুরুই মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' দিয়ে, আতাউর রহমানের নির্দেশনায়। তারপর ১৯৭৩-এ বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস', আলী যাকেরের নির্দেশনায়। এদের যদি বলা হয় কলকাতার নাটক, তবে বাংলাদেশের মৌলিক নাটকও তাদের চোখ এড়ায়নি—রশীদ হায়দারের 'তৈল সংকট', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র 'বহিপীর', সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য 'নূরলদীনের সারাজীবন' এবং 'ঈর্ষা'।

'থিয়েটার' নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা ও প্রথম অভিনয় ১৯৭২-এ। ১৯৭৪-এ তারা 'কবর' হাজির করে—তখন থেকেই একের পর এক নাটকের নিয়মিত অভিনয়। বিচিত্রতা 'থিয়েটার'-এরও বৈশিষ্ট্য। শেক্‌সপিয়র ('ওথেলো', 'ম্যাকবেথ'), রবীন্দ্রনাথ ('দুইবোন', 'ঘরে-বাইরে'), বঙ্কিমচন্দ্র ('কৃষ্ণকান্তের উইল') বা জঁ আনুঈ ('আন্তিগোনে') —সর্বত্রই তাদের বিচরণ। স্বদেশী-বিদেশী সবরকমের ক্ল্যাসিকসের দিকেই চোখ। বাংলাদেশের সমকালীন নাটকও কখনো তাদের অবলম্বন—'কবর'-এর কথা আগেই বলা হয়েছে, মুনীর চৌধুরীর 'চিঠি'-ও, কিংবা সৈয়দ শামসুল হকের 'এখানে এখন' বা 'যুদ্ধ এবং যুদ্ধ'। তবে, সন্দেহ নেই, তাদের অভিনীত নাটকের সিংহভাগই আবদুল্লাহ্ আল-মামুন রচিত। 'সুবচন নির্বাসনে' ও 'এখন দুঃসময়' দিয়ে শুরু ১৯৭৪-এ—তারপর 'এখনও ক্রীতদাস', 'তোমরাই', 'কোকিলারা', 'স্পর্ধা', 'মেরাজ ফকিরের মা', 'তাহারা তখন'—সবই আল-মামুনের নাটক। নির্দেশনা, প্রযোজনা, মূল অভিনয়েও মামুন-ই—সঙ্গে রামেন্দু মজুমদার ও ফেরদৌসী মজুমদার। রামেন্দু মজুমদারের কথা থেকেই 'থিয়েটার'-এর প্রধান লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে : "নাটকের বিষয়বস্তু হিশেবে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের এক অক্ষয় সম্পদ। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের নাট্যকর্মীদের জন্যে নিরন্তর প্রেরণার উৎস।" সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও বলেছেন, "সমসাময়িক জীবন নিয়ে লেখা মৌলিক নাটককে দর্শকপ্রিয় করে তুলতে নিরলস চেষ্টা করেছি আমরা।"

'আরণ্যক' নাট্যদলও সমসাময়িক—অর্থাৎ ১৯৭২-এই তার প্রতিষ্ঠা। তারা 'কবর' দিয়েই যাত্রা শুরু করেছিল, এবং সে-অভিনয় 'থিয়েটার'-এর আগে। সে-বছরই মামুনুর রশীদের 'পশ্চিমের সিঁড়ি'-ও ছিল তাদের প্রযোজনার অন্তর্গত, যাকে "বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার নাটক' বলা হয়েছে। মামুনুর রশীদ-ই 'আরণ্যক'-এর প্রাণপুরুষ—নাট্যকার ও নির্দেশক। সঙ্গে যাঁরা ছিলেন বা আছেন, তাঁদের মধ্যে আজিজুল হাকিম বা মান্নান হীরা প্রমুখের নামও খুব শোনা যায়। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৭৭ থেকে মামুনুর রশীদের নাটক আবার অভিনীত হতে থাকে ধারাবাহিকভাবে—'ওরা কদম আলী', 'ওরা আছে বলেই', 'ইবলিশ', 'মে দিবস', 'গিনিপিগ', 'অববাহিকা', 'সমতট', 'পাথর', 'জয়জয়ন্তী' ইত্যাদি। মামুনুর রশীদের নাটক সবসময়ই প্রতিবাদী—মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। তিনি স্পষ্টতই বলেন, "নাটক শুধু বিনোদন নয়, শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার।" বলা বাহুল্য, এই স্লোগানধর্মী নাটকের স্বর খুব উঁচু তারে বাঁধা এবং ফর্মের ব্যাপারে বেশ উদাসীন, গতানুগতিক ও অতিপরিচিত। তবু তাঁর এই নাটকগুলির মধ্য দিয়ে রাজনীতিসচেতন যে-নাটকের ধারা তৈরি হয়েছিল, তাকে উপেক্ষা করা যায় না মোটেই। অবশ্য মামুনুর রশীদও তাঁর এই "উচ্চকিত সুর" থেকে সরে এসে কখনো অনুবাদ-নাটকে মনোনিবেশ করেছেন—শেক্সপিয়রের 'কোরিওলেনাস'-এর মতো নাটক প্রযোজনা করেছেন বাংলায়।

১৯৭৩-এ 'ঢাকা থিয়েটার'। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন নাসিরউদ্দীন ইউসুফ এবং সেলিম আল দীন—দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু। নাসিরউদ্দীন পরিচালক-নির্দেশক এবং সেলিম নাট্যকার—দুই প্রতিভার এই অসামান্য যুগ্মতাই 'ঢাকা থিয়েটার'-এর জোর। ১৯৭৩-এ সেলিম আল দীনের 'সঙ্বাদ কার্টুন' দিয়েই তাদের যাত্রা শুরু। এর পর প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে অজস্র নাটকের অভিনয়। 'ঢাকা থিয়েটার'-এর প্রযোজনায় দু-একটি বাদ দিলে সবই প্রায় সেলিমের নাটক। 'থিয়েটার'-এর যেমন আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'আরণ্যক'-এর মামুনুর রশীদ, তেমনি 'ঢাকা থিয়েটার'-এর প্রধান অবলম্বন সেলিম আল দীন। ১৯৭৫-এ মিউজিক্যাল কমেডি 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসি' জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। ১৯৭৮-এ 'শকুন্তলা' একটা মোড় ফেরা। ১৯৮১ থেকে সেলিমের নতুন অভিযান—'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল', 'হাত হদাই' পার হয়ে, 'যৈবতীকন্যার মন', 'চাকা', 'বনপাংশুল'—নাটকের নতুন সংজ্ঞা, নতুন প্রকরণ। সেলিমের সব নাটকেরই নির্দেশক নাসিরউদ্দীন—মাত্র 'চাকা' নাটকের নির্দেশক হিশেবে নাম পাই জামিল আহমেদের। অভিনয়ে এবং তার চেয়েও বেশি নির্দেশনার পরিপূরক কাজে পাই শিমূল ইউসুফ, সুবর্ণা মুস্তফা,

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাইসুল ইসলাম আসাদ, হুমায়ুন ফরীদি প্রমুখকে। 'ঢাকা থিয়েটার'-এর ক্ষেত্রেও সেই একই কথা—মূলত সেলিম আল দীনের মৌলিক নাটকের ওপর নির্ভর করলেও, তারাও বিদেশী নাটকের চর্চা করেনি এমন নয়। ব্রেশট্‌ অবলম্বনে 'ধূর্ত উই' এবং শেক্‌সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এ তাদের সেই রুচির বিস্তার অবশ্যই প্রমাণিত।

অগ্রণী চারটি দলের কথা বলা হলেও, এমন মনে করার কারণ নেই, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যচর্চার বহুকথিত ঐশ্বর্য এদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শুধু ঢাকায় নয়, চট্টগ্রাম বা বগুড়া-র মতো বহু মফস্বল-শহরেই এরকম আরো অজস্র সৃষ্টিশীল নাট্যগোষ্ঠী আজও সক্রিয়।

দেশব্যাপী এই সক্রিয়তার চমৎকার ছবি পাওয়া যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত জাতীয় নাট্যোৎসবগুলির বিবরণীতে। নাট্যোৎসবের ঐতিহ্য অবশ্য অনেকদিনের—দেশবিভাগের আগেও পূর্ববঙ্গের জেলা-শহরগুলিতে উৎসব আয়োজিত হত। কিন্তু জাতীয় নাট্যোৎসবের গুরুত্বের সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না। স্বাধীনতা-পরবর্তী সামগ্রিক নাট্যচর্চার আভাস পেতে এই জাতীয় উৎসবের দিকেই তাকানো যেতে পারে। ১৯৭৭-এ হয় প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসব। ঢাকা, খুলনা, পাবনা, দিনাজপুর, পটুয়াখালি, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, যশোর, নোয়াখালি, বগুড়া, কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল, রংপুর, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ জেলা থেকে ৩০টি নাট্যগোষ্ঠী ৩৬টি নাটক মঞ্চস্থ করে। সাংবাদিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, 'ঢাকা থিয়েটার'-এর 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসি' সবচেয়ে সাড়া জাগিয়েছে দর্শকদের মনে। বলা বাহুল্য, ঢাকা-র প্রতিনিধিত্ব সবচেয়ে বেশি—'বহুবচন', 'নাট্যচক্র', 'অবসর নাট্যসংস্থা', 'ঢাকা থিয়েটার' 'থিয়েটার', 'নাগরিক', 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। এ ছাড়া নাটক নিয়ে হাজির ছিল চট্টগ্রামের 'গণায়ন', 'থিয়েটার '৭৩', 'অরিন্দম' ; বরিশালের 'খেয়ালী' রাজশাহী-র 'রাজশাহী সাংস্কৃতিক সংসদ' ; দিনাজপুরের 'নবরূপী' ; রংপুরের 'শিখা সংসদ' ; কুমিল্লার 'যাত্রিক' ; সিলেটের 'বৈশাখী' ; পাবনা-র 'মঞ্চপরাগ' ময়মনসিংহের 'বহুরূপী' ; বগুড়ার 'বগুড়া নাট্যগোষ্ঠী'। স্মরণীয় যে 'বগুড়া নাট্যগোষ্ঠী' প্রযোজনা করেছিল মুনীর চৌধুরী-র 'দণ্ডকারণ্য' এবং পাবনা-র 'মঞ্চপরাগ' করেছিল শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'। পরের বছরই, অর্থাৎ ১৯৭৮-এ দ্বিতীয় জাতীয় নাট্যোৎসবে এসেছিল ২৩টি দল এবং নাটক হয়েছিল ২৬টি। প্রায় একই জেলা থেকে নাট্যদলগুলো এসেছিল—অতিরিক্ত ছিল গাইবান্ধা, চাঁদপুর, মুনশিগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার দল। ১৯৭৯-৮০-তে তৃতীয় জাতীয় নাট্যোৎসবে, মতভেদের কারণে, ঢাকার নাট্যগোষ্ঠীরা যোগ দেয়নি। এই উৎসবেই জেলা-ভিত্তিক নাট্য-

প্রতিযোগিতা হবে এবং তা থেকে উঠে আসা দলগুলো নাট্যোৎসবের চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশ নেবে, এরকম কথা হয়েছিল। আগের উৎসবে যোগদানকারী দলের বাইরে এবার যে নতুন জেলাগুলি থেকে নতুন দল উৎসবে এল, তাদের নাম : কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, জামালপুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম। অনেক বছর বাদ দিয়ে ১৯৯১-৯২-তে চতুর্থ জাতীয় নাট্যোৎসব। এই উৎসবে অংশগ্রহণকারী নতুন জেলা : ফেনি, সিরাজগঞ্জ, নরসিংদি। এইভাবে উৎসব ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে—বিশেষ করে চতুর্থ উৎসবে বর্ণবৈচিত্র্যও বেড়েছে। এই শেষ উৎসবে যোগ দিয়েছিল : ঢাকা-র 'আরণ্যক', 'সুবচন', 'শৈবাল', 'মহাকাল', 'ঢাকা নাট্যম', 'নান্দনিক', 'ঢাকা পদাতিক', 'রঙ্গনা', 'নাট্যচক্র', 'নাগরিক' ; 'নারায়ণগঞ্জ থিয়েটার' ; রংপুরের 'সারথি'; চট্টগ্রামের 'গণায়ন', 'রণশিঙ্গা', 'কথক', 'থিয়েটার '৭৩', 'অরিন্দম', 'অঙ্গন', 'তির্যক নাট্যদল' ও 'তির্যক নাট্যগোষ্ঠী' ; 'বরিশাল নাটক' ; সিলেটের 'কথাকলি' ; ফেনি-র 'সুবচন' ; রাজশাহী-র 'অনুশীলন' ; 'খুলনা থিয়েটার' ; কুষ্টিয়ার 'অনন্যা '৭৯' ; 'বগুড়া থিয়েটার' ; কুমিল্লা-র 'জনান্তিক'। তালিকা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ব্যাপ্তি এর চেয়ে ভালো আর কীভাবেই বা বোঝা যাবে! নাট্যরুচিতেও মফস্বল-শহরগুলি পিছিয়ে নেই—অভিনীত হয়েছে ঢাকা-র বিখ্যাত দলগুলির ইতিপূর্বে প্রযোজিত নাটকগুলিই। এমনকী বিদেশী নাট্যকার মার্লো, ইবসেন, শেক্‌সপিয়র, সোফোক্লিস, মলিয়ের, ব্রেশট-এর নাটকও। বিশেষ উল্লেখযোগ্য : সফদর হাশমি-র নাটকও পৌঁছে গেছে উৎসবে।

লক্ষ করবার ব্যাপার, বিদেশী নাটকের অবলম্বন কিন্তু এখনো অব্যাহত। শুধু 'নাগরিক' নয়, এমনকী মৌলিক নাটকের ওপরই যাদের একান্ত নির্ভরতা, তারাও (যেমন 'আরণ্যক' বা 'ঢাকা থিয়েটার') কমবেশি বিদেশী নাটক মঞ্চস্থ করেছে। নাটক-রচনাতেও তা-ই। এমনকী সেলিম আল দীন, যিনি নাট্যরচনার মৌলিকতায় প্রায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন, তিনিও তাঁর প্রথম পর্বের নাটকে কোনো না কোনোভাবে পাশ্চাত্য-প্রভাবিত (যেমন 'জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন', 'নীল শয়তান : তাহিতি ইত্যাদি', 'সঙ্‌বাদ কার্টুন' এরকম নাটকগুলিতে)। বিদেশী নাটকের কাছ থেকে এই ঋণ গ্রহণ তো আমরা পাকিস্তানি পর্ব থেকেই দেখেছি—সেই নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস' বা মুনীর চৌধুরীর 'কবর' আর 'দণ্ডকারণ্য', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র 'তরঙ্গভঙ্গ' বা সাঈদ আহমদের 'মাইলপোস্ট'-এর সময় থেকেই। পরবর্তীকালে সত্তরের কলকাতার প্রভাবের কথাও উঠেছে, কিংবা আরো পরের বিদেশযাত্রা ও ইওরোপীয় অভিজ্ঞতার কথা, কিন্তু মূল তাগিদটা ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্প-প্রকরণের নিরীক্ষা ও

অর্জনকে আত্মস্থ করা। একই কারণে ইওরোপীয় নাটক শুধু নয়, বাংলা নাটকেও যেগুলো ইতিমধ্যে ক্ল্যাসিক্স হিশেবে গণ্য তাকে কাজে লাগানো আত্মোন্নতির ভাবনায়। কিন্তু বাংলাদেশের নাট্যচর্চার এই পর্বের অসাধারণত্ব এখানেই যে, তার পাশাপাশি অবিরল এই মৌলিক নাটকের রচনা ও প্রযোজনা ঘটে যাওয়া। এটা যে ঘটতে পেরেছে তার বড়ো কারণ নিশ্চয়ই বেশ কয়েকজন মৌলিক ও প্রতিভাবান নাট্যকারের আবির্ভাব। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বলতেন, বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও প্রযোজনার দিকে গেলেই ভালো মৌলিক নাটক রচনার প্রেরণা পাওয়া যাবে, সেটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কতটা ঘটেছে জানি না, কিন্তু বাংলাদেশে অন্তত বহুকথিত 'ভালো মৌলিক নাটক নেই' এই খেদ অনেকটাই দূর হতে পেরেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, নাট্যদলগুলির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে এক-একজন নাট্যকার যেভাবে সত্তা-আবিষ্কারে বা চারিত্র্য-অর্জনে সক্ষম হয়েছেন এবং তার সঙ্গে বৃহত্তর নাট্যকর্মীদের সংযোগ ঘটেছে, তা বোধহয় আমাদের এপারে ঘটেনি। কেউ-কেউ বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি-সত্তার আবিষ্কার বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি নাট্যকার ও নাট্যকর্মীর লক্ষ্য। রামেন্দু মজুমদার তাই বলতে পারেন, "মুক্তিযুদ্ধ নাটকের জন্যে প্রধান অনুপ্রেরণা এবং চালিকাশক্তি হিশেবে কাজ করেছে। এক অর্থে বাংলাদেশের নব নাটকে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে। কেবল নাটক নির্মাণে নয়, নাট্যকর্মীদের নাট্যবোধকে শাণিত করতে কাজ করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আজ ভাবতে গর্ববোধ হয়, বাংলাদেশের প্রায় সব নাট্যকর্মীই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত।" তবে, বলা বাহুল্য, শুধু চেতনা থাকলেই তো হয় না, নাট্যকার ও নির্দেশকের প্রতিভার যে অলৌকিক সমন্বয় ঘটে যায় সেটাই শেষপর্যন্ত প্রকৃত উৎস। তবে তার মধ্যেও তর-তম অবশ্যই আছে। সেই প্রশ্ন ছাড়াই কয়েকজন প্রধান নাট্যকারের কথা বলা যায়।

মামুনুর রশীদ রাজনৈতিক নাটক লিখেই একশ্রেণীর দর্শক বা পাঠকের কাছে জনপ্রিয়। রাজনৈতিক নাটকে যে-রিয়েলিজম (বস্তুত ন্যাচারালিজম) খুব সহজেই আসে, তারই পুনরাবৃত্তি হতে দেখা যায় তাঁর নাটকে। নাটকের পর নাটকে এই গড়নটাই তিনি অনুসরণ করে চলেন। তাঁর চরিত্রগুলি সমাজের নিচুতলা থেকেই আসে, এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষণের ছবিই ফুটিয়ে তুলতে চান তিনি। কিন্তু রাজনৈতিক নাটকে যে একপেশে ও ছককাটা ভাবনা ও গড়ন অনায়াসে আসতে চায় তা থেকে মামুনুরের নাটকেরও যেন রেহাই নেই। ফলে চরিত্রায়ণে বা সংলাপে বা নাটকের মূল বক্তব্যে স্থূলতাকে এড়াতে পারেননি সবসময়। সমাজসচেতন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার জন্যই তাঁর একটা স্থান আছে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের নাট্যচর্চায়,

কিন্তু, ভাবনা ও আবেগের সারল্য ও স্লোগানের চাপ তাঁকে বেশিদূর এগোতে দেয় না। এরকম একমাত্রিক নাটক নিশ্চয়ই সবদেশেই লেখা হয়, পশ্চিমবঙ্গেও হচ্ছে আখচার। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে একটা চটজলদি ভূমিকাও পালন করে তারা। একটা কৃতির জায়গাও আছে তাদের। মামুনুর রশীদ অবশ্যই সেই কৃতিত্বের অধিকারী।

আবদুল্লাহ আল-মামুনও জনপ্রিয়—তবে তাঁর জনপ্রিয়তার ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত। তাঁর নাটকের সংখ্যাও অনেক এবং সেগুলো অভিনীত হয়েছে প্রায় সর্বত্র। মামুনও সমাজসচেতন দায়বদ্ধ নাট্যকার। তিনি নির্মমভাবে খুলে দেন স্বাধীনতা-বিরোধী ঘাতকদের মুখোশ। তাঁর প্রতিবাদ মৌলবাদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। তবে মামুনুরের মতো অতটা স্লোগাননির্ভর নন। বুদ্ধি, আবেগ ও কৌতুকের মিশ্রণ থাকে তাঁর নাটকে এবং তিনি তা সাধারণ দর্শকের কাছে অতিশয় মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। তাঁর জনপ্রিয়তার রহস্যও সেখানে। কিন্তু তাঁর নাটক দেখতে-দেখতে বা পড়তে-পড়তে যেটা মনে হয়, তা হল একই কাহিনী বা চরিত্র বা সংলাপ যেন ফিরে-ফিরে আসছে। সেদিক থেকে কোনো নতুনত্ব সৃষ্টি বা ফর্ম নিয়ে কোনো পরীক্ষা করার চিহ্ন নেই। তিনি অতিচেনা কতকগুলো প্রতিক্রিয়ার ওপরই নির্ভর করেন। কিন্তু, মামুনুর সম্পর্কে যে-কথা বলা হয়েছিল, তা এখানেও বলা যায়—দর্শকদের আদর্শগত দায় পূরণে ও সচেতনতার সৃষ্টিতে এই মানবিকতা-বোধসম্পন্ন নাটকের পুনরাবৃত্তিরও একটা সদর্থক ভূমিকা আছে। তা ছাড়া, এঁরা দুজনেই নাট্যকার শুধু নন, বাংলাদেশের দুই প্রধান নাট্যগোষ্ঠীর প্রধান পুরুষ। সেদিক থেকে দলের প্রয়োজনেই তাঁরা লিখেছেন এবং তাঁদের কৃতিত্ব শুধু নাটকের টেক্সটেই সীমাবদ্ধ নয়, নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে বা সামগ্রিক নাট্যচর্চার সঙ্গেও সংলগ্ন।

কিন্তু, পরের যে দুজন আলোচিত হবেন—সৈয়দ শামসুল হক এবং সেলিম আল দীন—তাঁরা প্রযোজক নন, শুধুই নাট্যকার। এই পর্বের আলোচ্য নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ শামসুল হক। সাহিত্যের সবক্ষেত্রেই তাঁর বিচরণ—কবিতা বা উপন্যাসের সঙ্গে-সঙ্গে কাব্যনাট্যও লিখেছেন অন্তত পাঁচটি। বিভিন্ন গোষ্ঠী তাঁর নাটক প্রযোজনা করেছে—'নাগরিক', 'থিয়েটার' এবং অন্যান্যরাও। 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' তাঁর প্রথম নাটক এবং সবচেয়ে জনপ্রিয়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তো বাংলাদেশে বহু নাটকই লেখা হয়েছে। কিন্তু তাদের পাশে 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। গ্রাম্য এক মাতবর মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিম-পাকিস্তানি সেনার দালাল হিশেবে কাজ করে, এমনকী নিজের মেয়েকে পাকিস্তানি মেজরের হতে তুলে দেয়। তারই মোকাবিলা করতে সামনে এগিয়ে আসে সেই

ধর্ষিতা মেয়ে এবং গ্রামবাসীরা। সেই গ্রামবাসী যারা মাতবরের প্ররোচনা সত্ত্বেও আকাশে-বাতাসে মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ের আওয়াজ শোনে—যেন ভয়াল তরোয়াল হাতে ঘোড়ার সওয়ার হয়ে প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসছে আবু হানিফা। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উঁচুস্বরের যে-নাটকগুলিতে অভ্যস্ত আমরা, 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' তা নয়। এখানে পীর সাহেব তো বটেই, মাতবর চরিত্রও জটিল ও দ্বিমাত্রিক হয়ে দেখা দেয়। ফলে, ওই লড়াইয়ের ঘটনা ও তার সঙ্গে জড়ানো আবেগের আরো বহুদিকই দৃশ্যমান হয় দর্শক-পাঠকের কাছে। ইশারাময় কাব্যনাট্যে কথাবার্তার আঞ্চলিক ভাষায় নিহিত কবিত্ব নাট্যকারকে সাহায্য করে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নাটকের মধ্য দিয়ে সৈয়দ হক বাঙালির সংগ্রামী চেতনার রূপটিকেই দেখাতে চান। তাই দ্বিতীয় নাটক 'নূরলদীনের সারাজীবন'-এ তিনি আরো পরোক্ষতায় চলে যান, অষ্টাদশ শতকের রংপুরের ব্রিটিশবিরোধী কৃষক-বিদ্রোহকে তুলে ধরেন—পরাজয় সত্ত্বেও যেখানে পরবর্তী ধৈর্যশীল আন্দোলনের প্রতিজ্ঞায় শেষ হয় নাটক। সৈয়দ শামসুল হকের এই দুটি নাটকের প্রসঙ্গই বারবার ওঠে। কিন্তু 'এখানে এখন' কাব্যনাট্যেও তিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী উঠতি বড়লোকের লোভ-লালসাকে ছিঁড়েখুঁড়ে দেখান। 'গণনায়ক' নাটকে শেক্‌সপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার'-এর অনুপ্রেরণাকে মুজিব-হত্যার সমান্তরালে খুব সময়োচিত মনে করেন।

অগ্রণী এই চার নাট্যকারদের মধ্যে সেলিম আল দীন বয়ঃকনিষ্ঠ (এ-বছরই পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিপুল সমারোহে সংবর্ধনা-অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল ঢাকায়)। সেলিম সম্পর্কে বলা হয়েছিল, তিনিও, সৈয়দ হকের মতোই, শুধুই নাট্যকার। এ-কথা অবশ্য পুরোপুরি ঠিক নয়। 'ঢাকা থিয়েটার'-এর জন্মলগ্ন থেকেই তার সঙ্গে তিনি যুক্ত—এমনকী তারও আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় তিনিও ছিলেন একজন। নব্বইয়ের দশকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিশেবে ছাত্রদের নিয়ে "গবেষণাধর্মী নির্দেশনা কর্ম"-ও করেছেন—'মহুয়া', 'দেওয়ানা মদিনা' বা 'একটি মারমা রূপকথা' নিয়ে। সেলিম আল দীনও নাট্যরচনা শুরু করেছিলেন, পাকিস্তানি পর্বের প্রধান নাট্যকারদের মতোই, বৈদেশিক নাট্যরীতির নিরীক্ষাকে ভর করে (তাঁর সেইসব নাটকগুলি—'জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন', 'এক্সপ্লোসিভ ও অন্যান্য' ইত্যাদি—প্রযোজনা করেছিল 'ডাকসু' ও 'নাট্যচক্র' ১৯৭৩-এ)। তারপরই 'ঢাকা থিয়েটার'-পর্বের শুরু—সত্তরের দশকে তাঁর অনেকগুলো নাটক প্রযোজিত হয়েছে সেখানেই ('সঙ্‌বাদ কার্টুন', 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসি', 'শকুন্তলা' ইত্যাদি)। কিন্তু এসব ঝেড়ে ফেলে ১৯৮১ থেকে শুরু হল সেলিমের নাটকের সম্পূর্ণ এক নতুন অধ্যায়। ইওরোপীয় মডেল আয়ত্ত করেই তিনি এবার বর্জন

করলেন তাকে। মনে হলে তাঁর, ওই মডেলকে অনুসরণ করে বাংলা নাটক চলেছে এতকাল—অথচ মধ্যযুগের বাংলাতেই বাঙালির একান্ত নিজস্ব যে-নাট্যরীতি ছিল, তাকে ফিরিয়ে আনাই তো তার নাট্যস্বভাবের পক্ষে সংগত। সে-রীতিতেই বাঙালির নিজস্ব বলার কথা ঠিকমতো ফুটবে। 'কিত্তনখোলা' থেকেই শুরু হল সেই যাত্রা। তারপর একের পর এক নাটক লিখে চললেন তিনি। বিস্ময়কর এটাই যে, প্রত্যেকটি নাটকই কোনো-না-কোনো দিক থেকে নতুন—পুনরাবৃত্তি কখনোই নেই, প্রত্যেকটিতেই বর্ণনাত্মক রীতির নতুন ব্যবহার। তত্ত্বের দিক থেকে সেলিম যাই বলুন, তাঁর নাটকের পাঠক বা দর্শক অবশ্য অনুভব করেন, পশ্চিমি নাটকের অভিজ্ঞতাকে তিনি মোটেই ত্যাগ করেননি। আত্মসাৎ করেছেন এবং তার সঙ্গে বাঙালির নিজস্ব রীতি বলতে যা বোঝেন, তার অসামান্য সৃষ্টিশীল সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাই ওই বর্ণনাত্মক রীতি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে সেলিমেরই রীতি এবং সেই রীতির প্রয়োগে তিনি প্রতিটি নাটকের বিষয় ও প্রকরণের রূপান্তর ঘটিয়েছেন। 'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল', 'হাত হদাই'-তে যে শিকড়সন্ধান ও মহাকাব্যিক বিস্তার, তা পেরিয়ে তিনি চলে যান 'চাকা' ও 'যৈবতীকন্যার মন' নাটকের বর্ণনাত্মক রীতির নতুন পরীক্ষায় এবং তার মধ্যে দিয়ে বাঙালির বিভিন্ন সময়পরিধির সুখদুঃখঘেরা অভিজ্ঞতায়, কিংবা সাম্প্রতিককালে 'বনপাংশুল' এবং 'প্রাচ্য'-তে এসে যেন বৃহত্তর এপিক-ভাবনায় সেই বৃত্তকেই সম্পূর্ণ করেন। এরকম বড়ো নান্দনিক আয়োজনে এর আগে বাংলায় তেমন নাটক লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। কারো যদি মনে হয়, প্রকরণের দিক থেকে সেলিম নাটকের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। কারণ তাঁর তত্ত্ববিশ্বে দ্বৈত মিশে যেতে চায় অদ্বৈতে—বাঙালির কিংবা বিশ্ববাসীরই অখণ্ড অনুভবে।

এই চারজন নাট্যকারের কথা কিছুটা বিশদ বলা হল বলে মনে করার কোনো কারণ নেই, আর কোনো নাট্যকার উল্লেখযোগ্য নন বাংলাদেশে। মমতাজউদ্দীন আহমদের কথা তো আগেও উঠেছে অনেকবার। এই নাট্যকার-অভিনেতা একাত্তরের লড়াইয়ের সময় যে সময়োপযোগী নাটক লিখেছিলেন, তা আমরা জানি। তাঁর 'হরিণ চিতা চিল' বা 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা' কিংবা 'সাত ঘাটের কানাকড়ি'-র মতো নাটকও পরবর্তীকালে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। 'সাত ঘাটের কানাকড়ি'-তে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রামকে অন্যভাবে হলেও পেয়েছি। ফরহাদ মযহার লিখেছেন 'প্রজাপতির লীলা লাস্য' এবং 'ঘাতক দেশকাল'। আরো যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন আলোচনায় নাম করা হয়েছে—বুলবুল ওসমান ('পাণ্ডুলিপির আড়ত'), রশীদ হায়দার ('তৈল সংকট'), শেখ আকরাম আলী ('লাশ ৭৪'), বশীর

আল হেলাল ('স্বর্গের সিঁড়ি'), গোলাপ আম্বিয়া নূরী ('কুমারখালির চর'), আবদুল মতিন খান ('মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব'), কবীর আনোয়ার ('জনে জনে জনতা'), এস. এস. সোলায়মান ('ইঙ্গিত'), আতিকুল হক চৌধুরী ('দূরবীন দিয়ে দেখুন') এবং আরো অনেকে। তালিকাটা নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ, কিন্তু সম্পূর্ণতাতেও কোনো লাভ নেই—কারণ এ-সব নাটকের প্রযোজনা দেখা দূরে থাক, পাঠের সুযোগও আমাদের নেই।

৪

ঢাকা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য মফস্বল-শহরের প্রসেনিয়াম থিয়েটারের একটা অসম্পূর্ণ ছবি হয়তো পাওয়া গেল। কিন্তু, প্রসেনিয়ামকে ছাড়িয়ে নাটককে খোলা ময়দানে নিয়ে যাওয়ার, নাগরিক বদ্ধতা থেকে গ্রামেগঞ্জে থিয়েটারের বাণীকে ছড়িয়ে দেওয়ার যে-পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গেও কারো-কারো কাছ থেকে আমরা শুনি, তা কিন্তু বাংলাদেশে আরো ব্যাপকভাবে (পশ্চিমি অনুসরণ ছাড়াই) অনুভূত ও অনুশীলিত হয়েছে। প্রথম তার দায় বোধ করেছেন ঢাকারই মঞ্চনির্ভর 'আরণ্যক' বা 'ঢাকা থিয়েটার'-এর মতো কোনো-কোনো দল। 'আরণ্যক'-এর কাছ থেকেই শুনি তাদের অভিজ্ঞতার কথা : "নাটককে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়মিত প্রযোজনাগুলিকে নিয়ে শুরু হল ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী। কিন্তু তাতেও প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হল না। এ ঘটনাটি ঘটে সত্তরের দশকের শেষ প্রান্তে। শুরু হল বিকল্প অনুসন্ধান—নাটককে মুক্ত করতে হলে চাই জনগণের অংশ গ্রহণ।... পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলল শেকড়ের সন্ধান। এ দলের নতুন প্রজন্মের তরুণ কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল এক অসম্ভব যজ্ঞে। যার ফলাফল মুক্ত নাটক। মুক্ত নাটক বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় একটি নতুন ধারার সংযোজন। প্রথাবদ্ধ নাট্যচর্চার শৃঙ্খল থেকে নাটক বেরিয়ে এল খড়ের গাদার পাশে ধান কাটার মাঠে। 'আরণ্যক' নাট্যদলের প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গঠিত হল অনেকগুলি মুক্ত নাটক দল।...১৯৮৬ সালে গঠিত হল সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সহযোগী জাতীয় বাংলাদেশ মুক্ত নাটক দল।" জানি না 'মুক্ত নাটকে'র সাংগঠনিক অবস্থা এখন কী—সে ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ পেয়েছে তাদের নিজেদের প্রতিবেদনেও। বিশেষত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উগ্র রাজনৈতিক আগ্রহ রাজনীতির পালাবদলে সংকটে পড়ে যায়, তা আমরা অন্যত্রও দেখেছি। পাশাপাশি আশির দশকের শুরু থেকে 'ঢাকা থিয়েটার' যে-আন্দোলন শুরু করেছে, তার নান্দনিক ভূমি বোধহয় আরো প্রশস্ত, তার অনুসন্ধান আরো তাৎপর্যবাহী। বস্তুত 'ঢাকা থিয়েটার' মঞ্চে যে-নাটক করে, সেখানেও ক্রমশ প্রকাশ পেয়েছে বদ্ধ মঞ্চকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা। সেলিম আল দীন ও

নাসিরউদ্দীন ইউসুফের মিলিত ভাবনায় তার জন্ম ও বিকাশ অনেক আগে থেকেই। 'কিত্তনখোলা' বা 'কেরামতমঙ্গল' বা 'হাত হদাই' থেকেই দেখতে পাই সেলিমের নাটক প্রসেনিয়ামে বদ্ধ থাকতে চাইছে না। 'চাকা' বা 'বনপাংশুল'-কে মঞ্চের মধ্যে মঞ্চকে ভেঙেই হাজির করতে হয়েছে। অনিবার্যভাবেই তাই সেলিম-নাসিরউদ্দীনের শিকড়সন্ধানী নাট্যানুসন্ধান প্রসেনিয়ামকে ছাপিয়ে গ্রামেগঞ্জে বিস্তৃত হতে চায়। জন্ম নেয় 'গ্রাম থিয়েটার'। এর লক্ষ্য ও আয়োজন একেবারেই ভিন্ন। শুধু গ্রামে যাওয়াই নয়, নান্দনিক ধারণাটাও প্রসারিত। তাদের ঘোষণাপত্রে বলা হল : "গ্রাম থিয়েটার মেরুদণ্ডহীন আপোসকামী নাট্যচর্চার বিরুদ্ধে প্রাণবন্ত ও প্রাণদায়ী নাট্যচর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।...গ্রাম থিয়েটার আধুনিক নাট্যকলার সঙ্গে বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্য-আঙ্গিকের সমন্বয় সাধনে বদ্ধপরিকর। গ্রাম থিয়েটার শহরকেন্দ্রিক নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে নাটকের দল গঠন ও মেলা পত্তনে দৃঢ়সংকল্প।...গ্রাম থিয়েটার বাংলাদেশের মঞ্চে...এদেশের জনগণ, জনপদের সংস্কৃতি ও অবহেলিত আঞ্চলিক ভাষারীতির উজ্জীবন ঘটাতে চায়।" এরকম একটা বড়ো পরিকল্পনা কতদূর সার্থক হয়েছে সে-জিজ্ঞাসা উঠতেই পারে ভিনদেশী মানুষের কাছে। ১৯৯৯-এর মে মাসেই রাজশাহী-র পুঠিয়াতে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল—সে-উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকাটি আমাদের হাতের কাছেই। তা থেকে জানতে পারি, দীর্ঘ ওঠাপড়ার ইতিহাস পার হয়ে আজও সারা বাংলাদেশে ১৮১টি সংগঠন ছড়িয়ে আছে। সেগুলোকে ৩৫টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। পাতাগুলো ওলটালেই বোঝা যায়, কী প্রবল কর্মকাণ্ড চলেছে—জাতীয় নাট্যকার কর্মশালা, গ্রাম থিয়েটার প্রকল্প, লোকনাট্য উৎসব, নাট্য উৎসব ইত্যাদি তারই এক-একটি অঙ্গ। 'ঢাকা থিয়েটার'-এর নাগরিক ভাবনা থেকেই হয়তো অনিবার্য শৈল্পিক তাগিদে 'গ্রাম থিয়েটারে'র ভাবনার জন্ম হয়েছে, কিন্তু 'গ্রাম থিয়েটার'-এর অভিজ্ঞতাই এখন প্রতিনিয়ত পুষ্ট করছে ঢাকার থিয়েটারকেও। তাই তো নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বলতে পারেন, "এ কথা অনস্বীকার্য যে গ্রাম থিয়েটারের অভিজ্ঞতা ছাড়া সেলিম আল দীনের কিত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গল, হাত হদাই, চাকা, যৈবতীকন্যার মন, হরগজ, বনপাংশুল বা প্রাচ্য-র মতো শৈল্পিক নাটকের সাক্ষাৎ আমরা পেতাম না।" শুধু সেলিম কেন, গ্রাম থিয়েটারের অনুপ্রেরণায় নতুন নাটক লেখা চলেছে সর্বত্র। নাসিরউদ্দীনই জানিয়েছেন, "রাজশাহীর কাজী সাঈদ হোসেন দুলাল আমাদের সামনে তুলে ধরছেন মনসামঙ্গলের ঐতিহ্যবাহী রূপ, বগুড়ার তৌফিক হাসান ময়না প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের মিথ ভেঙে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছেন কমলাসুন্দরী-কে, জামালপুরের আসাদুল্লাহ ফারাজী যমুনার

দুধাল চরের সূক্ষ্ম সরলরেখা এঁকে দিয়েছেন বাংলা নাটকে, বরিশালের শুভঙ্কর 'আগুনমুখা'-র আগুনে ঝলসে দিতে চান বর্তমান শিল্পের ক্লিশে অবয়ব।" গ্রামথিয়েটারের, কিংবা বলা যায়, সেলিম-নাসিরউদ্দীনের স্বপ্নের এই অর্জন, গ্রাম-থিয়েটারেরও সীমানার বাইরে, ফসল ফলাচ্ছে এমন টের পাওয়া যায়। বাংলাদেশে প্রকাশিত নাট্যপত্রের খবরাখবর থেকেই জানতে পারি, এই প্রেরণা কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সামান্যই। কিন্তু তারই মধ্যে চট্টগ্রামে গিয়ে শিশির দত্তের 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার', সংক্ষেপে যার নাম 'বিটা', তাদের কর্মশালায় গিয়ে দেখি, কখনো পতেঙ্গা বন্দরের জেলেদের নিয়ে, কখনো চট্টগ্রামে শহরেরই রিকশাওয়ালা-মজুর-দোকানদারদের নিয়ে থিয়েটারের মহড়া চলেছে, নাটকের কুশীলবেরা নিজেরাই মুখে-মুখে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচনা করে চলেছে সেই নাটক। ঢাকা-য় জাদুঘরের চত্বরে দেখি বিপ্লব বালার প্রণোদনায় তৈরি পরীক্ষামূলক "নাট্যভাষ্য" : 'হায় বাংলা হায় বেহুলা'। 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র'-র এই প্রযোজনা তাদের 'বাঙালি সংস্কৃতি উৎসব'-এর যোগ্য সংযোজন— বেহুলা-লখিন্দরের পুরাণের অনুষঙ্গে যেখানে বেরিয়ে আসে বাঙালির ধারাবাহিক ইতিহাস, সৃজনশীল কোলাজে। কলকাতায় বসেই দেখেছিলাম কামালউদ্দিন নীলু-র 'ভেলুয়া সুন্দরী'—একক অভিনয়ে মাটির সুরের খোঁজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের 'কমলারানীর সাগরদিঘি'-কে হয়তো এই সূত্রেই মনে পড়ার কথা (দুর্ভাগ্যবশত আমি কলকাতায় ওঁদের অভিনয় দেখার সুযোগ হারিয়েছি)। এরকম কাজের দৃষ্টান্ত আরো অনেক আছে। তবে এগুলোর কোনোটাই 'গ্রাম থিয়েটার' প্রসঙ্গে উচ্চার্য নয়। নান্দনিক সমগ্রতার দুস্তর ব্যবধান তাদের মধ্যে। কোনো-কোনোটির আয়োজন তো নিতান্তই শহুরে এবং শৌখিন। কোনো-কোনোটি বাংলাদেশের এখন সবচেয়ে চালু ব্যবস্থা এন-জি-ও-র অন্তর্গত এবং তার ভূমিকা ও পশ্চাদ্‌পট নিয়ে ঠিক হোক ভুল হোক, প্রশ্ন আছে কারো-কারো মনে। কিন্তু এ-কথা কী করে অস্বীকার করি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা দেখেছি, বিদেশী সাহায্যকে সীমিতভাবে ব্যবহার করে খুলনার 'লোকনাট্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কেন্দ্র' (লোসাউক) যাত্রাপালার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাচ্ছে, ঢাকার 'থিয়েটার সেন্টার ফর সোশাল ডেভেলপমেন্ট' (টি-সি-ডি-এস) গ্রাম-মফস্বলের মানুষের মধ্যে বহুমুখী উন্নয়নের চেতনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে, এবং 'সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার' (সি-এ-টি) লক্ষ্য রেখেছে বাংলাদেশের থিয়েটারে পেশাদারিত্বের প্রসারে। অর্থাৎ, প্রত্যন্ত গ্রামের লোকায়ত স্তর থেকে শহুরে বিদেশী অনুবাদ নাটকের সাবালক নাট্যকর্মী ও দর্শক পর্যন্ত তার বিস্তার। সমপর্যায়ের কাজই হয়তো করছে প্রশিকা

মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র এবং আরো অনেকেই। তবে যে-সব নাট্যদল এখনো ঘাম ঝরিয়ে, শত বাধার মধ্যে, বেইলি রোডে তাদের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের শৈল্পিক কৃতিত্বের সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনীয় নয় ওই সব 'সুখী' নাট্যপ্রয়াসের। তাই মাসুম রেজার রচনায় ও নির্দেশনায় 'দেশনাটক'-এর 'নিত্যপুরাণ', ফয়েজ জহিরের নির্দেশনায় 'সুবচন নাট্য সংসদ'-এর 'তীর্থঙ্কর' ও 'অনুশীল নাট্যদল'-এর 'বহে প্রান্তজন', কিংবা আজাদ আবুল কালামের নির্দেশনায় 'প্রাচ্যনাট'-এর 'সার্কাস সার্কাস' বা 'কইন্যা' স্বতন্ত্র নান্দনিক অভিজ্ঞতাতেই নিয়ে যায়। বিশেষ করে মুরাদ খান রচিত 'কইন্যা' সেলিম আল দীনের একান্ত অনুরাগী বর্তমান লেখককে যেভাবে উদ্বেল করেছিল, তার দৃষ্টান্তে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার স্বাতন্ত্র্য ও ধারাবাহিকতা সম্পর্কে প্রত্যাশা অটুট রয়ে যায়। শুনেছি আশীষ খোন্দকারের নিরীক্ষামূলক পরিবেশ-থিয়েটার 'মহম্মদ আমিন'-এর কথাও। তবু, আবারও বলছি, এ সবই বিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা মাত্র। ২০০০-এর ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের পুস্তিকার পরিশিষ্টে যে সারা বাংলাদেশ জুড়ে ২৪৫টি দলের ঠিকানা আছে, সেটাই বাংলাদেশের ব্যাপক ও সমুজ্জ্বল নাট্যচর্চার ঠিকানা।

যে-কথা দিয়ে শুরু হয়েছিল সে-কথাতেই ফিরে আসা যায়। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যকর্ম দেখে যে দূরাগত দর্শক মুগ্ধ কিংবা কোনো নাটক পাঠ করে আপ্লুত, তার তো তাগিদ হতেই পারে, সেই নাটকের বা নাট্যপ্রযোজনার পশ্চাদ্‌পটটা জানার। কোন ইতিহাসকে পেছনে রেখে গ্রহণবর্জনের কোন প্রক্রিয়াকে মেনে আজকের নাটক বা আজকের নাট্যপ্রযোজনা তার নান্দনিক স্বকীয়তায় পৌঁছেছে, তা না জানলে সাম্প্রতিককেও প্রকৃত চেনা হয় না। কিন্তু এপার বাংলার পাঠকের কাছে পূর্ববর্তী নাটকের মুদ্রিত পাঠ দুর্লভ। তাদের প্রযোজনা প্রায় কারোরই কখনো দেখা হয়নি, আজ আর তা দেখার কোনো উপায়ও নেই। সাম্প্রতিক নাট্যাভিনয় দেখার অভিজ্ঞতাও সীমিত ও খাপছাড়া। 'ঢাকা পদাতিক'-এর 'বিষাদ সিন্ধু', যেখানে নির্দেশক জামিল আহমেদ ধর্মীয় মৌলবাদকে ডিঙিয়ে তাঁর স্বকীয় ঐস্লামিক থিয়েটারের ধারণা ও সম্ভাবনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, তার অসামান্যতা আন্দাজ করতে হয় প্রযোজনায় নয়, তাঁর বই 'ইন প্রেইজ অব নিরঞ্জন' বইয়ের ব্যাখ্যায় বা আলোকচিত্রে। আর সেই না-দেখা প্রযোজনার গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য তো কখনোই শুধু নথির সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম হতে পারে না। তাই পরের মুখে ঝাল খাওয়া এই প্রবন্ধের লেখককে যেমন অনেক সময়ই মেনে নিতে হয়েছে, তার পাঠককেও তা-ই করতে হবে। অন্য কোনো পথ নেই।

১. উনিশ শতকে বাংলাদেশের থিয়েটার। মুনতাসীর মামুন। সুবর্ণ, ঢাকা। এপ্রিল ১৯৮৫।

২. বাংলাদেশের নাটচর্চা ও নাটকের ধারা (১৯৪৭-১৯৭১)। সুকুমার বিশ্বাস। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮।

৩. একুশের প্রবন্ধ ১৯৮৮। সংকলন। সংকলকের নাম নেই। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ : 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর: বিষয় ও প্রকরণ/প্রসঙ্গ-নাটক' (নাজমা জেসমিন চৌধুরী) ; 'আলোচনা : নাটক' (মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর)।

৪. বাংলাদেশের সাহিত্য। সংকলন উপবিভাগ কর্তৃক সংকলিত। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ : 'বাংলাদেশের সাহিত্য : নাটক' (কবীর চৌধুরী)।

৫. সমকালীন বাংলা সাহিত্য। খান সারওয়ার মুরশিদ সম্পাদিত। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা। জুন ১৯৮৯। প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ : 'বাংলাদেশের সমকালীন নাটক' (জিয়া হায়দার) ; 'বাংলা নাটক ও মঞ্চ' (মামুনুর রশীদ) ; 'আলোচনা/নাটক: মঞ্চ' (রামেন্দু মজুমদার, সাঈদ আহমদ, শান্তনু কায়সার)।

৬. বাংলাদেশের সাহিত্য। বিশ্বজিৎ ঘোষ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। এপ্রিল ১৯৯১। প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ : 'বাংলাদেশের পাঁচটি নাটক : প্রসঙ্গ গঠনশৈলী'।

৭. ঢাকা মহানগরীর নাট্যচর্চা। সংকলন। সম্পাদকের নাম নেই। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা। জুন ১৯৯২। প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ : 'বর্তমান নাট্যচর্চা' (আসকার ইবনে শাইখ) ; 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চার বিকাশ—তার অতীত বর্তমান' (মোহম্মদ জাকারিয়া); 'আমাদের গ্রুপ-থিয়েটার আন্দোলন' (আরিফুল হক) ; 'পুরাতন ঢাকার নাট্যচর্চা' (পরেশ আচার্জি) ; 'কালের যাত্রায় ঢাকার থিয়েটার' (কামাল উদ্দিন নীলু)।

৮. পঞ্চাশ দশকের পত্রপত্রিকায় ঢাকার নাটক। ওবায়দুল হক সরকার। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা। জুন ১৯৯৪। প্রাসঙ্গিক অধ্যায় : 'মঞ্চে মহিলাদের আগমন' ; 'দেশীয় নাটক রচনা' ; 'একুশের নাটক' ; 'সংস্কৃতি সংসদের নবান্ন' 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক উৎসব'।

৯. নাট্যপ্রবন্ধ বিচিত্রা। আতাউর রহমান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। এপ্রিল ১৯৯৫। প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ : 'বাংলাদেশের নাটকে প্রতিবাদী চেতনা' ; 'বাংলাদেশের নাটক : নতুন প্রজন্মের সমস্যা ও সম্ভাবনা' ; 'বাংলাদেশের থিয়েটারে বিদেশী প্রভাব'।

১০. সেকালে আমাদের নাট্যচর্চা। ওবায়দুল হক সরকার। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা। জুন ১৯৯৫। প্রাসঙ্গিক অধ্যায় : 'সেকালের ঢাকার মঞ্চ'; 'সেকালের নাট্যচর্চা' ; 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' ; 'পেশাদার নাট্যগোষ্ঠী'।

১১. হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা। সৈয়দ জামিল আহমেদ। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা। জুন ১৯৯৫।

১২. একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ। (১৯৬৩-১৯৭৬)। মোবারক হোসেন সংকলিত ও সম্পাদিত। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জুন ১৯৯৫। প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ : 'বাংলাদেশের নাটক : ১৯৭৪ পর্যন্ত' (মমতাজউদ্দীন আহমদ)।

১৩. একুশের প্রবন্ধ (১৯৭৭-১৯৭৯)। মোবারক হোসেন সংকলিত ও সম্পাদিত। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জুন ১৯৯৬। প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ : 'স্বাধীনতা-উত্তর কালের নাটক' (রামেন্দু মজুমদার)।

১৪. বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যোৎসব/কতিপয় দলিল। সুকুমার বিশ্বাস। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

১৫. বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক/থিয়েটার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর নির্বাচিত সংকলন (১৯৭২-৯৮)। রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা। মার্চ ১৯৯৯। প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ : 'নাটকের নিজের মুখ' (সৈয়দ শামসুল হক) ; 'মুনীর চৌধুরীর নাটক' (আবু হেনা মোস্তফা কামাল) ; 'কবর' (আনিসুজ্জামান) ; 'নাট্য আন্দোলনের সমস্যা' (শাহরিয়ার কবির) ; 'গ্রাম থিয়েটার : একটি বিকল্প পাঠশালা' (সাজেদুল আউয়াল) ; 'মুক্তনাটক : জাতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা' (মামুনুর রশীদ) ; 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা : ১৯৭১-১৯৯৫' (বিশ্বজিৎ ঘোষ)।

বাংলাদেশের শিল্পধারা

দেশভাগের আগে পূর্ববঙ্গে কোনো আর্ট স্কুল ছিল না। বস্তুত সারা বাংলাতেই শিল্পশিক্ষায় উৎসুক ছাত্রদের আসতে হত কলকাতায়। একমাত্র সেখানেই শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পূর্ববঙ্গের কিছু ছাত্র তিরিশের দশকে কলকাতায় এসেছিলেন আর্ট স্কুলে পড়তে। যেমন জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক, কামরুল হাসান, হাবীবুর রহমান এবং আরো কেউ-কেউ। অবশ্য তাঁদের আগে, তিরিশের দশকের শুরুতেই কলকাতায় দু-একজন বাঙালি মুসলমান শিল্পীর নাম পাওয়া যাচ্ছিল, ছাপাও হচ্ছিল তাঁদের ছবি 'সওগাত' বা 'মোহাম্মদী'র সঙ্গে 'ভারতবর্ষ' বা 'বিচিত্রা'তেও। প্রথম বাঙালি মুসলমান শিল্পী হিশেবে নাম পাওয়া যায় আবুল কাশেম-এর। এবং প্রথম পেশাদার মুসলমান শিল্পী আবদুল মঈন, যিনি কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগ থেকে ১৯৩৪ সালে পাশ করেছিলেন প্রথম হয়ে। জয়নুল আবেদিনের জীবনীতেও পাওয়া যায়, ময়মনসিংহের কিছু ছেলে কলকাতার আর্ট স্কুলে পড়তেন—তাঁদের সঙ্গে আলাপ করেই স্কুলে পড়ার সময় তাঁর বাসনা হয় কলকাতায় ছবি আঁকা শিখতে যাবেন। ১৯৩২-এ জয়নুল সেই উদ্দেশ্যেই এলেন কলকাতায়। ঘটনাটি বেশ খানিকটা অভিনব এবং ঐতিহাসিক। কারণ বোঝা যাচ্ছে, ছবি আঁকার বিষয়ে গোঁড়া ইসলামি বিধিনিষেধের বেড়া এবার ভেঙে যাচ্ছে। ব্যাপারটি যে নতুন, তা আরো অনুধাবন করতে পারি, যখন দেখি ১৯৪৬-এর শেষের দিকে শুধু মুসলমান চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী আয়োজিত হচ্ছে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে 'মুসলিম আর্ট এক্সিবিশন' নামে।

শিক্ষান্তে পূর্ববঙ্গে গিয়ে এই শিল্পীরা জীবিকা নিয়েছিলেন বিভিন্ন স্কুলে, আর্ট-টিচার হিশেবে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে এবং ১৯৪৮ সালে সরকারি আনুকূল্যে ঢাকাতেও আর্ট ইনস্টিটিউট বা স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কলকাতা থেকে প্রত্যাগত বা আগত যুবক ও তরুণ শিল্পীরা সোৎসাহে এই উদ্যোগে সমর্থন জুগিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁরা অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন ওই আর্ট স্কুলের শিক্ষকতার পদ। সে-সময়ে পূর্ববঙ্গে আর্ট স্কুলের ওই উদ্বোধন ব্যাপারটা খুব

সহজে ঘটেছে এমন নয়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক তদ্‌বির করে, সরকারি আনুকূল্য মিলেছে। তা ছাড়া মুসলমান প্রতিবেশীদের বিরোধিতাও কম ছিল না।

সবচেয়ে অগ্রণী যিনি সেই জয়নুল আবেদিন অবশ্য আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠার সময় ঢাকায় ছিলেন না—তিনি ওই সময়ে পাকিস্তান সরকারের প্রচার দপ্তরের প্রধান শিল্পী হিশেবে করাচিতে গিয়েছিলেন। তবে এক বছরের মধ্যেই ফিরে আসেন এবং ১৯৪৯ সালের ১ মার্চ আর্ট স্কুলের, যার নাম ইতিমধ্যেই 'ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট', তার অধ্যক্ষ-পদে যোগ দেন। ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউটের গড়ন, শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণের ধরণ ইত্যাদি কলকাতার আর্ট স্কুলের (যার নাম ইতিমধ্যেই আর্ট কলেজ) আদর্শের অনুসারী ছিল বেশ কিছুকাল ধরে।

কিন্তু, যাঁরা ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষণ ও পরিচালনার দায় নিয়েছিলেন—সেই জয়নুল, সফিউদ্দিন, আনোয়ারুল, হাবীবুর, কামরুল—শিল্পী হিশেবে তাঁদের অনন্যতা, শিল্পভাবনার দিক থেকে তাঁদের মৌলিকতা, শিক্ষক হিশেবে তাঁদের ছাত্র তৈরি করার কৃতিত্ব অচিরে বাংলাদেশের একটি স্বতন্ত্র শিল্পজগৎ গড়ে তুলল। ছড়িয়ে পড়ল তার প্রভাব ইনস্টিটিউটের চত্বরের বাইরেও। ১৯৫১ সালে তৈরি হল 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ'—ঢাকার লিটন হলে তাদের প্রথম প্রদর্শনী। পূর্ববঙ্গে এ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা—"ঢাকার ছবির সমঝদার সৃষ্টির প্রথম সূচনা"। এর কিছুদিন পরে চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষে অস্থায়ী তেরপল টাঙিয়ে চিত্রপ্রদর্শনী। ১৯৫২-তে ঢাকার জাদুঘরে 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ'-এর দ্বিতীয় প্রদর্শনী। এভাবেই শিল্পসংস্কৃতির জগতে একটা নতুন যুগ এসে গেল। যে-সব শিল্পীকে সামনের সারিতে পেলাম, তাঁদের মধ্যে জয়নুল, সফিউদ্দিন, কামরুল এবং কিছু পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গা থেকে আসা সুলতান—তাঁরাই বাংলাদেশের শিল্পধারার উদ্‌গাতা, বলা যেতে পারে।

২

এই শিল্পধারার পক্ষে একটা গৌরবের ব্যাপার যে এর সূত্রপাত হয়েছিল জয়নুল আবেদিনের মতো একজন বড়ো শিল্পীর মধ্য দিয়ে। ময়মনসিংহের ছেলে জয়নুল ছোটোবেলা থেকেই ছবিআঁকায় মত্ত এবং দক্ষ, এবং নিজেরই চেষ্টায়, বিপুল দারিদ্র্য সত্ত্বেও, কলকাতার আর্ট স্কুলের ছাত্র হিশেবে শিক্ষক ও সহাধ্যায়ীদের প্রায় চমকিত করলেন তাঁর প্রকরণদক্ষতায়। সেই বয়সেই তাঁর শিল্পক্ষমতার যে-পরিচয় পাওয়া গেল তা অসামান্য। তখনই আর্ট স্কুলের সবচেয়ে সেরা ও সবচেয়ে আলোচিত ছাত্র জয়নুল। এতটাই যে, আবদুল মঈনের মতোই ছাত্রাবস্থাতেই তিনি শিক্ষকতার কাজ করার সুযোগও পেয়ে গেলেন। পাশ করেও বেশ অনেক বছরই

তিনি কলকাতায় কাটিয়েছেন, নানারকম কমার্শিয়াল আর্টের কাজ করে। অজস্র স্কেচ আঁকতেন বিচিত্র প্রকৃতি ও কর্মমুখর মানুষকে নিয়ে। সেটা শুরু হয়েছিল অবশ্য জন্মভূমি ময়মনসিংহেই। তারপর ছাত্রজীবনে বা অব্যবহিত পরে কলকাতায়, ছুটি কাটাতে সাঁওতালপরগনার দুমকায়, মাঝে-মাঝে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী নিজের দেশে ফিরে তিনি স্কেচের খাতা ভরিয়ে তুলতেন। এ ছাড়া ছবিও আঁকতেন—প্রধানত জলরঙে, কখনো তেলরঙে।

চিত্রশিল্পী হিশেবে জয়নুলের খ্যাতি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল, যখন ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের অজস্র স্কেচ তিনি আঁকলেন। কলকাতার ফুটপাতের মৃত বা মৃতপ্রায় কঙ্কালসার মানুষ, ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট নিয়ে মারামারি, এই বাস্তব ফুটে উঠল এক্সপ্রেশনিস্ট ভঙ্গিতে—অনুজ সহকর্মী কামরুল হাসানের কথায় "অতি সাধারণ হলুদ রঙের কার্টিজ কাগজে অয়েল কালারের তুলি দিয়ে স্রেফ কালো রঙের আঁচড়"। চল্লিশের দশকের সেই সময়টার একটা বড়ো দলিল হয়ে আছে ওই ছবিগুলো আজও। শুধু দেশীয় নয়, আন্তর্জাতিক প্রশংসাও কুড়োল দুর্ভিক্ষ-সিরিজ। জয়নুল বস্তুত জড়িয়ে পড়েছিলেন সে-সময়ের কলকাতার প্রতিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে।

দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে ফিরে তাঁর একটা বড়ো সময়ই অধিকার করে নিয়েছিল সংগঠনের কাজ। নবগঠিত আর্ট ইনস্টিটিউটের দৈনন্দিন কর্মসূচি, প্রদর্শনীর আয়োজন, ভবন-নির্মাণ পর্যন্ত সবকিছুতেই। এই সাংগঠনিক কাজের ফাঁকে-ফাঁকেই তিনি বিদেশে যান, প্রধানত ইওরোপে। কিন্তু তার মধ্যেই ছবি আঁকাও চলতে থাকে ব্যাপকভাবে, বলাই বাহুল্য।

জয়নুলে যেমন বিষয়ের বৈচিত্র্য, তেমনি মাধ্যমেরও বৈচিত্র্য। তিনি জলরঙ, তেলরঙ, গোয়াশ, টেম্পারা, মিশ্র-মাধ্যম ইত্যাদি সবরকম কাজই করেছেন এবং এঁকেছেন বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন পরিচয়ের কর্মসচল মানুষ—কাদায় আটকে যাওয়া গোরুর গাড়ি টেনে তোলা, মাঝির কাঁধ নুয়ে গুন টানা, ঢেউ ভেঙে পালের নৌকোর এগিয়ে চলা, কলসি কাঁখে মেয়েদের হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া, ইত্যাদি। প্রকৃতি ও মানুষের জোটবাঁধা জীবনের রূপ এইসব ছবিতে। বিশেষ করে জলরঙের প্রতি পক্ষপাতে বিশিষ্ট।

পাশ্চাত্যের চিত্রশিল্পেও জয়নুলের আগ্রহ ছাত্রবয়স থেকেই। ইওরোপ-ভ্রমণে তা আরো বেড়েছে। অন্যদিকে বাংলার লোকশিল্পের সংগ্রহ, প্রভাব ও ব্যবহারও ছিল বরাবর। ফলত, অনিবার্যভাবেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয়েরই একটা অনায়াস ছাপ পড়ে তাঁর ছবির মধ্যে। বিদেশে তিনি অনেকবারই গেছেন নানা উপলক্ষে।

যে-সব জায়গায় তিনি গেছেন, মাস্টারদের ছবি দেখেছেন, সমকালীন শিল্পীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘটেছে—তাঁর নিজের ছবির প্রদর্শনীও আয়োজিত হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দ্বিমুখী আগ্রহের প্রমাণ হিশেবেই যেন, দেশে ফেরার পর নিজেকে নিয়োজিত করেছেন বাংলার লোকশিল্পের চর্চায় এবং তা নিয়ে নানাবিধ উদ্যোগে। লক্ষণীয় ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫৬-৫৭ দুবারই বিদেশ ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেই তিনি লোকশিল্পের ব্যাপারে উদ্যমী হয়ে ওঠেন কীভাবে।

এভাবেই চলতে থাকে জয়নুলের জীবন। তাঁর অবস্থান বা স্বীকৃতি তখন এমনই যে, নিজের শিল্পরচনার কাজের বাইরে তাঁকে নানাভাবে ব্যস্ত থাকতে হত—অধ্যক্ষ হিশেবে, প্রদর্শনীর বিচারক হিশেবে, নানা সরকারি আমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনায় রাষ্ট্রীয় মুখ্য প্রতিনিধি হিশেবে। এমনকী আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নেওয়ার পরও পাকিস্তান আমলে তাঁকে সরকারি শিল্প সম্পর্কিত কাজে পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করে যেতে হয়। স্বাধীনতার আন্দোলনের সময়, সেই উপদেষ্টার পদে থেকেও, তিনি আন্দোলনরত শিল্পীসমাজের পাশে ছিলেন। তারই মধ্যে ১৯৭০-এ এঁকেছেন 'নবান্ন' ও 'মনপুরা' স্ক্রোলচিত্র। প্রথমটিতে বাংলার গ্রামীণ কৃষক জীবনের সুখদুঃখ—ধান বোনা, ফসল কাটা থেকে সবকিছুই। দ্বিতীয়টিতে ১৯৭০-এর সামুদ্রিক ঝড়ে বিপর্যস্ত বাংলাদেশের ছবি। জয়নুল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ছবিও এঁকেছেন বেশ কিছু। আর শেষ কটি বছর সব মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের সংস্কৃতির দূত দেশে ও বিদেশে, ১৯৭৬-এ মৃত্যু পর্যন্ত।

৩

দেশভাগের পর কলকাতা থেকে যাঁরা ঢাকায় চলে এলেন, তাঁদের মধ্যে বয়সের দিক থেকে শফিক উল আমিন বা হাবীবুর রহমান জয়নুল আবেদিনের চেয়ে মাত্র দু-এক বছরের বড়ো এবং আনোয়ারুল হক, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, এস এম সুলতান প্রমুখ সামান্যই ছোটো (ব্যবধান দশ বছরের বেশি নয়)—তাই তাঁদের সবাইকেই সমকালীন বলা চলে। কামরুল অবশ্য এঁদের কারো-কারো ছাত্র—একটু বেশি বয়সেই এসেছিলেন তিনি কলকাতার আর্ট স্কুলে। তবু, এরই মধ্যে, কামরুলের চারিত্র্য আলাদা করেই নজর কেড়েছিল। যদিও শিক্ষক হিশেবে জয়নুল সম্পর্কে তো বটেই, অন্যান্যদের প্রতিও তিনি পোষণ করতেন অপার শ্রদ্ধা।

জয়নুল আবেদিনের ছবিতে বিষয় বা ফর্মের বৈচিত্র্য থাকলেও, লোকশিল্পের প্রেরণা বা ব্যবহার যে একটি বড়ো দিক তাতে সন্দেহ ছিল না। কামরুল হাসানের

মধ্যে সেই প্রেরণা বা ব্যবহার আরো গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন। লোকশিল্পকে ভর করে শিল্পের যে-আধুনিকতা স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত, তা তাঁর মধ্যে আরো দ্বিধাহীন। সে-কারণেই জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে কামরুল হাসানকেও যামিনী রায়ের উত্তরসূরি বলে ফেলেন কেউ—যদিও যামিনী রায়ের সঙ্গে তাঁদের চিত্রভাষাতে শেষপর্যন্ত পার্থক্য বিপুল, যা বড়ো শিল্পীদের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী।

কামরুল হাসান একসময় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে (মুকুলফৌজের সাংগঠনিক কাজ থেকে শুরু করে শরীরচর্চা পর্যন্ত) জড়িত হয়ে কলকাতাতেই ছিলেন, এবং কলকাতার আর্ট স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে ঢাকায় চলে যান দেশভাগের পরে। কলকাতায় থাকার সময় গুরুসদয় দত্ত-র ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগ ঘটে এবং গুরুসদয়েরই প্রভাবে স্বদেশচিন্তা ও লোকশিল্প সম্পর্কে একটা লিপ্ততা তৈরি হয়, যা তাঁকে প্রাণিত করেছে সারাজীবন। তাই, গোড়ার দিকে তিনি বাস্তবধর্মী কাজও করেছেন বটে, কিন্তু তাতে বোধহয় তৃপ্তি ছিল না। ক্রমশই বাংলার লোকশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকের দিকে বেশি করে তাঁর মন গেল—লোকশিল্পে রেখা, রঙ, নকশা, বিন্যাস ইত্যাদি নানা দিক থেকে। অন্যদিকে, খুবই স্বাভাবিক, পাশ্চাত্য শিল্পের আঙ্গিকের শিক্ষাকে তো পুরোপুরি ছেড়ে আসা যায় না—তাই এই দুয়ের একরকমের একটা মিলন ঘটল তাঁর মধ্যেও। অর্থাৎ লোকশিল্পের আত্মসচেতন প্রয়োগ তখন তাঁর চিত্রকলায় প্রত্যক্ষগোচর। যেমন, ১৯৫৫-তে তেলরঙে আঁকা তাঁর 'তিন কন্যা'—কিউবিস্ট ঢঙ এবং লোকজ ধারার একটা অসাধারণ সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায় সহজেই। নানা মাধ্যমের পুতুলের ফর্ম, কিংবা পট ও পাটায় দেখা যায় এমন রঙ ও রেখার ব্যবহার, আবার সেই সঙ্গে জলরঙে আঁকা নিসর্গ নিয়ে পরীক্ষা—এ সবই একসঙ্গে এবং পর্যায়ক্রমে চলতে থাকল। সবসময়ই নিরীক্ষা ব্যাপার থাকেই সেখানে, পাশ্চাত্যের শিল্প-অভিজ্ঞতারও দূরাভাস। যেমন অনেকেই বলেন মাতিস বা পিকাসোর কথা। কিন্তু, লোকশিল্পকে নিজের মতো করে ব্যবহার করার যে প্রাণাবেগ তা ক্রমশই তাঁর ছবির নিজস্ব আদল তৈরি করে। 'পটুয়া' বলে আত্মপরিচয়- দেওয়াটা সেখান থেকেই আসে।

কামরুল হাসানের সৃষ্টিকর্মও, জয়নুলের মতোই, প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে বিস্ময়কর। বিষয়ের সূত্রে বলা যায়, তাঁর ছবিতে নানা ধরণের নিসর্গ আছে এবং আছে অজস্র কাজের মানুষের ভিড়। কামার কুমোর ছুতোর চামার, এক কথায় কর্মরত 'নিচুতলার মানুষ'। বিভিন্ন স্তরের নরনারী। অন্যদিকে জন্তুজানোয়ার। ফর্ম পালটে যায়, তাদের ব্যবহার করার রীতি ও লক্ষ্য পালটে যায়—কিন্তু বিষয়ে এই সাদৃশ্য একটা থাকেই।

সবাই লক্ষ করেছেন, কামরুলের একটা বড়ো ঝোঁক নারীর ছবি আঁকায়। কতভাবে যে নারী এসেছে তাঁর ছবিতে। 'তিনকন্যা' সিরিজে এবং অন্যত্রও আছে নারীর নানা রূপ ও অভিব্যক্তি যা তাদের দেহাবয়বে মূর্ত। নারীর ইন্দ্রিয়তাড়িত সংরক্ত মোহিনী রূপ যেমন, তেমনি মা-জায়া-কন্যা, কিংবা নেহাতই পারিবারিক আবহের নারী, বাপের বাড়ির অভিমুখী নারী (নাইয়র)। প্রসাধনরতা বা স্নানরতা নারীর পাশাপাশি কলসি-কাঁখে বাংলার চিরন্তন নারী। এবং সর্বত্রই লোকায়ত বৈশিষ্ট্যই অনাবিল ফুটে ওঠে।

লোকায়তের সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টি ও প্রকরণকে কীভাবে মেলান কামরুল হাসান সেটাই দেখার বিষয়। জলরঙ ও তেলরঙ উভয় মাধ্যমেই ছবি এঁকেছেন তিনি অজস্র। ক্রমশ নানা রীতির ছাপাই-শিল্প বা গ্রাফিক্স ও মিশ্রমাধ্যমেও। পরের দিকে কাঠখোদাইতে তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। ড্রইং তো বরাবরই করতেন, কিন্তু জীবনের শেষদিকে তা আরো—জীবনকে দেখার ও জানানোর হয়ে ওঠে যেন একটা পদ্ধতি। রঙের ব্যবহার কামরুলের ছবিকে চেনার একটা বড়ো দিক। রঙের ব্যবহারের এই বিশেষত্বের কথা বিশদ করে বলেছেনও অনেকে। কারো মতে, রঙ "তাঁর চিন্তার বাহন"। কামরুলের তীব্র রঙের ব্যবহার তা বলে পশ্চিমি রীতির নয়, বরং লালের পাশে হলুদ রঙের ব্যবহার যেন ঘটে বাংলার লোকশিল্পের প্রেরণাতেই।

যে-বোধ থেকে কামরুল হাসান লোকশিল্পকে নিজের মতো করে অবলম্বন করেছিলেন, সেই বোধেই তিনি মানবজীবন-মানবসমাজ এমনকী মানবরাজনীতিতেও নিজের মতো করেই যুক্ত হয়েছেন। পাকিস্তান-আমলে ও স্বাধীন বাংলাদেশের নানা সংকটে তাঁর সাড়া ছিল কোনো-না-কোনোভাবে। পাক-প্রতিবাদী ও মৌলবাদ-প্রতিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনিও শরিক—জয়নুলের চেয়ে আরো আপোসহীন প্রত্যক্ষতায়। তাঁর ছবিতেও তার ছাপ পড়ে। তাঁর চেনা ফর্মের ছবিতে যেমন, তেমনি কার্টুনে বা ব্যঙ্গপ্রধান স্কেচে তিনি তাঁর সেই সময়ের মনের বিক্ষোভ ও চিন্তাকে তুলে ধরেন। চলমান জীবন ফুটে ওঠে অজস্র ড্রইংয়ে। জন্তুজানোয়ারকে ব্যবহার করেন নিজের প্রতিবাদ জানাতে।

তাঁর ছবির মধ্যে আবেগ ও গতিশীলতার এবং অস্থিরতার লক্ষণ অবশ্য বরাবর। লোকশিল্পের আপাত শান্ত জমিতেও তা ধরা পড়ে। সেখানেই বোধহয় তাঁর অনন্যতাও। বাংলাদেশকে ঘিরে যে সংগ্রামী চেতনা ক্রমশ উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছিল, তিনি তাতে অংশ নিয়েছিলেন পটুয়ার অহংকারে। বাংলার রূপকথা আঁকতে চেয়েছেন পরিবেশের গ্লানিকে মুছতেই। শাশ্বত বাঙালিরই আধুনিক রূপ বেরিয়ে এসেছে কামরুল হাসানের শিল্পে।

৪

বয়সে এক বছরের ছোটো হলেও কামরুল হাসান যখন কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হলেন, তখন সফিউদ্দিন আহমেদ সেখানকার সদ্য-নিয়োজিত শিক্ষক। কামরুলের মতোই তিনিও জন্মসূত্রে কলকাতারই মানুষ। স্কুলে, প্রায় গোড়া থেকেই, তিনি ড্রইংয়ের জন্য শিক্ষকদের কাছে বহুপ্রশংসিত। তেলরঙেও ক্রমশ সিদ্ধি অর্জন করলেন। ফাইন আর্টসে পাশও করলেন। কিন্তু তাঁর নজর ছাপাই-ছবির দিকে। প্রিন্টমেকিং বিভাগের প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ রমেন চক্রবর্তীর আনুকূল্যে সে-দিকেই চলে গেলেন।

সফিউদ্দিন সাঁওতালপরগনার গ্রামের দৃশ্য আঁকতেন ছাত্রজীবন থেকে। উড-এনগ্রেভিং, ড্রাইপয়েন্ট, এচিং-এর অনুশীলন শুরু হল তখনই। আরো এগিয়ে গেলেন তিনি ছাপাই-ছবির নানামুখী কৃৎকৌশলে। বিশেষ করে তাতে চলে এল আলোছায়ার বিন্যাস। কাঠখোদাইয়ে প্রকৃতি নতুন মাত্রা পেল।

ইতিমধ্যে কলকাতার আর্ট স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সেখানেই শিক্ষকতা করলেন কিছুকাল। দেশভাগের পর সফিউদ্দিনও ঢাকায় চলে এলেন এবং যোগ দিলেন জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে, ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষকতায়, বলা বাহুল্য ছাপাই-ছবি বিভাগেই। কিছুদিনের মধ্যেই, আরো অনেকের মতো সফিউদ্দিনও প্রিন্টমেকিংয়ে আরো দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদেশে গেলেন। বিভিন্ন মিউজিয়মে দেখাশোনা শেষ করে এবং ছাপাই-ছবির বিভিন্ন প্রকরণে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফিরেও এলেন।

তারপর শুরু হল তার প্রয়োগ। বিদেশে সফিউদ্দিন যাওয়ার আগেই বন্যা-সিরিজে হাত দিয়েছিলেন, এবার তাম্রতক্ষণের শিক্ষাকে কাজে লাগালেন জলঘূর্ণির তীব্রতাকে ফুটিয়ে তুলতে, মোটা কালো রেখায়। শুধু যে ছাপাই-ছবির কাজ করলেন তা নয়, তেলরঙেও আঁকলেন অনেক ছবি। তেলরঙে বাস্তবধর্মী নিসর্গদৃশ্য রচনায় তাঁর নৈপুণ্য আগেই প্রমাণিত—এখন তার মধ্যে আরো বৈচিত্র্য এসে গেল। ড্রইংয়ের সংখ্যাও তাঁর কম নয়। আর আছে চারকোল ও ক্রেয়ন। তেলরঙ তো বটেই। ক্রমশই দেখা গেল, তাঁর সব মাধ্যমের কাজেই কতকগুলি প্রতীক উঠে আসছে। কখনো 'মাছ', কখনো 'চোখ', কখনো 'জল'। সেই সঙ্গে স্বাভাবিক সংলগ্নতায় নৌকো, মাছ ধরার জাল, জলমগ্ন নিসর্গ—জ্যামিতিক নকশায় তারা বিমূর্ত হয়ে উঠল। কখনো এক্সপ্রেশনিস্ট, কখনো ইমপ্রেশনিস্ট ধাঁচে। কোনো-কোনো ছবিতে মিরো-র কথাও মনে পড়ে যেতে পারে কারো।

সফিউদ্দিন যদিও বাহ্যত খুব নির্জন স্বভাবের মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে একটা চাপা আবেগও ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউট

গড়ার সময়েও। পাকিস্তান-আমলে, লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেই, তিনি তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন বিভিন্ন আন্দোলন ও লড়াইয়ের সময়। সেটা প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে নয়, প্রধানত টের পাওয়া যায় তাঁর এই শিল্পকর্মেই। যে-সব প্রতীক তিনি নির্মাণ করেছিলেন, তার মধ্যে ঢেলে দিচ্ছিলেন তাঁর ওই স্বাদেশিকতাকেই। 'একুশের স্মরণে' বা 'একাত্তরের স্মৃতি' বা 'একাত্তর স্মরণে' নামাঙ্কিত ছবিগুলোতে বর্ণময় এনগ্রেভিং-এর মাধ্যমে 'চোখ'কে যখন তিনি ব্যবহার করেন, তখন তার মধ্যে সংহত হতে থাকে মানুষের অসহায়তা, বিষাদ ও যন্ত্রণা। মাছের চোখ থেকে মানুষের চোখে তিনি পৌঁছোন এই আশ্চর্য সংলগ্নতাতেই। সেরকমই বলা যায়, 'বিক্ষুব্ধ মাছ', 'জলের নিনাদ', 'সেতু পারাপার', 'গুনটানা' ও চারকোল-ক্রেয়নে আঁকা বিভিন্ন ড্রইংয়ে।

৫

এতক্ষণ যাঁদের কথা বলা হল, তাঁদের প্রত্যেকেরই কলকাতার শিল্পজগৎ থেকে ঢাকার শিল্পজগতে আসার পথরেখার মধ্যে একটা মিল আছে। কিন্তু, এস এম সুলতান এলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গা থেকে। যদিও সমকালীন অগ্রগামীদের সঙ্গেই বাংলাদেশের শিল্পকলার সূচনা-পর্বে তাঁকেও ধরতে হবে। তিনিও পূর্ববঙ্গের নড়াইল থেকে ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি হতে কলকাতায় এসেছিলেন, ভর্তিও হয়েছিলেন, কিন্তু আগের ছকটা টিকল না। পাঠ অসমাপ্ত রেখেই তিনি ছিটকে গেলেন সেই বৃত্ত থেকে। এর পর ভবঘুরের মতো ঘুরলেন দেশে-দেশে—কাশ্মীর, লাহোর, করাচি, অবশেষে ইওরোপ-আমেরিকাতেও। তখনও ছবি এঁকে চলতেন ঠিকই, স্বীকৃতিও বোধহয় মিলেছিল, কিন্তু কী ছবি কেমন ছবি কেউ বলতে পারে না। অবশেষে ১৯৫৩-তে দেশে ফিরলেন, তবে রাজধানী ঢাকাতে নয়, থিতু হলেন নিজের গ্রামে, নড়াইলে, চিত্রা নদীর ধারে। এর পর শুরু হল অদ্ভুত নেশাগ্রস্ত প্রায়োন্মাদ ছন্নছাড়া জীবন যাপন। এবং সেই সঙ্গে চারপাশের গ্রামীণ প্রকৃতি ও মানুষ নিয়ে তাঁর ছবি আঁকা। তার মধ্যেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল বাংলাদেশের পরিবেশ। তাঁর স্বদেশ।

সে-ছবিতে কিন্তু লোকশিল্প বা গ্রামীণ শিল্পের কোনো ছোঁয়া ছিল না। পেছনের অভিজ্ঞতাগুলোই বরং যেন কাজে লেগে গেল। কলকাতার স্বল্পকালীন শিক্ষাপর্বেই আশ্রয়দাতা শাহেদ সোহরাওয়ার্দির স্টাডিতে কিংবা সরকারি আর্ট স্কুলের লাইব্রেরিতে সুলতান সুযোগ পেয়েছিলেন ইওরোপীয় শিল্পীদের ছবির অ্যালবাম দেখার। পরে ইওরোপ ভ্রমণের সময় নিশ্চয় দেখেছিলেন অনেক অরিজিনাল। আর এভাবেই

তাঁর আসল শিক্ষাটাই হয়েছিল, মনে গেঁথে গিয়েছিল রেনেসাঁস-যুগের শিল্পীদের কাজ—দা ভিঞ্চি, মাইকেলএঞ্জেলো, রাফায়েল। কিংবা ভান গখ বা পিকাসো।

ঢাকার শিল্পপরিবেশ সুলতানের পোষাল না, যদিও সেখানে তাঁর তারিফ একেবারেই হয়নি এমন নয়। আসলে তাঁর মনমেজাজই আলাদা। তিনি বিচিত্র সব গৃহপালিত পশুপাখি, গ্রামের মানুষ, বিশেষত চারপাশের শিশুদের নিয়ে থাকতেই ভালোবাসতেন। শেষের দিকে অনেকসময় ভাসমান নৌকোই ছিল তাঁর বাসস্থান। পোশাক-আশাকে, দৈনন্দিন অভ্যাসে, নানারকম উদ্ভটের চর্চায় মেতে থাকতেন। ছবিতে অবশ্য তার সরাসরি ছাপ পড়ত না। আঁকতেন চোখে-দেখা চাষি, চাষের জমি, চাষবাসের প্রত্যেকটি স্তর বা উপাদান (গোরু আছে, লাঙলও আছে) এবং সেই সঙ্গে তার চারপাশের কুঁড়েঘর, গাছপালা, পুকুর, নদী। সব মিলিয়ে তাঁর ছবিতে ফুটে উঠত গ্রামীণ মানুষের ঘর, উঠোন, গৃহস্থালি, পারিবারিক জীবন, গোষ্ঠী-জীবন। একদিক থেকে তা মনে হতে পারে বাস্তব, কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা যায় বাস্তবকে ছাপিয়ে যেন এক বাস্তবোত্তীর্ণ জগতে পৌঁছে দিচ্ছেন নিজেকে। প্রকৃতি ও মানুষকে আঁকতে গিয়ে এক ধরণের আতিশয্যকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তাই তাঁর ছবির নিসর্গ ধুমসো, নারীপুরুষ স্ফীত স্থূলকায় পেশিবহুল—কখনো-কখনো মনে হয় শরীর থেকে যেন মেদ ঝরে পড়ছে। নারীরা হয়তো ইন্দ্রিয়ঘন, কিন্তু পৃথুল।

কেউ-কেউ মনে করেছেন, সুলতানের ছবিতে কৃষিসভ্যতার রূপক প্রকাশ পেয়েছে, কেউ-কেউ দেখেছেন সেখানে প্রাক-পুরাণিক আদিম মানুষ। তাঁর ছবিতে যে তামাটে রঙের প্রাধান্য তাতে কেউ খুঁজে পেয়েছেন বঙ্গীয় সংস্কৃতির অনার্য উৎসের ইঙ্গিত। ব্যাখ্যা যা-ই হোক, শাদা চোখে বাংলার ঘরোয়া জীবনের প্রসন্ন শান্তি এবং তার কর্মময় সচল এমনকী কখনো-কখনো সংগ্রামী জীবনের মুখরতা—উভয়কেই পাশাপাশি পাওয়া যায় তাঁর ছবিতে।

কোন প্রকরণে সুলতান পৌঁছোলেন সেখানে, এই জিজ্ঞাসা উঠতেই পারে শিল্পরসিকের মনে। শারীরসংস্থানে তাঁর অসামান্য জ্ঞান টের পাওয়া যায় তলে-তলে, কিন্তু তাকে সচেতনভাবে অগ্রাহ্য করে তিনি বিষয়কে মোটা রেখার সাহায্যে নধর এবং কিছুটা ভাস্কর্যসুলভ অবয়বে রূপান্তরিত করেন—যার মধ্যে, তুলনা না করেই বলা যায়, রুশোর 'শহুরে নাইভ' চরিত্রের আদল। জলরঙ এবং তেলরঙ দুটোই সুলতান ব্যবহার করেন সবসময়। ছোটো আকারের ছবিতে, বিশালাকার ছবিতে। কখনো-কখনো ম্যুরাল কিংবা স্ক্রোল হিশেবে। রঙের ব্যবহারে তিনি প্রবলতায় বিশ্বাসী—হলুদ সবুজ নীল লাল ইত্যাদি মৌল রঙের সমাবেশে উজ্জ্বল তাঁর ছবি।

মনে হতে পারে, সুলতানের ছবিতে এই যে উজ্জ্বল পরিবেশ ও শক্তিশালী মানুষ আঁকা হয়েছে, কী তার লক্ষ্য? এ কি তবে তাঁর স্বপ্নেরই জগৎ—যেখানে ফসল ফলানোর আবেগ উঠে আসে জীবননাট্যে? পরিবেশের অন্ধকারে তিনি ধরতে চেয়েছেন আলোকবর্তিকা? যা অতীতে ছিল কিংবা যা ভবিষ্যতে ঘটবে, আনতে চেয়েছেন সেই আবহমানকে? এ সবই কি 'অতীত দিনের স্মৃতি' (১৯৭৬-এ আঁকা তাঁর একটি তেলরঙ ছবির নামকরণ)? এই ঘোর আনন্দময় প্রকৃতি ও শ্রমচঞ্চল আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের সমন্বিত জীবনকে এঁকে তিনি বোধহয় আজকের বিব্রত মানুষের মনে আশাই জাগাতে চেয়েছেন। এই সমাবেশ ও সমঝোতার জীবন, এই যৌথতাই সুলতানের ছবির অন্তঃসার—অন্য যুগে অন্য অর্থে যা পেয়েছিলাম আমরা ফ্লেমিশ শিল্পী পিটার ব্রুখেলের ছবিতে। সৃজনশীলতার বন্দনাই যেন তাঁর ছবি থেকে শুনতে পাই আমরা।

এই সৃজনশীলতা যখন শান্তিময়, তখন পাই একের পর এক দৃশ্য—জমিতে লাঙল দেওয়া, ধান ভানা, মাছ ধরা, গুন টানা, নদী পারাপার করা। তেলরঙে বা জলরঙে। এক ধানভানার ছবিই যে কত তার শেষ নেই। পাশাপাশি আছে 'চরদখল' বা 'হত্যাযজ্ঞ'-র মতো স্বল্পসংখ্যক হলেও শান্তিভঙ্গের ছবিও। প্রকাশ্যত রাজনীতি থেকে অনেক দূরে তিনি, তবু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অন্তত যে-তিনটি ছবি এঁকেছেন, তাতে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের এই সংগ্রামশীলতার দিকটিও প্রকাশ পায় নির্ভুলভাবে। অবশ্য এই সব কিছুর মধ্যেই, এমনকী শান্তির ছবির মধ্যেও, সুস্থ শক্তিমত্তারই প্রকাশ। সুলতানের ছবি তারই রূপক। কখনো মনে হয় তা প্রতীকে উন্নীত। 'আদি আবাদ' বা 'প্রথম রোপণ' নামক তেলরঙে আঁকা বিখ্যাত ছবিটি—সেখানে শক্তিধর আদম মাটির পৃথিবীতে এসে প্রথম বৃক্ষ রোপণ করছেন, আর ওপরে রোমক প্রেমের দেবতারা ভেসে বেড়াচ্ছেন—সেটা তো তারই দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্যের শিল্পের অনুষঙ্গই সেখানে, কিন্তু তবু তা বাংলাদেশেরই ছবি।

৬

কলকাতার আর্ট স্কুল থেকে ঢাকায় আসা আরো কয়েকজন শিল্পী ছিলেন যাঁরা দেশভাগের পরে ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে ছবি আঁকা শেখাতেন, কেউ-বা অতঃপর আর্ট ইনস্টিটিউটেও। জয়নুল-কামরুল-সফিউদ্দিন এই ত্রয়ী ছাড়াও প্রথম যুগের শিল্প-আবহে তাঁরাও অংশীদার। যেমন, শফিক উল আমিন, হাবীবুর রহমান, সৈয়দ আলী আহসান, আনোয়ারুল হক প্রমুখ। এঁদের মধ্যে আনোয়ারুল হকের কৃতির কথা অনেকেই বলেছেন, পাশ্চাত্যের ধরণে ছবি আঁকার রীতিতেই তিনি অভ্যস্ত

ছিলেন। তবে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ এবং এস এম সুলতান, যাঁরা বাংলাদেশের শিল্পের আদিপুরুষ, তাঁদের মধ্যে এই দেশের শিল্পের যে একটি স্বতন্ত্র আদল বা চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই—যদিও প্রত্যেকেই বিষয় ও আঙ্গিকের নানা দিক থেকেই এত আলাদা। কিন্তু তবু যে তাঁরা একটি ভূখণ্ডের এমনকী একটি সময়েরই প্রতিভূ তা-ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটাই তাঁদের মিলের জায়গা। মিলের একটা বড়ো দিক : প্রত্যেকের মধ্যেই স্বকীয়ভাবে পূর্ববঙ্গের নিসর্গ ও তার সঙ্গে সংলগ্ন চেনা মানুষের উপস্থিতি। এবং মানুষ বলতে ওঁদের সকলের কাছেই নিচুতলার শ্রমজীবী মানুষ—যারা ধান ভানে, নৌকোয় গুন টানে, জাল ছড়িয়ে মাছ ধরে। অলস মানুষ নয়, সব সময় কর্মময় মানুষ। এর প্রায় কোনো ব্যতিক্রমই নেই। সেই সঙ্গে যে-নিসর্গকে পাই, তাতে নদী জল নৌকো সবুজ ধানখেত বা বৃষ্টির প্রাধান্য। এক কথায় পূর্ববঙ্গের চেনা বা শোনা প্রকৃতি। নিসর্গনির্ভর তাঁরা বরাবরই। জয়নুল-কামরুল-সুলতান তিনজনই সাঁওতালপরগনার দুমকা-মধুপুর বা সন্নিহিত অঞ্চলের ছবি এঁকেছেন প্রথম জীবনে। পরে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতিও আলোড়িত করেছে কাউকে। সুলতান তো কাশ্মীরের ছবি এঁকে স্মরণীয় হয়েছিলেন। তবু, শেষপর্যন্ত বাংলাদেশের নিসর্গই তাঁদের সর্বস্ব। এমনকী সফিউদ্দিনের বিমূর্ত ছাপাই-ছবিতেও সেই নিসর্গকেই চেনা যায়। শিল্পীদের দৃষ্টিকোণ এবং শিল্পের মাধ্যমে ও প্রকরণে প্রত্যেকের মধ্যে পার্থক্য ও তাঁদের নিজেদের কাজের মধ্যেও বৈচিত্র্য অনেক—কিন্তু সেখানে অন্তরালবর্তী সমভাবের জায়গা আছে, যার জোরে বলে দেওয়া যায়, এগুলো বাংলাদেশেরই ছবি।

এঁদের সামীপ্যকে অবশ্য অন্য দিক থেকেও দেখা হয়েছে আগেই। যেমন, জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসানের মধ্যে কমবেশি বাংলার লোকশিল্পের প্রভাব, এমনকী সফিউদ্দিন আহমেদের ক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে। তবে একান্তভাবে গ্রামমুখী হলেও লোকশিল্প যে সুলতানের জায়গা নয়, তাও আমরা জেনেছি। তা বলে, এ-কথাও আগেই হয়েছে, বাকি তিনজনের কেউই ঠিক যামিনী রায়ের অনুসারী নন, এমনকী কামরুলও নন—যতই তাঁরা তাঁর একান্ত অনুরাগী হন। এই অসমতার জায়গাটাতেই বোধহয় আছে 'বাংলাদেশ'। লোকশিল্পকে যেভাবে তাঁরা 'ব্যবহার' করেছেন, যেভাবে গ্রহণ-বর্জন ঘটেছে, কখনো স্বদেশের ইতিহাস থেকে জাত একটা গোপন 'টেনশন' এসে গেছে, তাতেই তাঁদের শিল্পীজীবনের স্বতন্ত্র পটভূমি ও বিশেষত্ব বেশ স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

আরো একটি কথা বলা যায় : চারজনের ছবিতেই শৈল্পিক বাস্তবতার একটা পরিচয় সবসময় থাকে, শুধু প্রথম পর্বেই নয়, যখন তাঁরা প্রত্যেকেই পরীক্ষানিরীক্ষার

মধ্যে স্বতন্ত্র পথে চলে গেছেন, তখনও। সফিউদ্দিন আহমেদের ছবিতে বিমূর্তন যখন স্পষ্টতর হল, তখনও এই বাস্তবতা পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে যায়নি, অন্তত অধিকাংশ ছবিতেই। অন্যদিকে, একই সঙ্গে বলা যায়, জয়নুল আবেদিন বা কামরুল হাসানের মধ্যে লোকশিল্পের ভিত্তি প্রগাঢ় হলেও, তাঁরা একজায়গায় থেমে থাকেননি, নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন ফর্মভাঙার নানা প্রয়াসে—ইওরোপীয় শিল্পের, এমনকী তার বিমূর্তায়নের বিভিন্ন শাখার সীমিত ছাপও পড়েছে। পাশ্চাত্য-শিল্পের তুলনা তো সুলতান প্রসঙ্গেও এসেছে। সফিউদ্দিনের পরিক্রমা সেদিক থেকে একেবারে সোজাসুজি—বিমূর্ত শিল্পধারাকে নিঃসংকোচে তিনি ধরতে চেয়েছেন। অর্থাৎ, বাংলাদেশের শিল্পধারার সূত্রপাতেই বাংলার লোকশিল্প-নির্ভর আধুনিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিকতার একটা সম্পর্ক এভাবেই ঘটে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তবতার নানা প্রকরণগত নিরীক্ষাতেও সমৃদ্ধ হল এই ধারা।

৭

জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র শিল্প-প্রগতির এই যে সূত্রপাত, প্রধানত ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে, তা কিন্তু অচিরে বাঁক নিল সেখানকার ছাত্রদের সম্পূর্ণ পৃথক অভিযানে। এই ছাত্ররা একেবারে গোড়ায় হয়তো তাঁদের শিক্ষকদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু এর পরেই একটা ঘটনা ঘটল—তাঁরা অনেকেই বিদেশে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেলেন। দেশে থাকতেই অবশ্য তাঁরা—বাংলাদেশের আদি শিল্পীদের পরে যাঁদের বলা হয় প্রথম প্রজন্মের শিল্পী—পাশ্চাত্যের শিল্পের বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন কিউবিজম স্যুররিয়েলিজম এক্সপ্রেশনিজম অ্যাবস্ট্রাক্ট-এক্সপ্রেশনিজম ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছবি এঁকেছেন, ভাস্কর্য গড়েছেন। এমনকী এই এক্সপ্রেশনিজমের বিভিন্ন ধারা পূর্বসূরি জয়নুল আবেদিনকেও চঞ্চল করেছিল। পাশ্চাত্যের এইসব শিল্পরীতিতে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে ছবি এঁকেছেন যে-সব ছাত্ররা তাঁদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, রশিদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ। আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁরা প্রায় সকলেই বেরিয়ে পড়লেন ইওরোপের আমেরিকার ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শিল্পকলা-চর্চার শহরে। শুধু কলকাতা থেকে আগত মোহাম্মদ কিবরিয়া কিছু পরে গিয়েছিলেন জাপানের টোকিও-তে।

এই কিবরিয়াকেই বলা যায় বাংলাদেশের প্রথম বিমূর্ত শিল্পী। এক-অর্থে বিমূর্তনের ইশারা হয়তো প্রথমযুগের শিল্পীদের মধ্যেও ছিল, কিন্তু কিবরিয়াই তাকে পশ্চিমি অত্যাধুনিক ধারার সঙ্গে যেন যুক্ত করলেন—যদিও দেশজ শিল্পের সঙ্গে সংযোগ

রেখেই। রঙের ওপর এবং জ্যামিতিক গঠনের ওপর মৌল নির্ভরতা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে—তারই মধ্যে ক্রমশ আবিষ্কার করা যায় তাঁর নিজের জায়গাটা—তাঁর নিজস্ব ভাষা ও প্রতিমার নির্মাণ। তেলরঙে আঁকা কিউবিজম-ছোঁয়া 'পূর্ণিমা' বা 'জলকেলি' থেকে যেভাবে তিনি সত্তর-পরবর্তী দশকগুলিতে শুধু 'পেইন্টিং' নামের ছবিতে ধূসর বা নীল রঙের বিস্তারে, বিমূর্ত কম্পোজিশনে, তাঁর নিজস্ব বিষাদকে প্রকাশ করার সিদ্ধিতে পৌঁছোলেন, তা বাংলাদেশের চিত্রকলার জগতে অতুলনীয়।

বাংলাদেশে বিশুদ্ধ বিমূর্তায়নের প্রথমদিককার চিত্রকর হিশেবে আর যাঁর নাম করা হয়, তিনি হামিদুর রাহমান। প্রথম ভাস্কর যেমন নভেরা আহমেদ। আমিনুল ইসলামের 'বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর' বইতে পাওয়া যায় কীভাবে হামিদুর রাহমান ও নভেরা আহমেদ-এর সঙ্গে তিনি ফ্লোরেন্স শহরে কালাতিপাত করেছেন। আসলে ইওরোপ-আমেরিকার কোনো-একটি শহরে প্রথমে পা রাখলেও, প্রত্যেকেই প্রায় পরে বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করেছেন। মিউজিয়মে গেছেন, মাস্টারদের কাছে শিখেছেন, স্টুডিও ভাড়া করে নিজেরাও এঁকেছেন এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হয়েছে কখনো-কখনো।

শুধু হামিদুর রাহমান নয়, অন্যেরাও দেশে ফিরে এসে এমন সব ছবি আঁকতে শুরু করলেন, যেখানে পশ্চিমের, কিংবা বলা যায় অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট বা বিমূর্ত শিল্পের আধুনিকতম চিত্ররীতি অনুসৃত। ষাটের দশকেই বাংলাদেশের চিত্রকলার পুরোধাদের পাশাপাশি আরেকটি পর্ব এভাবেই দানা বাঁধল। তাঁদের পথেই এমনকী যাঁরা তখনও বিদেশে যাননি, পরে হয়তো গেছেন, তাঁরাও চললেন দেখা যায়। সামান্য আগের কিবরিয়া তখনও বিদেশে না গিয়েও তা-ই, এমনকী বলা যায়, আদিপর্বের সহযাত্রী হিশেবে প্রথম পর্বের সূচনাতেই তাঁর অবস্থান। আর যাঁদের পেলাম, তাঁরা হলেন আবদুর রউফ, কাইয়ুম চৌধুরী, কাজী আবদুল বাসেত, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, দেবদাস চক্রবর্তী, মোবিনুল আজিম, নিতুন কুণ্ডু প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকেরই জন্ম তিরিশের দশকের প্রথমার্ধে বা মাঝামাঝি (শুধু কিবরিয়ার জন্ম ১৯২৯-এ)।

এই যে বাংলাদেশের শিল্পধারার নবীন অংশ, পূর্বসূরিদের কিছুটা পাশ কাটিয়ে নতুন মোড় নিল, তা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। কেউ-কেউ ভেবেছেন, পাকিস্তান-আমলের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বদ্ধতা থেকে রেহাই পেতে চেয়েছেন তাঁরা এভাবেই। আবার কেউ মনে করেছেন, এটা নেহাতই দেশকালনিরপেক্ষ শিল্পীমনেরই আকুতি। বিমূর্ত শিল্প তো একভাবে সারা বিশ্বের মানসকেই প্রকাশ করেছে। কিন্তু এইসব ব্যাখ্যা খুব বেশি যুক্তিসহ বলে মনে হয় না। একটা অস্বস্তি

বা অননুমোদন তৈরি হলই নবীন শিল্পীদের এই চলনে। বাংলাদেশের শিল্প-আবহাওয়া ঠিকমতো তৈরি হওয়ার আগেই এই ঝাঁপ আধুনিকতা-বিষয়ে সাধারণ শিল্পভোক্তাদের সঙ্গে শিল্পের দূরত্বকে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে ফেলল। তা ছাড়াও একটি মৌলিক নান্দনিক প্রশ্ন আছে বইকী! সেটা অবশ্য শুধু বাংলাদেশের শিল্প প্রসঙ্গে নয়, প্রাচ্যের যে-কোনো দেশের শিল্প প্রসঙ্গেই। ইওরোপের বিভিন্ন 'ইজম' বা 'অ্যাবস্ট্রাকশনে'র ধরণ সেখানকার শিল্প-অভিজ্ঞতার মধ্যে যেভাবে উঠে এসেছে তাতে নিশ্চয়ই একটা সুস্থ অনিবার্যতা আছে, সেই উদ্ভাবনের উৎস ও বিবর্তনের ইতিহাস আছে, আছে তার ভেতরকার সংগত স্তর ও স্তরান্তর—কিন্তু তাদের উপড়ে নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে আমদানি করাটা শিল্পের দিক থেকে কোনোভাবে স্বাভাবিক নয়, সার্থকও হতে পারে না। কিন্তু তারই পালোয়ানি চেষ্টা হয়েছে বলে সন্দেহ হয়।

কিন্তু তা বলে শিল্পের একদেশের ভাষা অন্যদেশের ভাষাকে আদৌ স্পর্শ করবে না এমনও তো হতে পারে না। শুধু পাশ্চাত্য কেন, প্রাচ্যেরও বিভিন্ন দেশের শিল্প ও তার আধুনিকতা ভারতীয় বা বাংলার শিল্পের পুরোধাদের বিভিন্ন সময়ে কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছে তা তো আমরা দেখেছি। কিন্তু সেটা অন্ধ অনুকরণ নয়। তখনই তা সার্থক হয়েছে, যখন শিল্পীরা তাকে আত্মস্থ করে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের দ্বিতীয় পর্বের, বা যাদের বলা হয়েছে প্রথম প্রজন্মের শিল্পী, তাদের বা তারও পরবর্তীদের পাশ্চাত্য ইজমগুলি যেভাবে তাড়িত বা আচ্ছন্ন করেছে, তা বোধহয় যে-প্রক্রিয়ার কথা বলা হল, তার চেয়ে বেশি। অন্তত সেরকমই মনে করেছেন অনেকে।

তবে, সকলের সম্পর্কে নিশ্চয়ই একই কথা একইভাবে বলা যায় না। পাশ্চাত্যের পরিগ্রহণেরও মাত্রাভেদ আছে। বিভিন্ন শিল্পীর মধ্যে এ-ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক আছে, কিংবা একই শিল্পীর বিভিন্ন কাজের মধ্যেও আছে অসমতা। এমন কাজও আমরা দেখেছি যেখানে পাশ্চাত্যের চিন্তা বা ভাষা স্বদেশের চিন্তা বা ভাষার সঙ্গে একটা সাযুজ্য গড়ে তুলতে পেরেছে। আর তাতেই বাংলাদেশের শিল্পকলার একটা ভিন্ন চেহারা তৈরি হয়েছে।

প্রথম যুগের শিল্পীদের মধ্যে এরই আভাস পেয়েছিলাম সফিউদ্দিন আহমেদের ছবির বিমূর্তায়নে। তাঁর তেলরঙের ছবির কাঠামোয় বা ডিজাইনে বাংলার লোকশিল্পের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে যাঁরা লোকশিল্পের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এই বিমূর্তায়নের ধারার ভেতরেই, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী অবশ্যই এবং সেই সঙ্গে অল্পবিস্তর রশিদ চৌধুরী, হামিদুর রাহমান ও আরো কেউ-কেউ।

লোকশিল্পে লিপ্ততা কাইয়ুম চৌধুরীর এমনই যে, বিমূর্তায়নের দিকে নানারকম ঝোঁক সত্ত্বেও লোকশিল্পে বিভিন্ন মোটিফ ডিজাইন বা নকশা কিংবা কাঠামো স্পর্শ করে তাঁর ছবিকে। নৌকো তাঁর প্রিয় বিষয়—সেই নৌকোই তেলরঙে কত যে এঁকেছেন তা বলার নয়। 'আমার গ্রাম' সিরিজেও তা-ই। প্রয়াত রশিদ চৌধুরী তাঁর ছবিতে লোককলার বিবিধ প্রতিমা, উপাদান ও উপকরণকে মেলাতে পারেন পাশ্চাত্য-অনুপ্রাণিত ছবির সঙ্গে—এমনকী তাঁর 'উৎসব' বা 'সরাচিত্র' দেখে তা-ই মনে হয়—তা সে পিকাসো-ই হোক কিংবা মার্ক শাগাল। কারো-কারো কাছে দুটো আলাদা জগতই হয়তো রয়ে যায়—তাদের মধ্যে চলে নিত্য যাওয়া-আসা। এভাবেই হামিদুর রাহমান পাশ্চাত্য ধারার শিল্পী হয়েও মাঝে-মাঝে চলে যান লোকশিল্পের জগতে। পরবর্তীকালেও একই ভাবে নয়, নানাভাবেই লোক-ঐতিহ্যের অনুশীলনের পরিচয় পাই, যেমন পেয়েছি এম মহিউদ্দীনের মধ্যে।

তাই বলা যায়, বাংলাদেশের শিল্পীদের এই যে বিমূর্তায়নের দিকে যাত্রা, তা সকলের মধ্যে শৌখিন বিলাসী অনুকরণ মাত্র নয়। সেটা বিশেষ করে বোঝা যায়, যখন দেখি এরই মধ্যে তাঁরা স্বকাল ও স্বদেশের ভাবনায় বারবার ফিরে আসছেন, তাঁদের এই নবলব্ধ বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক শিল্পভাষাতেও। আমিনুল ইসলামের বিমূর্তায়নের মধ্যেও তাই থাকে শুধু মননের চাপ নয়, 'আদিম শক্তি ও সংগ্রামে'র দুঃসাহসী গতিময়তা—যা প্রকাশ পেয়েছে জলরঙে, তেলরঙে, অন্য নানা মাধ্যমে, এমনকী মোজাইক ম্যুরালে। 'জেনোসাইড'-এর মতো তাঁর বহু ছবিতে মূর্ত ও বিমূর্তের স্বতঃস্ফূর্ত সমাহার। আবদুর রাজ্জাক বাস্তববাদী ধারায় কাজ শুরু করলেও ক্রমশই এগিয়েছেন বিমূর্তায়নের দিকে—জলরঙে বা তেলরঙে, বিশেষভাবে ছাপাই-ছবিতে। এমনকী অনেক ভাস্কর্যের কাজও করেছেন তিনি সেই ভাষায়—তার মধ্যে আবার কাঠের কাজে জ্যামিতিকতার প্রাধান্য। চিত্রকলাতে যেমন প্রাধান্য বর্ণময় নিসর্গের। তিনিও বারবার চেনা প্রকৃতিতে ফিরে যান, চেনা সামাজিক পারিপার্শ্বেও। মুর্তজা বশীর বিদেশ থেকে ফিরে এসে এঁকে গেছেন অনেক বিমূর্ত ছবি, যেমন 'দেয়াল' সিরিজ, কিংবা নুড়ি ও পাথর নিয়ে 'শহিদ শিরোনাম' সিরিজ। সেইসব ছবির পেছনে থাকে দেশ ও কাল সচেতন শিল্পীর প্রচণ্ড বিক্ষোভ। তাই তা কখনো 'এপিটাফ ফর দি মারটায়ার্স', কখনো 'শহিদ বৃক্ষ'। দেবদাস চক্রবর্তীর ছবিতে নিসর্গ ও মানুষের বিপুল বৈচিত্র্য। ক্রমশ তিনিও চলে যান আপোসহীন বিমূর্তায়নের দিকে, কিন্তু তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য যে আবেগের প্রাবল্য, তা কিন্তু চাপা পড়ে না। যে-আশাবাদ তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক বিশ্বাসে, তা ছবিতেও ছাপ রেখে যায়। তাই তাঁর ছবির বিষয় হতে পারে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' বা 'শহিদের স্মরণে'—কিন্তু

তখনও তারা রেখা ও রঙে নির্বস্তুক রূপ নেয়। এমনকী কখনো মনে করায় পল ক্লে-কে। সৈয়দ জাহাঙ্গীরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমূর্ত-ধারার ছবির প্রভাব। অবিরল নিরীক্ষায় তাঁর উৎসাহ। কিন্তু সেটাও প্রকাশ করে তাঁর লড়াকু ভাবনার তীব্রতা এবং তাতে রাজনৈতিক মাত্রাও থাকে। স্পন্দিত জীবন ও উচ্ছ্বসিত নিসর্গের সঙ্গে যুক্ত হয় সমকালীন অস্তিত্বের আলোড়ন—শিল্পের অজস্রতায়, মাধ্যমের বিভিন্নতায়, প্রকরণের বৈচিত্র্যে। অথচ তিনি সেজান থেকে শুরু করে মনে পড়িয়ে দেন হয়তো আধুনিক শিল্পের প্রতিনিধিদের অনেককেই। কাজী আবদুল বাসেতের যাত্রা ইমপ্রেশনিজম থেকে খানিকটা কিউবিজমের দিকে, পরে অ্যাবস্ট্রাক্ট-এক্সপ্রেশনিজমের পথে। সারা ক্যানভাসে বুনট বা টেক্সচারকে নানাভাবে ব্যবহার করেন তিনি। 'ছন্দোময় প্রকৃতি'কে তেলরঙে তুলে ধরেন বিভিন্ন ফর্মাল আকৃতিতে বা বর্ণবিন্যাসে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনিই আবার হয়তো ফিরে আসেন অনেকখানি বাস্তবের মূর্তায়নে। এইভাবেই একটা শিল্পের যুক্তি তৈরি হয়।

শুধু আবদুল বাসেত-ই নয়, ষাটের দশকের সমকালীন দেবদাস চক্রবর্তী বা নিতুন কুণ্ডু-র মধ্যেও দেখি আধুনিক বিমূর্ত শৈলীতে আঁকা ছবিও দেশ ও কালের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে। দেবদাস চক্রবর্তীর তেলরঙে আঁকা 'টাইম অ্যান্ড স্পেস' বা 'কম্পোজিশন' বা 'টাইম অ্যান্ড মুভমেন্ট' ইত্যাদি সাম্প্রতিকতর বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের ছবির মধ্যে যেমন, তেমনি স্বতন্ত্রভাবে 'কাপল্' বা 'বৃষ্টি'-র মতো ছবিতেও বাস্তবের ছোঁয়া থাকে। নিতুন কুণ্ডু-র মধ্যে একজন শিল্প-আলোচক খুঁজে পেয়েছেন "শান্ত মনোহরণের ক্ষমতা"। রঙের ব্যবহারে তাঁর নিসর্গ ও মানব চিত্রণে থাকে আবেগ ও যুক্তির দ্বৈত, এবং তা ফুটে ওঠে যেমন জলরঙে তেমনি ছাপাই-ছবিতে, কিংবা ভাস্কর্যে। বিমূর্ত রীতিকে অবলম্বন করে এই শিল্পীরা স্বদেশের আত্মাকেই তুলে ধরেন।

৮

বিমূর্তায়নের বাড়াবাড়ি হয়তো কখনো বাংলাদেশের শিল্পকে উন্মার্গগামী ও অজ্ঞাতকুলশীল করেছে। এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কখনো বাংলাদেশের শিল্পীদের শিল্পতে চোখে পড়ে যায় বিদেশের বিশ্রুত শিল্পীদের আছাঁকা অনুকরণ—মাতিস বা দুফি, রুয়ো বা শাগাল, ক্লে বা মিরো, ব্রাক বা পিকাসো, ভিলন বা কানদিনস্কি, মঁদ্রিয়ান বা আরো সব বিশুদ্ধ বিমূর্ত শিল্পীরা ভিড় করে আসেন। তখন প্রভাবের যে-সব বিপদের কথা আগেই বলা হয়েছে, তা খুবই মনে পড়ে যায়—হয়তো অপ্রসন্নতাও সৃষ্টি করে। কিন্তু সে-কারণেই আবার বাংলাদেশের বিমূর্তনের এই

সূচনা-পর্বের বহু শিল্পীর মৌলিকতাকে উপেক্ষা করা যায় না। এমনকী শুধুই নির্বস্তুক বিমূর্ততাকে অবলম্বন করেছেন এমন অনেক শিল্পী এমনই স্বকীয়তা প্রমাণ করেছেন তাঁদের শিল্পভাষায়, যাঁর পরিণামে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁদের স্বীকৃতিও জুটেছে—বিভিন্ন প্রদর্শনীতে বা প্রতিযোগিতায়। কিন্তু, বাংলাদেশের শিল্পধারার দিক থেকে বোধহয় স্মরণীয় সেই শিল্পই যেখানে বিমূর্তায়ন ও বাংলাদেশের বাস্তবতার সৃজনশীল সমন্বয় ঘটেছে। বস্তুত গোড়াকার এই পর্বে বিমূর্তায়নকে ধারণ করেননি বোধহয় এমন কোনো শিল্পীকেই পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই, বিমূর্ত-চর্চার ফাঁকে-ফাঁকে বারবার ফিরে এসেছেন বাস্তবে। বিমূর্তায়ন যেখানে অবিকল, সেখানেও প্রায়শই রেখায় বা রঙে, নকশায় বা কাঠামোয় বিষয়গতভাবেই স্বদেশের নিসর্গ-সমাজ-মানুষের ইশারা পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর তিরিশের প্রথমার্ধে যাঁদের জন্ম, তাঁদের সম্পর্কেও এই কথা বলা হয়েছিল। তিরিশের দ্বিতীয়ার্ধে, কিংবা চল্লিশের বা পঞ্চাশের দশকে যাঁদের জন্ম, তাঁদের সম্পর্কেও সেই একই কথা।

সব শিল্পী সম্পর্কে ধারাবাহিক উল্লেখ সম্ভব নয়, কিন্তু সমকালীন চারুকলার অ্যালবামকে নির্ভর করে যাঁদের নাম করা যায়—যেমন, আবু তাহের, শাহতাব, শামসুল ইসলাম নিজামী, সমরজিৎ রায়চৌধুরী, মনিরুল ইসলাম, এম মহিউদ্দীন, মাহমুদুল হক, কালিদাস কর্মকার, হামিদুজ্জামান খান, আবদুস সাত্তার, স্বপন চৌধুরী, হাসি চক্রবর্তী, মাহবুবুল আমিন, শাহাবুদ্দিন, মনসুর-উল-করিম, মোমিনুল রেজা, শামীম সিকদার, রতন মজুমদার—এত দূর পর্যন্তও যদি পৌঁছোই, তবে সেখানে বিশুদ্ধ বিমূর্ততা কিংবা অনেকটাই বাস্তব কিংবা বিমূর্ততা-বাস্তবের সমন্বয় ইত্যাদি, সব চিত্রলক্ষণই খুঁজে পাব। এর মধ্যে স্বদেশ ও বিদেশের একটা অবস্থানঘটিত সম্পর্কও আছে। তাই তো প্রবাসী মনিরুল ইসলাম স্পেনের মাদ্রিদে গিয়ে ম্যুরাল-চিত্র ও ধাতুর ওপর গ্রাফিক প্রিন্টের শিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে স্বদেশকেই তুলে ধরেছেন, বিদেশেও। আর প্রচণ্ড গতিময়তার শিল্পী শাহাবুদ্দিন স্পেস ও ফিগারের নাটকীয় বিন্যাসে বাংলাদেশের ইতিহাসের সাম্প্রতিককেই প্রকাশ করেন, প্যারিসে দীর্ঘ বসবাসের মধ্যে।

বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন নারীশিল্পীর নামও চলে আসে, বিশেষত নারীর মনোজগৎকে যেখানে স্বতন্ত্রভাবে চেনা যায়। তাঁদের এই পরিচয় বাংলাদেশ-পর্বের সূচনাতেই নভেরা আহমেদের অতুলনীয় ভাস্কর্যের মধ্য দিয়েই তো প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল। তার পর সৈয়দা মইনা আহসান, জোবেদা ইসলাম, রওশানা আরা আমীন, তাহেরা খানম প্রমুখের মধ্য দিয়ে নারীশিল্পীদের উপস্থিতি আমরা টের পেয়েছি। এঁদের সকলেরই জন্ম তিরিশের দশকে। কিন্তু, অতঃপর পঞ্চাশের দশকে

জন্মেছেন এমন বেশ কয়েকজন শক্তিশালী নারীশিল্পীকে আমরা পেলাম—যেমন, নাজলী লায়লা মনসুর, ফরিদা জামান, নাইমা হক, নুরুল নাহার পাপা, নাসরীন বেগম, রোকেয়া সুলতানা—যাঁরা স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক বিরুদ্ধতার মধ্যে নারীর সত্তাকে দৃশ্যগোচর করেছেন। ফরিদা জামান 'মাছ ধরার জাল' থেকে পৌঁছে যান 'সুফিয়া' সিরিজে, রঙ ও কম্পোজিশনের স্বাতন্ত্র্যে। নাইমা হকের ওয়াশে আঁকা ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গেই এসে যায় প্রতিবন্ধী নারী। নাসরীন বেগমের 'ক্যাকটাস'-এ নারীর নিঃসঙ্গতা, বিষাদ ও অন্তর্দহন। রোকেয়া সুলতানার ছবিতে রোমান্টিক মেজাজের নিসর্গ-নির্ভর আপাত সারল্যের ভঙ্গির পাশাপাশি আসে প্রতীকে বিন্যস্ত নারীর কামনা-বাসনা, পূর্ণতা-অপূর্ণতা, স্বপ্ন ও বাস্তব—তাঁর অসামান্য টেম্পেরার কাজে। একই সঙ্গে বলা যায়, আধুনিক বিমূর্তনের সমকালীন বৈশিষ্ট্যও তাঁদের মধ্যে অনুপস্থিত নয়। আবার, নুরুন নাহার পাপা-র কাজে ভাস্কর্য ও চিত্রকলার সমন্বয়ের আধুনিকতা, কোলাজ ও মিশ্রমাধ্যমের রীতিতে। (এর পরেও অবশ্য নারীর সুখদুঃখের অনুভবকে প্রকাশ করে পরবর্তী নারীশিল্পীরাও এসেছেন—দিলারা বেগম জলি, নিলুফার চমন, কনকচাঁপা চাকমা, কুহু, লায়লা শার্মিন, সুলেখা চৌধুরীর মতো শিল্পীরা—কিন্তু তাঁরা তো এই আলোচনার কালসীমার বাইরে)।

ছাপাই-ছবির চর্চাও সফিউদ্দিন আহমেদ বা মোহাম্মদ কিবিরিয়ার পরে থেমে থাকেনি, আরো অনেকেই সেই পথে গেছেন। এমনকী রতন মজুমদারের মতো তরুণ প্রতিভাবান কাঠখোদাই-শিল্পীকেও পেয়েছি। ছাপাই-ছবিতে নিসর্গের নানামুখী উদ্ভাস চট্টগ্রামের শিল্পীদের মধ্যে এবং আরো অনেকের মধ্যেই। লোকশিল্পে আধুনিকতার মাত্রা আনার যে-সক্রিয়তা, তা-ও একেবারে হারিয়ে যায়নি বিমূর্ত শিল্পের দাপটে। কামরুল হাসান থেকে কাইয়ুম চৌধুরী, তারপরে আরো, আবদুস শাকুর পর্যন্ত ; মাঝখানে রশিদ চৌধুরী ; পরবর্তীকালে সমরজিৎ রায়চৌধুরী, এম মহিউদ্দীন, হাসি চক্রবর্তী, মাহবুবুল আমিন—এই পথেরই পথিক।

তবে, বাংলাদেশের শিল্পের একটা বড়ো ব্যাপার বাইরের দেশের দর্শকদের চোখে না পড়েই পারে না। তা হল, ভাষা-আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংগ্রাম বাংলাদেশের শিল্পীদের চিত্র ও ভাস্কর্যে ব্যতিক্রমহীনভাবে রূপ পেয়েছে। আঙ্গিকে প্রখর বিমূর্তায়ন যেমন বাংলাদেশের শিল্পে সত্য, তেমনি সত্য বিষয়ের দিক থেকে এই সংগ্রামী চেতনা। বিভিন্ন শিল্পীদের আধুনিকতার নির্মাণে কীভাবে তা উঠে এসেছে, সেটা বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। জয়নুল আবেদিন বা কামরুল হাসানের মধ্যে তা প্রবলভাবে দেখেছি, এমনকী সফিউদ্দিন বা সুলতানের মধ্যেও। আমিনুল ইসলাম বা মুর্তজা বশীর, সৈয়দ জাহাঙ্গীর বা

কাজী আবদুল বাসেত, কেউই এই চেতনার বাইরে নন। এবং লক্ষণীয়, এর পরের শিল্পীরাও ভোলেননি এই দায়, এই সংকল্প। ভাস্কর্যে দেখেছি আবদুর রাজ্জাকের পর, নভেরা আহমেদের পর, আনোয়ার জাহান বা আবদুল্লাহ খালেদের মধ্যে এই মগ্নতা। তার আগেই, মনে পড়ে যায়, হামিদুর রাহমান যিনি ছিলেন বাংলাদেশে বিশুদ্ধ বিমূর্তায়নের প্রথম শিল্পীদের একজন বলে স্বীকৃত, তিনিই গড়েছেন বহুনন্দিত শহিদ-মিনার—যদিও তাঁর মূল পরিকল্পনার অসম্পূর্ণতার ইতিহাসও আমরা জানি। নিতুন কুণ্ডু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক যে ভাস্কর্য গড়েছেন, তার পরিচয় 'সাবাস বাংলাদেশ' নামে। আধুনিকতর হামিদুজ্জামান খান তাঁর ভাস্কর্যে এবং শাহাবুদ্দিন আহমেদ তাঁর ছবিতে স্বাধীনতার লড়াইয়ের অবিস্মরণীয় অনুভবকেই অবিরল প্রকাশ করে গেছেন। 'একাত্তরের স্মরণে' নামে হামিদুজ্জামানের একের পর এক বিভিন্ন উপকরণের ভাস্কর্য আর 'বঙ্গবন্ধু' বা ভাষা-আন্দোলনের 'মুক্তিযোদ্ধা' নিয়ে শাহাবুদ্দিনের ছেদহীন আবেগতীব্র চিত্রমালা—বাংলাদেশের শিল্পে এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের দিকটিকে যেভাবে প্রকাশ করেছে তার তুলনা নেই। হামিদুজ্জামান প্রসঙ্গে কারো মনে এসেছে রোদ্যাঁ-র কথা, শাহাবুদ্দিন প্রসঙ্গে মাইকেলএঞ্জেলো, পল রুবেন্স বা ফ্রান্সিস বেকনের কথা—কিন্তু যাঁরা এনেছেন এসব তুলনা, তাঁরাও তাঁদের কাজের নিজস্বতার কথা বলতে ভোলেননি। কখনো-কখনো মনে হতে পারে, এঁদের এই আবেগ খানিকটা সাহিত্যাক্রান্ত কিনা। কিন্তু শেষপর্যন্ত বোঝা যায় এঁদের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশেরই সত্যানুভব থেকে।

হামিদুজ্জামান বা শাহাবুদ্দিনের কাজ লোকপ্রিয়তার শীর্ষে। কিন্তু তার বাইরেও শেষত যাঁদের নাম করা হয়েছে, তাঁরাও অনেকেই ঘুরেফিরে বাঙালির সংগ্রামের এই স্পর্শকাতর বিষয়টিতে এসেছেন। আবু তাহের, একসময় বিরাট ক্যানভাসে যিনি এঁকেছিলেন বিমূর্ত এক্সপ্রেশনিস্ট ছবি, তিনিই আঁকলেন 'শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে'। এরকমই উল্লেখ করা যায় শামসুল ইসলাম নিজামী-র তেলরঙে আঁকা 'স্বাধীনতার জন্য'। মনিরুল ইসলামের বিশাল পরিকল্পনা, তামার ওপর খোদাই ভাস্কর্য 'হোমেজ টু বাংলাদেশ'। স্বপন চৌধুরী-র ছোটো অ্যালবাম 'একাত্তরের স্মৃতি' নামে—যেখানে আছে মিশ্রমাধ্যমে 'কাল রাত্রির দিন' বা 'সারা বাংলার যুদ্ধ', প্যাস্টেলে আঁকা 'ভয়ের শহর' ও 'কালরাত্রি', কালি ও কলমে 'ভালোবাসা এবং যুদ্ধ'। হাশেম খানের বাস্তববাদী নিসর্গ বা প্রকৃতি চিত্রণের পাশেই একের পর এক বিপুল অজস্রতায় '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি', '৭১-এর মুখ', '৭১-এর চিঠি', '৭১-এর নদী'। আশির দশকে নবীন শিল্পীদের প্রদর্শনীর ক্যাটালগে যখন পাই মৃণাল হকের আঁকা বদ্ধভূমিতে মৃত শহিদ 'স্বাধীনতা তুমি আসবে বলে', আনোয়ার

চৌধুরীর 'বাংলাদেশ '৭১', সেলিনা চৌধুরীর মিলি-র 'বন্দী স্বাধীনতা', সৈয়দ হাসান মাহমুদ-এর 'একটি জাতির ট্রাজেডি'—তখন বুঝতে পারি বিষয় ও ফর্মের নানা বৈচিত্র্যসাধনার মধ্যেও স্বাধীনতার লড়াইয়ের স্মৃতি অনুজদের কাছেও এখনো সতেজ।

সমাজ বা পরিবেশ সচেতনতার এই লক্ষণ তো শুধু এই ইতিহাসচর্চাতেই শেষ হতে পারে না। তাই দেখতে পাই, স্বাধীনতা অর্জনের পরে অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশে যে ভয়ংকর বিরূপ পরিবেশ তৈরি হল, তীক্ষ্ণ নখ নিয়ে বেরিয়ে এল অন্ধকারের শক্তি, তখনও তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন শিল্পীরা। সেকুলার, বিশ্বনাগরিক ও আত্মবিশ্বাসী মানবিকতার যে-ঐতিহ্য প্রথম থেকেই তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশের শিল্পে, তা এই সময়েও তার দায় পালন করেছে। কখনো সেই আত্মসচেতনতা নেতির মধ্যেই হয়তো প্রকাশ পায়, কিন্তু পায়। এম মহিউদ্দীনের চিত্র 'ডুবন্ত কারখানার প্রতিবিম্ব' বা 'অপস্রিয়মাণ আলো', মনসুর-উল-করিমের 'চেয়ার ও রাজনীতি' বা 'আতঙ্ক', মাহমুদুল হকের বিভিন্ন ছাপাই-ছবি, কালিদাস কর্মকারের 'পরিবেশ' সিরিজ, শামিম সিকদারের ভাস্কর্য 'নিরাপত্তাহীনতা', রতন মজুমদারের কাঠখোদাই 'বিভক্ত সমাজ' কিংবা লিনোকাট 'সমাজের রূপ'—বিমূর্তনের মধ্যেই সমাজের জটিল হতাশাকে ফুটে উঠতে দেখি। সামাজিক অবক্ষয়ে ক্ষুব্ধ বলে যে রাগী তরুণ শিল্পীদের উল্লেখ করা হয়েছে, সেই রণজিৎ দাস থেকে শিশির ভট্টাচার্য পর্যন্ত শিল্পীরাও আছেন। সকলকেই সমানভাবে এই অন্ধকার ঘা দেয় তা নিশ্চয়ই নয়। অন্ধকারের মধ্যে আলোও খুঁজে পান এ সময়েই অনেকে। জটিল অন্ধকারের মতোই জটিল আলো। তাই তো সমরজিৎ রায়চৌধুরী গোয়াশে এঁকে চলেন 'আমার দেশের গান', হাসি চক্রবর্তী আঁকেন তেলরঙে 'বর্ণিল প্রকৃতি' বা 'আলো আমার আলো', মাহবুবুল আমিন তেলরঙে 'স্নানরতা' বা কাঠখোদাইতে 'রাজহাঁস ও পদ্মফুল', মোমিনুল রেজা তেলরঙে 'উৎসব', নুরুন নাহার পাপাও তেলরঙে 'ক্যানভাস'। বিমূর্তন, লোকশিল্প ও চেনা বাস্তব—সবেরই মহামিলন ঘটে এখানেও। একই সঙ্গে বা আলাদাভাবে। বোঝা যায়, বাংলাদেশের সাম্প্রতিকতর শিল্পকর্মেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই।

৯

অন্যপারের একজন বাঙালির কাছে বাংলাদেশের চিত্রকলা বা ভাস্কর্যের পুরোপুরি হদিশ পাওয়া খুবই দুষ্কর। যেহেতু শিল্পের সেই আবহাওয়ায় তিনি বাস করেন না। কিন্তু, কখনো বেশি সময় নিয়ে, কখনো চকিত সন্দর্শনের সুযোগে আংশিকভাবে হলেও সেই শিল্পজগতের অসামান্য কৃতির পরিচয় তাঁর মনে গেঁথে যায়। মূল ছবি

বা ভাস্কর্যের মুখোমুখি হওয়া যায় বিভিন্ন মিউজিয়মে বা শিল্পকেন্দ্রে, বন্ধু শিল্প-সংগ্রাহকদের বাড়িতে, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে। দুর্ভাগ্যবশত মরশুমি প্রদর্শনীগুলিতে হাজির থাকার সৌভাগ্য প্রায় ঘটেই না, যদিও শিল্পকলার জীবন্ত পরিবেশ মেলে সেখানেই বেশি। এছাড়া আরেকটা বড়ো নির্ভর ছোটোবড়ো অজস্র অ্যালবাম। প্রধানত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর ওইসব অ্যালবামের মুদ্রণে ভালোমন্দের হেরফের এত বেশি যে মাঝে-মাঝে যেমন আস্থা পাওয়া যায়, তেমনি কখনো নিরাশ হতে হয়। বাংলাদেশের শিল্পজগৎ তো এখন আর শুধু আর্ট ইনস্টিটিউট বা চারুকলা ইনস্টিটিউট নির্ভর হয়ে নেই। এখন অনেক সমারোহ, অনেক গ্যালারি। সেই কবে 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ' তৈরি হয়েছিল, এখন 'স্কেচ গ্রুপ', 'বাংলাদেশ ভাস্কর পরিষদ', 'শিল্পচর্চা কেন্দ্র', অধুনা-নিষ্ক্রিয় 'সময়' বা অতি-সাম্প্রতিক 'বৃত্ত আর্ট ট্রাস্ট', কিংবা শুধুই মেয়েদের 'সাঁকো' ইত্যাদির কথা শুনতে পাই। ১৯৭৫ থেকে বছর-বছর 'জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী' আয়োজিত হয়। তদুপরি 'নবীন শিল্পীদের প্রদর্শনী' এবং 'দ্বি-বার্ষিক এশীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী'। মান্য শিল্পীদের সংখ্যাও ক্রমশ বেড়ে গেছে এবং সময়ের দিক থেকে যত এগোনো যায়, ততই ধারাবাহিকতাহীন অনিয়মিত দর্শক দিশেহারা হন, তাঁর নির্বাচনে আপতিকতার বিপর্যয় হয়তো বেশি ঘটতে থাকে।

তবু, প্রকৃত সমঝদারি হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু ওইসব অবলম্বন করেই অনুভব করা যায় : বাংলাদেশের শিল্পকলা, জয়নুল আবেদিন থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত, নিঃসন্দেহে সে-দেশের সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন। নিসর্গ, লোকায়ত জীবন, নাগরিক মনন নিয়ে বাস্তবের নানামুখী বিন্যাস এবং রঙ-রেখা নিয়ে প্রকরণগত কৌশলের বৈচিত্র্য তো পাওয়াই যায়—এরই মধ্যে বাঙালির নিজস্বতা। প্রথম থেকেই বিভাগপূর্ব, প্রধানত কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলার শিল্পের নানা দিক থেকে উত্তরাধিকার যেমন ছিল (অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় বা রবীন্দ্রনাথ থেকে ক্যালকাটা গ্রুপ পর্যন্ত সকলকেই ধরা যায়), তেমনি বাংলার লোকশিল্পের পরিগ্রহণও ঘটেছিল (বিশেষত লোকশিল্পের রঙ-রেখার প্রয়োগে নির্ভীক স্বকীয়তা, নকশি-কাঁথা থেকেই হোক কিংবা পট বা সরা থেকে, খুবই স্পষ্ট)। পশ্চিমি আধুনিকতা ইমপ্রেশনিজম, নিও-ইমপ্রেশনিজম, সিমবলিজম, ফবিজম, এক্সপ্রেশনিজম, স্যুররিয়েলিজম, কিউবিজম, ফিউচারিজম, ইত্যাদির পথ ধরে বিশুদ্ধ অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে এসে পৌঁছোল আধুনিক শিল্প, তা আমরা জানি। বাংলাদেশে সেই মধ্যবর্তী স্তরগুলির কমবেশি চর্চা যেমন হয়েছে, তেমনি বিমূর্তায়ন বা অ্যাবস্ট্রাকশনের নানা জাতের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা গেছে। কখনো পুরো, কখনো আধা। এই 'ইজম'-এর লক্ষণগুলো কোনো-সময়ে

ফ্যাশনের দিকে নিয়ে যায়নি তা নয়। আবার দেশগত ও কালগত আত্মপরিচয়ের শিকড় অটুট রেখে অপূর্ব সমন্বয়ও ঘটিয়েছে। বিমূর্ত শিল্পের নির্বিচার আধিক্য মাঝে-মাঝে ক্ষুব্ধ করে যাঁকে, তিনিও টের পান, বাংলাদেশের বাস্তব বা বাংলাদেশের লোকায়ত জীবনের স্পর্শ সেই বিমূর্ততাকে অনেক ক্ষেত্রেই নিজস্বতার গুণে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। এই সব মিলিয়েই বাংলাদেশের শিল্পধারার গৌরব।

গ্রন্থপঞ্জি

১. চিত্রশিল্প : বাংলাদেশের। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। বাংলা একাডেমী। ১৯৭৪।

২. কামরুল হাসান। আবুল হাসনাত সম্পাদিত। থিয়েটার। ১৯৯০।

৩. কামরুল হাসান। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। ১৯৯১।

৪. আধুনিক ঐতিহ্যের নয় শিল্পী। সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। ১৯৯৩।

৫. সমকালীন শিল্প ও শিল্পী। নজরুল ইসলাম। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। ১৯৯৫।

৬. এস এম সুলতান স্মারক গ্রন্থ। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। ১৯৯৫।

৭. জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। ১৯৯৬।

৮. জয়নুলের জলরঙ। মতলুব আলী। বাংলা একাডেমী। ১৯৯৬।

৯. শিল্পী এস এম সুলতান। আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত। কৃষ্টি প্রকাশ। ১৯৯৬।

১০. কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম। সৈয়দ আজিজুল হক। বাংলা একাডেমী। ১৯৯৮।

১১. দেশজ আধুনিকতা : সুলতানের কাজ। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। ১৯৯৯।

১২. বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব। ফয়েজুল আজিম। বাংলা একাডেমী। ২০০০।

১৩. বাংলাদেশের চিত্রশিল্প। মইনুদ্দীন খালেদ। দিব্যপ্রকাশ। ২০০০।

একুশের ডায়েরি

মুখবন্ধ

মাত্র দিন পনেরোর জন্য বাংলাদেশে যাওয়া, তা-ও ১৯৮৭-তে—এও কি একটা বলবার কথা? মনে-মনে শুধু একটাই কৈফিয়ত তৈরি হয় : প্রত্যেকেরই তো আছে নিজস্ব ও স্বতন্ত্র দেখা এবং শোনা। আর তাতেই জন্মায় নিজের কথা বলার অধিকার।

তা ছাড়া যে বলছে সেই মানুষটিও কি এক? আমার কথাই যদি ধরি। প্রায় আজন্ম কলকাতাবাসী হয়েও আমার বেড়ে-ওঠা তো যাকে বলা যায় 'বাঙাল' পরিবারে ও পরিবেশে, তা-ই—যেখানে সবসময় শুনেছি গোয়ালন্দ আড়িচা নারায়ণগঞ্জ মাদারিপুর ঝালকাটি এইসব নামাবলি, অবিরল কানে শুনেছি নানান পূর্ববঙ্গীয় শব্দ অন্বয় বাগধারা কিংবা উচ্চারণ। এরকম একটা ভৌগোলিক ও সামাজিক বাতাবরণেই আমি কলকাত্তাই 'বাঙাল'। রক্তে-মজ্জায় কলকাতা, কিন্তু তারই ভেতর কোথায় যেন পূর্বজন্মের অজ্ঞাত নদীনালার টান।

তা সত্ত্বেও, বলতেই হয়, প্রায় অচেতন শৈশবে বরিশাল শহরে যাওয়া ছাড়া, বড়ো হয়ে পূর্ববঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তান বা বাংলাদেশের কোথাও যাওয়া হয়নি কখনো। এমনকী ১৯৭১-এর সহজ হিড়িকেও নয়। তখন বরং এসব নিয়ে আবেগের বাড়াবাড়িতে বা আদেখলেপনায় মনটা সংকুচিত হয়েই থাকত। আমার একজন পরমাত্মীয়, শুনতাম, বাংলাদেশের বিস্কুট দিয়ে রোজ চা খেতেন। আমরা হাসাহাসি করতাম। তাই দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে সন্‌জীদা খাতুন যখন বন্ধুত্বের সমালোচনায় লিখলেন, ওই আবেগেই তো 'খায়', তখন ব্যাপারটার আদ্যোপান্ত না জেনেও, বাংলাদেশে না গিয়েও, আমার সায় ছিল তাতে।

এখন তো সেসব অনেকটাই চুকেবুকে গেছে। এখন সহজভাবে তাকানো যায়, কথা বলা যায় মুখোমুখি। কোনোরকম হঠাৎ-আবেগ বাদ দিয়েই। বাংলাদেশের নতুন মানুষ—ছাত্রছাত্রী যুবকযুবতী নবীন-লেখকশিল্পী—তাঁদের দেখতে এবং বুঝতে চেয়েছিলাম আমি—যতটুকু সম্ভব ওই কদিনে—একুশে ফেব্রুয়ারির আলোয়। অনুভব করেছি ওঁরাও বুঝতে চেয়েছেন অনেক কিছু, শুধু মুগ্ধতা নয়। ফরিদপুরের তরুণ

বন্ধু দেখা হলেই কথায়-কথায় বলতেন : দুই দেশের বাঙালিত্বের বিনিময় কি সম্ভব নয়? নানাভাবেই এ-কথা বলতে চাইতেন ঢাকার রাজশাহীর বরিশালের বন্ধুরাও। ওঁরা কি ভাবতেন পূর্ববাংলার গ্রামকে মেলাবেন পশ্চিমের নগরমনস্কতার সঙ্গে? কিন্তু তাই বা কী করে? এ কথা তো ওঁদের অভিজ্ঞতাতেও প্রকাশ পেত— পূর্ববাংলার সুস্থ গ্রামীণতাকেও শহরের ঘুণ আক্রমণ করেছে, পশ্চিমবাংলার শহরও যেমন, আমরা জানি, সত্যিই ততটা শহর নয়। তবে কি ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার লেনদেনেই চিনে নিতে হবে ভবিষ্যৎ? কিংবা গ্রাম বলতে যা ছিল, যা এখনও হয়তো কমবেশি আছে দু-বাংলাতেই, তার সঙ্গে শহর বলতে যা খুঁজি কমবেশি, স্বপ্নে দেখতে পাই, তার সুন্দর মিলন? দুই বাংলার তরুণতরুণী সেই মিলনের দিকেই এগিয়ে চলেছে? আমি ওই বাংলার সেই তরুণ মুখই দেখতে গিয়েছিলাম বলে ভাবি।

নো ম্যান্স ল্যান্ড

পাছে বাংলাদেশের আতিথ্যে মুগ্ধ হয়ে বাংলাদেশের লোকজনের সম্পর্কে বেশি আবেগে আপ্লুত হই, আবেগ আমাকেও আস্ত খেয়ে ফেলে, তাই বোধহয় বর্ডার পার হওয়ার আগেই আমাদের এ-বাংলাতেও, পেট্রাপোলের কাস্টমস-দপ্তরের সরকারি কর্মচারীদের সৌজন্য ছিল অনিন্দ্য। মাথায় গুঞ্জন ওঠে : মানুষ সব জায়গায়ই কি এক! সমব্যথী, সহৃদয়, বন্ধুবৎসল!

পেট্রাপোলে রাত্রিবাসের কারণ, খুব ভোরে আমিই প্রথম বাংলাদেশে পা দেব, এরকম একটা রোমাঞ্চের প্রতি লোভ। তা ছাড়া দিনে-দিনে ঢাকায় পৌঁছোতে চাই, দু-চোখ মেলে দেখতে চাই, শুষে নিতে চাই আমারও গতজন্মের স্বদেশ।

দু-দেশের মাঝখানে বাঁশ দিয়ে ঘেরা যে ছোট্ট জায়গাটুকু, সেখানে পা দিয়েই দেখি অত সকালে আমি একা, ত্রিসীমানায় কাকপক্ষী নেই। কাঁধের ব্যাগটা মাটিতে রেখে নো-ম্যানস ল্যান্ডের কৌতুক বুঝে নিচ্ছিলাম। ঘুরেফিরে, সিগারেটে দম দিতে-দিতে। বোধহয় একটু বেশিক্ষণই। হঠাৎ বেনাপোলের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, বাংলাদেশের কাস্টমসের বেশ কয়েকজন উর্দিপরা অফিসার ও পুলিশ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন এইদিকে।

অতগুলো দৃষ্টির সামনে বিব্রত ও ভীত হয়ে পড়ি। তড়িঘড়ি সামনে গিয়ে দাঁড়াই বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে। একঝাঁক প্রশ্নের মুখোমুখি। অত সকালের রিনরিনে পূর্ববঙ্গীয় স্বরে। নো ম্যানস্ ল্যান্ড দেখছিলাম শুনে যেন বিষাদখিন্ন সামান্য থেমেই হো-হো করে হেসে উঠলেন ওঁরা। মুহূর্তেই অন্তরঙ্গ। বেড়াতে যাচ্ছি, একুশে

ফেব্রুয়ারি দেখতে যাচ্ছি—জেনে গলার স্বর আরো নরম হয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় আপ্যায়ন, পরিচিতি। একে একে সবাই নিজের কথা বলতে থাকেন। ভালোবাসার কথা। সাদর আমন্ত্রণ চোখেমুখে। এমনকী নাস্তাও করতে হয় ওঁদের সঙ্গে। পাশপোর্ট-ভিসা সংক্রান্ত অবশিষ্ট যেটুকু করণীয় ছিল তখনো, সেটাও তাঁরাই সঙ্গে নিয়ে করিয়ে দিলেন।

অনেককিছুই তো আগেই শুনেছি, তবু বাংলাদেশে ঢুকেই কাস্টমসের দপ্তরে এই খাতিরের সমারোহ আমার কাছে একটু অবাস্তব ঠেকছিল। ভাবছিলাম, একে কি ব্যতিক্রম বা কাকতালীয় হিশেবেই নেব, না কি মানুষই আলাদা—তার গলার স্বর, তার হাতজড়ানো চাপ, তার মুখভরা হাসির মতোই?

যশোর থেকে ঢাকা

কাস্টমসের স্নেহপাশ কাটিয়ে বেনাপোলের বাসে উঠতে একটু দেরিই হল। যশোরে পৌঁছতে-পৌঁছতে আরো বেলা। দু-পাশে তামাকের চাষ, সবুজ শস্য এবং মাঝে-মাঝেই মাদারফুলের নগ্ন লাল। এঁকেবেঁকে গেছে পরিত্যক্ত রেললাইন। প্রকৃতি একেবারেই অপরিচিত ঠেকছে না। শুধু যেসব গ্রামীণ মানুষেরা উঠছে বাসে (মিনিবাসের চেয়ে কিছু বড়ো এই বাসকে ওরা বলে 'কোস্টার'), তাদের মুখের ভাষা ও ভঙ্গি যেন অল্প-অল্প করে বদলে যাচ্ছে। আর নতুন লাগছে দেয়াললিখনের বিষয় ও ধরণ, দোকানের নাম, ব্যাঙ্কের নাম, স্কুলের নাম। নাভারন থেকে উঠতে চাইছে গ্রামের এক মেয়ে ভিড় এই কোস্টারে, ধূলিধূসরিত চাষি কথার অভ্যস্ত চালে রঙ্গ করে বলতে পারে, 'মেয়েছেলেরা আজকাল যেরকম অগ্রণী'—তা তো বলতেই পারে, এখানকার ব্যাঙ্কের নামও যে অগ্রণী ব্যাঙ্ক! ঢাকা-গামী দূরপাল্লার বাসগুলোর নামও কানে বেশ নতুন—বলাকা, দ্রুতি, দিগন্ত ইত্যাদি।

এগারোটার বাসে ঠাঁই মেলেনি বলে যশোরে একপাক ঘুরে আসার সময় পাওয়া গেল। মিস্ত্রিখানা রোড দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে, দড়িটানার মোড়ে বইয়ের দোকানে চোখ বুলিয়ে, কচুরিপানায় ভর্তি চিত্রা নদীকে ডাইনে রেখে, কালেক্টরেটের আপিসের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে একসময় চলে এলাম যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরিতে। বইমেলা হচ্ছে সেখানেও, একুশে উপলক্ষে—জাতীয় গ্রন্থ সপ্তাহ। বিশাল হলের মধ্যে কয়েকটি স্টল সাজানো। সকালে এবং বিকেলে মেলা। তখন বোধহয় প্রভাতী মেলা বন্ধ করার সময়। আমার সামনেই দু-দল যুবকের সামান্য কথা-কাটাকাটি বন্ধ করা নিয়ে। ইসলামি ফাউন্ডেশনের তরুণটি তর্জনী উঁচিয়ে কথা বলছেন। বাংলাদেশী তারুণ্যের একটু চাপা টেনশন চকিতে অনুভব করা গেল।

'দিগন্ত' বাস হুহু করে ছুটছে। চমৎকার বাঁধানো রাস্তা। মাগুরা নদী ও তার খাল পেরিয়ে মাগুরা শহর। তখনো যশোর জেলাই। গড়াই নদী পেরিয়ে ফরিদপুর জেলার শুরু, কামারখালি থেকে। প্রাকৃতিক, মানবিক চেহারাটা এত বেশি চেনা, অন্তত এই বসন্তের মধ্যাহ্নে, যেন প্রথমে একটু অপদস্থ হতে হয়।

বাসে উঠেই আলাপ হয়ে গিয়েছিল কয়েকজন যুবকের সঙ্গে। দুপুরের ওই বাসে, বিকেল গড়িয়ে পড়তেই, কারো-কারো বেশ আস্তরয় পেয়ে বসছিল। দেশের হালচাল, আইনকানুন, রাজনীতি-সমাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে যে-রকম জোরালো সমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ পাচ্ছিল উঁচু গলায়, তাতে এ-বাংলার সঙ্গে বাক্স্বাধীনতার কোনো তফাতই বুঝছিলাম না, অন্তত বাহ্যত। বরিশালের গ্রামের এক প্রৌঢ় স্কুল-শিক্ষক তর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন সেই যুবকদের সঙ্গে—একাত্তরের আন্দোলন ও তার পরিণাম নিয়ে। মাঝে-মাঝে মার্কসীয় বুলির বিনিময় হচ্ছিল উভয় তরফ থেকেই। যুবকেরা ব্রাক-এর কর্মী। 'ব্রাক' বাংলাদেশের একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, কী কী আদ্যক্ষর দিয়ে যেন তৈরি, বেশ কয়েকটি পশ্চিমি দেশের যৌথ বদান্যতায়। সুতরাং কানে-কানে একথা প্রায় সকলেরই জানা হয়ে গেছে, বৈদেশিক অভিসন্ধির এ আরেক কর্মকাণ্ড। হয়তো তা-ই। আমি অবশ্য ঠেকে-শিখে এরকম মার্কা মেরে দেওয়ার অভ্যাসের ব্যাপারে আজকাল একটু সাবধানী। শুধু এটুকু বলতে পারি, ব্রাক-এর যুবকদের সঙ্গে কথা বলে কিংবা ওঁদের বন্ধুত্বে কৃতজ্ঞ হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। ওঁরাই আমাকে নির্জলা ফরিদপুরের ভৌগোলিক চরিত্র বোঝালেন, গোধূলি-সন্ধ্যায় দৌলৎদিয়া থেকে লঞ্চে পার হওয়ার সময় হঠাৎ বর্ষণে কাদা হয়ে যাওয়া পাড়ে কাঁধের ব্যাগটা ধরে-ধরে ওঠালেন। এপারে আড়িচাতে 'নীচে যান—গরম ভাত ইলিশ মাছ আছে' এখনো শুনতে-শুনতে, গল্পকথা সত্যি হয়ে যাওয়ায়, যখন শিহরন লাগে, তখনই তাঁদের কথাতেও আরো অন্তরঙ্গতার সুর বাজে। ফলে ঢাকার গাবতলি বাসস্ট্যান্ডে নেমে হোটেল খুঁজতে যাচ্ছি টের পেয়ে খপ্ করে হাত ধরে ওঁরা টেনে নিয়ে গেলেন ওঁদের সিদ্ধেশ্বরীর গেস্ট-হাউসে। সিদ্ধেশ্বরী পুবদিকের একটি অভিজাত পুরোনো পাড়া।

গেস্ট-হাউসে সারিসারি খাট পাতা। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাক-এর যে শাখা আছে, তারই কর্মীরা ঢাকাতে কাজে এসেছেন। তাঁদেরই আগ্রহে ও আপ্যায়নে আলাপ হয়ে গেল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের মুখের সঙ্গে। ভারত সম্পর্কে আগ্রহ তো ছিলই, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাতেও তাঁরা সজাগ মনের পরিচয় দিচ্ছিলেন। ঢাকার অনেক খবর, এমনকী বাংলা একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানের দৈনন্দিন খবরাখবরও ওঁদের টুকরো সংলাপে জেনে ফেলছিলাম। অনেককে চেনেন

ওঁরা, অনেককে জানেন, এবং বোঝেনও। সহজে ছাপ ফেলে দেওয়াটা বিপজ্জনক এরকমই মনে হচ্ছিল।

রাত্রির হোটেলের খাওয়া এবং সকালের 'নাস্তা' ওঁদের নাছোড়বান্দা আতিথ্যেই সেরে নিয়ে রওনা দিলাম গেন্ডারিয়ার দিকে। এবারই ঢাকার মুখোমুখি একা।

এক পা বাড়িয়ে

রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা-আড়িচা রোড ধরে বিবর্ধমান নতুন ঢাকার আভাস পেতে-পেতে যখন অকস্মাৎ পৌঁছোলাম ঝলমলে গাবতলি বাসস্ট্যান্ডে তখনই অবাক হয়েছিলাম ঢাকার বৈভবে। এ তো বইয়ে পড়া ঢাকা নয়, এ একেবারেই আলাদা। সিদ্ধেশ্বরী পর্যন্ত পৌঁছোতে-পৌঁছোতেই বুঝতে পারছিলাম ঢাকার পরিচ্ছন্ন ও শান্ত সৌন্দর্য কলকাতাবাসীকে ঈর্ষাতুর করছে। কিন্তু তখনও তো অনেক বাকি। সকালের আলোয় সিদ্ধেশ্বরীর মৌচাক-বাজার থেকে ভিন্ন-ভিন্ন রাস্তা ধরে, কোস্টার ও রিকশাকে বাহন করে যতই এগোই, ততই ঢাকা তার চওড়া নির্জন রাস্তা, তার অসামান্য ঘোরানো বাঁক, রাস্তার মোড়ের স্থাপত্য আমার মুগ্ধ চোখের সামনে মেলে ধরে। চোখ জুড়িয়ে যায় বাংলায়, শুধুই বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড, সরকারি দপ্তরের নাম, বিজ্ঞপ্তি, গাড়ির নাম্বারপ্লেট দেখে। গুলিস্তান থেকে আরো এগোলে পুরোনো ঢাকার শুরু। ওয়াড়িকে ডাইনে রেখে ধোলাইখাল ব্রিজে উঠি। ব্রিজের দু-পাশে রিকশা ঠেলে তোলার জন্য অজস্র কিশোর দাঁড়িয়ে আছে—মনে পড়ে যায় জলমগ্ন কলকাতায় গাড়িঠেলা কিশোরদের কথা। তারপর অলিগলি দিয়ে অকস্মাৎ গেন্ডারিয়া স্কুল।

গেন্ডারিয়া ছিল পুরোনো ঢাকারই অতিপরিচিত পাড়া। সরু-সরু গলিতে এখনো নিশ্চয়ই আছে সেই পুরোনোরই আভাস। বন্ধু হায়াৎ মামুদের বাড়িতে পৌঁছেই টের পাওয়া গেল একুশের ঢাকাতেই এসেছি। গতরাত্রির বাসি বিছানাতেই বইখাতা ছড়িয়ে হায়াৎ লিখছেন, বাংলা একাডেমীর একুশের বৈকালিক অনুষ্ঠানে পড়বেন বলে। হায়াতের স্ত্রী, ভাই, পুত্রকন্যারাও মাঝে-মাঝে খোঁজ নিচ্ছেন কতদূর কী হল! হায়াৎকে নিয়ে সকলেরই স্নেহসিক্ত উৎকণ্ঠা। বিরাট খোলামেলা বাড়ি ওদের—বাঙালি যৌথ মুসলমান পরিবার, যার পরতে-পরতে বইছে শিক্ষা সুরুচি ও প্রগতির হাওয়া, তার ছন্দ ও মেজাজ গায়ে মেখেছি, তার সহজ মিঠে অন্তরঙ্গতা অনুভব করেছি কয়েকদিন ধরে। কিন্তু সে তো পরের কথা এবং ব্যক্তিগত কথা। উল্লসিত হায়াৎ খানিকটা নিরুপায় আত্মসংবরণেই আমাকে চালান করে দিয়েছিল ওর তাক-লাগানো লাইব্রেরি-ঘরে। কিন্তু আমি তার খপ্পরে বেশিক্ষণ পড়তে চাইনি। ফলে

পায়ে চটি গলিয়ে গেন্ডারিয়ার এ-গলি ও-গলি। বেলা প্রায় পার করে ফিরে এসে হায়াৎকে ওয়াকিবহাল করতে চাইলাম ঢাকার তুলনামূলক মিঠাইতত্ত্বে। কিন্তু সত্যিই জমা হয়েছিল যে অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা তা হল, সূত্রাপুরের দিকে যাওয়ার রাস্তায় চুলদাড়ি-কাটানোর সেলুনে তরুণ কর্মীটি 'ভারতীয়' জেনে যখন পয়সা নিতে চাইছিল না এবং অনেক কষ্টে নিরস্ত করাতে অন্তত চা-বিস্কুট খেতেই হল। ১৯৮৭-তেও এসব একটু অতিনাটকীয় বাড়াবাড়ি কিনা ভাবতে বসি।

বাংলা একাডেমীর চাতালে

হায়াতের পিসিমার সযত্ন পরিবেশনায় খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা দুজন রিকশা করে বাংলা একাডেমীতে। পথে চিনে নিচ্ছিলাম স্টেডিয়াম, পুরোনো পল্টনের ঘরবাড়ি, রমনা এলাকা। চওড়া ঝকঝকে পরিষ্কার রাস্তা, দু-পাশে আন্দোলিত গাছ, যন্ত্রচালিত গাড়ির বিরল উপদ্রব, সুসজ্জিত রিকশার প্রায় মাতাল হয়ে ছুটে-যাওয়া—ঢাকাকে ভালোই লেগে গেল অল্প সময়ের মধ্যে।

যখন পৌঁছোলাম, বাংলা একাডেমী তখন ঝিমোচ্ছে। সামনের মাঠে শামিয়ানা। অজস্র খালি চেয়ার। পাশ কাটিয়ে একাডেমীর বাড়িতে, নীচে প্রেস, ওপর-নীচ এঘর-ওঘর করলাম খানিক। বেশ কাজের জায়গা, তবে সুখের কথা ততটা ভারিক্কি নয়। বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপক ওবায়দুল ইসলামের ঘরে আপ্যায়ন, বাংলাদেশের এখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে আলাপ। ওবায়দুলও কবিতা লেখেন—বই দিলেন 'এইসব মহৎ মিথ্যাচার'। আলাপ হল আরো অনেকের সঙ্গেই। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, বাংলা একাডেমী এখনো নিছক প্রতিষ্ঠান হয়ে যায়নি—লেখকেরা সহজেই আসা-যাওয়া করেন, আড্ডা দেন। পরস্পরের সঙ্গে মোলাকাত করার একটা জায়গা হিশেবে প্রায়ই বেছে নেন একাডেমী। ততটা আড় তৈরি হয়নি এখনো। সরকারি দপ্তরে যেমন হয়ে থাকে।

একাডেমী-ভবনের আরেক পাশে, একটা ছোটো পুকুরকে ঘিরে, বইমেলা। বেশ কিছু স্টল সারসার। সামান্য এঁকেবেঁকে। কিন্তু সংখ্যায় বা সাজসজ্জায় কলকাতার বইমেলার ধারেকাছে নয়। সে-কারণেই বোধহয় বেশি ভালো লেগে গেল। যে-কোনো লোককে চিনে নেওয়া যায়, হারিয়ে যাওয়ার ফিকির নেই। তবে ভয় যে এখানেও থাকছে না এমন নয়। ক্রমশই তো মেলা বাড়ছে। রশীদ হায়দারের কাছে শুনি ১৯৮১-তে বইমেলার শুরু—৮১-তে ছিল মাত্র ১৩-১৪টি স্টল, ৮৬-তে ৮০, আর এবার এই ৮৭-তে ১০৩। আমার চোখের সামনেই দিন-দিন কীরকম ভিড় বাড়ছে তা তো দেখছিই। একুশের সন্ধেয় যেন কলকাতা। তবু তফাত একটা আছেই।

একপাশে উঁচু চাতাল, তাতে রোজ নাটক হয় বেশি রাত্রে—একাডেমীর শামিয়ানা-মঞ্চের অনুষ্ঠান শেষ হবার পর। আর সেই শামিয়ানা-মঞ্চেই তো আলোচনা-সভা রোজ, পনেরো দিন ধরে।

তেরছা রোদে বইমেলা একটু কাত হয়ে আছে, আর আমি এই সুযোগে ঘুরে-ঘুরে দেখি। বাংলা বইই প্রায় সব। নিশ্চিন্ত স্টলকর্মীরা কলকাতার ক্রিকেটের রিলে শুনছে। হঠাৎ চোখে পড়ে মজার দুটি বই। জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'-এর বাংলাদেশী সংস্করণ। দুটি বইতেই বনলতা সেনের ফটো ছাপানো হয়েছে। সিগনেটের সেই পরিচিত ব্যঞ্জনা নয়, একেবারে রক্তমাংসের জ্যান্ত বনলতা সেন। পরে জানতে পারি, নওরোজ সাহিত্য সংসদ সংস্করণের বইটিতে মালিকের প্রয়াত পত্নী মনোয়ারা ইফতেখারেব ছবি ছাপানো হয়েছে (বইতে "বনলতা সেনের মডেল" হিশেবে তার উল্লেখও আছে)। মালিক হলেন শিশু-সাহিত্যিক নাসীর আলীর বড়ো ছেলে ইফ্‌তেখার রসুল জর্জ। আর খান ব্রাদার্স সংস্করণের বনলতা নাকি ঢাকাবাসিনী জীবিত মহিলা-কবি শিরিন মজিদ। তাঁর কবিতার বইয়ের নাম 'নন্দিনী থামো'। কিনে নিলাম বইদুটি। মলাটের কারণেই অন্তত আমোদ দেওয়া যাবে এদেশী বন্ধুদের। তবে, পাঠক, বাংলাদেশের বই মানেই এরকম প্রচ্ছদসজ্জা বা পরিকল্পনা ভুলেও মনে করবেন না। বহু বই-ই কলকাতাকে পাল্লা দিতে পারে। কাইয়ুম চৌধুরী তো এখানকারই মানুষ—দীর্ঘ কয়েক দশক জুড়ে যিনি বাংলা বইয়ের অঙ্গসজ্জায় সুন্দরের চর্চা করে চলেছেন। সত্যজিৎ, খালেদ বা পূর্ণেন্দু-র পাশেই যাঁর আসন। বাংলাদেশের গৌরব, কাইয়ুমও প্রগতি-আন্দোলনের এক নিষ্ঠাবান সৈনিক। এবারের বাংলা একাডেমীর একুশের পোস্টার তাঁরই আঁকা।

একাডেমীর আলোচনাসভার জন্য হাঁকডাক শুরু হল মাইকে। গিয়ে দেখি বিস্ময়কর রকমের নির্জন। পরে ভিড় কিছু বাড়ল বটে, কিন্তু অনুষ্ঠান কখনোই প্রাণ পেল মনে হয়নি। দু-দিন বাদে, ২০ ফেব্রুয়ারি, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ ভাষা সমিতির প্রভাতী সভায় সভাপতি আহমদ শরীফ খুব তিক্তভাবে বলছিলেন, বাংলা একাডেমী যে তার জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তার প্রমাণ একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান-পরিকল্পনা। যে-যে বিষয় নিয়ে সেমিনার হয়, যেভাবে অনুষ্ঠান হয়, তার পেছনে অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, যেন কোনো জরুরি তাগিদই নেই আজ। একুশে নিয়ে আবেগ যে ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে, কিংবা তা নিয়ে খেদ ও আত্মসমালোচনা তৈরি হচ্ছে, কিংবা সেই আবেগ অন্য এক বোধে রূপান্তরিত হতে চাইছে—এ সবই আস্তে-আস্তে বুঝতে পারছিলাম। এবং খুব অবাস্তব কিংবা অসংগতও মনে হচ্ছিল না আমার। কতদিন আর মানুষ আবেগের টঙে চড়ে থাকতে পারে, যদি না তাতে

নতুন লক্ষ্য ও সন্ধান যুক্ত হয়! সেই যোজনার ইঙ্গিত যে একেবারেই নেই তা তো নয়—বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ছাত্রসমাজ, রাজনীতিসচেতন মানুষ যে খোঁজা শুরু করেছে তার অস্পষ্ট আভাস আমি পেয়েছি এই সামান্য কয়েকদিনের ভ্রমণেও। বিকেল পড়তেই বইমেলায় ভিড় বেড়ে যায়। একুশে ফেব্রুয়ারি অবধি রোজই কাজ ছিল : বিকেল থেকে সন্ধে, সন্ধে থেকে রাত্রি বইমেলায় চক্কর দেওয়া। ওয়াহিদুল হক ফোনে খবর পেয়ে যান। পুরোনো অন্তরঙ্গতায় আমি তাঁর করপুটে আশ্রয় নিই। আর ওয়াহিদুলভাই মানেই তো ঢাকার শুধু নয়, সারা বাংলাদেশেরই যৌবনের দূত—তাঁর সূত্রেই পেয়ে যাই ঢাকার, ফরিদপুরের, চট্টগ্রামের, দিনাজপুরের সংস্কৃতিমনা যুবমানসের হদিশ। গানপাগল মানুষ, আসলে অনেককিছুরই পাগল, তাঁর পরিচয় ক্রমশ প্রকাশ্য। ওয়াহিদুলভাই নিয়ে যান এর-ওর কাছে। দু-তিন দিনের মধ্যেই এসে যান আবুবকর সিদ্দিক, এখলাসউদ্দিন আহমেদ, বিপ্লব বালা, সৈয়দ শহীদ কিংবা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মিলন। আরো আরো অনেকে। আলাপ হতে থাকে খালেদা এদিব চৌধুরী, সরকার মাসুদ, আহমদ আজিজ, খৈয়াম ওমর প্রমুখদের সঙ্গে, যাঁদের সদ্য-প্রকাশিত বই জমতে থাকে হাতে। আবুবকর সিদ্দিক তো আমাদের পুরোনো বন্ধু, এখানে নিত্যসঙ্গী। সারা বাংলাদেশ যেন জয় হয়ে যাচ্ছে এমনভাবে ঘুরতে থাকি মেলায়। একটু আলাদা করে আলাপ হয়ে যায় আরেকদিন ঢাকার দলছুট ক্রুদ্ধ 'প্রতিষ্ঠানবিরোধী' প্রজন্মের সঙ্গে। মেলার একধারে ওঁরা স্টল করেছেন। 'চর্যাপদ'। পত্রিকার নামও তাই। আরেকটি পত্রিকা 'গাণ্ডীব'। আরেকটি 'সংবেদ'। কিংবা 'একবিংশ'। এরকম অনেক। বেশ কয়েকজন উজ্জ্বল তরুণ ভিড় করে বসে থাকেন চর্যাপদ-এর স্টলে। আলাপ হল 'চর্যাপদ'-এর বদরুল হায়দারের সঙ্গে, 'গাণ্ডীব'-র সাজ্জাদ শরিফ ও শোয়েব শাদাবের সঙ্গে। হারুন রশিদের সঙ্গে। আরো অনেকের সঙ্গেই। সাজ্জাদের কবিতা-বিষয়ে 'সাম্প্রতিক ভাবনা' পড়ে, তাঁর বা শোয়েব বা কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার বা খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতা পড়তে-পড়তে মনে হয়, সত্যিই বিচলিত করার মতো কবিতা, টাটকা কবিতা লেখা হচ্ছে এই দিকে। চেনাও যায় ওঁদের এ-বাংলার অ্যাংরি-হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে তুলনায় ও প্রতিতুলনায়। সাজ্জাদ শরিফ লেখেন : "বর্তমান ধাবমান সময়ে আমরা বিসংগত, উদ্ভট, আত্মঘ্ন ও বমিউদ্রেককারী সংবেদনার ছেঁড়া, টুকরো, একত্রচাপ অনুভব করছি।" এবং "পাঠককে মগ্ন-মথিত করার জন্য প্রচাপ দিতে হবে তার সমগ্র ইন্দ্রিয়ে, যাতে আক্রান্ত পাঠকের ভেতরে সহজেই সংক্রামিত হতে পারে কবিতাটির স্ফুলিঙ্গ।" ফলে কোথায় যেন ব্যক্তিগতে আটকে আছেন ওঁরাও। কিন্তু সে কথা থাক—সে তো স্বতন্ত্র নান্দনিক প্রবেশ-প্রস্থানের ব্যাপার।

খুব আদর করে ওঁরা চায়ের স্টলে বসালেন। তারপর এ-বাংলার ও-বাংলার সাহিত্য নিয়ে সওয়াল-জবাব। অনেকেই বেশ পড়াশোনা করা ছেলে। চটপট নিজেদের মতামত জানাতেও কোনো দ্বিধা নেই। মুখে-মুখেই লিস্টি বানিয়ে দিলেন কাকে-কাকে গ্রাহ্য করেন ওঁরা—কবিতায় আল মাহমুদ, হ্যাঁ সব-সত্ত্বেও আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী, আবুল হাসান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবিদ আজাদ কিংবা আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। আমার সঙ্গে যে পুরোপুরি মতে মিলবে না সেটা তাঁরা জেনে নিয়েই বলছেন বোঝা গেল। দৃঢ়তা কণ্ঠস্বরে, তবু যথোচিত বিনয়ের অভাব নেই। ঢাকাতে কদিন ধরেই শুনছি *'চিলেকোঠার সেপাই'* নামের উপন্যাস এবং তার লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথা। ওঁদের মুখেও আবার শোনা গেল। তা ছাড়া হাসান আজিজুল হক ও সৈয়দ শামসুল হক আছেন, ওঁদের কাছেও, নতুন নাম বরং মঞ্জু সরকার। আমরা অবশ্য এ-বাংলায় তাঁর লেখা আগেই পড়েছি 'পরিচয়'-এ। শামসুর রাহমানকে ওঁরা খুব শ্রদ্ধা করেন ওঁর চারিত্র্যের জন্য, বিশেষ করে সাম্প্রতিক প্রতিবাদী কবিতা-উৎসবের উদ্যোগ নেওয়ায়, কিন্তু তাঁর কবিতা সম্পর্কে বেশ উদাসীন। অনেকের নামই তবু আমি করলাম। এ ওঁর মুখের দিকে তাকান। একটু চাপা হাসিও যেন হাসেন।

বলা বাহুল্য, এই দায়মুক্ত তরুণ কবিদের মেজাজ ও ঢঙই আলাদা। রাত্রি করে আরো গেছি। এ-বাংলার কবি রণজিৎ দাশ ও মৃদুল দাশগুপ্ত তাঁদের ডেরায় আস্তানা নিয়েছেন বলেও বটে। মাঝে-মাঝে ওঁদের কাউকে ততটা প্রকৃতিস্থ মনে হয়নি হয়তো, কিন্তু বিচারবুদ্ধি বেশ টনটনে এবং মর্যাদাসম্পন্ন।

সবচেয়ে ভালো লেগে গেল মোহাম্মদ রফিককে। কবিতায় বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন এবার উনিই। কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। উনি বসেছেন চর্যাপদ-ওয়ালাদের একেবারে বিপরীত প্রান্তে জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীর সামনে। আকাশের নীচে টুল রেখে নিজের বই নিজে ফিরি করছেন। মুখভর্তি পান। কমিউনিস্ট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক, কিন্তু জীবনযাপনের বেহিশেবি ধরণধারণের জন্য নাকি অনেককে প্রায়ই মুশকিলে ফেলেন, ভালোবাসাও পান অনেকের। এর-ওর কাছে গল্প শুনে যাই তাঁর। কবিতার বই ওলটাতে-ওলটাতে কবিত্বের তীব্রতায় অজস্রতায় অস্থির হই। অনেকদিন ধরেই তো লিখছেন। 'খোলা কবিতা' নাকি কিংবদন্তি। আমি এর আগে পড়িনি। বাংলাদেশে এসে, বইমেলায় এসে, আমার সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার মোহাম্মদ রফিক এবং তাঁর কবিতা।

যৌবনের অর্কেস্ট্রা

ঢাকায় সবচেয়ে মন কেড়েছিল ছাত্র-শিক্ষক-কেন্দ্র, ইংরেজিতে এখানে যাকে বলা হয় টিচার্স-স্টুডেন্টস-সেন্টার বা সংক্ষেপে টি-এস-সি—তার তিনতলা সুন্দর ছড়ানো বাড়ি, তার সবুজ মাঠ নিয়ে অন্দরমহল এবং সারাদিনের ব্যস্ত কর্মকাণ্ড। একটা ব্যাপার শুধু বুঝিনি। ওরা সবাই এত বাংলা ব্যবহার করতে চায়, কিন্তু এর নামের বেলায় ইংরেজি আদ্যক্ষর কেন? উচ্চারণের সুবিধে? এ উত্তর অন্তত বাংলাদেশের তরুণেরা দেবেন না আশা করা যায়।

বাংলা একাডেমীর পাশে (মাঝখানে শুধু বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের কেন্দ্র), বিশ্ববিদ্যালয়-এলাকা শুরু হওয়ার ঠিক মুখে ছাত্রশিক্ষককেন্দ্রের বাড়ি। একপাশে রমনা পার্ক, আজ যাকে বলা হচ্ছে সোওরাওয়ার্দি পার্ক। ছাত্রযুবকদের যা-কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তার পীঠস্থান এখন এটা। আর বাংলাদেশে, সবাই জানেন, রাজনৈতিক আন্দোলনও দানা বাঁধে ভাষার আন্দোলন, সংস্কৃতির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। তিনতলা বাড়িতে ছোটোবড়ো অডিটোরিয়াম আছে, ঘর আছে—বিভিন্ন ছাত্রযুব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের হেফাজতে। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল' এরকমই একটি। গেটের মুখে ওদের ফেস্টুন : 'আমরা সুন্দরের অতন্দ্র প্রহরী'। কেন্দ্রের বাড়ির ভেতরে ঢুকলেই শোনা যায় দুপুর থেকে জোর-কদম মহড়া চলছে। ঘরে ঘরে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভেতরের মাঠে, বারান্দায়, সিঁড়িতে—ছোটো-ছোটো দল যারা ঘর পায়নি তারাও গোল হয়ে বসে কোনো কিছুর 'অনুশীলন' চালিয়ে যাচ্ছে। থিয়েটার, গান, আবৃত্তি কিংবা সব কিছু মিশিয়ে বানিয়ে নিচ্ছেন ওঁরা। যাকে বলা হয় 'নিরীক্ষা' তার ধুম পড়েছে।

ওয়াহিদুল হক, বিপ্লব বালা এবং তাঁদের দল 'কণ্ঠশীলন'-এর বেশ কিছু কর্মী ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখালেন। এই কেন্দ্র নিয়ে বেশ গর্ব রয়েছে ওঁদের। 'কণ্ঠশীলন' মূলত আবৃত্তির দল, এবং আবৃত্তির চর্চাই এখানে, বস্তুত সারা বাংলাদেশেই, সবচেয়ে ব্যাপক বলে মনে হল। বোধহয় নাটককেও ছাড়িয়ে। বিপ্লব বালা অজস্র নাট্যদল ও আবৃত্তিদলের নাম করলেন। নিত্যনতুন তৈরি হচ্ছে এবং তাদের সবারই আশ্রয় 'ছাত্র-শিক্ষক-কেন্দ্র'। গানের দলও আছে অবশ্যই। দুপুরে, বিকেলে, সন্ধেয় যে-কেউ এই কেন্দ্রে এলেই শুনতে পাবে নানা দিক থেকে কথা কিংবা সুর ভেসে আসছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের যৌবনের অর্কেস্ট্রা। সব ব্যর্থতা সব নৈরাশ্য সব পিছুটান সত্ত্বেও ছাত্রযুবকের এই প্রাণময়তা কোথায় যেন অক্ষত রয়েই গেছে—ঢাকায় এলে, বাংলাদেশ ঘুরলে তা টের পেতে দেরি হয় না।

তরুণবয়সী বিপ্লবকে একটু খোঁচা দিতেই বোঝা গেল, আবৃত্তির যাথার্থ্য নিয়ে কবি এবং আবৃত্তিকারদের মধ্যে মন-কষাকষি এখানেও আছে, কলকাতারই মতো। অরুণ মিত্র বনাম শম্ভু মিত্রের এপিসোডও প্রায় সকলেরই জানা। বিপ্লব অনেক কিছু স্বীকার করে এবং বেশ কিছু অস্বীকার করে শেষপর্যন্ত বলল, বাংলাদেশে অন্তত আবৃত্তির একটা অন্য ভূমিকা আছে। এখানকার ভাষা নিয়ে আন্দোলন এখনো তো একটা জ্যান্ত ব্যাপার। সেই সূত্রে সামাজিক রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও একটা বড়ো হাতিয়ার কবিতা ও তার আবৃত্তি। তা ছাড়া ওরা এ-ব্যাপারটাকে আরো গুরুত্ব দিয়ে দেখে। মুখের ভাষা ও লেখার ভাষা, দৈনন্দিন ঘরোয়া আঞ্চলিক উচ্চারণ ও শিষ্ট সমাজে প্রচলিত উচ্চারণ—এসবের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বা বিরোধকে তারা ঘোচাতে চায় এই আবৃত্তিচর্চার মধ্য দিয়েও। তাই তো ওদের কর্ণধার ওয়াহিদুল হক উচ্চারণ নিয়েই সবসময় মাথার চুল ছেঁড়েন—ওঁর গানের দল 'আনন্দধ্বনি'-তেই হোক, আবৃত্তির দল 'কণ্ঠশীলন'-এই হোক কিংবা জামিল চৌধুরীর সঙ্গে উচ্চারণ-অভিধানে মেতে যাওয়াতেই হোক। ওয়াহিদুলভাইয়ের কাছে সমস্তই একসূত্রে গাঁথা—সমাজনীতির শুদ্ধতা, লিখিত ভাষার শুদ্ধতা, উচ্চারণের শুদ্ধতা সমস্তই। ঐতিহাসিক কারণে এই শুদ্ধতা অর্জনের যে সমস্যা ও গোলমাল—সবসময় তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। পাশের যে-কোনো মানুষেরই উচ্চারণ নিয়ে তিনি যেরকম ঝাঁপিয়ে পড়েন, তা প্রায় বাতিকের পর্যায়ে পৌঁছেছে। যথেষ্ট শিক্ষিত ও আত্মসচেতন বাঙালও কথায় বা গানে 'স্টান্ডার্ডাইজড' চালু উচ্চারণের মধ্যে তাঁর আঞ্চলিক উচ্চারণ কীভাবে মিশিয়ে ফেলেন তার কৌতুককর দৃষ্টান্ত দেন রসিয়ে-রসিয়ে।

অবশ্য ভাষা নিয়ে ভাবনায় অনেকেই জড়িয়ে আছেন দেখা যায় বাংলাদেশে। হায়াৎ মামুদ রাতদিন খাটছেন একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে 'ব্যবহারিক বাংলা ও বানানবিধি' বইটি বের করার আশায়। বইটির লেখক মুহাম্মদ আবুদল গফুর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েরই সামান্য একজন কর্মী। হায়াৎ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, "তিনি বৈয়াকরণ নন, ভাষাবিদ নন। তিনি তাঁর কর্মজীবনের ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে মমতাবোধ করেছেন সেটুকু তাঁর প্রাথমিক মূলধন।" বাংলাভাষা নিয়ে কাজকর্ম পশ্চিমবঙ্গেও কম হচ্ছে না, পূর্ববাংলার অর্থাৎ বাংলাদেশের সবকাজই যে খুব উঁচুমানের তাও নয়—কিন্তু "মাতৃভাষা সম্বন্ধে মমতার বোধ" কথাটা ওখানে যত লাগসই এখানে বোধহয় তার অনেকটাই ক্ষয়ে গেছে।

জামিল চৌধুরী একদিন আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাস এডুকেশন'-এর দপ্তরে। অদ্ভুত মানুষ এই জামিল। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক।

একসময় টেলিভিশনেও ছিলেন। এখন মেতেছেন 'উচ্চারণ-অভিধান' তৈরিতে। ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে নিজের দপ্তর, যন্ত্রপাতি এবং সহকর্মীদের নিয়ে বেশ নিশ্চিত ও খুশি মনে হল। অভিধানের দু-এক পাতা প্রুফ দেখালেন। কীভাবে কম্পিউটারে কাজ হচ্ছে তা-ও। অভিধানের পদ্ধতি ও নীতি নিয়ে সামান্য কথাবার্তাও হল।

ঢাকার উপকণ্ঠে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, একুশে উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিশেবেই, কর্মশালা হচ্ছে 'শুদ্ধভাবে বাংলাভাষার ব্যবহার' নিয়ে। 'ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থা'র তরুণ কর্মীদের উদ্যোগে ছাত্রদের জন্য বানান নিয়ে কর্মশালা। বরিশালে উদীচী-র ঘরে নিখিল সেনগুপ্তর পরিচালনায় যে আবৃত্তির মহড়া তাতেও উচ্চারণ নিয়ে কথাবার্তা—এ সব তো আমার চোখের সামনেই।

ছাত্রশিক্ষককেন্দ্রের আবৃত্তি-বিষয়ক অত্যুৎসাহকে এদিক থেকেই দেখার কথা বললেন ওরা। আমার অবশ্য পুরো সন্দেহটা গেল না। সবচেয়ে কম নৈপুণ্যে কম শ্রমে ব্যাপারটা সেরে ফেলা যায়, এই অভিজ্ঞতা কি ও-বাংলাতেও নেই? কেন্দ্রের সেমিনার-ঘরে আমন্ত্রিত প্রদীপ ঘোষের বক্তৃতার পর 'কণ্ঠশীলন'-এর ছেলেমেয়েরা মাঠে গোল হয়ে বসে যখন আড্ডা দিচ্ছিলেন, তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা এইসব তরুণ মুখগুলির দিকে তাকিয়েও প্রশ্ন মনে উঁকি দিচ্ছিল, জবাব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আবার এও ঠিক, কিছুক্ষণ আগে ওঁদের অনুষ্ঠান—বিষ্ণু দে ও সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা দিয়ে ঘেরা প্রাচীন লোকছড়ার সম্মিলিত ও একক আবৃত্তি, যাকে ওঁরা 'বৃন্দ-আবৃত্তি' বলেন, 'সেই শিকড়ের ডানা'—শুনতে-শুনতে বিপ্লব বালার দাবিও মেনে নিতে হচ্ছিল। সত্যিই তো বাংলাভাষা ও বাঙালি-মনের শিকড় সন্ধান করছেন তাঁরা আবৃত্তি দিয়েই।

একুশের হাওয়ায়

একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলার বাঙালির নবজন্ম। ১৯৫২ থেকে শুরু হয়ে ১৯৮৭: পতনঅভ্যুদয়ে চিহ্নিত এই জাতকের ইতিহাস। অনেক দুঃখ আর অনেক সুখ মেশানো। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি শোকের দিন, প্রস্তুতির দিন, আবার আনন্দ ও গৌরববোধেরও দিন।

একুশের দু-দিন আগে থেকেই রোজ একবার করে শহিদ-মিনারে যাই। বাংলা একাডেমী থেকে রওনা হয়ে ছাত্রশিক্ষককেন্দ্র ছুঁয়ে, অর্ধবৃত্তাকারে রোকেয়া হলের পাশ দিয়ে ঘুরে, ধীরে-ধীরে পৌঁছোই শহিদ-মিনারের বুকে-গেঁথে-যাওয়া স্থাপত্যের দিকে। প্রথম দিন সঙ্গে ছিলেন ওয়াহিদুল হক এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা। এখলাসউদ্দিন

আহমদ ও তাঁর ফটোগ্রাফার-ভাই আসাদউদ্দিন আহমদও ছিলেন। শহিদ-মিনারের নীচে উজ্জ্বল আলোয় স্তম্ভিত দর্শকদের সামনে একের পর এক আবৃত্তির দল কবিতা শোনাচ্ছে—ভাষা নিয়ে, লড়াই নিয়ে, জীবনের সুখদুঃখ নিয়ে লেখা বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দেশের কবিতা। দর্শকদের একাগ্র মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছিল, কবিতা বোধহয় এমন করে সত্য হয়ে ওঠেনি আর কোথাও। কোনোদিন একের পর এক টুকরো নাটক হতে দেখি—জীবনের যন্ত্রণার মর্মভেদী চিৎকার, শপথ উচ্চারণের হুংকার। এই অতিনাটকীয়তাও কেমন গ্রাহ্য হয়ে যায় একুশের হাওয়ায়।

একুশের আগের দিন প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি ঢাকা শহরে। সরকারি আর্ট কলেজের অধ্যাপক হাশেম খান তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বরাবর সারারাত ধরে আলপনা আঁকেন রাস্তায়—এবার ওঁকে দেখলাম সামনে কাজ করতে। এখলাস ও আসাদ নিয়ে গেলেন। কাজ ফেলে এসে হাত জড়িয়ে ধরলেন হাশেম ও তাঁর সহকর্মীরা। ছাত্ররা যুবকেরা পোস্টার লিখছে, ব্যানার টাঙাচ্ছে। ব্যঙ্গচিত্র এঁকে চলেছে। একাডেমী, ছাত্রশিক্ষককেন্দ্র আর শহিদ-মিনার—এই তিন জায়গায় চক্কর দিতে-দিতে পা ব্যথা হয়ে যায়। শহিদ-মিনারে তখন উদ্দাম নাট্যাভিনয়।

একুশের শেষরাত্রি থেকেই বেরোবার তোড়জোড়। হায়াতের ভাই হাফিজুর, হায়াতের পুত্রকন্যা সৌম্য ও লোপা, গতরাত্রির সঙ্গী আবুবকর সিদ্দিক এবং আমি—এই পাঁচজনের পায়ে-হাঁটা মিছিল প্রায় অন্ধকার থাকতে-থাকতেই রওনা দেয় গেন্ডারিয়া থেকে। নিস্তব্ধ শহর মাঝে-মাঝে সরব হয়ে ওঠে গলি থেকে বেরোনো ছোটোবড়ো মিছিলে। যত এগোই তত মিছিল বাড়তে থাকে। তবু, মানতেই হবে, একুশের মিছিলের যে-কল্পনা মনে গাঁথা ছিল, তাতে একটু ঘা খায়। তবে কি একুশের উদ্দীপনার ক্ষয়ে যাওয়া নিয়ে যে-খেদোক্তি শুনেছি অবিরল চারপাশে, তা পুরোপুরি মিথ্যে নয়? আভ্যাসিক আবেগসঞ্চারের বদলে একুশের পরিণতি নিয়ে তর্কও যে উঠছে যার লক্ষণ এই ঈষৎ ঔদাস্য, তাকে যে আমার অস্বাভাবিক মনে হয় না, বরং সুস্থই লাগে, সে তো আগেই বলেছি।

বাংলা একাডেমীর কাছাকাছি আসতেই দেখি দু-পাশে পোস্টার-ব্যানার ছেয়ে আছে। পথের পাশে ছেড়ে-ছেড়ে দু-পায়ে দাঁড় করানো বোর্ড, বোর্ডের ওপর রঙিন কালিতে লেখা রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, জীবনানন্দ কিংবা বাংলাদেশের কবি সিকান্দার আবু জাফর, শামসুর রাহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখের ছিন্ন চরণ। ভাষার লড়াই নিয়ে, একুশের ঐতিহ্য নিয়ে প্রবচন। স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে উনিশশতকী অনুশাসন : "মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নয়"।

বাংলা একাডেমী থেকে সামান্য দূরে শহিদ-পার্ক—সেখানে ফজলুল হক, সোওরাওয়ার্দি ও নাজিমুদ্দিনের স্মৃতিতে তিনটি স্তম্ভ। মুজিব-উত্তর কালের কীর্তি। এই তিন নামের সমন্বয় ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ করেছে অনেককেই। কিন্তু এবারই তার বিরুদ্ধে কয়েকটি লাইন লেখা পোস্টার সকলের চোখে পড়ল। "একুশে, তুমি আজ ফিরিয়ে দাও ঘৃণা এবং ভালবাসার সঠিক বিচারবোধ"।

বাংলাদেশে এটাই এখন রক্তের ভেতরে মূল ধ্বনি, একুশে-উদ্‌যাপন যেন তাকেই ঘিরে। ভাষার আন্দোলনে স্বাধীনতার আন্দোলনে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তারা আজ ক্ষমা পেয়ে যায়, তারাই আজ উচ্চাসনে, তারাই ভাগ্যনিয়ন্তা। এই নিয়ে বই লেখা, গানের সুর, নাটকের অভিনয়। লোকের মনে-মনে নৈরাশ্য, ক্রোধ, দীর্ঘশ্বাস। সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস 'স্মৃতিমেধ' কে যেন হাতে গুঁজে দিয়ে যায়। বইমেলায় বিশ্বাসঘাতকদের নামপরিচয় চিনিয়ে দেওয়ার পুস্তিকা বেস্টসেলার। ২০ ফেব্রুয়ারি সকালে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের হলে গাজীউল হকের ঝাঁঝালো বক্তৃতা শুনি। সভাপতি আহমদ শরীফ কটূক্তি করছেন সৈয়দ আলী আহসানের নামে। শক্তিশালী কবি ও সমালোচক আহসান নাকি আরো একবার বেড়া ডিঙিয়েছেন। বোঝা যায় ভেতরে-ভেতরে ফুঁসছে বাংলাদেশ।

এই গাজীউল হকই ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারিতে, ভাষা-আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের প্রাঙ্গণে আমগাছতলায় যে ঐতিহাসিক ছাত্রসভা হয়েছিল, তার সভাপতি ছিলেন। ছাত্রনেতা জনাব গাজীউল হক এখন অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট। সেই গাজীউল হক ৮৭-র একুশের সকালে ছাত্রশিক্ষককেন্দ্রের সামনে হাতে হাত জড়িয়ে টেনে নেন আমায়—এতে যদি শিহরন অনুভব না করি, তবে কীসে করব! টেনে নিয়ে সাংস্কৃতিক জোটের মিছিলে দাঁড় করালেন পাশে।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের মিছিলটা যেন আপনা থেকেই গড়ে ওঠে ছাত্র-শিক্ষককেন্দ্রের সামনে থেকে। এতে জুটে যান নাট্যকর্মীরা, নাচিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়েরা, লেখক ও বুদ্ধিজীবী। আমার সামান্য দূরেই রামেন্দু ও ফেরদৌসী মজুমদার হাঁটছেন, গাজীউল হক হাঁটছেন, পাশে ওয়াহিদুল হক তাঁর কনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে, ওপাশ থেকে ছায়ানট যোগ দিল। সবার মুখে গাফফার চৌধুরী ও আলতাফ মাহমুদের 'একুশের গান'। ছায়ানট এসে যোগ দেওয়ায় সেটা আরো গান হয়ে উঠল। কখনো আবার অখণ্ড নীরবতা। আরো কত মিছিল এ-পথ দিয়ে ও-পথ দিয়ে। সবাই খালি পায়ে অভিষেকের আলপনা ডিঙিয়ে। শেষকালে সব মিছিল মিলে রাস্তা বন্ধ। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অবশেষে পা টিপে-টিপে শহিদ-মিনারের সামনে পৌঁছোই।

অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় ফুল সরিয়ে নিচ্ছেন, সাজিয়ে রাখছেন ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবকেরা। তাকিয়ে থাকি হামিদুর রাহমানের বারবার গড়াভাঙার স্থাপত্যের দিকে।

মিছিল একসময়ে শেষ হয়ে যায়, সারিসারি দুধের 'মাঠা' নিয়ে বসে আছে দোকানিরা, তাদের সামনে কেউ-কেউ থামে। হেঁটে-হেঁটে আমরা আবার বাংলা একাডেমী।

সকাল থেকে সেখানে কবি-সম্মেলন চলছে। দূর থেকে মাঝে-মাঝে তা-ই কানে আসে। কোনো নির্বাচন নেই—সবারই অবাধ অধিকার আজ। ফলে যা হবার হচ্ছে। কবিতা ও অকবিতায় মেশামেশি। তবে একুশই তো বড়ো কবিতা—তার সামনে বাদবিচার অবান্তর।

আমি বরং অশ্বত্থগাছকে ঘিরে যে প্রদর্শনীগুলি চলছে তাতে চোখ বোলাই। মনোয়ার আহমেদের 'আলোকচিত্রে ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি', মুরাদের চিত্রপ্রদর্শনী 'আমার দেশ' কিংবা বাংলা ও বাঙালির প্রেরণা-পুরুষদের অবয়ব—দেখতে-দেখতেই যেন বেরিয়ে আসি একাডেমীর চাতাল থেকে।

দুপুরে বাইরে খেয়ে নিই। সারাদিনই আজ মেলা। বিকেলে মেলায় আরো ভিড়। সন্ধেয় দেখা হয় কাইয়ুম চৌধুরীর সঙ্গে। এতদিন শুধু ছবিতে আর প্রচ্ছদে চিনেছি, নিজেদের মধ্যে কত বলাবলি করেছি—আজ আলো-অন্ধকারে মেশা এই মেলার ভিড়ে পক্ককেশ প্রৌঢ়কে সামনে পেয়ে শ্রদ্ধা জানাই।

সাভারের নির্জন

ঢাকা-আড়িচা রোড ধরেই ফরিদপুরে যাওয়ার পথে পুরো একটা বেলা কাটল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকার উপকণ্ঠ সাভারে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। বাসে করে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা আছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাভাষার সেমিনারের উদ্বোধনে যোগ দেওয়া। হায়াৎ মামুদ আছেন, ওয়াহিদুল হক আছেন, জামিল চৌধুরী আসবেন, তাই যাওয়া। নইলে সাতদিনের সেমিনারের প্রথম দিনে আর কী বোঝা যায়। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বিখ্যাত অধ্যাপক এবং প্রবীণ বুদ্ধিজীবী, তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। ওঁর সম্পাদিত 'সুন্দরম্' পত্রিকাটি দেখে তো আমি মুগ্ধ। এত উঁচুদরের পত্রিকা এ-বঙ্গেও কটা আছে সন্দেহ। সেমিনার-অধিকর্তা বুঝিয়ে দিলেন—সেমিনারের বিষয় : শুদ্ধভাবে বাংলাভাষার ব্যবহার। প্রধানত চারদিক থেকে আলোচনা হবে—ব্যাকরণগতভাবে, যথার্থ শব্দ নির্বাচনে, বাক্যগঠনে এবং উচ্চারণে। জামিল চৌধুরী উচ্চারণ নিয়ে বললেন। তবে সব মিলিয়ে, ভাষা ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রশ্নে অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পাওয়া গেল ওয়াহিদুল হকের কাছে

থেকে। শুধু বাংলাভাষার নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের ছাত্র ও অধ্যাপক অনেকেই যোগ দিয়েছেন সেমিনারে। ফাইল, কাগজ, বই কোনো কিছুর কমতি নেই। দেরিতে এলেও সভাপতিত্ব করেছিলেন উপাচার্যই।

একদিন আগেই বাংলা একাডেমীর বইমেলায় আলাপ হয়েছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েরই বি.এ. ক্লাশের ছাত্র সামছুদ্দীন চৌধুরীর সঙ্গে। এখানেই মীর মোশাররফ হোসেন হলে থাকে সে। ডাকনাম মিলন। ছোট্টখাট্ট লাজুক চেহারা। সে তখন থেকে উশখুশ করছে আমাকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্য। ক্যাম্পাসের ভেতরকার গাছপালা, পাখি, ঝিল সবমিলিয়ে যে অপরূপ সৌন্দর্য তা নিয়ে তার গর্ব আছে মনে হল। সাভারের প্রকৃতি ও ভূগোল বোঝাতে থাকে সে। নিচু গলায় বলে, এই নির্জনতা ভালো, আবার খারাপও কারো-কারো কাছে। সবই নির্ভর করছে মনটার ওপর। মন যার বিপর্যস্ত, সে আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এই নির্জনতায়। কেন বলল জানি না। কিন্তু আমার ভারী ভালো লেগে গেল মিলনকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো কয়েকজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপের উপক্রম হয়—কিন্তু মিলন তার পড়াশোনা, নীরব ব্যক্তিত্ব ও অকুণ্ঠ আগ্রহ দিয়ে ঘিরে রাখে আমাকে।

বিনিদ্র ফরিদপুর

দুপুর তিনটেয় বাসে চড়ে সাভার থেকেই ফরিদপুর। বিরাট দল। ওয়াহিদুল হক তো থাকবেনই—তাঁরই প্ররোচনায় যাওয়া। সঙ্গে আছে বিপ্লব বালা। ঢাকায় থাকলে কী হবে, আসল বাড়ি তার ফরিদপুরে—শহর থেকে আরো দূরে, মাদারিপুর। তবে ফরিদপুর শহরের সঙ্গেই তার নাড়ির যোগ, বোঝা যায় বাস থেকে নেমেই, তারই সাম্রাজ্যে এসে পড়লাম যেন। বন্ধুবান্ধব, আড্ডা, সংস্কৃতি সব নিয়ে। আর আছে: ওয়াহিদুল ভাইয়ের ছোটো ছেলে এষণ, হায়াতের ছেলে সৌম্য এবং দিনাজপুরের মেয়ে লিটা।

জেলার হিশেবে ঢাকা থেকে পদ্মা পার হলেই ফরিদপুর। পদ্মার ওপর লঞ্চে বসে নদী চর দিগন্ত পেরিয়ে চোখ চলে যায় কতদূর। লঞ্চের ছাদে নামাজের দৃশ্যে আবার ফিরে আসে। পদ্মা পার হয়ে দৌলৎদিয়ার ধু-ধু বেলাভূমিতে ছড়িয়ে পড়া—সে-সব অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। সন্ধে নাগাদ ফরিদপুর বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দেখি ফরিদপুরের 'যুবসমাজ' হাজির। গোয়ালচামট-পাড়ার অরুণ বসু শুধু চেহারাতেই বিরাট লম্বা নয়, মনন-উৎসাহেও। কাজেকর্মে কথায়-বার্তায় টগবগ করছে সে। ওদের বন্ধু সিরাজুল আজম চোখে দেখতে পায় না—কিন্তু ওরা কাউকে বুঝতে দেয় না। সিরাজুলের বুদ্ধিদীপ্ত কথা শোনাটাও ছিল আনন্দের। আর আছে : ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল কাসেম, এঞ্জিনিয়ার-ব্যবসায়ী দুলাল সিকদার (যে তার সাইকেল বানানো ও সারানোর নতুন দোকানের নাম দিতে চায় 'কলকজা'), ব্যবসায়ী এবং এদের থেকে বয়সে বড়ো মাকছুদুর রহমান বা হীরু এবং আরো অনেকেই। সবাইকে নিয়ে ওদের 'পরিবার'।

কুমার নদ পার হয়ে সন্ধেবেলার ফরিদপুর শহরে হাঁটতে-হাঁটতে পৌঁছে গেলাম শহরের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে, চরকমলাপুরে, হীরুর বাড়িতে। ওঁর ভাইয়ের নাম মজিবুর রহমান। চকিত আলাপ হল। ওঁদের বাড়ির সামনে বিরাট বাগান। দিশি বাগান। দোতলা বড়ো বাড়ি। বোঝা যায় অবস্থাপন্ন। ভারী শ্রীমণ্ডিত পরিবার— বাড়ির মেয়েদের সলাজ মিষ্টি হাসির আতিথ্য।

পরের দিন সকালে হীরুবাবুর নেতৃত্বে কুমার নদের ধারে গ্রামেগঞ্জে কিছু হাঁটা হল। কুমার নদ প্রায় দুদিকে ঘিরে রেখেছে এই শহরকে। টিনের বাড়ি, ঝকঝকে তকতকে উঠোন। গ্রামবাসীদের উৎসুক চোখ।

সকালের জলখাবার খেয়ে আঁকাবাঁকা গতিপথে মসজিদবাড়ি সড়ক ধরে আমরা বিপ্লবের বাড়ি পৌঁছোলাম। কিছুক্ষণ বাদেই অরুণ আমাকে বগলদাবা করে শহর দেখাতে বেরোল। হালকা পরিচ্ছন্ন শহর হিশেবে নাকি ফরিদপুরের নামডাক আছে! তা কিছুটা মনে হল বইকী। গাড়িঘোড়া নেই, শ্লথ মন্থর জীবন। মুজিব সড়কের দুপাশে রাস্তা, বাড়িঘর, অফিস-দোকান চিনিয়ে দিতে লাগল অরুণ। তারপর রিকশায় করে কিছুটা ভেতরে ঢুকে অম্বিকা হল, কবি জসীমউদ্দীন হল, ফরিদপুর মিউজিয়ম, শিশু একাডেমীর হল, জেলখানা, রাজেন্দ্র কলেজ ইত্যাদি দেখতে-দেখতে অবশেষে হুস করে এসে পড়লাম লালরঙের বিরাট কোর্টের বাড়ির পাশে। সেখানেই 'ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থা'। আসলে এটাই দেখাতে চায় অরুণ। ছোট্ট দু-কামরার ক্লাবঘর। নামের প্রাচীনত্ব নিয়ে ঈষৎ লজ্জিত, কিন্তু এই সংস্থার সঙ্গেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে সে। সংস্থার ঘরেই আলাপ হল কয়েকজন তরুণের সঙ্গে: মহম্মদ হায়দার আলী, দেবব্রত দাস এবং আরো কেউ কেউ। সংস্থার কর্মকাণ্ডের বিবরণ শুনি। এঁরাই সাহিত্যে আলাওল পুরস্কার দেন, দু-বছরের ব্যবধানে। সবচেয়ে মনোযোগ কাড়ল সংস্থার সাম্প্রতিক বানানা-সংশোধন অভিযান। এর উদ্যোক্তা প্রধানত দুজন : ফরিদপুর ইয়াছিন কলেজের বাংলার অধ্যাপক আজিজুল হক খান এবং অরুণ বসু নিজে। অল্প কিছু আগে, এবারের এই একুশে উপলক্ষেই, এরা আটটি স্কুল নিয়ে বাংলা বানানের কর্মশালার আয়োজন করে। "বাংলাদেশের ছাত্রদের মধ্যে বানানভুল তো বড্ড বেশি (যেন এ-বাংলায় নেই!), তা দূর করার জন্যই অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর মধ্যে ৫০ জন করে ছাত্র নিয়ে আমাদের কর্মশালা।

প্রত্যেক স্কুলে একদিন করে তিন-চার ঘণ্টা।" বহুল-প্রচলিত বানান-ভুলের সাইক্লোস্টাইল করা একটি তালিকা দেখাল অরুণ। আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম, এসব ভুল আমাদের দেশেও বিস্তর। জানলাম, প্রথম-প্রথম শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল—অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁদের মন জয় করতে হয়েছে। এখন তো চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে। ২০ জানুয়ারি একটা বানান-প্রতিযোগিতারও আয়োজন হয়েছিল—সব মিলিয়ে প্রায় চার থেকে পাঁচ শো জন স্কুলকলেজের ছাত্র যোগ দিয়েছিল। ওয়ার্কশপে শুধু স্কুলেরই ছাত্র থাকবে, প্রতিযোগিতায় স্কুল ও কলেজ মিলিয়ে সবাই। আজিজুল ও অরুণের মাথায় আছে আরো পরিকল্পনা—ফরিদপুর শহরের সাইনবোর্ডের বানান সংশোধন করতে বেরোবে তারা। অরুণের নিজের যে আবৃত্তি-সংগঠন আছে 'লোককথা' নামে, তারই প্রযোজনায়।

সংস্থার ঘরের পাশে চায়ের দোকান, সেখানে বসেও কথা হচ্ছিল। কে যেন অনুযোগ করে গেল, "হায়দার কর্মসূচি দিয়া কর্ম করতে আসো নাই...", কে যেন দোকানে বসেই অনায়াসে কথার তোড়ে ব্যবহার করল "লোচনশোভন" শব্দটি। ভাষার এই সাধুগতিতে আমি পুলকিত। বিপ্লবের বাড়িতে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে, ওয়াহিদুলভাইয়ের নেতৃত্বে সদলবলে আরো দুই সাংগীতিক গোষ্ঠীসুখে গা এলিয়ে আমরা বেশ রাত করেই পৌঁছোলাম আজিজুল হক খানের বাড়ি। চওড়া এবং লম্বা মুজিবর সড়ক দিয়ে হাঁটতে ভালোই লাগছিল। আজিজুলের বাড়িতে আরেক প্রস্থ আড্ডা। এবং বলাই বাহুল্য সার্বজনীন ভুরিভোজ। ওঁর চমৎকার লাইব্রেরিতে অনেক বাংলাদেশী বইয়ের খোঁজ পাওয়া গেল। গভীর রাত করে হীরুভাইয়ের বাড়ি আবারও হেঁটে ফিরতে-ফিরতে তুমুল তর্ক। ফরিদপুরের এই যুবকেরা মহা-তার্কিক। দুই রাত্রে কত 'মৌলিক' বিষয় নিয়ে যে তর্ক হল তার শেষ নেই। এবং সে-ব্যাপারে তারা এতটাই সিরিয়স যে সকালের আড্ডার কোনো পয়েন্ট সন্ধেবেলায় তুলে বলে, "সারাদিন ভেবে দেখলাম কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন" কিংবা পরে চিঠিতে লেখে, "না, মানতে পারছি না আপনার কথা"। তারপর অন্তহীন যুক্তি ও আবেগের বিস্তার। আবেগই হয়তো বেশি—তা নিয়ে খোঁটা দিলে আরো ফুঁসে ওঠে। দুষ্টুমি করে বলি, "সত্যি, আমরা একটু শুকনো হয়ে গেছি, ভেজা হলেও আবেগের সত্যটাই হয়তো বড়ো।" দুষ্টুমিতে ওরাও কম যায় না। ঢাকায় এসে বলে যায়, "আমরা বাংলাদেশীরা আবেগের স্রোতে ভাসি—যদি আপনাদের মতো শুদ্ধ যুক্তির মনটা পাওয়া যেত!"

তর্ক বোধহয় লিটাকেও একদিন পেয়ে বসে। এমনিতে বেশ চুপচাপ এই তরুণী। এতদিন মোটামুটি আমাদের নীরব সঙ্গীই ছিল। ঢাকার কোনো সরকারি

অফিসে কাজ করে, কাজের মেয়েদের হোস্টেলে থাকে। হোস্টেলে বহু বিধিনিষেধ। সব মিলিয়ে তার মন যে খুব ভালো নেই বোঝা যায়। একবারই সে কেবল উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ক্রোধে। ঢাকার মেয়েদের অসম্মান ও লাঞ্ছনা নিয়ে সে কথা বলছিল। কথায়-কথায় বুঝলাম এটা নাকি ঢাকার বেশ পুরোনো ব্যাপার। বাসে রাস্তায় বাজারে মেয়েদের ওপর প্রতিবাদহীন অসভ্যতা শুধু মাস্তানদের কাছ থেকে নয়, কখনো-কখনো ছাত্রদের কাছ থেকেও। হতবাক হই। কেউ-কেউ এর পালটা কথাও বলে। তবে সমর্থন আমি ঢাকাতেও আরো অনেকের কাছে পেয়েছি। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা এও জানান : নতুন ছাত্র নতুন যুবসমাজ যারা উঠে আসছে নতুন শিক্ষা নিয়ে, তারাই বদলে দেবে এই পরিবেশ, বদলে দিচ্ছে। পর-পর দু-রাত্রি এই তর্কের ঘোরেই প্রায় বিনিদ্র কাটল।

ঢাকাই আড্ডা

সারাদিন টো-টো করে ঘুরে গেন্ডারিয়ায় হায়াৎ মামুদের বাড়িতে ফিরতাম রাতে। সারাটি দিন হায়াতের টিকিটি পাওয়া যেত না তেমন। মহাব্যস্ত লোক। বিশেষ করে ওঁর মানসসন্তান সাহিত্য-সমবায় প্রকাশন-সংস্থার কারণে একুশের দিনগুলিতে তাঁর পাত্তা পাওয়াই ভার। অনেকগুলি বই তাঁর দায়িত্বে। সারাদিনই প্রুফ দেখছেন, কপি এডিট করছেন, প্রেসে ছুটছেন। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় তো আছেই। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক। অবশ্য আমার তাতে তেমন অসুবিধে ছিল না। ঢাকার রাস্তার জন্য বন্ধুরা তো আছেনই। গেন্ডারিয়াতে হায়াতের বাড়িতেও সঙ্গী হায়াৎ-পুত্র সৌম্য ও হায়াৎ-ভ্রাতা হাফিজুর। মনে হত, এই দুই বুদ্ধিমান ও মিষ্টি-স্বভাব কিশোরের সঙ্গ পেলে আমি আর কিছুই চাই না। তাছাড়া হায়াৎ-পত্নী ফিরোজা বেগম ওরফে খুকুও তাঁর স্কুলে-পড়ানো,. সাংসারিক কাজকর্ম ইত্যাদির ফাঁকে-ফাঁকে আদরযত্নে ঠিক নজর রাখতেন। হায়াতের বোন হাফিজা ও তার স্বামী, হায়াতের পিসিমা, মা-বাবা, অন্যান্য ভাইবোন সকলকে নিয়ে যৌথ-পরিবারের একটা সুর আমাকে মুগ্ধ করে রাখত যতটুকু সময় থাকতাম। অথচ খুব সহজ অনাড়ম্বর একটা ব্যাপার ছিল সকলের আচার-আচরণে। বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের সঙ্গে এভাবে মিশিনি কখনো কোনোদিন—তাই উৎসুক জিজ্ঞাসা ছিল বরাবর। এবার তা চরিতার্থ হল। জানা গেল বাঙালিত্বের শিকড়টা ঠিক কোথায়। কারোর কণ্ঠস্বরেই কোনো অমিল খুঁজে পাইনি। হায়াৎকে পাওয়া যেত রাত্রে। ক্লান্ত অবস্থায় ফিরে আমরা দুজনেই খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়তাম চুটিয়ে আড্ডা দিতে। পাড়াতেই থাকতেন আলমগীর রহমান। 'বিচিত্রা' পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক। ওঁর ছড়ানো ফরাসে

আধশোয়া অবস্থায় গল্পগুজবে প্রায় রাত কাবার হবার জোগাড়। আলমগীর একটু সিনিক মেজাজের—হায়াতের অত উৎসাহের ঝোঁক বোধহয় তেমন পছন্দ হত না। অথচ দুজনের সৌহার্দ্য অটুট। আলমগীর নিজেও যে বন্ধুত্বে দরাজ তা বুঝে নিতে দেরি হয় না। একদিন ওই নৈশ আড্ডায় আবুবকর সিদ্দিকও জুটে যান। ওঁর মুখে রাজশাহীর গল্প শুনতে-শুনতে আমরা বিভোর হই। কিন্তু যতবারই একুশে বা ভাষা-আন্দোলন নিয়ে কথা ওঠে, ততবারই আলমগীর অন্যমনস্ক। কখনো মুখে ফুটে ওঠে অবিশ্বাসের হাসি—শোনান পেছনকার বুজরুকির সত্যটা। সবটাই যে বড়ো গলায় শোনানোর মতো নয়, তা অবশ্য শুধু আলমগীরের নয়, অনেকের মুখ থেকেই বেরিয়ে আসে। প্রত্যাশাটা আন্তরিক ছিল বলেই বোধহয় প্রত্যাশাভঙ্গের অভিমানটাও খুব বেশি। আরো একদিন সবার সঙ্গে বসে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতায় ঢাকা-টিভির প্রোগ্রাম দেখা ও শোনা হল। কথা প্রসঙ্গে উঠল বাংলাদেশের থিয়েটারের আবেগাতিশয্যের কথা, রদ্দি সিনেমার কথা, মুখের ভাষা ও লেখার ভাষার মধ্যকার গোলমালের কথা আবারও। হায়াতের বাড়িতে এসে পড়তেন তাঁর ছাত্র ও অনুরাগী বন্ধুরা। তখন কথা উঠত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র উপন্যাস নিয়ে। ওয়ালীউল্লাহ্কে নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিনা সে-বিষয়ে কথা তুললে বিষণ্ণ হয়ে পড়তেন কেউ। সত্যেন সেনের রচনাবলির নতুন খণ্ড সম্পাদকীয় কৃতিত্বে সগর্বে সামনে মেলে ধরতেন হায়াৎ। কখনো কবিতার কথায় এলোমেলোভাবে এসে যেত বেলাল চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী, আবুল হাসান কিংবা শিহাব সরকারের কথা। বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে স্বল্প-পরিচিতির কারণে বিহ্বল বোধ করতাম—মনে-মনে প্রতিজ্ঞা দানা বাঁধত আত্মসংশোধনের। লজ্জিত হতাম পশ্চিমপারের বাংলা সাহিত্য নিয়ে ওঁদের আগ্রহ ও জ্ঞানের বহরে। এইভাবে বিচিত্র ভাবনার দোলায় ভাসতে-ভাসতে কেটে যেত অনেকটা সময়। যদিও জানি, ঢাকাই আড্ডার বিস্তার ও প্রকৃত চরিত্র বুঝে ওঠার সময় এবার যে-কোনো কারণেই হোক পেলাম না। আড্ডাবাজ হিশেবে এটা আমার মস্ত অনুশোচনা।

তবু, উপলক্ষ যাই হোক, মধ্যরাত্রি না গড়ালে ঘুমের কথাই ওঠে না। তারপর, ঘরে ঢুকতেই, সৌম্য যে মটকা মেরে শুয়েছিল, তড়াং করে উঠে বসে বলে, "কাকু, এবার আমার সঙ্গে আড্ডা!"

শহরের ধুলো

কোনো শহরে হেঁটে-হেঁটে একা ঘোরা আমার প্যাশন। আর ঢাকার মতো সুন্দর, বইয়ে-পড়া কানে-শোনা স্মৃতির শহরে তো কথাই নেই। কিন্তু একা ঘোরার সুযোগ

কমই মিলত—বন্ধু ঠিকই জুটে যেত। অবশ্য সেও কম আনন্দের নয়। আবুবকর সিদ্দিকের সঙ্গে ধানমন্ডি, সায়েন্স ল্যাবরেটরির গেস্ট-হাউস—একদিন গেন্ডারিয়াতেও ফিরলাম রাত্রির পুরোনো ঢাকা মাড়িয়ে। নবাবপুর রোড দিয়ে ফিরেছিলাম প্রথম দিন হায়াতের সঙ্গে, গুলিস্তানে দুজনে দুটি 'ভাপা' পরখ করে। ওয়াহিদুল হকের সঙ্গে প্রেস ক্লাবের আশেপাশে। সৈয়দ শহীদ আমাকে নিয়ে যায় স্টেডিয়ামের বইপাড়ায়, তোপখানা রোড ছেড়ে অবশেষে পুরানা পল্টন ও রমনার রাস্তাঘাটে। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীর মফিদুল হকের কাছেও যাই তারই সৌজন্যে। মফিদুলের তো আমি গুণমুগ্ধ। তাই অল্প কথাবার্তাতেই অন্তরঙ্গতা অনুভব করেছি। ওঁর ডেরাতেই উদীচী কিংবা অন্যান্য প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক উদ্যোগের আঁচ সামান্য হলেও পেয়েছি। দায়বদ্ধ কবিশিল্পী সংগঠকদের নিত্য আনাগোনা সেখানে। সৈয়দ শহীদের সঙ্গে সাবেক ঢাকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত খিলগাঁওতে রাত্রি যাপন করেছি। সৈয়দের কাছে থাকা মানেই ঢাকার অনেকটা জানা—আমাদের নন্দনের সহযাত্রী বলেই সে জানাটা অনেক কাজের হয়। তবে সবচেয়ে উৎসাহী সঙ্গী ছিল মিলন। বরিশালের ছেলে, এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মিলন।

একদিন জোর করেই সবাইকে এড়িয়ে ঘুরছিলাম একা-একা। ঢাকা শহরে 'সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্র' নামের স্টলগুলি বেশ চোখের আরাম। স্টলের বই ও পত্রিকার পাতা উলটিয়ে, রাস্তার মোড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ-হঠাৎ রাস্তা বদল করে এবং মাঝে-মাঝে পকেট থেকে ঢাকার মানচিত্রটা দেখে নিয়ে অনেক সময় কেটে যেত। বুদ্ধদেব বসু বা পরিমল রায়ের পুরানা পল্টন বা রমনা বৃথাই খুঁজছি জানি, এমনকী রণেশ দাশগুপ্ত-র ঢাকাকেও কি পাওয়া যাবে ভাবি। রিকশা করে হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়-এলাকায় ঘুরে আসি। আবার এলোমেলো হাঁটতে-হাঁটতে ভিন্ন পথে পৌঁছোই দিলখুশা বাণিজ্যিক এলাকায়। 'বাণিজ্যিক এলাকা' শব্দটি সারসার সাইনবোর্ডে।

হেঁটে-হেঁটে যখন ক্লান্ত এবং ইচ্ছে করছে কোনো পরিচিত মুখ দেখার, ঠিক তখনই চোখে পড়ে রাস্তার ওপার থেকে মিলন উত্তেজিতভাবে হাত তুলে ডাকছে। বাসে করে যাচ্ছিল, দেখে নেমে পড়েছে।

কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। খেয়ে নেওয়া গেল বলা ঠিক নয়, খেয়ে নিলাম। মিলন 'খায় না'। ওরই নির্দেশে শস্তা একটা হোটেলে রুটি-কাবাব। দামি ও সুস্বাদু হোটেল নাকি একটা কাছেই আছে, খুব ভালো মাছ পাওয়া যায়—কিন্তু ওখানে যাওয়া চলবে না—কারণ ওখানে ব্ল্যাক-মার্কেটিয়াররা খায়—কারণ তা না হলে অত দামে খাবার কী করে কেনা হয়। মিলন এমনিতে খুব শান্তশিষ্ট, কিন্তু গলাতে অসম্ভব জোর। খুব নিচু গলায় চূড়ান্ত কথাটা বলে ফেলে। ফলে প্রশ্ন না করে

ওকে অনুসরণ করাই ভালো। আর তারই ফলে ঢাকার অনেকগুলি দরজা খুলে গেল। নিউ মার্কেটের পাশ দিয়ে ও কোথায়-কোথায় নিয়ে যায়। একবার নীলখেতের পুরোনো বইয়ের দোকানে দোকানিদের সঙ্গে কাজের কথা সেরে নিল। আমাকে বোঝাল কী ধরণের বই বা পত্রিকা পাওয়া যায় এখানে। তারপর সেখান থেকে বইয়ের এ-পাড়া ও-পাড়া। সর্বত্রই পরিচিত সে। এত বইয়ের খবর রাখতে আমি অল্প ছেলেকেই দেখেছি। পশ্চিমবাংলার বইয়ের খবরও তার নখদর্পণে। এবং কী আকুতি সে-সব বই পাওয়ার জন্য! নিউ মার্কেটের পত্রিকার দোকানগুলির সামনে নিয়ে যায়। 'নলেজ হোম' নামের দোকানে অন্তত পঁয়ষট্টিটি সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন দেখে তো আমার চক্ষু স্থির। এতটাই উত্তেজিত যে মিলনের সহায়তায় তাদের নাম লিখে নিই। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, অঙ্গসৌষ্ঠবে বা আত্মসচেতনতার গৌরবে জাঁক করার মতো বেশ কিছু পত্রিকা।

বাংলাবাজার হয়ে, জগন্নাথ কলেজ হয়ে ঘুরতে-ঘুরতে একসময় বুড়িগঙ্গার ধারে সদরঘাটে পৌঁছে যাই। সদর ঘাট থেকে বাদামতলি, বুড়িগঙ্গার দিকে চোখ রেখে। সৌম্যর সঙ্গে, সৈয়দ শহীদের সঙ্গে, বরিশাল যাওয়ার দিন হাফিজুরের সঙ্গে বুড়িগঙ্গায় আসা-যাওয়া ঠিক চলে। বুড়িগঙ্গার এত সৌন্দর্যের কথা কেউ তো বলেনি আমাকে এইভাবে!

কী নতুন ঢাকা, কী পুরোনো, দু-জায়গাতেই দুটি জিনিশ আমাকে অবাক করত— আগে অন্তত তা ভাবিনি। প্রথমত ঢাকার অসাম্প্রদায়িক মেজাজ। অনেকে বলেন, ভালো করে তলিয়ে দেখনি। হতে পারে। মসজিদের জৌলুশ তো এবঙ্গেও বাড়ছে। সেখানেও শুনি তার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের লেনদেনের কথা। ইসলামি ফাউন্ডেশনের দাপট কিন্তু বাংলা একাডেমীর চত্বরে নেই। তারা কুণ্ঠিতভাবেই থাকে। নিশ্চয়ই প্রগতিশীল শিক্ষিত মুসলমান পরিবারে বা ছাত্রশিক্ষককেন্দ্রের হাওয়ায় যা দেখেছি তা পুরো ঢাকা সম্পর্কে সত্য নয়—কিন্তু ঢাকার রাস্তাঘাটে ছেঁড়া হাঁটা হাঁটতে-হাঁটতে সেই টেনশন জোরালোভাবে থাকলে টের পেতাম না এমন অন্তত মনে করি না। ওবায়দুল রহমান যে গলা উঁচু করে বললেন, বাংলাদেশে আর যাই হোক, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আর হবে না, তা কি মিথ্যা স্তোক? সংখ্যাগত দিক থেকে যাই হোক, প্রগতিশীল মুক্তমন আজ গুণগতভাবে এমন বাস্তব চেহারা পেয়েছে বাংলাদেশে, সাময়িক উলটো-পালটা ঝড় সত্ত্বেও সেটাই যে বড়ো হয়ে উঠেছে, টিকে যাচ্ছে, তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

দ্বিতীয় ভাবনা ভাষা নিয়ে। ঢাকা যাবার আগে মনে করেছিলাম, রাস্তাঘাটে আঞ্চলিকতার ধাক্কায় আমার কলকত্তাই কান বিপদগ্রস্ত হবে, আমার কলকাত্তাই

কণ্ঠস্বর ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু সে-অভিজ্ঞতা তো হল না! তবে কি ভাষার ও বাগ্‌ভঙ্গির আঞ্চলিকতা দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে? কলকাতার আশেপাশে এককালের উদ্বাস্তু-কলোনি অঞ্চলে এখনো যে-উপভাষার বা ডায়লেক্টের ছোঁয়া পাওয়া যায়, ঢাকার কথাবার্তায় তার চেয়ে একটুও বেশি আছে বলে মনে হল না। বাংলাদেশেব বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভিন্ন-ভিন্ন উচ্চারণ নিয়ে মানুষ ঢাকায় আসছে বলেই আপনা-আপনি একটা 'গড়' তৈরি হয়ে যাচ্ছে? নাকি টিভি-রেডিও-বই যে শিষ্ট চলতি বুলিকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে, তা কলকাতার বা পশ্চিমবাংলার বুলির সঙ্গে অভিন্ন বলেই, এই পার্থক্য দ্রুত বিলীয়মান? ওয়াহিদুল হক বা বিপ্লব বালা হয়তো খুশিই হবেন এই আঞ্চলিকতার বিলয়ে—বাংলাদেশে নানা স্তরের ভাষা-ব্যবহারের গোলমেলে সহাবস্থানেই বিচলিত তাঁরা। কিন্তু নাটকে বা গানে বা উপন্যাসে বা এমনকী কবিতায় আঞ্চলিকতার চর্চা যাঁরা করতে চাইছেন ওখানেও, তাঁরা কি সাংস্কৃতিক ক্ষতি বলেই মনে করবেন না আঞ্চলিকতার এই নিত্য ক্ষয়ে? ঢাকার আড্ডায় ভাষার এইসব সমস্যার কথা উঠে পড়ে প্রায়ই, কিন্তু সমাধান মেলে না চট করে।

বিদায় ঢাকা

ঢাকায় বসবাসের শেষদিন এসে গেল। বাংলা একাডেমীর কাছে ঘুরঘুর করি, শেষবারের মতো বইমেলায় সময় কাটাই। রফিক আজাদ তাঁর সদ্যপ্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠকবিতা' খুঁজে দিয়ে গেলেন। রোজই বইমেলায় লুব্ধভাবে তাকাতাম বইটির দিকে। রফিকের আমি ভক্ত পাঠক সেই 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' কিংবা 'সশস্ত্র সুন্দর'-এর সময় থেকে। পরের কবিতা এবং গোটা সময়ের কবিতা একসঙ্গে পড়তে পাব ভেবে খুশি হই। মহাদেব সাহা তাঁর সাম্প্রতিকতম 'আমি ছিন্নভিন্ন' পাঠিয়ে দেন সৈয়দ শহীদের হাত দিয়ে। ওঁর সঙ্গে দেখা হল না, ওঁকে জানানো গেল না 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস' বা 'কী সুন্দর অন্ধ' বা 'তোমার পায়ের শব্দ' বইগুলো প্রায়ই আমার টেবিলে ছড়ানো থাকে। আর থাকে আসাদ চৌধুরীর 'তবক দেওয়া পান' বা 'বিত্ত নাই বেসাত নাই' বা 'প্রশ্ন নেই, উত্তরে পাহাড়'। শুনলাম তিনি বিদেশে, তাই দেখা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু শিহাব সরকারের সঙ্গে দেখা হল না কেন? আলাপ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে কলকাতায়। সৈয়দ শামসুল হকের 'বেজান শহরের জন্য কোরাস' পড়েছি—আর কী লিখলেন কবিতার বই জানতে পারলাম না। আবদুল মান্নান সৈয়দের নিজের এবং তাঁর অনুপ্রেরণায় যে অনৈতিক কবিতার ধারা তৈরি হচ্ছে বলে কেউ-কেউ মনে করছেন ওখানে, যে-

কারণেই বোধহয় 'চর্যাপদ' বা 'গাণ্ডীব' গোষ্ঠীরা সবচেয়ে বেশি নাম করেন তাঁর— তাঁকেও দূর থেকে চকিতে দেখলাম একবার। আল মাহমুদের নাম আজ আর কেউ করে না, অন্তত প্রগতিমহলে, বাংলা একাডেমী বা বইমেলাতেও কেউ তাঁকে দেখে না, তবু ঢাকায় ঘুরতে-ঘুরতে কেন তিনি রয়ে যান মনের গোপনে? নির্মলেন্দু গুণ কি হারিয়ে যাচ্ছেন তাঁর বিরতিহীন শব্দস্রোতে? সবচেয়ে জনপ্রিয়, আবৃত্তিধন্য, কিন্তু অতি-প্রজননে কি ক্লান্ত? দীর্ঘকায় এই কবিকে প্রায়ই একা হাঁটতে দেখেছি বইমেলার মাঠে। তবে সবচেয়ে আহ্লাদ হয়েছিল মোহাম্মদ রফিকের চারটি বই— 'খোলা কবিতা', 'কীর্তিনাশা', 'কপিলা' এবং 'গাওদিয়া' বাড়িতে নিয়ে যখন খুলে বসেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম এখন অনেকদিন আক্রান্ত হয়ে থাকতে হবে এই কবির কাছে। কিন্তু তবু শুধু মৌখিক আলাপই হল, তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে কথাও তো হতে পারত!

এইসব ভাবতে-ভাবতে ক্ষুণ্নমনে হেঁটে যাচ্ছি। ওয়াহিদুলভাইয়ের কাছে থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছি আপাতত শেষ-সাক্ষাতের উত্তাপ। এমন সময় বইমেলার সাময়িক-রেস্তোরাঁর টেবিলে সদলবলে এসে বসলেন শামসুর রাহমান। সঙ্গে রশীদ করিম। শামসুরের চেহারা, তাঁর হাসি, বাংলাদেশে তাঁর সাম্প্রতিক ভূমিকার গৌরব, সবমিলিয়ে প্রসন্নতায় মন ভরে যায়। শামসুর সম্পর্কে যে-উপেক্ষায় তরুণতমেরা এখন অভ্যস্ত, সে-বিচারে আমার সায় নেই। শুধু ঐতিহাসিক নয়, বিচিত্র অজস্রতায় ও নিহিত মানবিকতায় তিনি কবিতার দিক থেকেও কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর কবিতার বইয়ের হদিশ রাখাই এখন প্রায় মুশকিল, তবু তাঁর একটি বই যখন বেরোয় বাংলাদেশের কবিতার জগতে সেটা হয়ে ওঠে বড়ো ঘটনা। হাতে-হাতে-পেয়ে যাই এবারের একুশে-তে প্রকাশিত 'স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার'। কথায়-কথায় গল্প জমে ওঠে। এ-বাংলার ও-বাংলার সাহিত্যিক খবরের বিনিময় ঘটতে থাকে। দু-পাশে বন্ধুরা ভিড় করেন। যেন ক্রমেই একটা তাৎক্ষণিক সাহিত্যবাসর।

শেষদিনে সন্‌জীদা খাতুনের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আলাপ ছিল না। কিন্তু মনে-মনে তিনি ছিলেন। শুধু তো গায়িকা নন, বাংলাদেশে রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতির পক্ষে লড়াকু সৈনিক। যে-সংস্কৃতি বাংলাদেশে আরো জরুরি। একুশে উপলক্ষে ঢাকায় এসে ওঁর সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যাব? সন্‌জীদাকে যেন বিষণ্ণ মনে হল। বাংলাদশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তাই কি তাঁকে এই একুশের দীপ্র দিনগুলিতেও স্বস্তি দিচ্ছে না? যেন কোনো অনিশ্চয়তা ছুঁয়ে আছে তাঁকে। ওঁর সঙ্গে কথা বেশি হওয়ার সময় ছিল না।

বুড়িগঙ্গায় লঞ্চের ভোঁ বাজল বলে।

নদীপথে

বুড়িগঙ্গায় 'মাসুদ খান' লঞ্চটি ভাসছে। একটু বাদেই ছাড়বে। লঞ্চ থেকে বুড়িগঙ্গা আশ্চর্য সুন্দর। বিকেলের মেঘাচ্ছন্ন আলোয় জল নরম এবং ঘোলা। কত বিচিত্র গড়নের ছোটোবড়ো নৌকো পারাপার করছে, চলে যাচ্ছে এদিক বা ওদিক। কোনোটা মালভর্তি, কোনোটায় যাত্রী। কোথাও একজনের হাতে বৈঠা, কোথাও পাঁচ-সাত-দশজন। ভিন্ন-ভিন্ন গতিতে অবিরল যাওয়া-আসা ভিন্ন-ভিন্ন দিকে। সমস্ত নদীটাই যেন ভরে আছে নানা রঙের নানা ঢঙের নৌকোয়। তাদের বৈচিত্র্য এবং গতি একসঙ্গে কীরকম জাদু করে ফেলছে মনকে। এই সময়ে আছি বলেই মনে হচ্ছে না। চলে গিয়েছি পিটার ব্রুখেল-এর ছবির জগতে। সেরকমই অবাস্তব এবং বড়ো বেশি বাস্তব।

লঞ্চ একসময় ছেড়ে দেয়। ওপারের ইটখোলা বাড়িঘর জমি এবং এপারের পুরোনো ঢাকার ইমারত দেখতে-দেখতে পার হয়ে যাই। বিচিত্র-সঙ্গী নৌকোগুলোও ক্রমশ বিরল। বুড়িগঙ্গা থেকে শীতলক্ষা। নারায়ণগঞ্জ পৌঁছোতে-পৌঁছোতেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। মুনশিগঞ্জে যখন, তখন তো সন্ধেই। মেঘনায় এসে পৌঁছোই বেশ রাতে। আপশোস রয়ে যায়, চাঁদপুর দেখতে পাচ্ছি, নদীর ধারের তীব্র আলোয়—অথচ পদ্মা ও মেঘনাকে পাশাপাশি দেখলাম না দিনের আলোয়। রাত্রির অন্ধকারেও এর বিশালত্ব ঠাহর করতে ভুল হয় না। সারারাত জেগে বসে থাকি নদী, নদীর বাঁক, তীরের ভুতুড়ে জঙ্গল বা লোকালয়ের ক্ষীণ আভাস, আলোকিত স্টিমারঘাট—এসবের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। বাতাস এসে জুড়িয়ে দিচ্ছে শরীর। রাত তিনটে নাগাদ সারেঙ্গের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বলল, প্রথমে বুড়িগঙ্গা, তারপর ধলেশ্বরী, তারপর মেঘনা। এখন সেই মেঘনা দিয়েই চলেছি। কীরকম নামের হিশেবে গোলমাল হয়ে যায়। সারারাত ধরে কোন নদী দিয়ে কোন নদীতে পড়ল সে ব্যাপারে সারেঙ্গরাও যেন অস্পষ্ট।

শেষরাতে পাঁচটা নাগাদ চরমোনাইতে লঞ্চ থামল। থামার কথা নয়। কে একজন পীর আছে এখানে। হুড়মুড় করে অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান লঞ্চ খালি করে দিয়ে কর্দমাক্ত চরে নেমে গেল। ওই নিস্তব্ধতায় ধু-ধু চর, লণ্ঠনের আলো নাচানাচি করছে, সেই আলো ফেলে-ফেলে সার দিয়ে তারা চলে যায় ভেতরে। ওই নির্জনতার মধ্যে তাঁদের হাঁকডাক কীরকম মৃদু গুঞ্জনের মতো শোনায়। সারেঙ্গের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, নদীর নাম কিত্তনখোলা। বরিশাল শহরও তো কিত্তনখোলারই ধারে। তবে তো এসে গেছি! ধড়মড় করে উঠে বসি।

বরিশালের ঘাটে লঞ্চ যখন পৌঁছোল তখনও অন্ধকার। ঘাটে নেমে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতেই সকাল হয়। বদিউর রহমান হাজির। মফিদুল হক ঢাকা থেকে ফোন করে দিয়েছিলেন। এ হল 'উদীচী'-র কানাকানি।

উদীচী-র বরিশাল

উদীচী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো সাংস্কৃতিক সংগঠন, প্রগতিশীল ভাবনায় ও কর্মে নিয়োজিত। সারা বাংলাদেশ ছড়িয়ে অজস্র-এর শাখা। অনেকটা একসময়ের ভারতীয় গণনাট্য সংঘ যেমন। 'একসময়ের' বলছি, কারণ এর পেছনের যে-প্রেরণা সেই কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশে অখণ্ড। মফিদুল হক যেমন ঢাকার উদীচী-র একজন অগ্রণী কর্মী, বদিউর রহমান বরিশাল উদীচী-র। সাংগঠনিকভাবে বলতে গেলে, উদীচী-র বরিশাল শাখার সভাপতি। তা ছাড়া বরিশালের প্রগতিশীল সমস্ত কর্মকাণ্ডেরই তিনি উদ্যোগী পুরুষ। বরিশাল শহরেই হাতেম আলী কলেজে বাংলার অধ্যাপক। মফিদুল হক যে ঠিক লোকের কাছেই আমাকে সঁপে দিয়েছেন, তা বুঝলাম ওঁর সহাস্য মুখে হাত-বাড়ানো দেখেই।

বদিউর আমাকে প্রথম নিয়ে তুললেন ডাকবাংলোয়। পরে এ নিয়ে অবশ্য তাঁর খেদের অন্ত ছিল না। কী করে বুঝবেন ওঁর বাড়িতে উঠতে রাজি হব কিনা, তখনো তো আলাপ হয়নি, ইত্যাদি। পরে অবশ্য মুসলমান গোরস্তান রোডে ওঁর বাড়িই আমার আস্তানা হয়েছিল। বদিউরের সঙ্গে শহর দেখতে বেরোই। ওঁর বাড়ির কাছেই জীবনানন্দ দাশের 'সর্বানন্দ ভবন'। বলা বাহুল্য, ব্রজমোহন কলেজও আমাদের কাছে একটা দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া সদর রাস্তা, চক, ভাঙাচোরা বাড়িতে প্রেস ক্লাব ইত্যাদি। বরিশাল তো খুবই ছোটো, ওঁরা মনে করেন 'উপেক্ষিত' শহর। সেই উপেক্ষার প্রতিবাদ পোস্টারে বা দেয়াল-লিখনে। বেশির ভাগই টিনের দোতলা বাড়ি। পাকাবাড়িগুলোও মফস্বলের সাবেক-ধাঁচের। উঁচু-উঁচু দেউড়ি। আধুনিক যুগের ছোঁয়া মাত্র নেই। অন্তত আমাদের রাস্তায় পড়েনি। তবে, একটা দিকে বরিশালের জিত, আকাশ গাছে-গাছে ছাওয়া, প্রধানত নারকেল-গাছে। বদিউর এরই মধ্যে আমাকে নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে এলেন। দেখা গেল, পিঠে-নারকেলের অতিথিসেবা এখনো চালু। কিন্তু যেটা এখন কিংবদন্তি তা হল 'মাছ'। মাঝখানে বাজারটাও ঘুরে আসা গেল। এরকম প্রায় মাছহীন মাছের বাজার কম দেখেছি। ঢাকাতেই দেখেছিলাম, আমরা যে এখনো বলি মাছের দেশ হল পূর্ববঙ্গ, তা শুনে ওরা হাসে। নতুন প্রজন্মের কাছে ঢাকার পিতাই বরং গল্প করে, "চল্, মাছ খাওয়াতে নিয়ে যাব কলকাতায়!" এখানে এসে মনে হল, বরিশালের পক্ষে সেটা

আরো নিষ্ঠুর সত্য। হঠাৎ-হঠাৎ ছেয়ে যায় ইলিশ মাছে। অতিথির জন্য কষ্ট করে জোগাড়ও করে অসময়ে। কিন্তু বদিউর যেমন বললেন, মেহমান বাড়িতে এলে এখন মাংসটাই আমাদের পরিত্রাণ।

কালীবাড়ি রোডে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর বরিশাল শাখার দপ্তর। টিনের ঘরের দোতলায়, বাইরে দিয়ে সিঁড়ি। 'বরিশাল নাটক' উদীচী-র সহোদর সংগঠন। সেখানেই আলাপ হল অনেকের সঙ্গে—উদীচী-র সম্পাদক অনুতোষ ঘোষ, উপদেষ্টা নিখিল সেনগুপ্ত, নাট্যকর্মী মুরাদ আহমেদ তো ছিলেনই। বরিশাল শহর হিশেবে ছোটো হলে কী হবে, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে বরাবরই উজ্জ্বল। এখনো তাই। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সদস্য চারটি নাট্যদল এখানে। অন্তত ছটি পত্রিকা। ছটি সংগীত-প্রতিষ্ঠান। আছে 'নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন পরিষদ', সংক্ষেপে ওঁরা বলেন 'নিনামপ'—তাদের কাজ : টাউন হলে সব নাট্যসংগঠনদের নিয়ে পনেরো দিন পর-পর অভিনয়ের ব্যবস্থা। উদীচী এর মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় এবং বড়ো। উদীচী ও বরিশাল নাটকের প্রযোজনায় মুকুন্দ দাসের গানের যে ক্যাসেট-রেকর্ডটি ওঁরা করেছেন তাও উপহার দিলেন।

উদীচী-র ঘরে বিরাট দুটি ছবি টাঙানো। একটি সত্যেন সেনের, আরেকটি মনোরমা মাসিমা, অর্থাৎ মনোরমা বসু-র। সত্যেন সেন লেখক, সংগঠক, উদীচী-র প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ছবি তো থাকবেই। বাংলাদেশে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী 'সত্যেন সেন রচনা-সমগ্র' বের করছেন খণ্ডে-খণ্ডে এবং তার সম্পাদকমণ্ডলীতে যেমন হায়াৎ ও মফিদুল আছেন, তেমনি বদিউরও। আর মনোরমা বসু বরিশালের মেয়ে, ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা-আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম, বিশেষ করে নারীমুক্তি ও প্রগতির পক্ষে লড়াইয়ে বড়ো যোদ্ধা ছিলেন তিনি। বরিশালের প্রগতিমনা মানুষের মুখে-মুখে তাঁর নাম।

ঢাকায় যেমন ছিল 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মোর্চা', বরিশালেও তেমনি 'সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদ'। তারাই উনিশটি সংগঠনকে জড়িয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করে। এবারে কীভাবে একুশে পালিত হল তা নিয়ে উদীচীর ঘরে সমস্বরে অনেকেই খবর দিচ্ছিলেন। প্রভাতফেরি, কবিতা পড়া, গান, নাটক সবকিছুই ছিল। সেদিনও টেপরেকর্ডারে বাজানো হচ্ছিল মুজিবের কণ্ঠস্বর, আন্দোলনের দিনগুলির সেই বিখ্যাত ভাষণ। বরিশালের উদীচী 'একুশে' যেমন উদ্‌যাপন করে, ঠিক তেমনি একই উৎসাহে তাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় 'পয়লা বৈশাখের মেলা'। অবশ্য, শুধু বরিশালে নয়, সারা বাংলাদেশেই দুটি ধর্মনিরপেক্ষ অনুষ্ঠান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে—একুশে ফেব্রুয়ারি এবং পয়লা বৈশাখ। বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলন ও

প্রগতি-আন্দোলনের এটা একটা বড়ো দান। নিখিল সেনগুপ্ত-র সঙ্গে আলাপ গাঢ়তর হল উদীচী-র আভ্রতেই। বরিশালের সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় এবং দীর্ঘদিনের। থাকেন ঝাউতলা রোডে। ওঁর বাড়িতেও অনেকটা সময় কেটেছে আমার। খাওয়া-দাওয়া তো বটেই। 'বরিশাল নাটক'-এর যে আবৃত্তি-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তার পরিচালক তিনি। নিজের বয়স হয়েছে, শরীরেও নানা আধিব্যাধি, কিন্তু অদম্য তাঁর উৎসাহ। বাড়িতে অল্পই থাকেন, সঙ্গী তাঁর শিশুকিশোর থেকে শুরু করে পরিণত যুবকেরা। তাঁদের নিয়ে তাঁর সবসময় চিন্তা—কী নাটক করবেন, কাকে কী আবৃত্তি শেখাবেন। রুবানা আফরোজ শিল্পী, অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়া ছোটো মেয়েটি আমাদের আবৃত্তি করে শোনাল শামসুর রাহমানের কবিতা, সেও নিখিলবাবুরই প্রশিক্ষণে। নিখিলবাবু অনেক দেখেছেন, শুনেছেন। তাই সহজ আশাবাদে গা ভাসাতে রাজি নন। সাম্প্রদায়িকতামুক্ত প্রগতির প্রতিষ্ঠা এখনো দূরাগত বলেই তিনি মনে করেন। তবে সে-প্রতিষ্ঠা যে ঘটবেই তাও তিনি মর্মে-মর্মে জানেন। হঠাৎ একটু সন্দেহগ্রস্ত বলে তাঁকে মনে হতে পারে, কিন্তু ঠিকভাবে দেখলে সে-ভুল ভেঙে যাবেই।

উদীচী-র ঘরেই আলাপ হল বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বরিশাল জেলার সম্পাদক নুরুল ইসলাম মুন্‌শী-র সঙ্গে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অ্যাডভোকেট। এই চমকহীন বৃদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে হাত মেলালেই বোঝা যায় কী বিপুল অভিজ্ঞতায় ভর করে তিনি এসেছেন। নুরুল ইসলামই শুধু নয়, নবীন কমিউনিস্টদের কয়েকজনকেও কাছে পেয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে মনে পড়ে ঝালকাটির তরুণ কমিউনিস্ট-কর্মী এম এ জলিলের কথা। বরিশাল শহরে তখন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন/বরিশাল শাখার সম্মেলন চলছিল। সেই উপলক্ষে ডাকবাংলোয়, পথেঘাটে, উদীচীর ঘরে অনেক ছাত্রকর্মীর মুখোমুখি হচ্ছিলাম। ডাকবাংলোয় প্রথম রাত্রিবাসের দিন আমার সহ-আবাসিক ছিলেন জলিল। একসময়ের বরিশালের ছাত্রনেতা—সেই সুবাদেই ছাত্রসম্মেলনে এসেছেন। ইতিহাসে এম-এ, আইনে স্নাতক, বয়সে নবীন, এখন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। তাঁর কাছ থেকে দেশ ও রাজনীতির অনেক প্রত্যয়সিদ্ধ উচ্চাশার কথা শোনা গেল। জানা একটা কথা ভারী সুন্দর করে বলেছিলেন জলিল, বাংলাদেশে সাম্যবাদী চিন্তার বিস্তার বিষয়ে। বহুকাল এই চিন্তার ধারক ছিলেন প্রধানত হিন্দুসন্তান বা তথাকথিত হিন্দুঘরের মানুষজন। এখন, স্বভাবতই, যা কিছু হচ্ছে-হবে তা নতুন আত্মসচেতন মুসলমান-সমাজকে কেন্দ্র করে। এ শুধু রাজনীতিতে নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও। 'হিন্দু'দের' যে ভূমিকা ছিল আবহমান পূর্ববঙ্গে, তা আজ অবান্তর হয়ে গেছে সংখ্যাগত কারণেই—বেরিয়ে এসেছে নতুন প্রগতিচিন্তায় দীক্ষিত

মুসলমানেরা। জলিল সেই প্রজন্মেরই একজন। কৌতুক করে তিনি গল্প করেন, মা-বাবাদের এখনকার খেদোক্তি : কেন তাদের মাদ্রাসা ছাড়িয়ে 'বাংলা' স্কুলে পড়ানো হল! "কী ভুলই করেছি!"

ইচ্ছে ছিল খুব বরিশালের আশেপাশে ঘোরার। নিখিলবাবু শুনেই চটপট ব্যবস্থা করে ফেললেন। দ্বিতীয় দিন সকালে ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল। নথুল্লাবাদ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রিকশায়। নথুল্লাবাদের পাশ দিয়ে যে সরু খালটি কিত্তনখোলা থেকে বেরিয়ে বরিশালের গ্রাম-গ্রামান্তরের ভেতরে চলে গেছে, তার ধারে কিছুক্ষণ বসি। গাছগাছালি নুয়ে পড়েছে খালের ওপর। ছোটো ডিঙি নৌকো একটি লগি ঠেলে-ঠেলে ভেসে চলেছে। বড়ো-বড়ো গাছের পাতা নৌকোর আরোহিণী লালশাড়ি-পরা মেয়েটিকে স্পর্শ করছে। মনে হয় পূর্ববঙ্গের যেন একটি চিরন্তন ছবি চেনা হয়ে গেল। বাস-স্ট্যান্ডেরই অদূরে মুকুন্দ দাসের কালীমন্দির। তাঁর স্মৃতিতে মেলাও চালু করেছে নাকি উদীচী। বানরিপাড়ার বাসে করে একটু এগোতেই গৌরী রায়ের দিঘির মোড়। নিখিলবাবু চেনাতে-চেনাতে যান। এসব জায়গার প্রতিটি মাটির ডেলার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। লোকে যাকে সংক্ষেপ করে নিয়ে বলে গেরিরায়ের দিঘি, সেখান থেকে রাস্তা চলে গেছে দু-পাশে। ডানদিকের পথ দোয়ারিকা নদী পার হয়ে শিকারপুর এবং আরো অনেক-অনেক পরে পালং হয়ে ফরিদপুর। বাঁ দিকের পথ দিয়ে আমাদের বাস চলতে থাকে। প্রথমে কলসগ্রাম, নিখিলবাবুর স্বদেশ—এখানকার মাটির টান, পঞ্চাশের দাঙ্গা, মানুষের সাহসিকতা ও ভীরুতার অনেক গল্প শোনালেন তিনি। কলসগ্রাম পার হয়ে মাধবপাশা। মাধাবপাশাতেই নেমে পড়লাম আমরা। ডান দিকে মোচড় দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে দেহের গতি ও বানরিপাড়ার দিকে। মাধবপাশায় দুর্গাসাগরের পাশে কয়েকটি ঘণ্টা কেটে গেল। নির্জন প্রকৃতি। দিঘির জল বেশি নেই, মাঝখানে দ্বীপ, চারপাশে সবুজ। আরেক দিকে কিছুটা নীচে মাধবপাশার স্কুল। দিঘির আশেপাশে হালকা বসতি। ভাটফুলের জঙ্গল। নিখিলবাবুর গলায় দুর্গাসাগরের পৌরাণিক কিংবদন্তিও একসময় থেমে যায়। শুধুই নিস্তব্ধতা অনুভব করতে থাকি আমরা দুজনে। যতক্ষণ না, পর্যন্ত ঝড় তুলে ফেরার বাস আসে। বেলা করে ফিরে উদীচী-র কর্মিণী পুষ্প চক্রবর্তীর কাছে অপ্রতিভ। অনেক খাবার রেঁধেবেড়ে তিনি বসে আছেন আমাদের জন্য। ওঁর সহাস্য মুখ আমাদের অপরাধমুক্ত করল। খাওয়া-দাওয়ার পর বরিশালের সাংস্কৃতিক খবরাখবর নিয়ে আরেক প্রস্থ আড্ডা। নিখিলবাবু তো ছিলেনই, প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীরাও কেউ-কেউ। পুষ্প বললেন, "বরিশালের একুশে দেখতে এলেন না তো, ঢাকা-ই শুধু আপনাদের চোখে পড়ে। একুশে আমরাও পালন করি প্রাণভরে।"

আমাকে সামান্য অপ্রতিভ দেখেই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলেন, "আসবেন আবার। সবাইকে নিয়ে আসবেন।"

সন্ধেবেলায় উদীচী-র ঘরে অনুতোষবাবু একটা আসর বসিয়ে দিলেন। বদিউর তার আগে ঘুরিয়ে আনলেন বরিশালের বইপাড়া থেকে। এখানেও, ঢাকার মতোই, প্রায় সব দোকানেই কিছু-কিছু কবিতার বই যেন থাকবেই। বদিউরের পক্ষপাত ওমর আলীর কবিতায়—একখণ্ড কিনে উপহার দেন। ইতিমধ্যে উদীচী-র ঘর ভর্তি। সবাইকে খবর পাঠানো হয়েছে : মেহমান এসেছেন। কেউ ফটো তোলেন। কেউ হাত জড়িয়ে বলেন, "কালকেই ফিরছেন? নদীপথে?" গলা উঁচিয়ে কেউ তারিফ জানান, "খুব ভালো করেছেন। দেখবেন খুব ভালো লাগবে। জানেন তো পথেই পড়ে জীবনানন্দের ধানসিঁড়ি। খেয়াল রাখবেন।" কে-একজন বিড়বিড় করে হিশেব করেন কোন-কোন নদী বা খাল পড়বে পথে : কিত্তনখোলা, গাবখান, কচা, বলেশ্বর...বলতে-বলতে মিলিয়ে যায় কণ্ঠস্বর, ভৈরব বা রূপসা পর্যন্ত আর পৌঁছোয় না। খুরসেদ আলম খুব পড়ুয়া ছেলে, সে অতুলচন্দ্র গুপ্ত-র 'নদীপথে' পড়েছে। বলে, "ঝালকাটি কাউখালি হুলারহাট এসবের কথা তো শুনছেন। ভেতরে-ভেতরে সেসব জায়গা একেবারে বদলে গেছে, বাইরে কিন্তু মনে হবে এক। শুধু স্টিমারঘাটের প্ল্যাটফরমের নীচের পাড়ে দেখবেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির দেয়াল-লিখন, তখনই বুঝবেন নতুন জমানা এসে গেছে।" অনুতোষবাবু হাঁকডাক করে এই জমায়েতকে একটা 'সভা' বানিয়ে ফেলতে চান। সভার বদলে অবশেষে শুরু হল প্রশ্নোত্তর। দুই দেশের প্রগতি-সংস্কৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতার বিনিময়। উদীচী-র অনেক সভ্যদের গলাতেই ভাষা-আন্দোলন বা একুশে নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল সামান্য অহংকার, সেটা আমার কানে একটুও বেসুরো বা অসংগত ঠেকেনি। কারণ পাশাপাশি ছিল আত্মসমালোচনা বা আত্ম-অসন্তুষ্টিও। তার চেয়েও বেশি ছিল পশ্চিমের বাংলা নিয়ে জিজ্ঞাসা ও প্রত্যাশা। 'সভা' ভাঙতে রাত হয়ে যায়। কেউ আর যেন উঠতে চান না। পরদিন অন্ধকার থাকতে-থাকতে বদিউর রহমান আমাকে নিয়ে স্টিমার-ঘাটে। ঘুমন্ত বরিশাল শহরের উপর দিয়ে রিকশা করে যেতে-যেতে ছোটো-বড়ো অসংখ্য শহিদ-মিনারের পরিচিত স্থাপত্য ঝাপসা চোখে পড়ে। অবশেষে টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে কিত্তনখোলা এবং প্ল্যাটফরম-জোড়া অতিকায় স্টিমার। 'গাজী' স্টিমার শুধু বাইরে থেকে নয়, ভেতরেও বেশ জমকালো। কেবিনের টিকিট মেলেনি, বদিউরের তৎপরতায় স্টিমারের 'মাস্টারে'র কেবিনটিই 'ভাড়া' পাওয়া গেল এবং ফার্স্টক্লাসের ডেক যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুমতি। শেষেরটাই দরকার ছিল। ডেকের চেয়ারে বসে বদিউরকে হাত নাড়লাম। আবার দেখা হবে, বদিউর ভারতে-পশ্চিমবঙ্গে কিংবা আমি, কবে কে জানে, বাংলাদেশে।

একুশের অতিথি

নদীর দিকে চোখ রেখে বসে আছি ডেকে। হঠাৎ পেছন থেকে নাম ধরে কে ডাকল শুনে চমকে উঠি। এখানে কে চেনা থাকতে পারে? আবিষ্কার করি ঢাকার 'ইত্তেফাক' পত্রিকার শাহীন রেজা নুর এই স্টিমারেই। সস্ত্রীক বেড়াতে যাচ্ছেন খুলনায়। নদীপথটাই আসল—নবপরিণীতা স্ত্রীকে দেখানো। এই শাহীনই ঢাকায় বাংলা একাডেমীর বইমেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের নিয়ে শখের স্টল দিয়েছিলেন। খাবারের স্টল। একদিন বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে ওখানে খাবার খেতে গিয়ে অপদস্থ। কী করে যেন টের পেয়ে গেলেন আমি কলকাতা থেকে এসেছি। তারপর থেকে কিছুতেই দাম নিতে চান না। বন্ধুরা বলেন, "তা আমরা তো কলকাতা থেকে আসিনি, আমরা তো বাংলাদেশেরই...।" কিন্তু কে কার কথা শোনে, শাহীন কারোর দামই নেবেন না। এর পর থেকে বইমেলায় যতদিন গেছি, সন্তর্পণে এড়াতে চেয়েছি ওই স্টল—শাহীন কিন্তু চোখে পড়া মাত্র ধরে-বেঁধে বসিয়েছেন। সেই শাহীন! সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ পা ছড়িয়ে বসে আড্ডা, এখানেও। মনে পড়ে গেল, বন্ধুরা ঢাকাতেই জানিয়েছিলেন, একাত্তরের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় যাঁদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে খুন করা হয়েছে শাহীনের বাবা তাঁদের একজন। কথায়-কথায় শাহীনও বললেন, "বাবার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। যে-দেহকে বাবার বলা হয়েছিল তার সঙ্গে অনেক কিছুই মেলেনি। তবে বাবাও আর ফেরেননি।" সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়। একটু কেবিনে গিয়েছি গা এলাতে। বাটলার এসে বলল, "খাবার কখন দেব?" আমি অবাক। অর্ডার তো দিইনি এখনো। বাটলার সবিনয়ে জানাল, "সাত-নম্বর অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন।" গিয়ে দেখি সাত-নম্বর কেবিনেই শাহীন। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই বললেন, "দাদা, এখনো তো বাংলাদেশেই আছেন আমাদের অতিথি! একুশের অতিথি!"

খুলনায় পৌঁছোতে-পৌঁছোতে বেশ রাত।

রচনাকাল : ১৯৮৭

ঢাকা থেকে ফিরে, এখন

শেষ গিয়েছিলাম ১৯৮৯-এ। চার বছর পরে এই আবার। মনেই হয় না। বাংলাদেশের বন্ধুবান্ধব, চিঠিপত্র, বইকাগজ এত ঘিরে রেখেছিল যে টেরই পাইনি সময়ের এই ব্যবধান।

মনে-মনে যেন জানতামই কী কী ঘটবে। বন্ধুদের আপ্যায়ন, রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরা, হেঁটে বা রিকশায়, হঠাৎ-হঠাৎ বন্ধুদের সঙ্গী করে বাইরে চলে যাওয়া, তা ছাড়া ঘরে-ঘরে দাওয়াত তো আছেই। বন্ধুত্বের কাড়াকাড়ি। নানা বয়সের বন্ধুদের ভালোবাসায় পাগল হবার জোগাড়।

এবার অবশ্য সময়টা একটু আলাদা। দুটো বড়ো ঘটনা ঘটে গেছে। এরশাদের পতন এবং নির্বাচন। আর ৬ ডিসেম্বর হিন্দু করসেবকদের হাতে বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে ভেঙে যাওয়া। যে-দেশের অধিবাসীরা অধিকাংশই মুসলমান সেখানে তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা আন্দাজ করাই যায়। মনে-মনে তাই প্রস্তুত হয়েই ছিলাম।

ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে যখন শহরে ঢুকছি তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলাম আলাদা কিছু চোখে পড়ে কিনা। রাস্তাঘাটে যেন ভিড় বেড়েছে, এয়ারপোর্ট থেকে শহর অবধি যে ফাঁকা জায়গাগুলো তা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আরো আলো, আরো জৌলুশ, আরো উজ্জ্বল দোকান। কিন্তু তা ছাড়া এ তো আমার পরিচিত ঢাকা-ই। বন্ধুদের উচ্ছ্বাসে কোনো বদল নেই। রাতভর আড্ডায় কোনো খামতি নেই। খাওয়ার স্বাদ একটুও পালটায়নি।

১৯৮৯-এ এসেছিলাম একুশে ফেব্রুয়ারিকে উপলক্ষ করে। তার আগে ১৯৮৭-তেও সেই একুশে। এবারও তাই। একুশকে ছাড়াতে পারছি না কিছুতেই। বোধহয় একুশের সময় যে-রঙ লাগে বাংলাদেশে তারই টান। শুধু মানুষজনের মধ্যেই তো নয়, প্রকৃতিতেও। ফাল্গুন-চৈত্রের টান। শীতের জড়োসড়ো কাটিয়ে বাংলার প্রাকৃতিক স্বভাব যখন প্রথম জানান দেয়।

প্রথমেই ছুটে যাই তাই বাংলা একাডেমীর বইমেলায়। কলকাতার বইমেলার সদ্য-অভিজ্ঞতার পর ঢাকার ছোটো বইমেলা খুব অন্তরঙ্গ লাগত। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলবার জায়গা। অন্য মুখচোখ, অন্য কণ্ঠস্বর, পায়ে চলার অন্য ছন্দ। এবার

দেখি মেলা উপচে পড়েছে রাস্তায়। পুকুরকে ঘিরে যে-মাঠ সেখানে হয়তো চেনা আদলটা আছে। কিন্তু ঢুকবার আগেই চওড়া রাস্তা জুড়ে বইয়ের দোকানের সঙ্গে খেলনা বাসন বা খাবারের দোকান। ছেঁড়া ভিড়। মফস্বলি মেলার ভিড়। কেমন ছন্নছাড়া। ভেতরের ভিড়েরও কোনো চরিত্র নেই। অন্যবারে যে শ্রী দেখেছি এবার তা অনুপস্থিত. শুনলাম, হঠাৎ নয়, কয়েক বছর ধরেই ধীরে-ধীরে এই দাঁড়িয়েছে। মনটা একটু দমে গেল। আগের সেই আরাম খুঁজে পেলাম না।

মন দমে যাওয়ার কারণ আরো হাজির হল একে-একে।

অন্যান্যবার সারা এলাকা জুড়ে—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শহিদ-মিনার, ছাত্রশিক্ষক-কেন্দ্র, বাংলা একাডেমী—শুধু উৎসব নয়, একটা ব্রত উদ্‌যাপনের ভাব দেখি। ১৯৮৭-তে আমার বন্ধুরা বলেন, "এ আর কী দেখছ! আমরা তো ক্ষয়ে যাওয়াটাই টের পাচ্ছি।" খুব স্বাভাবিক, একই রকম উদ্দীপনা বরাবর থাকার কথা তো নয়। তবু নতুন চোখে যা দেখেছি তাতেই মুগ্ধ। অনেকেরই কথায় এবং শরীরে প্রত্যয় ও প্রতিবাদের রোখ। এবার ছেলেমেয়েদের চোখেমুখে তো তা দেখছি না। না কি আমার চোখটাই পুরোনো হয়ে গেল! ছাত্রশিক্ষক-কেন্দ্রে এখনো ভিড়। কিন্তু এ যেন শুধুই ভাব-মোলাকাতের জায়গা। তরুণতরুণীদের অস্তিত্বে আগের সেই চেনা ভাষা খুঁজে পাই না। সেবারে দেখেছি টি-এস-সি-র কোণে-কোণে, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে পথনাটিকা, দলবদ্ধ আবৃত্তি, সম্মেলক গান। কোথায় সে-সব? ২০ ফেব্রুয়ারির রাত্রে ঘুরতে-ঘুরতে দেখি রাস্তায় আলপনা এখনো দেওয়া হচ্ছে, দেয়ালে লিখন, মধ্যরাত্রি পার হতেই ফুল হাতে নিয়ে একুশে গাইতে-গাইতে মিছিল। কিন্তু সেই প্রাণবন্ত উত্তেজনা কোথায়? সবই যেন এখন নিয়মরক্ষা, প্রথা।

দিনকতক কেটে যেতেই বদলটা আরো টের পাওয়া গেল। বন্ধুদের কথাবার্তায় ভাব-ভঙ্গিতে বারবার হানা দিচ্ছে নৈরাশ্য। যে-বন্ধুরা লেখালেখি বা প্রকাশনা নিয়ে ব্যস্ত, তাঁরা জানালেন : মেলায় ভিড়, কিন্তু বইকেনার লোক কই? ভালো বই বেরোচ্ছে না তা হয়তো নয়, কিন্তু কিছু শস্তা গল্প-উপন্যাস ছাড়া অন্য কোনো বই নিয়ে কথা হচ্ছে না। এমনকী সাম্প্রতিক সমস্যা নিয়ে, দাঙ্গা নিয়ে, স্বদেশভাবনা নিয়ে ছোটোবড়ো যে-সব লেখালেখি চলছে সে-বিষয়েও কোনো আগ্রহ নাকি টের পাওয়া যাচ্ছে না। যে-বন্ধুরা রবীন্দ্রসংগীত থেকে শুরু করে নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মে নিয়োজিত, তাঁরা রুটিন-মাফিক কাজ হয়তো করে যাচ্ছেন, কিন্তু কোনো লক্ষ্য আছে বলে বোধ হচ্ছে না। যাঁরা রাজনৈতিক বা সামাজিক কাজে বা ভাবনায় জড়িত, তাঁদের মধ্যেও আগের সেই উৎসাহ নেই। বছর চারেক আগে তো এরকম মনে হয়নি। আগেই বলেছি, তখনো ওখানকার বন্ধুরা ক্ষয়ের কথা বলতেন।

নিশ্চয় সত্যি কথাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী আমি ভাষা নিয়ে, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত চেতনা নিয়ে, বাঙালিয়ানার মার্জিত চর্চা নিয়ে যে-আলোড়ন দেখেছি তাতেই শ্রদ্ধাশীল হয়েছি। সীমাবদ্ধতা তখনো জানতাম না তা নয়। আমার অভিজ্ঞতার বাইরে দেশব্যাপী অন্ধকারের কথাও ভুলিনি। কিন্তু যে কর্মময় ও প্রতিবাদী অংশটুকু দেখেছিলাম তার শুদ্ধতা ও সজীবতা আমাকে স্পর্শ করেছিল।

ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে। অনেকেই বলেছেন। তখন ছিল এরশাদের আমল। এরশাদের বিরুদ্ধে লক্ষ্য ছিল স্থির, ঐক্যও ছিল তাই ব্যাপক। তাছাড়া এরশাদের উত্থানের মধ্যে এমন একটা ঘোর অন্যায় ছিল, এরশাদের শাসনের মধ্যে এমন শিকড়হীন অস্তিত্বের অবাস্তবতা, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াটাই ছিল অনিবার্য। কিন্তু এবারে যে-নির্বাচনকে মূলত গ্রাহ্য করতেই হয়েছে, তাতে রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের সম্ভাবনা যেমন দীর্ঘকাল পরে উজ্জ্বল হল, তেমনি সেই নির্বাচনের পরিণামে রাজনৈতিক বিন্যাসে অনেকটা জট পাকিয়েও গেল। আওয়ামী লীগ তার ধাক্কা এখনো সামলে উঠতে পারেনি। শাসক দল হিশেবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি সুখসুবিধা ও পাওনাগন্ডার জমাখরচ নিয়ে মশগুল। ছাত্রদের ভূমিকা বাংলাদেশে বিরাট, এতকাল অন্তত তা-ই ছিল। কিন্তু রাজনীতির এই নতুন পটে ছাত্ররাও মনে হয় যেন নৈষ্কর্ম্যে সমর্পিত। কমিউনিস্টদের প্রভাব রাজনীতিতে ব্যাপক হয়তো কখনোই ছিল না—কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীর ভাবনায় ও সংস্কৃতিতে তার একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। তাকে কেউই অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু, এখন সে-প্রভাবটুকুও প্রায় লুপ্ত। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও দেশীয় অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনে কমিউনিস্ট পার্টি দিশেহারা ও তার প্রভাব বিলীয়মান। আর এই সব কিছুর ফাঁকে, প্রতিরোধের নিষ্ক্রিয়তায় ও বিপরীত শক্তির তৎপরতায় ধর্মীয় মৌলবাদ দিনে-দিনে সংহত। নেতিবাচক শক্তি একাত্তরের পরেও যে নির্মূল হয়ে যায়নি, বরং অনেক শৈথিল্য ও প্রশ্রয়ে লালিত হয়েছে তা তো আমরা জানি। ধীরে-ধীরে তা আরো পাকিয়ে উঠেছে। আপোসহীন প্রগতির শক্তি, গণনার দিক থেকে যাই হোক, নৈতিক বলে সামনের সারিতে ছিল তবু এতকাল। ৬ ডিসেম্বরের ধাক্কায় সব এলোমেলো হয়ে গেল।

এই নৈরাশ্য তো আমাদেরও। সারা ভারতের চেহারা আজ যা দাঁড়িয়েছে তা আর বলবার নয়। বাবরি মসজিদের ঘটনার আগে থেকেই তো মৌলবাদের উত্থান নানাভাবে আমাদের দেশে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এর জন্যও অবশ্যই দায়ী বিকল্প শক্তির ভেতরকার ক্ষয়, স্ববিরোধ ও ভ্রষ্টাচার। বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে একটু আলাদা প্রত্যাশার জায়গা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সে-ব্যাপারেও আমাদের অহংকার আর টিকল না। দায়ী, এখানেও, বামপন্থী শক্তির ভেতরকার পতন। এ অবস্থায় যা

হয়, এবং তা খুবই স্বাভাবিক ও সংগত, অন্য জায়গায় আশার কেন্দ্রকে খোঁজা। বাংলাদেশের প্রতিরোধের যা ইতিবাচক দিক ছিল—যা আমরা টের পেয়েছিলাম নানা বিবরণে, বইয়ে—তাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম। ডিসেম্বরের ঘটনার সময় বাংলাদেশের কোনো সামান্য বা কল্পিত প্রতিরোধকেই আমরা বড়ো করে দেখেছি। আমাদের সংবাদপত্রগুলিও প্রায় সবাই তা-ই করেছিল। এবং উচিত কাজই হয়তো করেছিল সেই উত্তেজনার মুহূর্তে। আমরা জানি, বাংলাদেশের প্রগতিশীল বন্ধুরা বা পত্রপত্রিকাও তা-ই করেন পশ্চিমবঙ্গের কোনো ঘটনার সূত্র ধরে।

কিন্তু তার একটা বিপদও আছে। অকুস্থলে গিয়ে নিজেরা তো ধাক্কা খাই-ই, তার চেয়েও বড়ো কথা : আমরা হয়তো টের পাই না, কিন্তু দু-দেশের সাধারণ মানুষ তাদের নিজের-নিজের অভিজ্ঞতায় আমাদের অতিশয়োক্তিটা ধরে ফেলে। আমাদের কথার প্রামাণিকতা হারিয়ে যায় তাদের কাছে। সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতার সেই সোজা পথ ছেড়ে বরং সত্যের মুখোমুখি হওয়াই ভালো। নিজেদের সম্পর্কে। অন্যদের সম্পর্কে।

সেই সত্যের মুখোমুখিই হলাম এবার বাংলাদেশে গিয়ে। এরকম মূর্খের স্বর্গে অবশ্য কখনো বাস করিনি, কখনো ভুলেও ভাবিনি : আমাদের বন্ধুরাই বাংলাদেশ! পশ্চিমবঙ্গ যেমন ভারতবর্ষ নয়, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী হাওয়ায় ক্যাডারদের লাফালাফি দেখেই যেমন তাদের মনের ভেতরকার দাঙ্গাকে ভোলা উচিত নয়—তেমনি বাংলাদেশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যে ইসলামি মৌলবাদের জট রয়েছে, পদে-পদে যে পিছিয়ে-পড়া লক্ষণগুলো পাকিয়ে উঠেছে তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশে সামান্য শৈথিল্য থাকাও চলে না। অথচ কী ঘটে? বাংলাদেশের সেকুলার 'মুসলমান' বন্ধুরা প্রায় হিন্দু মৌলবাদীর মতো কথাবার্তা বলেন এবং এখানকার আমরা 'হিন্দু'রা বলি মুসলিম মৌলবাদীর মতো। নিরপেক্ষতা বা সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতার দায়ে আমরা অনেকে বিপরীতটার ওপরই জোর দিই—আঘাত করি স্ব-সম্প্রদায় বলে জন্মসূত্রে যারা পরিচিত তার দোষত্রুটির ও স্খলনের বিরুদ্ধে, চোখ বুজে থাকি অন্য সম্প্রদায়ের অন্ধতার বিষয়ে। এতে হয়তো অনেকসময় সংখ্যালঘুদের প্রতি যথোচিত কর্তব্যই পালন করি। কিন্তু আমরা যা ভেবে করি তা সিদ্ধ হয় না। স্বসম্প্রদায়ের মৌলবাদীদেরই ক্ষোভ জাগাই, তারা আমাদের দৃষ্টান্তেই তাদের পরধর্মবিদ্বেষকে আরো পাকা করে তোলে।

এবার বাংলাদেশে গিয়েও সেই মৌলবাদেরই দাঁতনখ দেখতে পেলাম—যা দেখে গিয়েছি আমার নিজের দেশে। অন্যান্যবার তার চেহারা একেবারেই দেখিনি তা তো হতে পারে না, কিন্তু এরশাদ-বিরোধী প্রতিবাদের সাধারণ্যে তা ভুলে থাকতে

পেরেছিলাম। এবার সেই ভুলে থাকাটা সম্ভব হল না। প্রতিবাদী সংস্কৃতির চেহারা ধোঁয়াটে। প্রতিবাদী বন্ধুরা বিহ্বল। আর রাস্তাঘাটে মৌলবাদীদের চলাফেরা টের পেয়ে যাই অনেক বেশি। বাসে করে বা ট্রেনে করে ঢাকার বাইরে গেছি এবারও। যে-কোনো জমায়েতে—তা সে স্টেশন বাজার সিনেমাহল যেখানেই হোক—টেবিল নিয়ে বসে গেছে ধর্মের ধ্বজাধারীরা, নিচু গলায় বিদেশী উচ্চারণে আউড়ে যাচ্ছে ধর্মীয় গ্রন্থমালার বাংলা ভাষান্তর। বন্ধুরা গুটিয়ে গেছেন ঘরের আচ্ছ্রয়। এবং সেখানেও কথাবার্তায় সবসময় আশঙ্কা উঁচিয়ে আছে : জামাতরা কোথায়-কোথায় দলবদ্ধ হয়ে তৈরি হচ্ছে। জামাতদের শৃঙ্খলা ও কর্মতৎপরতা কতদূর। তাদের ফ্যাসিস্ট আচরণ কী ভয়ংকর। এবং তার পাশাপাশি নিজেদের অক্ষমতা নিয়ে খেদ।

২০ ফেব্রুয়ারির রাত্রির কথা তো ভোলা সম্ভবই নয়। সন্ধেবেলাতেই বইমেলায় ভাসাভাসা শুনতে পাই শহিদ-মিনারে কী ঘটেছে। মূল মিনারের পেছনে লাল সালুতে যে লাল সূর্য টাঙানো হয়, বিকেলবেলা তা ছিঁড়ে এবং পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে একদল যুবক। লেপটে দিয়েছে দেয়াললিখন ও আলপনা। শহিদ-মিনারের এত কাছে ছিলাম সে-সময়—এবং তখন তো সময় আরো পার হয়ে গেছে—কিন্তু তা নিয়ে তেমন কোনো চাঞ্চল্য নেই, কেউই ঠিকমতো জানে না, এমনকী জানার আগ্রহ আছে বলেও মনে হল না। শুধু অল্পস্বল্প কথা চালাচালি। সেদিন রাত্রে ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকাতে এক বন্ধুর বাড়ি। রাতে একে-একে সবাই ফিরে আসেন দুঃসংবাদ নিয়ে। শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসে। আমাকে নিয়ে অনেকেরই দুশ্চিন্তা। গোলমাল বাঁধতে পারে। আমি যেন না বেরোই। দূরের কেউ-কেউ জানতে চান, প্রতিবাদী মিছিল বেরিয়েছে কিনা আমাদের এলাকায়। আমিও উন্মুখ হয়ে থাকি। কান খাড়া করে থাকি। কিন্তু না, কোনো শব্দই নেই।

রাত বারোটার পর একুশের মেজাজ দেখতে বেরোই, অন্যান্য বারের মতোই বেশ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে। ভেবেছি, সন্ধের ওই ঘটনার পর প্রতিবাদের ঝড় আছড়ে পড়বে। দেখব বাংলাদেশের ছাত্রদের অন্য চেহারা। কিন্তু না, কিছুই দেখিনি। যথারীতি ফুলের মালা নিয়ে একের পর এক মিছিল আসছে বিভিন্ন পথ দিয়ে। শান্ত মিছিল। নির্বিকার মিছিল। মিনারের সামনে ভিড়। বক্তৃতা। সেই বক্তৃতাতে সামান্য বেশি ঝাঁজ থাকেও বা। তার বেশি কিছু নয়। শুধু নতুন লাল কাপড়ে নতুন সূর্য টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে।

পরদিন সকলের মুখে-মুখে এবং খবরের কাগজে অনন্ত গবেষণা—কারা ওই কাজ করেছে। এ বলে ওর কথা, ও বলে এর। খুঁজতে-খুঁজতে দেখা যায় সর্বের

মধ্যে ভূত। তারপর আরো দশ দিন ছিলাম বাংলাদেশে। ঢাকার বাইরে গেছি, আবার ফিরে এসেছি। শহিদ-মিনারের পাশ দিয়ে রিকশা করে গেছি, হেঁটে গেছি—কিন্তু সেই ল্যাপটানো আলপনা, দেয়াল-লিখনে সেই কাটাকুটি একইভাবে রয়ে গেছে। কুকীর্তি তো হঠাৎ করে যে-কেউই ঘটাতে পারে, তাকে ঠেকানো যায় না সবসময়। কিন্তু আশা করেছিলাম, যেটুকু ক্ষতি হয়েছে বিদ্যুৎগতিতে ছাত্ররা তার মেরামতি করে দেবে—পুনর্নির্মাণের মধ্যেই প্রতিবাদ। কিন্তু কারোর সেটা মাথায় আছে বলেই মনে হল না।

বন্ধুদের সঙ্গে যথারীতি ঘুরে বেরিয়েছি। গ্রামেগঞ্জে। মফস্বল শহরে। নৌকায়। বাসে। ট্রেনে। অন্যান্যবারের মতোই মেহমান হিশেবে খাতির পেয়েছি অদ্ভুত-অদ্ভুত জায়গা থেকে। সাধারণ অপরিচিত মানুষ আমি ভারতীয় জেনে সহৃদয়তা দেখিয়েছেন। গোয়ালন্দঘাটের দোকানদার আদর করে অন্যদের সরিয়ে বেঞ্চে বসতে দিয়েছেন। আপত্তি করলে হাঁ-হাঁ করে অন্যেরা সায় দিয়েছে। বুড়িগঙ্গা পার হয়ে জিন্‌জিরায় বাস ধরেছি, ধলেশ্বরী পার হয়ে বান্দুরায় পৌঁছে ইছামতী নদীতে দিন কাটিয়েছি মাঝির অন্তরঙ্গ গল্প শুনতে-শুনতে। কুষ্টিয়ার রাস্তায় পথ জানতে চাইলে গৃহস্থ ঘরে নিয়ে বসাতে চেয়েছেন। শিলাইদহে কুঠিবাড়ির নিম্নপদস্থ কর্মীরা হাত ধরে বিদায় জানিয়েছেন, সবাইকে নিয়ে যেন আসি। রাজশাহীতে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের ফেজ-পরা গাইড সস্নেহ ভঙ্গিতে সঙ্গী হয়েছেন। একটাই কারণ, আমি মেহমান।

কিন্তু তবু এরই মধ্যে কোথায় যেন অস্বস্তিও টের পেয়েছি এবার। যে-বন্ধুর অভিভাবকতায় বাইরের এই ভ্রমণে বেরিয়েছি, তিনি আমাকে আগলে-আগলে রেখেছেন। সতর্ক থেকেছেন যেন আমার ভারতীয় পরিচয় বা তথাকথিত 'হিন্দু' পরিচয় কোনোসময় প্রকাশ্য না হয়ে পড়ে। ভাবটা এই : কী দরকার! আগের বছরগুলিতে সেই বন্ধুর আচরণই ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সগর্বে আমার ওই পরিচয়ই দিয়েছেন সবাইকে ডেকে-ডেকে। ফিরে এসে অন্যদের কাছে জানতে চেয়েছি, এটা আমার ওই সহযাত্রী বন্ধুর অহেতুক উদ্বেগ কিনা। তাঁরাও আমতা-আমতা করে বন্ধুকেই সমর্থন করেছেন। নিজের চোখেই দেখেছি, যেখানে সে-পরিচয় বেরিয়ে পড়েছে, সেখানে আদর বা সম্ভাষণ যেমন ছিল, তেমনি কখনো-কখনো ছিল একটু সন্ত্রস্ত করা উদ্ধত ভঙ্গি, বিদ্বেষ জড়ানো দৃষ্টি। অন্তত সচেতন উপেক্ষা।

হিন্দুদের সংখ্যা কমতে-কমতে এখন বাংলাদেশে এমন দাঁড়িয়েছে যে বহু জায়গাতে তাদের প্রায় চোখেই পড়ে না। (তাই তো আমার কবিবন্ধু দুঃখ করে বলেন, কৈশোর-যৌবনে গ্রামের বাড়িতে সন্ধেবেলায় আজান এবং শঙ্খধ্বনি শুনতাম একসঙ্গে। কিন্তু শাঁখের সেই আওয়াজ কমতে-কমতে আজ প্রায় একেবারেই হারিয়ে

গেছে। বাংলাদেশের কিশোর জানবে না, কবিতায় লেখা হবে না তার কথা।) সাধারণভাবে তো আলাদা করে বোঝার উপায় নেই। ধুতি সম্পূর্ণ অদৃশ্য। এমনকী গ্রামেও বহু মুসলমান ধর্মীয়তার চিহ্নসূচক দাড়ি রাখে না, ফেজ পরে না। তবু এরই মধ্যে কোথাও-কোথাও হিন্দুদের আলাদা করে চেনাও যায়—বিশেষত শাঁখা-সিঁদুর পরা মেয়েদের এবং তাদের সঙ্গীদের দেখে। গ্রামে-গঞ্জে মাঝে-মাঝে সাইনবোর্ড দেখে বুঝতে পারি হিন্দুদের দোকান। হঠাৎ-হঠাৎ মন্দির, অক্ষত এবং সমুজ্জ্বল। তার ভেতরে বা আশেপাশে যে-মানুষ চলাফেরা করে তাদের দেখি। তখন মনে হয় যেন তাদের চলনে সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য নেই। একটু ত্রস্ত ভাব। নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ। ঢাকাতেও যে-ভাব আগেই দেখেছি বা কথা বলে বুঝেছি হিন্দু বা অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে। হয়তো সেই অভিজ্ঞতাই তাড়িত করে থাকবে পথচলতি আমাকে, এখানেও।

কেউ-কেউ বলেছেন, বাংলাদেশ জুড়ে ধর্মীয় উগ্রতা বা ত্রাসের যে-ইশারা পেয়েছি এবার বেশি করে, তা রোজা-র সময় বরাবরই ঘটে থাকে। আমি আগে দেখিনি বলেই এতটা বিচলিত হয়েছি। একেবারে দেখিনি বললে ভুল হবে। আগের দিনই তো ঢাকায় চোখে পড়েছে, পোস্টারে ছেয়ে গেছে সারা শহর, মিছিল বেরিয়েছে বড়োসড়ো, তাতে লাঠি হাতে যুবকেরাও ছিল। সেখানে ধর্মীয় শুদ্ধতা রক্ষার নির্দেশের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ভারত-বিরোধী জেহাদ। হয়তো রোজার সময় বলেই এতটা বাড়াবাড়ি। এবারে 'একুশে' এবং 'রোজা' সময়ের দিক থেকে মিলে গিয়েছিল বলেই এতটা বৈপরীত্য। শিলাইদহের কাছারিবাড়ির সামনের চত্বরে, নির্জন সেই পরিবেশে, অচেনা এক মানুষের নির্দয় ভঙ্গি ও চোখের আগুন দেখে যে বিস্ময় ও ভীতি জমেছিল, হয়তো এখনই তার ব্যাখ্যা পেলাম। আমি অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরিয়েছিলাম। তাই কুষ্টিয়া স্টেশনে, আমাকে বারবার নিষেধ করেও, বন্ধুটি নিজেই একসময় কাগজেমোড়া বিড়ি ধরালেন। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল এক সার্টপ্যান্ট পরা যুবক। পরিচয় জানতে চাইল। তারপর সংক্ষেপে মনে করিয়ে দিল এটা রোজার মাস। সমস্ত ঘটনার আকস্মিকতায় ও যুবকটির ভঙ্গিতে গা হিম হয়ে গেল। ধূমপান করার মতো সর্বঅর্থে গর্হিত কাজই নয়, এটা এমনকী হতে পারত প্রকাশ্যে খাবার খাওয়া নিয়েও। কেননা বহু খাবারের দোকানই দিনের বেলায় বন্ধ কিংবা পর্দা টাঙিয়ে আড়াল করা। ধর্মাচরণ কীরকম উগ্রভাবে সামাজিকতাকে বা জীবনযাপনকে গ্রাস করেছে তা দেখার অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই আমার পড়া ও জানা কথাগুলোই ভুলতে বসেছিলাম। আজ আবার তা ঠাহর করতে পারলাম।

এই জমিতে দাঁড়িয়েই বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিন আমার কাছে নতুনভাবে হাজির হলেন।

তসলিমাও বাংলাদেশে একটা ব্যাপার এখন। যেখানে যাই সেখানেই তাঁর কথা শুনি। উঠতে, বসতে, দাওয়াত খেতে-খেতে। পক্ষে এবং বিপক্ষে। বিপক্ষেও কম নয়। এত যে আলোচনা হচ্ছে তা নিয়েও লায়েক হাসিঠাট্টা। কিন্তু তবু আলোচনা চাই-ই।

এটা অবশ্য পশ্চিমবঙ্গেও দেখে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশে এত হইহই হবার একটা কারণ কলকাতার ওই স্বীকৃতিও। তবে সবটা নিশ্চয় নয়। কলকাতার হইচই-এর একটা বড়ো কারণ যেমন সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকের আনুকূল্য।

তসলিমা সম্পর্কে আমার নিজের প্রতিক্রিয়া ছিল অবশ্য অনেকটাই মিশ্র ধরণের। তসলিমার সাহস যেমন, তেমনি তাঁর গদ্যের ঝরঝরে ভঙ্গি তারিফ করার মতোই। নারী-নির্যাতনের যে-ছবি তিনি হাজির করেছেন, নারীমুক্তির যে-ঘোষণা তাঁর লেখায় উচ্চারিত হয়েছে, তা নতুন না হলেও, অন্যরকমের জোর দিয়ে বলা হয়েছে এবং বলা বাহুল্য সে-কারণেই অন্তত প্রশংসনীয়। কারো-কারোর কাছে কুম্ভিলকবৃত্তির যে অভিযোগ শুনেছি তা আমার কাছে নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত নিদর্শন মনে হয়েছে। কিন্তু আপত্তির কারণও অনেক। প্রথমত, প্রশ্ন জেগেছে, নারী-নির্যাতনের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এত ডিটেল্‌সের ব্যবহারের ঝোঁক পঠনকামকে প্রশ্রয় দেয় না তো? নানা কায়দায় নারীশরীরের যে-বর্ণনা লাইনে-লাইনে তা কি কোনো-কোনো পুরুষ-পাঠককে উৎসাহই দেবে না, তসলিমা চান বা না চান? কেউ যদি বলেন এও এক ধরণের প্রদর্শন-বিকার? দ্বিতীয়ত, যে-পুরুষজাতি তসলিমার আক্রমণের লক্ষ্য, তারা নিজেরাও কি শিকার নয় বিরূপ এই সামাজিক ও মানসিক পরিবেশে—এতটাই যে নানা প্রকার বিকারের মধ্য দিয়েই শুধু সুখ খুঁজে নিতে হয় তাদের? এই ট্র্যাজিক বোধ বা বিপরীতের কারুণ্যকে ছুঁতে পারেননি তসলিমা। একেই বলে বড়ো দৃষ্টির অভাব। তবে, তৃতীয়ত, আসল আপত্তি ছিল বোধহয় এখানেই যে নাটকীয় অতিশয়োক্তির ঝোঁকে তসলিমা প্রায়ই বাস্তবের লঙ্ঘন ঘটিয়েছেন। সারা বিশ্বের পট তাঁর কাছে বিচার্য হলেও, সন্দেহ নেই, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতারই প্রাধান্য তাঁর লেখায়। স্বভাবতই। কিন্তু কোন বাংলাদেশকে তিনি হাজির করেছেন? ৮৭ বা ৮৯-এর পরিচিতিতে অন্তত আমার মনে হয়নি, মেয়েরা ঢাকার বা ফরিদপুরের বা বরিশালের রাস্তায় একেবারেই নিরাপদে হাঁটতে পারে না। অথচ সেরকমই একটা ধারণা তৈরি হয় বইটা পড়তে-পড়তে। মেয়েদের প্রায়ই অসম্মানিত হতে হয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা নিয়ে অতিশয়োক্তি করলে সমস্যাটা বুঝতে অসুবিধা হয়, বলার বা শোনার ঝোঁকটা অন্যদিকে চলে যেতে চায়। ২১ ফেব্রুয়ারির বিকেলে বা সন্ধ্যায় বইমেলার গেটের সামনে অকথ্য একটা ভিড় হয় এবং বেশ কিছু

যুবক তার সুযোগ নিয়ে বদমাইশি করে তাতে সন্দেহ নেই। (পুজোর সময় বহু প্যান্ডেলের সামনে এরকমই ঘটে আমাদের দেশের অভিজ্ঞতাতেও)। কিন্তু সেই ভিড় পার হতে হলে প্রত্যেকটি মেয়েরই অঙ্গে 'অসৎ থাবা' পড়বে এটা বলা একটু বাড়াবাড়ি। ঢাকার রাস্তায় প্রতিবারই যে-কোনো সময়ে তরুণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঘুরেছি। ৮৯-তে কিশোরগঞ্জের রাস্তায় আমাদের শহর দেখানোর সঙ্গী ছিল দুই তরুণী। ভয় নেই তা নয়, হয়তো দুর্ঘটনার সংখ্যা অন্য জায়গার চেয়ে বেশিও হতে পারে, কিন্তু যে-ছবি বেরিয়ে আসতে চায় বইটি থেকে তাতে গণ্ডগোল আছে। তসলিমার বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে আমার এই অভিজ্ঞতার কথা অন্যদেরও বলেছি, এদেশের এবং ওদেশের, তাঁরাও সায় দিয়েছেন।

কিন্তু, এবার বাংলাদেশে এসে বুঝলাম, সমস্যাটা অন্য জায়গায়। আগে মনে হয়েছিল, তসলিমা যাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ভাষা প্রয়োগ করেছেন, যেমন পীরদের বিরুদ্ধে, তা সত্য হলেও ওভাবে বলাতে লাভ নেই, ক্ষতিই বরং। 'পীর মাত্রই দুশ্চরিত্র, লম্পট' এ-কথা বললে বাংলাদেশের বহু লোককে চটিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। কিন্তু, এবারে যে ধর্মীয় ক্রূরতা ও একনায়কত্বের বিষ পরিবেশকে শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছে বলে মনে হল, তাতে তসলিমার এই প্রতিবাদেরও অন্য প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করলাম। আজ যখন আমাদের চেনা প্রতিবাদী ভাষা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, প্রগতিশীল বন্ধুরাও প্রতিবাদকে সমালোচনা-আত্মসমালোচনায় মুখর ঘরোয়া আলাপচারিতার মধ্যেই নিঃশেষ হতে দিচ্ছেন, তখন বোঝা যায় তসলিমার ওই প্রতিবাদী বাচনের তাৎপর্যটা কী? একসময়ের দীপ্র ছাত্রসমাজও আজ যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে অসদাচরণের হুল্লোড়ে, তখন নারীর আত্মমর্যাদাবোধের ঘোষণার অতিরেকেই হয়তো ফিরতে পারে যৌবনের সংবিদ।

এবারের বইমেলায় সবচেয়ে সাড়া ফেলেছে তসলিমা নাসরিনের '*লজ্জা*'। ছোট্ট বই, ৭৬ পৃষ্ঠার, উপন্যাসই বলা হচ্ছে যদিও। উপন্যাস কেন, লেখা হিশেবেই বেশ দুর্বল রচনা। বোঝা যায় তাড়াহুড়ো করে লেখা। কিন্তু পাতা ওলটাতে-ওলটাতে অবাক হতে হয়—এই লেখাও হতে পারল বাংলাদেশের এই হাওয়ায়! শুধু হওয়া নয়, বইমেলার বেস্টসেলার। তবে তো আশা আছে এই দেশকে নিয়েও! বাংলাদেশের 'হিন্দু' বন্ধুরা হাতে গুঁজে দিয়েছিল '*লজ্জা*'। তসলিমা-বিষয়ে আমার দ্বিধা জানা ছিল বলেই বোধহয় সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তসলিমা-র এই বইটা পড়ব কিনা। তসলিমা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই নতুন করে ভাবনা আমার শুরু হয়েছে, সেটা আপাতত চেপে গিয়ে বললাম, আমার সায় নেই যার সঙ্গে তার লেখা পড়ব না সেই স্কুল তো আমি ছেড়েছি বহুদিন।

'লজ্জা' পড়বার সুযোগ পেয়েছি অবশ্য কলকাতায় ফিরে। এর ঘটনাকাল সাম্প্রতিক বললে কম বলা হয়। ৬ ডিসেম্বরের বাবরি মসজিদের ঘটনার পর কাহিনীর শুরু। তারপর বারবার পেছিয়ে যাওয়া তো আছেই। শেষপর্যন্ত হয়ে উঠতে চেয়েছে, বাংলাদেশে সংখ্যলঘুদের ওপর অত্যাচারের দলিল। পাকিস্তানি আমল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা ও আন্দোলনের ক্ষয়ের ইতিহাস মিশে আছে উপন্যাসের শরীরে। ভারতের ঘটনা ও বাংলাদেশের ঘটনা এসেছে সমান্তরালভাবে। কখনো-কখনো কাহিনীর সঙ্গে-সঙ্গে হাজির হয়েছে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, ভাবনা, তথ্য। উপন্যাসের এই ফর্ম তো আমাদের চেনাই। লেখার মধ্যে ওই ব্যস্ত তাড়া না থাকলে এই ফর্মটাই আরো অমোঘ হয়ে উঠতে পারত।

গোড়াতেই ধরিয়ে দিয়েছেন তসলিমা উপন্যাসের মূল সমস্যাটা। ৭ ডিসেম্বর, অর্থাৎ বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার পরের দিন বাংলাদেশে হিন্দু যুবক সুরঞ্জনকে লুকিয়ে থাকতে হবে, কেননা ভারতে হিন্দু করসেবকেরা বাবরি মসজিদ ভেঙেছে।

"ইঁদুর যেমন গর্তে ঢোকে ভয়ে, ভয় কেটে গেলে বা পরিস্থিতি শান্ত হলে চারদিক দেখেশুনে লুকোনো জায়গা থেকে ইঁদুর যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি বেরিয়ে আসতে হবে তাদের। কেন তাকে নিজের ঘর ছেড়ে পালাতে হবে—তার নাম সুরঞ্জন দত্ত, তার বাবার নাম সুধাময় দত্ত, মায়ের নাম কিরণময়ী দত্ত, বোনের নাম নীলাঞ্জনা দত্ত, শুধু এই কারণে? এই কারণে তাকে আজ আলতাফ, কামাল বা লতিফের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে, যেমন নিয়েছিল দুবছর আগে?" এই দিয়েই উপন্যাসের শুরু।

সুরঞ্জন ড. সুধাময় দত্তের ছেলে। সুধাময় মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক। সেই অবস্থাতেই তিনি অবসর নেন, পদোন্নতি হয় না, কারণ তাঁর নাম সুধাময়—সফিউদ্দিন বা সলিমুল্লাহ নয়। সুধাময় হাড়ে-হাড়ে বুঝেছেন, "মুসলমানের এই আবাসভূমিতে নিজের জন্য খুব বেশি সুযোগসুবিধা আশা করা ঠিক নয়।" এই কারণেই বহু হিন্দু একে-একে দেশ ছেড়েছেন। কিন্তু সুধাময় দেশ ছাড়েননি, ছাড়বেন না। "সুধাময় দত্ত বলেছিলেন, দেশ ছেড়ে পালাতে আমি পারব না। তোমরা যাচ্ছ যাও। এ আমার বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে। নারকেল-সুপুরির বাগান, ধানি জমি, ষোলো বিঘার ওপর বাড়ি এসব ছেড়ে শিয়ালদা স্টেশনের উদ্বাস্তু হব এ আমার ইচ্ছে নয়।"

সুধাময় তো এদেশের সঙ্গে হাড়েমজ্জায় মিশে আছেন। বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের স্বাধীনতা-আন্দোলন পর্যন্ত সব কিছুতেই অংশ নিয়েছেন।

এ দেশ তাঁরও দেশ। তাঁর এই 'একগুঁয়েমি'র জন্য তাঁকে দাম দিতে হয়েছে বারবার। যুদ্ধে যাবার দিনই তাঁকে মেরে বিকলাঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। আপোসহীন সুধাময়কে নিজের নাম পালটাতে হয়েছে—হতে হয়েছে আবদুস সালাম। স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের নাম পালটাতে হয়েছে। ধুতি ছেড়ে পাজামা পরতে হয়েছে। স্ত্রী মোটা করে সিঁদুর পরা ছেড়েছেন। লুট হয়ে গেছে গ্রামের বাড়ি। বাড়ি বিক্রি করে ঢাকায় বাড়ি ভাড়া নেন। সে বাড়িও লুট হয়, পুড়ে যায় ৯০-এর অক্টোবরে। তবু সুধাময় দেশ ছাড়বেন না—কেননা এ দেশ তাঁর দেশ। মাঝে-মাঝে বিহ্বল হয়ে পড়েন। শূন্য দৃষ্টি মেলে ভাবেন, "তিনি কি ভুল করছেন ভারতে না গিয়ে?" অচিরেই সামলে নেন নিজেকে।

সুরঞ্জন তো সুধাময়েরই ছেলে। তার সমস্ত শৈশব কাটে আতঙ্কের মধ্যে, বিদ্রূপের মধ্যে, ছোটো-ছোটো মন্তব্য সয়ে-সয়ে। চোখের সামনে সে দেখেছে : মন্দির ধ্বংস হয়েছে, সংখ্যালঘুদের দোকান লুট হয়েছে, বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তাতেও কীভাবে এসে যায় 'আমাদের' আর 'তোমাদের' বিন্যাস—এমনকী সেইসব মুসলমান-বন্ধুদের মধ্যেও যারা "ধর্ম মানে না", যারা "কাছের মানুষ"। সুরঞ্জন রাজনীতি করে, আত্মসচেতন মানুষ হিশেবেই বাঁচতে চায়, মিছিলে-স্লোগানে অংশ নেয়। কিন্তু মাঝে-মাঝে সেও বিপন্ন হয়ে পড়ে যখন বন্ধুরাই শুভার্থী হিশেবে পরামর্শ দেয়, "তুমি মায়াকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাও।" কিন্তু তখনো সুধাময়ের ছেলে সুরঞ্জন ভাবে, "মুসলমানরা যদি বাড়িঘর জ্বালিয়ে, তাদের সবাইকে কেটে রেখে চলে যায় তবুও সুরঞ্জন নড়বে না।"

এই আত্মবিশ্বাসের ভিত নাড়া খায় যখন বোন মায়াকে লুট করে নিয়ে চলে যায় মাস্তানেরা। সবাই দুঃখ করে, সান্ত্বনা দেয়। বন্ধুরা খোঁজার চেষ্টাও করে। তারপর আস্তে-আস্তে নিরুপায়ভাবে সরে যায়। সমস্ত পরিবার পাগলের মতো আচরণ করতে থাকে। সুরঞ্জনের কাছে এখন সবই অর্থহীন। বাড়িতে মুসলমান গণিকাকে এনে ধর্ষণ করে সে বদলা নিতে চায়। 'বাংলাদেশ' শব্দ নিয়ে বিশ্রী গালি দেয়। বাবরি মসজিদের ঘটনার পর সে আবিষ্কার করে কীভাবে কাছের মানুষরাও আলাদা হয়ে গেছে। সকলে তাকে দেখে অবাক হয়ে বলে—এখনো তুমি এখানে? এমনকী বাচ্চাদের সঙ্গে বাচ্চাদের কথাবার্তার ভাষা পালটে যায়। ধর্ম এসে হানা দেয় সেখানেও। মানববন্ধন, মিছিল, স্লোগান, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট—এ সবই সুরঞ্জনের কাছে অর্থহীন শব্দ আজ। বরং সে স্বস্তি পায় শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়ানো হিন্দুদের সঙ্গে কথা-চালাচালিতে। আর কোথাও তার যাবার নেই। সুরঞ্জন এইভাবেই হেরে যায়। আলাদা হয়ে যায়। প্রায়-মুমূর্ষু বাবাকে যেন শেষবারের

মতো চিৎকার করে দেশ ছাড়তে রাজি হতে অনুরোধ করে। আশ্চর্য, সুধাময় এ-অবস্থাতেও টলেন না। মায়াকে রক্ষা করতে পারা যায়নি বলে হাহাকার তাঁর বুকে। তবু শিকড় উপড়ে ফেলতে রাজি নন তিনি এখনো। সুরঞ্জন আরো চিৎকার করে বলে : "শেকড় দিয়ে কী করবে? শেকড় দিয়ে যদি কিছু হতই তবে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে হয় কেন?...এরকম ইঁদুরের মতো বেঁচে থাকতে আমার লজ্জা হয় বাবা। চলো চলে যাই।" পরিণত বয়সে ধুতি ছেড়ে পাজামা পরতে বাধ্য হয়েছেন যে-সুধাময় তাঁর দ্বিধা আসে। কিন্তু তবু মরিয়া প্রতিবাদে তিনি বলেন, "না। আমি যাব না। তোর ইচ্ছে হয়, তুই চলে যা।"

কিন্তু প্রতিবাদ শেষপর্যন্ত টেকে না। পরাজয় মেনে নিতে হয় সুধাময়কেও। বইয়ের শেষ পাতাটি উদ্ধৃত করি।

"শেষ রাতের দিকে ঘুম পায় সুরঞ্জনের। ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত এক দুঃস্বপ্ন দেখে সে। একা একটি নদীর পাড়ে সে হাঁটছে। হাঁটতে-হাঁটতে দেখে নদীর একটি ঢেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে গভীরে, সে পাকে পড়েছে, তলিয়ে যাচ্ছে। সুরঞ্জনের সারা শরীর ঘামতে থাকে। সে তলিয়ে যেতে থাকে ফুঁসে ওঠা অচেনা জলে। সুরঞ্জনের এমন অস্থির সময়ে একটি শান্ত স্থির হাত সুরঞ্জনকে স্পর্শ করে, জাগায়। সুরঞ্জন ধড়ফড় করে উঠে বসে। ভয়ে নীল হয়ে গেছে তার মুখ। পাক খাওয়া জল তাকে ডুবিয়ে নিচ্ছিল, বাঁচবার জন্য সে প্রাণপণ চিৎকার করছিল, একটা খড়কুটোও আঁকড়ে ধরবার জন্য যেমন সে হাত বাড়াচ্ছিল স্বপ্নের মধ্যে, সুরঞ্জন তেমন আঁকড়ে ধরে সুধাময়ের হাত। সুধাময় এসে বসেছেন সুরঞ্জনের বিছানায়।/ সুধাময় কিরণময়ীর কাঁধে ভর রেখে রেখে হেঁটে এসেছেন। অল্প অল্প শক্তি ফিরেছে তাঁর শরীরে। কিরণময়ী সুধাময়কে ধরে রাখে দুহাতে।/বাবা? সুরঞ্জন আর কোনও কথা বলতে পারে না। একটা বোবা জিজ্ঞাসা সুরঞ্জনের মুখে। তখন ভোর হচ্ছে। জানালার দুটো-তিনটে ছিদ্রপথে আলোর মুখ দেখা যায়। সুধাময় বলেন, সুরঞ্জন চলো আমরা চলেই যাই।/অবাক হয়ে সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাব বাবা?/সুধাময় বলেন—ইন্ডিয়া।/সুধাময়ের লজ্জা হয়, তাঁর কণ্ঠ কাঁপে, তবু তিনি চলে যাবার কথা বলেন, কারণ এতদিনে তার ভেতরে গড়ে তোলা শক্ত পাহাড়টিও দিনে দিনে ধসে পড়েছে।"

দুই প্রজন্মের সংখ্যালঘুকে, সমস্ত রকমের ত্যাগ ও ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও, দেশের সঙ্গে একাত্মতা সত্ত্বেও, বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বাস্তবতায় তাকে আঘাত করাই তসলিমার লক্ষ্য। দুই প্রজন্মের এই পরাজয়ের মধ্যেই তিনি

গেঁথে তুলেছেন তাঁর স্বদেশের ট্র্যাজেডি। কারণ তিনি জানেন, সংখ্যালঘুর নিরাপত্তার নিশ্চিতিতেই আছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের আসল পরীক্ষা।

যে-দুই হিন্দু যুবক আমাকে 'লজ্জা' হাতে তুলে দিয়েছিল, তাদের একজন ফরিদপুরের আরেকজন ঢাকার। বাংলাদেশেই তাদের জন্ম ও লালন, বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যোগে তারা স্বেচ্ছাব্রতী। অনেককাল ধরে তাদের চিনি। কিন্তু ক্রমশই দেখছি তাদের চোখের দীপ্তি ঘোলা হয়ে উঠছে, বিহ্বলতা আর চেপে রাখতে পারছে না। ওদের একজন নিজের নাবালিকা কন্যাকে শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠাবে শুনে আমি উটকো উপদেশ দিয়েছিলাম—একটি মাত্র মেয়ে, তাকে দূরে রাখবে? তাকে তো বাংলাদেশের মেয়ে হয়েই বড়ো হতে হবে! মনে আছে ওই মেয়ের মা, বাংলাদেশেরই তরুণী, জবাব দিয়েছিল : এখানে ওদের যে কী অসুবিধা তা আপনি বুঝবেন না। অদৃশ্য চোখের জলে ভেজা ছিল তার চোখের পাতা। না, আমি বুঝিনি তখনো। বুঝিনি ওরা দুজন তসলিমা-র 'লজ্জা' বইটি হাতে তুলে দিয়েছিল তাদের নিজেদের কথা জানাবার জন্যই। একজন লেখকের এর চেয়ে বড়ো পাওনা, এর চেয়ে বড়ো দায়মোচন আর কী হতে পারে! বইয়ের খুঁতগুলোও তখন তুচ্ছ হয়ে যায়।

আর পাঠক হিশেবে আমারও চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায় চলচ্চিত্রের মতো একেকটি দৃশ্য। তখন নিজেকেই প্রশ্ন করি : সংখ্যালঘুর এই সমস্যা কি আমাদের অভিজ্ঞতাতেও ছড়িয়ে নেই? ঠিক একরকম ভাবে হয়তো থাকে না। হয়তো রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ধরণ, নানান বাস্তবতা, মনের গড়ন ও ঐতিহ্য সবই আলাদা। কিন্তু তাই বা বলি কী করে? পশ্চিমবঙ্গে যা সত্য, তা কি উত্তরপ্রদেশে মধ্যপ্রদেশে রাজস্থানে বা গুজরাটে সত্য? মুসলিম সংখ্যালঘুর বিচ্ছিন্নতার ৪৭-পরবর্তী সমস্যার কথা জেনেছি কুরঅতুলয়েন হায়দারের উপন্যাসে, সথ্যু-র ফিল্মে। কিন্তু তখনো বাবরি মসজিদ ঘটেনি, তাই লেখকদের আশাবাদ চূর্ণ হয়নি। এবং, এমনকী পশ্চিমবঙ্গেও, সংখ্যালঘুর বেদনা আমরা বুঝব কী করে—আমরা যারা শহরবাসী এবং অঞ্চল-নিবদ্ধ গরিব ও পিছিয়ে-পড়া মুসলিম সংখ্যালঘুদের থেকে ভৌগোলিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই বরাবর বিচ্ছিন্ন?

১৯৪৬-এই সেই প্রাইমারি স্কুলের বন্ধুটি কোথায় হারিয়ে গেল, যে রাজাবাজার থেকে আসত পড়তে এবং স্কুলের একমাত্র মুসলমান ছাত্র হিশেবে ভালো ও খারাপ উভয় অর্থেই নজর কাড়ত মাস্টারমশাইদের—আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতাম? কলেজে রোলকলের সময় দেখেছি, প্রথম দিন অধ্যাপক যখন নাম ধরে-ধরে ডাকছিলেন, বিরল সেই দু-একটি মুসলমান ছাত্র কীরকম কুণ্ঠিত হয়ে উঠে দাঁড়াল

এবং ক্লাসসুদ্ধ সবাই তাকিয়ে থাকল—তারা এখন কোথায়? কলেজে পড়ানোর দিনগুলিতে দেখেছি, ইতিহাসের অধ্যাপক নিয়োগ করতে গিয়ে বিভাগীয় প্রধান মুসলমান প্রার্থীকে ডাকেনইনি, কী-একটা কুযুক্তি দেখিয়ে এবং গাঁইগুঁই করে সকলে মেনেও নিয়েছিলেন। আর এ তো হরহামেশাই দেখি, মুসলমান বন্ধু কী ঝঞ্ঝাটে পড়েন হিন্দুপাড়ায় বাসা খুঁজতে গিয়ে। আর এই তো ৬ ডিসেম্বরের পরেও, পার্কসার্কাসে আটকে পড়া মুসলমান লেখকবন্ধুকে উদ্ধার করতে গিয়ে চোখে পড়েছিল তাঁর চোখ দুটি, গভীর বিক্ষোভ ও আতঙ্ক সেখানে, মাথা নিচু করে উঠে পড়লেন সেই গাড়িতে যা তাঁকে নিয়ে যাবে 'নিরাপদ' অঞ্চলে। গোটা ভারত চিনি না, গ্রাম চিনি না, তবু নিজেদের ছোটো অভিজ্ঞতাতেই বুঝতে পারি, যে দুস্তর ব্যবধান ছিল তা আরো ঘনিয়ে উঠছে সংখ্যগুরু ও সংখ্যালঘুর সম্পর্কের মধ্যে, প্রীতির বদলে বিদ্বেষ, মিলনের বদলে বিচ্ছেদ। তসলিমা চেনেন ও লেখেন সুরঞ্জন ও সুধাময়ের কথা—আমাদের মধ্যে কে লিখবেন আফজল বা মযহারুলের কথা?

ফেরার দিন তুলে দিতে এসেছিলেন আমার বন্ধুরা—বাংলাদেশের বন্ধুরা। আমার নিকটবয়সী যশস্বী বন্ধুরা যেমন কেউ-কেউ, তেমনি তরুণ বন্ধুরাও। প্রত্যেকেই শুভকামনা করেছেন—আবার দেখা হবে। উভয় দেশেরই মাথার ওপর কালো ছায়া। প্রার্থনা করেছি, সে ছায়া কেটে যাক। প্রবীণ যাঁরা তাঁরা আশা করেছেন তাঁরা তাঁদের লেখায় ও অন্যান্য সাংগঠনিক কাজে প্রতিবাদকে আবার বাঙ্ময় করে তুলতে পারবেন। তরুণ যারা তারা কিছু বলেনি—কিন্তু চোখে-মুখে কথা ছিল।

বাংলাদেশের এই তরুণ-তরুণীদের আমি প্রবল ভক্ত। প্রথমবার যখন গিয়েছিলাম, ছাত্রশিক্ষক-কেন্দ্রের প্রায় উৎসবমুখর পরিবেশে আলাপ হয়েছিল একদল তরুণের সঙ্গে। দ্বিতীয়বার পরিচয়ের সেই পরিধি বেড়েছে। তারা কেউ-কেউ পঠনপাঠন ও নিরীক্ষামূলক আবৃত্তির মধ্য দিয়ে বাঙালি-সত্তার চর্চায় যেভাবে নিমগ্ন ছিল আমি অবাক হয়েছি। আরেকদল ছেলেমেয়ে দেখেছি যারা রবীন্দ্রসংগীতের চর্চায় নিবেদিত-প্রাণ। নিছক গান গাওয়াই নয়, যে-শুদ্ধতায় এই প্রাণবন্ত চর্চা তা হয়ে উঠেছে তাদের সংস্কৃতিরই অঙ্গ। যাঁদের প্রেরণায় এই অভিযান তাঁরাও হয়ে উঠেছিলেন আমার প্রিয়জন। মনে হয়েছিল ঠিক এরকম যেন দেখিনি আর কোথাও। আমি জানি, এই দেখার মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও ভুল আছে, আবেগ আমাকেও খেয়েছে, আমি বিশেষকে নির্বিশেষ করেই দেখতে চাইছি। কিন্তু দেখেছি তো! কত তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতী শালীন ও বুদ্ধিদীপ্ত ও সহজ স্ফূর্তিতে দলবদ্ধ হয়ে ঘোরাফেরা করে, নিজের-নিজের ক্ষমতা মতো সৃষ্টির কাজে মেতে থাকে। মনে হয়েছিল,

এরাই বাংলাদেশকে ভাস্বর করে তুলবে, দুই-বাংলার যৌথ ও সংলগ্ন বাঙালিত্বকে সব সংকীর্ণতা ডিঙিয়ে সত্য করে তুলবে কোনো এক সময়ে।

এবার কি তবে তাকেই ম্লান দেখলাম? সংগঠনের মুঠো ঢিলে? একসময় যে সহজ প্রীতির বন্ধন ছিল, এখন সেখানে কেবলই দোষারোপ ঘটছে। বিজ্ঞ প্রবীণকে বলতে শুনলাম, পরিপার্শ্বের ব্যথাবেদনা এই নবীনেরা নিজেদের গায়ে মেখে নিচ্ছে না কেন? কেন তারা হাসে, গান গায়? এভাবেই কি নিজেদের ব্যর্থতার দায়কে তুলে দিতে চাইছি নবীনের ঘাড়ে?

তা ছাড়া দায়বদ্ধতার ভাষা কি এক? কী জানি, কোনো বাচনের সমারোহ ছাড়াই এই তরুণ-তরুণীরা তাদের দৈনন্দিনের সুস্থ ও আপাত-প্রসন্ন যাপনেই হয়তো প্রতিরোধ ঘটাতে চাইছে। বাংলাদেশের ছাত্ররা আজ মঞ্চ থেকে নিরুদ্দেশ, এই পরিচিত অভিযোগ হয়তো অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অনিশ্চয়তাই যে তাদের বৈশিষ্ট্য তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে, বাংলাদেশের ছোট্ট ইতিহাসেও। ধোঁয়ার মধ্য থেকে ছাত্র ও যুবকদের সেই চেনা জ্যোতির্ময় মুখটিই বারবার দেখি। কুষ্টিয়ার ডাকবাংলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কয়েকজন ছাত্র ও তরুণ অধ্যাপক অকুতোভয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে বলে গেল, লড়াই তারা ছাড়বে না—সহযাত্রী প্রবীণকে আঙুল উঁচিয়ে অভিযোগ ছুড়ে দিল, "আপনারা তো নিজেদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠানোতেই ব্যস্ত। ইসলামের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান বলে প্রগতিশীল কবিরা আমন্ত্রণ এড়িয়ে যান, বলেন আমাদের বিপদে ফেলতে চান না—আসলে নিজেকে বাঁচানোই লক্ষ্য।" রাজশাহীর সেই ছেলেটি জামাতের দলবদ্ধতা ও আসন্ন আক্রমণের সম্ভাবনা মাথায় রেখেই বলেছিল, "কাল কী হবে জানি না—কিন্তু জান কবুল...।" কিংবা সেই মেয়েটি যে নাটক না করেই বিনীত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেছিল, তসলিমা-র মতো আরো অনেক মেয়ে দরকার বাংলাদেশে যারা তোয়াক্কা না করেই কথা বলতে পারবে।

ঢাকা এয়ারপোর্টে তুলে দিতে এসেছিল যে-তরুণতরুণীরা তাদের কথোপকথনে কান পেতে শুনে নিই, সংগঠনের সংকটকে দূর করতে তারা পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলছে কী সহজ মুক্তবুদ্ধিকে ভর করে। প্রকাশক-বন্ধুর ডেরায় শুনে ফেলি, এই প্রতিকূলতাতেও কোন-কোন বইকে অস্ত্র করে তোলা হবে আগামী বছরটিতে। রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে রাজনীতির বন্ধু বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক ব্যর্থ কালক্ষেপের পর কীভাবে তাঁরা করতে চাইছেন নতুন ভাবনার গোড়াপত্তন।

ঢাকা থেকে এই সবও শুনে এলাম, জেনে এলাম।

রচনাকাল : ১৯৯৩

বাংলার মুখ আবার : মুজিবের মুখ?

১৯৭৫-এ আমি হারিয়েছি আমার প্রতীক,
শৌর্যবীর্যধারা, অন্ধকারে। তারপর থেকে ভিতরে ভিতরে একা,
গৃহহারা। স্বপ্নহীন ক্ষোভে বসে থেকে থেকে, ঘুমে ঘুমে
আত্ম-গোপনে গোপনে ক্লান্ত।
একটা কিছুকে উপলক্ষ করে আবার দাঁড়াতে চাই,
বাংলার মাটি, বাংলার জল আমাকে কি নেবে?

—নির্মলেন্দু গুণ

ঢাকায় পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই বন্ধুরা ঘিরে ধরে একটা প্রশ্ন করেছিলেন বারবার : "নতুন কী দেখছ? কেমন দেখছ? এবার?" প্রশ্নের ধরণেই বোঝা যায় কী ভাবছেন তাঁরা নিজেরাও। হয়তো প্রশ্নের মধ্যে একটা চাপা অভিযোগও ছিল—যাঁরা আমাকে আলাদা করে চেনেন ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যে তাঁদের মনে। ১৯৯৩-এ ঢাকা থেকে ফিরে আমার কোনো লেখায় গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ পেয়েছিল। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরের ঘটনাবলিতে। প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলো তখন তাঁদের দাঁতনখ নিয়ে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে, প্রগতির শক্তি ঘরের মধ্যে মুখ লুকিয়েছে। আমি আর কী বলব, যে-নৈরাশ্য বন্ধুদের মধ্যে দেখেছিলাম, তাই তো চালান করেছিলাম সহ-অনুভূতিতে! কবে আবার গণতন্ত্র ফিরে আসবে, সংখ্যালঘুরা কবে স্বস্তি ফিরে পাবে, মৌলবাদের হুংকারকে ছাপিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ সুস্থ সংস্কৃতির স্বর শোনা যাবে—এর কোনো উত্তর যেন কারোরই জানা নেই। যে-বিশ্বাসে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল ঐকান্তরে, তার পুরুষার্থ কীভাবে হারিয়ে গেল, কবে ফিরে পাওয়া যাবে—মাথা কুটেও তার জবাব পাওয়া যাচ্ছিল না।

১৯৭৫-এর আগস্টে মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল, নভেম্বরে তাজউদ্দিন-নজরুলকে। বস্তুত তার কোনো প্রতিবাদ হয়নি, প্রতিবাদ করতে দেওয়া হয়নি। নমো-নমো করে যেটুকু প্রতিবাদ বা শোকপালন হয়েছে, তাকে বারবার চাপা দেওয়া হয়েছে। পরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে-পরিণাম ক্রমশই

ঘটতে থাকল, তাতে কোনোরকম প্রতিবাদ ও শোকের আবহাওয়াও যেন পালটে যাচ্ছিল। শুধু কারো-কারো মনে, হয়তো অনেকেরই মনে, ঘোর নিরুপায়তা নিঃশব্দ বেদনায় ভাষা পাচ্ছিল। সেই নিঃশব্দ কান্নাই এতকাল শুনতে পেয়েছি ঢাকার আকাশেবাতাসে, সারা বাংলাদেশের নদীপ্রান্তরে।

একুশ বছর পরে আবার আওয়ামী লীগ ফিরে এসেছে। মুজিবুর রহমানের হারিয়ে যাওয়া ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। তাঁকে হত্যার পর যে-শোক চাপা ছিল, সেই শোকই যেন জোরালো প্রত্যয়ে রূপ পাচ্ছে। মুজিবুর রহমান উঠে এলেন বিস্মৃতির কবর থেকে। তাঁর জীবিতকালে হাজারো বিচ্যুতি সত্ত্বেও যে-মূল্যবোধ বাংলাদেশকে নতুন সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তার উচ্চারণ আবার নতুন করে শোনা গেল। ঢাকার চট্টগ্রামের রাজশাহীর খুলনার পথেঘাটে। ঠিক যে প্রবল উচ্ছ্বাস বা বিহ্বলতা আছে তা নয়। বরং নেই বলেই তো মনে হচ্ছিল এক ধরণের পরিণতি যেন অর্জিত হয়েছে। অথচ তারই মধ্যে অনেকেরই চলনে-বলনে কথায়-বার্তায় একটা নতুন প্রত্যয় ও বিশ্বাস টের পাওয়া যাচ্ছে। আর তারই ঝোঁকে আগন্তুককে একটু অহংকারী গলাতেই যেন শোনাতে পারছেন বন্ধুরা : "নতুন কী দেখছ? কেমন দেখছ? এবার?"

বাংলাদেশের প্রাবন্ধিক আবদুল হক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—'আত্মহত্যার আগে'। প্রবীণ লেখক তাঁর জীবনের তিনটি বিস্ময়ের কথা বলেছেন সেখানে। প্রথম বিস্ময়—বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন নিয়ে এত বড়ো আন্দোলন পৃথিবীতে বোধহয় কখনো ঘটেনি। তাঁর মতে : বাঙালি মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছিল ভাষা-আন্দোলন এবং তার মধ্যেই ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা আর গণতন্ত্রের অঙ্কুর। দ্বিতীয় বিস্ময়—একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। যোদ্ধা জাতি হিশেবে তো বাঙালির তেমন নাম নেই, তবু ভাষা-আন্দোলন কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে পৌঁছোল এবং বাঙালির বীরত্বের অতুলনীয় পরিচয় পাওয়া গেল, তা জানা বিস্ময়কর বই কী! কিন্তু সবচেয়ে বড়ো বিস্ময়, এইসব আন্দোলন ও যুদ্ধে অর্জিত মূল্যবোধ কীভাবে অনায়াসে অল্পদিনের মধ্যে চুরমার হয়ে গেল, তার অভিজ্ঞতা। লুটপাট, দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, হত্যাকাণ্ড কীভাবে গ্রাস করতে পারল বাংলাদেশকে। কীভাবে মুজিবুর রহমানকে ভুলে যেতে পারল নিমেষে। একেই আবদুল হক-বলেছেন আত্মহত্যার প্রবণতা। আত্মহননের দিকে ছুটে চলেছে বাংলাদেশ। সেই আত্মবিনাশেরই আগের মুহূর্তে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন বাঙালিকে আত্ম-সমালোচনার, আত্ম-সংশোধনের ও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনের কথা।

সেই প্রায়শ্চিত্তেরই কি শুরু আজ সেখানে? উচ্ছ্বাসের বদলে গভীরতাটাই তাই আজ লক্ষণীয়। ঢাকায় পৌঁছেই খবরের কাগজে দেখি সেই 'ফিরে দেখা' শুরু হয়েছে সমারোহে। প্রায় সমস্ত পত্রিকারই প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে মুজিব-হত্যার পেছনের চক্রান্ত উদ্‌ঘাটনের খবর। সে-সবের কিছু-কিছু কলকাতার কাগজেই পড়ে গিয়েছিলাম। এখানে এসে বুঝতে পারছি কীভাবে উদ্বেল হয়েছে জনচিত্ত এই খবরে। প্রায় প্রতিদিন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'খুনিদের বিচার করতে হবে', 'খুনিদের রক্ষার চক্রান্ত করা হলে প্রতিরোধের ডাক' এই সমস্ত শিরোনাম ছেয়ে থাকে। শুধু মুজিব নয়, জেলে নজরুল-তাজউদ্দিনকে যে হত্যা করা হয়েছিল, তার কথাও উঠছে বেশি করে। ১৯৭৫-এর আগস্টে মুজিব-হত্যার পরও যেটুকু সম্ভাবনা ছিল পরিত্রাণের, তাকেও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ৩ নভেম্বর। আজ ১৯৯৬-এর ৩ নভেম্বর তাজউদ্দিন এবং অন্যান্যদের স্মৃতিতর্পণ করা হয়েছে অসামান্য গাম্ভীর্যে। কোনো কাগজে বেরিয়েছে স্ত্রী জোহরা তাজউদ্দিনের স্মৃতিকথা, কোথাও মেয়ে রিমির লেখা পিতৃস্মৃতি। এ ছাড়াও প্রতিদিন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংলগ্ন খবরাখবর আরো বিশদ মনোযোগে ছাপা হচ্ছে।

এটা শুধু এখনই নয়, আগেও যখন এসেছি তখন দেখেছি, অন্ধকারের মধ্যেও এই চর্চা কীভাবে আড়ালে কাজ করেছে। কখনো তার নাম মুক্তিযুদ্ধের চর্চা, কখনো একুশের চেতনার চর্চা, কখনো সরাসরি মুজিবুর-চর্চাই। রাজশাহীর তরুণতরুণীর কথা মনে পড়ে। ক্রমশই সেটা আরো জরুরি মনে হয়েছে। আসল প্রতিরোধ যেটুকু তা তো সেখানেই। প্রকাশক-বন্ধুরা একের পর এক বই বের করেছেন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ, ইতিহাস, তত্ত্ব ও সমস্যাকে নিয়ে—বাংলা একাডেমী ছাড়াও আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের কথা মনে পড়ে। কিন্তু এখন, আওয়ামী লীগের পুনরুত্থানে তা ব্যাপক হয়েছে। শুধু বই বা খবরের কাগজেই নয়, সভায় ও বৈঠকে, দৈনন্দিন আড্ডায় প্রকাশ্যে এসে পড়ছে সেই প্রসঙ্গ।

মুজিবের ছবি, মুজিবের বক্তৃতার ক্যাসেট, মুজিব-সম্পর্কিত লেখা চারদিকে এতই শোনা বা দেখা যাচ্ছে যে এই অতিভক্তির বিপদের কথাও মনে উঠবে নিশ্চয়ই। এতদিনে এঁরা কোথায় ছিলেন? এতদিন যে মনে হচ্ছিল মুজিবকে সবাই ভুলে গেছে, কিংবা তাঁর শেষপর্বের বিচ্যুতির কথা একটু বেশি করেই বলা হচ্ছে—তা কি সত্যি নয়? এ এক নতুন আবিষ্কার। এইভাবে নেতি-নেতি করেই বুঝে নিতে হচ্ছে সবকিছুকে। মুক্তিযুদ্ধের পর্বে যেমন মনে হয়েছিল সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ বুঝি লুপ্ত, পরে মর্মান্তিকভাবে আবিষ্কার করা গেল, তা মোটেই ঠিক নয়—তেমনি মুজিবের হারিয়ে যাওয়াও যে সত্য নয়, তা আজ আওয়ামী লীগের ফিরে-আসার

মধ্যেই শুধু বোঝা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায়। মুজিব-অতিভক্তির ফাঁকির আড়ালেও যা অগ্রাহ্য করা যায় না।

এবারের সময়টা নানা দিক থেকেই স্মরণীয়। মুজিব-হত্যার একুশ বছর পরে আওয়ামী লীগের ফিরে-আসা, মুজিব-কন্যা হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্ব এবং স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পূর্তি একসঙ্গে। ঢাকায় থাকতে-থাকতেই অনুভব করেছি লোকের চোখে-মুখে কথায়-বার্তায় উৎসাহ। নতুন কর্মপ্রেরণা কারো-কারো মধ্যে বেশ স্পষ্ট। ফিরে এসে দৈনন্দিন খবরাখবরে, বন্ধুদের চিঠিপত্রে জানতে পারি সেই উৎসাহ আরো মুখর হয়েছে। সমস্ত ঢাকায় ও বাংলাদেশে এখন উৎসব। তা ছাড়া সামনে তো একুশে ফেব্রুয়ারি আছেই।

বাকশাল সত্ত্বেও বলতেই হবে, মুজিবুর রহমানের নামের সঙ্গে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে আছে, যে-গণতন্ত্র সেখানে একুশ বছর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই পূর্বপাকিস্তানের আমলের সামরিক শাসনের সঙ্গে জিয়া-এরশাদের সামরিক শাসন তুলনীয় নয়। স্বাধীনতার একটা আবরণ শুধু নয়, সত্যও ছিল, তাদের শত বিকার সত্ত্বেও। জিয়ার আমলের কথা প্রত্যক্ষভাবে জানি না, এরশাদের আমলে গিয়ে দেখেছি, বাহ্যত মনে হতে পারে, প্রতিবাদের কণ্ঠ তো শোনা যাচ্ছে, তাকে চেপে ধরা হয়নি। কিন্তু বন্ধুরা দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, এই মুখোশের আড়ালে কীভাবে আসল জায়গাতে আঘাত হানা হয়েছে অবিরল। প্রশ্রয় পেয়েছে মৌলবাদ, বিপন্ন হয়েছে সংখ্যালঘু, প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রের অনুকূল প্রতিষ্ঠানগুলো ভেতর থেকে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থসম্পদ নিয়ে নয়-ছয় তো ছেড়েই দিলাম। মুজিবুর রহমান যে-সংবিধান তৈরি করেছিলেন, তার চারটি ভিত্তির অন্যতম ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। জিয়া এসে সেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে উড়িয়ে দিলেন, এরশাদ এসে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করলেন। নিশ্চয়ই খালেদা জিয়াকে বাধ্যতই গণতন্ত্রের রীতিনীতি কিছুটা মানতে হয়েছে, কারণ সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েই তিনি মসনদে এসেছিলেন। কিন্তু অন্য দিক থেকে তিনি তো জিয়ার স্ত্রী হিশেবেই এসেছেন, তাই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য তাঁর কী হতে পারে তা বুঝে নিতে অসুবিধা হবার নয়। হয়তো এক-পা দু-পা এগিয়েও তাঁর আসল কাজ ছিল গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার উত্থানকে ঠেকিয়ে রাখা। আজও তাই, হাসিনার আমলেও, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার চাপ সকলের আগে। চট্টগ্রামে গিয়ে ওখানকার দৈনিক 'পূর্বকোণ'-এ মুহম্মদ ইদ্রিসের একটি লেখার শিরোনামে বেশ নাড়া খাই—"গণতন্ত্রের ভান নয়, প্রাণ চাই"—বুঝতে পারি এটাই হল সত্যিকারের দায় এখন বাংলাদেশে। এই দায় মেটানো শুধু আওয়ামী লীগ বা হাসিনার কর্ম নয়—গণতান্ত্রিক সভ্য নাগরিকের প্রতিদিনের কর্মপ্রেরণায়,

সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে কল্পনা ও সৃজনের বিস্তারে তা সম্ভব হতে পারে। তার আয়োজন গত একুশ বছরে অনেক সময় সামনে হাজির না থাকলেও একেবারে নিভে গেছিল তা নয়, কিন্তু এখন আবার নতুনভাবে জ্বলে উঠতে চাইছে। ভাষা-আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা—এ সবেরই উৎস তো মুসলিম বাঙালির আত্মপরিচয় কিংবা সামগ্রিকভাবে বাঙালিরই আত্মপরিচয় সন্ধান থেকে। এরই পূর্ণতা পেতে চেয়েছে তারা এবং যেটুকু পেয়েছে তাও কষ্টার্জিত। যখন আমরা সবচেয়ে অসময় মনে করেছি, তখনও ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রে এবং ভিন্ন-ভিন্নভাবে এই অনুসন্ধান চলেছে। অনেক বাধার মধ্য দিয়ে। আজকের হাওয়াবদলের সম্ভাবনায় হয়তো সে-সবেরই নতুন করে যাথার্থ্য খুঁজে পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে।

যাদের আমন্ত্রণে এবার বাংলাদেশে গিয়েছি, সেই ঢাকা থিয়েটারের কথাই যদি ধরি, তাহলেও স্পষ্ট হবে আমার কথা। ঢাকা থিয়েটারের প্রাণপুরুষ নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, যাঁকে সবাই বাচ্চু বলে ডাকে, মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা লোকের মুখে-মুখে। জাহানারা ইমামের লেখায় তাঁর কথা পড়েছি। তাঁর নিজেরও মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা একই মলাটে গ্রথিত আছে দুটি ভিন্নধর্মী ছোটো লেখায়—'ঘুম নেই' আর 'টিটোর স্বাধীনতা'—এবারই হাতে পেলাম। যুদ্ধের পরে, স্বাধীনতার পরে বাচ্চু কিন্তু থেমে থাকেননি। ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কাজে, থিয়েটারের কাজে। এবং এ দুয়ের মধ্যে কোথায় যে একটা মিলও আছে তা বোঝা যাবে ঢাকা থিয়েটারের ধারাবাহিক ও সামগ্রিক কাজের ইতিবৃত্তে। নাসিরউদ্দীনের লেখা বইয়ের ভূমিকায় শাহাদত চৌধুরী জানিয়েছেন : "তুমি তো লিখেছ একাত্তরের এপিটাফ।" আর এখন? "তুমি আর সেলিম মিলে মঞ্চে রচনা করছ একের পর এক জীবনের মহাকাব্য...।" সেলিম অর্থাৎ নাসিরউদ্দীনের অভিন্নহৃদয়বন্ধু নাট্যকার সেলিম আল দীন। একের পর এক নাটক লিখছেন সেলিম এবং তার অসামান্য প্রযোজনা নাসিরউদ্দীনের। এ নাটক একেবারে ভিন্ন জাতের, প্রযোজনাও তাই। বাঙালির আত্মপরিচয় সন্ধানের খুব বড়ো প্রয়াস। সে-প্রয়াস কিন্তু গত একুশ বছরের অন্ধকারের মধ্যেই।

নাসিরউদ্দীন ইউসুফের বাড়িতেই ঢাকা থিয়েটারের দপ্তর। কয়েকটি দিন ও রাত্রি কেটেছে সেখানে। দেখেছি কর্মচাঞ্চল্য কীভাবে আলোড়িত করেছে তাদের সমস্ত নাট্যকর্মীকেই। দেয়ালে বা দরজায় স্টিকার লাগানো বাংলাদেশে খুব চলে। সে-সব স্টিকারে প্রায়ই লেখা থাকে উক্তি-প্রত্যুক্তিতে ভরা কৌতুক বাক্য, কখনো দীপ্ত স্লোগান। ঢাকা থিয়েটারের দরজায় অনেক বাক্যাবলির মধ্যে জ্বলজ্বল করছে :

'রাজাকারদের প্রবেশ নিষেধ'। উপলক্ষটা ছিল সেলিম আল দীনের বই 'মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য' প্রকাশের সূত্রে সেমিনার। সেমিনারকে সফল করার জন্য কর্মীদের তৎপরতাও লক্ষ করার মতো। সেমিনারের বদ্ধ ঘরের মধ্যে থাকার সময় বুঝতে পারিনি, বাইরে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। ঢাকার রাস্তা-ভাসানো জল-জমাও দেখলাম এই প্রথম। নাসিরউদ্দীনের বাড়িতে রোজই প্রায় আড্ডা হত অনেক রাত অব্দি। সেলিম আল দীন থাকতেন, শিমূল ইউসুফও থাকতেন। নিছক গল্পগুজব তো হতই, তার ফাঁকে-ফাঁকে ওঁদের তিনজনের গলায় ফুটত ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। বেশ টের পেতাম নতুন উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে, অনেক নতুন কথা ভাবছেন তাঁরা। শিমূল বলতেন, সেলিমের গদ্যকথায় সুর দিতে গিয়ে কী সমস্যায় পড়তে হত তাঁকে, কিংবা কলকাতা থেকে লালনের গানের যে-ক্যাসেট বেরোবে তাঁর, সুধীন দাসের শিক্ষকতায়, তাঁর সুর কেন আলাদা। সেলিম বলতেন তাঁর নতুন নাটক কী বিষয়ে লেখা হচ্ছে তার গল্প। নাসিরউদ্দীন জানাতেন, আগামী বছর ঢাকা থিয়েটারের সব-কটি নাটক কীভাবে প্রযোজিত হবে একসঙ্গে একমাসের মধ্যে।

এরই মধ্যে সেগুনবাগিচার মুক্তিযুদ্ধ-মিউজিয়মে কাটিয়ে এলাম সারাটা বিকেল-সন্ধে। মুক্তিযুদ্ধের হারিয়ে-যাওয়া চেতনা নতুন প্রজন্মের কাছে হাজির করার জন্য একটি মিউজিয়মের প্রয়োজন যে কেউ-কেউ অনুভব করছেন তা শুনেছিলাম অনেক আগেই। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তৈরি হয়েছে সেই মিউজিয়ম। পরিকল্পনা আছে আলাদা করে তার জন্য বড়ো বাড়ি করার। আপাতত ছোটো একটি পুরোনো তেতলা বাড়িতেই স্থান করে নেওয়া হয়েছে। অনেকগুলো ঘর। ঘরগুলিও বেশ ছোটো। তাতে পোস্টারে, ফটোগ্রাফে হাজির করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কে যা কিছু জানার, যা কিছু বলার। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন যে-কোনো জিনিশই রাখা হয়েছে। যোদ্ধাদের ব্যবহৃত পোশাক, কাগজপত্তর, জীবন-উপকরণ যা কিছু পাওয়া গেছে। সংগৃহীত সবকিছু তো দেখানো সম্ভব নয়, বেশিরভাগই বাক্সে ভরা আছে—তারই কিছু-কিছু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রদর্শন করা হয়। বোঝা যায়, পরিসর কম বলে জিনিশপত্রের একটু বেশি ভিড়। একটু অগোছালো। বোধহয় আর্কাইভ এবং একজিবিশন, সংগ্রহশালা এবং প্রদর্শনী : দুটোর কাজই একই সঙ্গে করতে গিয়ে এই বিপত্তি। তবে এর প্রয়োজন কতটা ছিল বোঝা যায়, যখন দেখি প্রবেশ-দক্ষিণা দিয়েও কত লোক এসেছে। মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। এখানে সমালোচনা সত্যিই অপ্রয়োজনীয়। প্রশ্নহীন আবেগ বাংলাদেশের মানুষের কাছে কতটা সত্য, তা আরো টের পাই তারেক আলীর মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক ডকুমেন্টারি ভিডিও 'মুক্তির গান'

দেখতে-দেখতে। বাংলাদেশে হাতে-হাতে ঘুরছে ওই ক্যাসেট। বাড়িতে বসে দেখতে-দেখতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে ওখানকার মানুষ। শিল্প দিয়ে কী বিচার হবে তাঁর!

আমরা যখন বাংলাদেশে ছিলাম তখনই মুক্তিযুদ্ধ-মিউজিয়মের জন্য টাকা তুলতে আনা হয়েছে কলকাতার সুরকার-গায়ক সুমন চট্টোপাধ্যায়কে। বোধহয় মোট পাঁচটা অনুষ্ঠান করেছেন তিনি—ঢাকায় এবং চট্টগ্রামে। প্রায় জয় করে নিয়েছেন বাংলাদেশের নবীন দর্শকদের। আশাতীত অর্থাগম হয়েছে উদ্যোক্তাদের। সুমনও অভিভূত বাংলাদেশের মানুষের এই উচ্ছ্বাসে। তবে সঙ্গে-সঙ্গে দেখেছি তা নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনাও সেখানে কম হয়নি। কেউ-কেউ সুরকার হিশেবে তাঁকে ততটা স্বীকার করতে চান না। কেউ-কেউ-তাঁকে নিয়ে এই হুল্লোড় অপছন্দের মনে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ-মিউজিয়মের জন্য টাকা তুলতে আরো কোনো 'সিরিয়স' শিল্পীকে আনা উচিত ছিল বলে ভেবেছেন তাঁরা। ভাবনার কি আর শেষ আছে? এই গ্রহণ-বর্জনের ধরণে ও ভাষায় বোঝা যায় দুই-বাংলার বাঙালি শেষপর্যন্ত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

এবারে চট্টগ্রামে যাওয়ার সুযোগও হয়েছিল। সেখানে আমন্ত্রক ছিলেন : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস, সংক্ষেপে 'বিটা'। বিটা যাকে বলে এন-জি-ও বা বেসরকারি সংস্থা তা-ই। বাংলাদেশে এলে এন-জি-ও শব্দটি মুহুর্মুহু শোনা যায়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে, সমাজে, এমনকী সংস্কৃতিতেও এন-জি-ও কথিত প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকার ব্যাপকতা আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। বিদেশী সাহায্যে এইসব বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলি গড়ে ওঠে—সাহায্যকারীদের মধ্যে থাকে ব্যক্তিগত ফাউন্ডেশন, আন্তর্জাতিক দাতা বা সাহায্য-সংস্থা, দাতা-দেশের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ইউনিট ইত্যাদি। সব রকমের সাহায্য—অর্থ, সরঞ্জাম, কারিগরি তো বটেই, সঙ্গে-সঙ্গে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ বা নির্দেশ। ছোটো-বড়ো অজস্র সংস্থা এভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। সবগুলোর প্রকৃতি আবার একরকমের নয়। কোথাও আন্তর্জাতিক উদ্যোগটা সরাসরি—কোথাও সরকারি মঞ্জুরি বা জাতীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার যোগ বা সহায়তা থাকে। তবে সকলেরই উদ্দেশ্য এক—উন্নয়ন। তা সে দারিদ্র্য মোচনই হোক কিংবা শিক্ষা স্বাস্থ্য সংস্কৃতি যে-কোনো ক্ষেত্রের প্রগতিই হোক। আগে আমরা বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট এইসব উদ্যোগকে যতটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখতাম, তা আর এখন অত সহজে পারা যাচ্ছে না। এদের সঙ্গে প্রগতিশীল ভাবনার মানুষেরাও নানাভাবে যুক্ত হচ্ছেন। তা ছাড়া বাংলাদেশে, সাম্প্রতিককালে, মৌলবাদের বিরুদ্ধে এইসব সংস্থার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লড়াকু ভূমিকাও চোখে পড়ছে সকলের। কিন্তু, প্রশ্ন একটা বোধহয়

থেকেই যায়। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা যেখানে খুব বেশি, সেখানে স্বদেশী উদ্যোক্তাদের দায়বোধের মধ্যে একটা বিরাট ফাঁকি রয়ে যায় কিনা। আত্মশক্তি ছাড়া আত্মোন্নয়ন কি সম্ভব? এইসব বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে জড়িত মানুষদের সঙ্গে কথা বলেও দেখেছি, এ ব্যাপারে তাঁদেরও দ্বিধা যে নেই তা নয়। তাঁদের কাছেই শুনেছি এইসব কর্মকাণ্ডের বহু অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচার যে সেখান থেকেই উঠে আসে তা সন্দেহ করার বেশ কারণ আছে।

তবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই ধরণের বেসরকারি সংস্থাতেই ফলপ্রসূ কাজকর্ম যে হতে পারে তা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারলাম চট্টগ্রামের বিটা-র সংস্পর্শে এসে। 'থিয়েটার ও রাজনীতি' বিষয়ে সেমিনার ছিল পরে। তার আগেই দু-দিন আমরা বিটার কর্মশালায় এসে দেখলাম, সর্বক্ষণ কী কর্মযজ্ঞ চলেছে। তাদের সামগ্রিক কর্মসূচির ব্যাপকতা টের পাওয়া যায় 'সংস্কৃতি : উন্নয়ন' এই নামের বুলেটিনগুলো হাতে নিলে। আমরা সকালে-সন্ধ্যায় যখনই গিয়েছি, দেখেছি কোনো সময় পতেঙ্গা বন্দরের জেলেদের নিয়ে, আবার কখনো চট্টগ্রাম শহরেরই রিকশাওয়ালা মজুর ছোটো-দোকানদার ইত্যাদির নিয়ে থিয়েটারের মহড়া চলেছে। নাটক তাঁরা নিজেরাই মুখে-মুখে রচনা করছেন নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে, আবহ-বাজনা বাজাচ্ছেন তাঁরাই। শুধু এক-একজন প্রশিক্ষক হয়তো আছেন পাশে দাঁড়িয়ে। কথাবার্তাও হল অভিনেতাদের সঙ্গে। গভীর উদ্দীপনা চোখে-মুখে। গ্রামে গিয়ে যখন এইসব মহড়া কিংবা অভিনয় হয়, তখন গ্রামের সমস্ত মানুষজন ভেঙে পড়ে। আর অভিনয়ের মধ্য দিয়েই নতুন চিন্তা বা নতুন শিক্ষা গ্রামের জীবনে সঞ্চারিত হতে থাকে। বিটা-র বুলেটিন পড়ে জানতে পারি, শুধু একটি-দুটি জায়গায় নয়, গ্রামে-গ্রামান্তরে এই আয়োজন। সুইপার কলোনিতে মাঠকর্মীদের মধ্যে, হরিজন সম্প্রদায়ের ভিতর কিংবা বস্তি এলাকায়। নিরক্ষর মানুষ, নারী, শিশু সকলের মধ্যে। নাম দিয়েছেন তাঁরা 'সমাজের নাটক'। ঢাকা থিয়েটারের সূত্রে 'গ্রামীণ থিয়েটার'-এর কথা শুনেছিলাম। এবার শুনছি 'সমাজের নাটক'। দুয়ের মধ্যে মিল আছে যেমন, অমিলও প্রচুর।

কথা হচ্ছিল, বিটা-র পরিচালক শিশির দত্তের সঙ্গে। বলছিলেন কীভাবে তৈরি হল বিটা। কত কঠিন গ্রামের একেবারে অভ্যন্তরে মন বদলানোর এই মৌলিক কাজে হাত লাগানো। পদে-পদে বাধা এবং বিপদ। মৌলবাদীরা অস্ত্র উঁচিয়ে আছে। কারণ এই কাজ যতটুকু সফল হবে ততটুকুই ধর্মীয় কুসংস্কার-অবিচার-অনাচারের ভিত নড়ে উঠবে, মৌলবাদীদের পায়ের তলার মাটি সরে যাবে। এটাই এখন বড়ো কাজ বাংলাদেশে। আওয়ামী লীগের ফিরে-আসা, শেখ হাসিনার ফিরে-আসা,

মুজিবের ফিরে-আসা সেজন্যই এত আশ্বাস জোগায় শিশির দত্তদের। ভাবছেন তাঁরা, এবার বোধহয় আরো উৎসাহ ও প্রত্যাশা নিয়ে কাজ করা যাবে। কাজটা সহজ হয়ে গেল তা নয়, কিন্তু পরিস্থিতির একটা মাত্রাবদল ঘটল। এখন আর মনে হবে না অসম্ভব এই উত্তরণ। আবার নতুন করে আরো গভীরে কাজ করার জন্য তৈরি হচ্ছেন শিশিরবাবু। বিটা-র মতো এন-জি-ও এই কাজে সহায়ক বলেই মনে করেন তিনি।

বিটা-র কাজ চট্টগ্রামে কতদূর বিস্তৃত তা দেখানোর জন্যই শিশির দত্ত জনৈক কর্মীর অভিভাবকতায় আমাদের পাঠিয়ে দিলেন কক্সবাজার-বন্দরে। কক্সবাজারে আমাদের মন ভরেনি। নতুন কিছুই লাগেনি সমুদ্র-অভ্যস্ত আমাদের চোখে। তা ছাড়া বর্ষার মধ্যে হিমছড়িতে যাওয়ার সুযোগও ঘটেনি যে পাহাড়-জঙ্গল-সমুদ্র একসঙ্গে দেখব—শুধু পথেব জঙ্গল ও টিলাতেই খুশি থাকতে হয়েছে। কিন্তু তা সুদে-আসলে পুষিয়ে গেল কাছেই রামু গ্রামে গিয়ে। পাশেই পুরোনো বৌদ্ধমন্দির, তবে আমাদের মন কাড়ল রামু-র 'জগৎ জ্যোতি শিশুসদন'। এটাও একটি এন-জি-ও। ইতালীয় সাহায্য—এর চেয়ে বিশদ কিছু জানি না। অনাথ ও ভাগ্য-বিড়ম্বিত অবহেলিত শিশুদের আবাসস্থল। প্রায় শ-খানেক শিশু এখানে বড়ো হচ্ছে, তারা উপজাতীয় ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। চাকমা, মারমা, মুরং, ত্রিপুরি ও রাইকান সম্প্রদায়ের শিশু। চমৎকার বাড়িটির স্থাপত্য, বিদেশী ছোঁয়া আছে বোঝা যায়, তবে চারদিকের নিশ্চুপ প্রাকৃতিক পরিবেশে সত্যিই মানানসই। আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছোই, তখন গান ভেসে আসছে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে। প্রসূন বড়ুয়া অনুপস্থিত, তাঁর স্ত্রী লোপা বড়ুয়া গান শেখাচ্ছেন। ওঁরা দুজনেই পরিচালক। লোপা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখালেন যা কিছু দর্শনীয়। এই শিশুসদনের অনাথ শিশুদের সঙ্গেই যৌথ নাট্য কার্যক্রম বিটা-র। সে-কারণেই দেখতে পাঠিয়েছেন শিশিরবাবু। ছোটোদের সঙ্গে আলাপ্ হল, খুব সপ্রতিভ, অনুরোধ মাত্রই 'আমার বন্ধু' আর 'রাজপুত্রের অভিযান' নাটক দুটির কয়েকটি দৃশ্য দেখিয়ে দিল ছড়ানো মাদুরের ওপরই। অদ্ভুত কেটেছিল কয়েকটি ঘণ্টা। কক্সবাজার-বন্দরে ফিরে এসেও তার রেশ যায়নি। বাসে ওঠার আগে বাক্‌খালি খালের ধারে হাঁটতে গিয়ে দেখি গত দু-তিন দিনের বৃষ্টি আর ঝোড়ো বাতাসে মাছধরার নৌকোগুলো সমুদ্র থেকে সরে এসে আশ্রয় নিয়েছে সেখানে, তাদের রঙিন পতাকাগুলো পত্‌পত্ করে উড়ছে।

চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মৌলবাদীদের প্রতাপ নিয়ে কাগজে খুব পড়তাম। সেখানে গিয়ে কিন্তু সে-সবের কিছুই টের পাইনি। অত অল্পতে অবশ্য পাওয়াও যায় না। তাছাড়া ঝিরঝিরে বৃষ্টিতেই ঘুরতে হয়েছে অনেক সময়। রাস্তাঘাট নির্জন।

তবু তারই মধ্যে দেখা হল অনেকের সঙ্গে, বিশেষত তরুণ লেখককর্মীদের সঙ্গে। নতুন জমানা নিয়ে কথাবার্তাও খানিক। শান্ত প্রত্যাশা সেখানেও। এই আবহাওয়াতেই বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে এলাম চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ফুলকি'-র চত্বরে—শীলা মোমেনের ফুলকি।

ফুলকি কিন্তু এন-জি-ও নয়। আবুল মোমেন ও শীলা মোমেন এবং তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের হাড়-জল-করা পরিশ্রমে তৈরি। পদে-পদে তাই সমস্যা—অর্থ, লোকবল, মনোবল ইত্যাদি সবকিছুর। সে-কারণেই তার চরিত্রটাই আলাদা। আমাদের খুব চেনা লাগে। সে-কারণে এখানে এসে আরামও লাগে। তাঁরা নিজেরাই বলেছেন, ফুলকি হল "ছোটোদের সাংস্কৃতিক জগৎ"। আরো স্পষ্ট করে : "এক ধরণের মুক্ত স্কুল"। রবীন্দ্রনাথের কথা তাই বারবার ওঠে তাদের উচ্চারণে। শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করাই তাঁদের লক্ষ্য। পাঁচটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা : 'সহজপাঠ', যাকে বলা হচ্ছে নিরীক্ষাধর্মী প্রাথমিক বিদ্যালয় ; 'সুকুমার' ছোটোদের পাঠাগার ; 'গ্যালিলিও' ছোটোদের বিজ্ঞান গবেষণাগার 'তানসেন' সংগীত-শিক্ষায়তন ও সংগীত-সংগ্রহশালা এবং 'নন্দন' ছোটোদের চারুকলা চর্চা কেন্দ্র। ফুলকি-র অঙ্গনে ঢুকতে গিয়েই রাস্তার ধারে একটি বইয়ের দোকান—তার নাম 'ডিরোজিও'—জানি না ফুলকি-র সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে কিনা। পরোক্ষে যে আছে তা বুঝতেই পারা যায়। প্রত্যেকটি ঘরে ছোটো ছেলেমেয়েদের তন্ময় চোখমুখ। সত্যিই একটা আলাদা জগৎ। তারই একটি খালি ঘরে চাটাইয়ে বসে পড়লেন কয়েকজন লেখকশিল্পী, তাঁরা সকলেই ফুলকি-র নিকটবন্ধু, আপনজন। লেখা পড়া হল। কথাবার্তা হল। সময়ের পালাবদল নিয়ে সকলেরই খুশি, প্রত্যাশা ও দায়িত্ববোধের উদ্বেগ টের পাওয়া গেল। ফুলকি ছোটো-ছোটো বইও প্রকাশ করে—কয়েকটি হাতে এল—যেমন, 'পম্পেই' বা 'চাঁদের জগতে', 'মুক্তিযুদ্ধ ও শিশু' বা তাদের 'সাময়িকী'। চমকে যেতে হয় প্রকাশনাগুলোর সৌন্দর্যে।

রাত্রে কথা হয় আবুল মোমেনের সঙ্গে। আবুল ফজলের বাড়ি 'সাহিত্য নিকেতন'-এ থাকা কিংবা কথাবলাই তো এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। শুধু আবুল ফজলেরই না, তাঁর ছেলে আবুল মোমেনের গদ্যেরও আমি অনুরাগী। চট্টগ্রামের বহু সাংগঠনিক কাজের সঙ্গেই মোমেনের যোগাযোগ। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যখন নতুন পরিস্থিতিতে নতুন সম্ভাবনার কথা বলেন, তখন আমরাও উন্মুখ হয়ে শুনি।

ঢাকায় ফিরে এসে বন্ধুদের বাড়ি দাওয়াত খেতে-খেতেই কেটে যায় সময়। তার সঙ্গে দীর্ঘ জমাট আড্ডা। এবার অবশ্য আড্ডার সুর একটু আলাদা। মাঝে-মাঝে

সুর কেটেও যাচ্ছে প্রবল বিতর্কে। নতুন পরিস্থিতি নিয়েই তর্ক। যাঁদের কথা বলছি তাঁরা প্রত্যেকে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্বে কিংবা স্বাধীনতার পরের নৈরাশ্যের পর্বেও লড়াই চালিয়ে গেছেন নিজের-নিজের মতো করে। তাঁরা কেউ লেখক, কেউ গায়ক, কেউ শিল্পী, কেউ সংগঠক। কিছু আগেও হতাশা ও নৈষ্কর্ম্য ক্রমশই তাঁদের গ্রাস করছে অনুমান করে বিষণ্ণ বোধ করেছি। আজ তাঁদের মুখের ওপর থেকে সেই কালো ছায়া কিছুটা সরে গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু পুরোটা নিশ্চিন্ত কি তাঁরাও হতে পারেন? অভিজ্ঞতাই হতে দেয় না। তাই কথায়-কথায় একটা স্বস্তির ভাব ও প্রত্যাশাও যেমন থাকে, তেমনি থাকে অনিশ্চয়তার বোধ, আশঙ্কা ও ভয়ও হয়তো কিছুটা। কতদিন টিকবে, কতদূর কী করা যাবে? এইসব প্রশ্ন সবসময় মাথায় গিজগিজ করে। আর তারই জেরে হয়তো প্রায়ই মতভেদ ঘনিয়ে ওঠে।

কথাটা উঠেছিল আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর সাংবাদিক-লেখা নিয়ে। 'ভোরের কাগজ' পত্রিকায় নিয়মিত বেরোয় তাঁর লেখা। তারই কোনো-কোনোটাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে কিছু-কিছু সমালোচনা তিনি করেছেন তীব্র ভাষায়। যেমন, খুবই সম্প্রতি, বিরাট এক সাঙ্গোপাঙ্গের বাহিনী নিয়ে হাসিনার বিদেশ-ভ্রমণের বিরুদ্ধে। 'ভ্রমণ' হয়তো ঠিক নয়, কাজের জন্যই—কিন্তু কাজ কতটুকু হয়েছে? তার বদলে ভ্রমণের বিলাসটুকুই কি বেশি হল না? এরকম সমালোচনা আরো উঠেছে এবং উঠছে হাসিনা সম্পর্কে—যেমন, তাঁর সাম্প্রতিক সাজগোজ কিংবা নির্বাচনের আগে ও পরে হজ-ফিরতি ধর্মীয় টুপি পরে বেরোনো, ইত্যাদি। এগুলোর কোনো-কোনোটা হয়তো নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার এবং তার যথোচিত ব্যাখ্যাও আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এরকম কথাবার্তা যে উঠছে সেটাই বড়ো ব্যাপার। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা নিয়ে কারো-কারো আপত্তি। গাফ্ফার চৌধুরীর মনোভাব নিয়ে কারোরই সন্দেহ নেই। আওয়ামী লীগের ফিরে-আসায় তাঁর অখুশি হওয়ার কোনো কারণই নেই এবং যে-সমালোচনা তিনি করছেন তা যে বন্ধুরই সমালোচনা সেটা সকলেই মানেন। কিন্তু কারো-কারো মনে হচ্ছে, এরকম একটা স্পর্শকাতর মুহূর্তে যে-কোনো সমালোচনাই ভুল একটা আবহ তৈরি করবে। বরং প্রশ্নহীন সমর্থনেরই প্রয়োজন অন্তত কিছুকালের জন্য। বাংলাদেশের আবেগপ্রবণ সাধারণ মানুষের কাছে তা না হলে খুঁটিনাটি প্রশ্নগুলোই অতিকায় হয়ে উঠবে। একটা বিরুদ্ধতার পরিবেশ তৈরি হবে। ইত্যাদি। যিনি বলছিলেন তিনি খুব জোরালোভাবে শরীর দিয়েই বলছিলেন। কিন্তু দেখা গেল অন্য অনেককে তা তেমন নাড়া দিতে পারল না। তাঁরা আগের মতোই 'ক্রিটিক্যাল সাপোর্ট'-এর পক্ষপাতী। তা না হলে কী বিপদ হতে পারে তা তাঁরা মুজিবের সময়েও দেখেছেন।

অবশ্য সে-সময়ে কী করা উচিত ছিল এবং কী করা উচিত ছিল না, তা নিয়ে সব জটের সমাধান হয়ে গেছে তা নয়—কিন্তু সতর্ক না থাকলে বিপদ যে যে-কোনো পথেই আসতে পারে তা বোঝা গেছে। এই সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই নির্বাচনের আগে অসহযোগ-আন্দোলনের সময় জাতীয় পার্টি বা জামাত-ইসলামের সঙ্গে সমঝোতা কারো-কারো অত্যন্ত আপত্তিজনক ও সুবিধাবাদী বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন কেউ-কেউ তাকেই প্রাজ্ঞ কৌশল বলে মনে করতে পারছেন—পরেও পারবেন কিনা তা অবশ্য এক্ষুনি বলা যাবে না।

এ সমস্ত কথাই আড্ডাতে ওঠে। আরো নানা প্রসঙ্গ। ছাত্ররাজনীতির নিষেধ সম্পর্কিত রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক অবশ্য একটু পুরোনো। তবে ৭ নভেম্বরে ছুটি বাতিল করা উচিত হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ এখন খুবই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ওই দিন রাজনীতিতে জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাই এক হিশেবে তো "স্বাধীনতা দিবস"! ওইদিনই নাকি জাতীয় স্বাধীনতা পূর্ণতা পেল। খালেদা জিয়ার আমল পর্যন্ত তা সরকারিভাবে সমারোহে পালিত হত। এ-বছর অনুষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু ছুটি বাতিল করা হয়নি। এটা কি আপোস, না সঠিক কৌশল? বি-এন-পি আমলের বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্তদের যে পুনর্বহাল করা হয়েছে, তাতে সবাই খুশি। বিদেশে পোশাক-রপ্তানির সংকট নিয়ে একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তবে ঘুরে-ফিরে সবচেয়ে যে-প্রসঙ্গ ওঠে, তা হল জলের সমস্যা। এ বিষয়ে সকলেই একমত, এই সমস্যা না মিটলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে না, হাসিনার অবস্থাও অচিরে খারাপ হবে। এর নৈতিক দিকটা না হয় বাদ দেওয়াই গেল। বাংলাদেশে অনেকের সঙ্গে কথা বলেই দেখেছি : পশ্চিমবঙ্গের নদীতেও যে জল নেই, ভাগীরথী যে বছরের অধিকাংশ সময়ই শুকনো হয়ে থাকে, নদীর মাঝখানে মস্ত চর পড়ে, লোকে অনেকটাই হেঁটে যেতে পারে—তা কারোরই প্রায় জানা নেই। এই ধারণাটা গেঁথে দেওয়া হয়েছে—বাংলাদেশের নদীতে জল নেই এবং পশ্চিমবঙ্গের নদীতে জল থই-থই করছে! এ যে দুই অভাবীর সংসারের টানাটানি তা কম লোকই হিশেবে রাখে। আমাদের বন্ধুদের আড্ডায় অবশ্য অজ্ঞতাটা এত দূর নয়। কিন্তু তাঁরা সকলেই আশা করছেন : ভুটানের জল পাওয়া যাবে, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের সঙ্গেও রফা হবে ভারত সরকারের সক্রিয়তায়, জ্যোতি বসু-র সরকারও সহৃদয়তার হাত বাড়াবে এবং শেষ পর্যন্ত চুক্তি একটা হবেই। কেননা এর ওপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশের চাষবাস ও জল-পরিবহণই শুধু নয়, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ-ও। দিল্লিতে সত্যিই যেদিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, তখন খুব করে মনে পড়ছিল ওই আড্ডার

দিনগুলোর কথা। এবার কি বন্ধুরা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক করিডর বা বাসের যাতায়াত-ব্যবস্থার কথা বলাবলি করছেন?

ঢাকায় থাকতে আরেকটা আলোড়নের বিষয় ছিল তেভাগা সংগ্রামের পঞ্চাশ বছর পূর্তি। আমরা জানি, ১৯৪৬-এ তেভাগার একটা বড়ো ক্ষেত্রই ছিল পূর্ববঙ্গ। নাচোল, সুসং, নেত্রকোণা, জামালপুর ইত্যাদির কথা অনেক শুনেছি। এখন ১৯৯৬-এ সারা দেশ জুড়ে তার স্মরণ-অনুষ্ঠান চলেছে। পত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র বেরিয়েছে—তেভাগা সংগ্রামের ঐতিহ্য ও ইতিহাস নিয়ে অনেক প্রবন্ধ সেখানে, অনেক সমকালীন ফটো। ইলা মিত্র, বিনয় কোঙার, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, মেহবুব জাহেদি, অবনী লাহিড়ী ও নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানো হয়েছে সংবর্ধনা। সারা দেশ ঘুরে-ঘুরে তাঁরা সংবর্ধনা গ্রহণ করেছেন। ইলা মিত্রকে দেখতে দলে-দলে মানুষ এসেছে নাচোলে। পত্রিকায় পড়ছি : "রানীমার আগমনে জেগেছিল নাচোল।" যশোরে, রাজশাহীতে, ঢাকায় সর্বত্র সভা-অনুষ্ঠান। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তো এতটা অকল্পনীয়।

মাঝখানে কুমিল্লায় একদিন ঘুরে এলাম। চমৎকার রাস্তা, কিন্তু আশেপাশেই দু-একটা করে গাড়ি উলটে পড়ে আছে দেখলাম, এক জায়গায় তিনটি লাশ পাশাপাশি শোয়ানো। কুমিল্লাকে খুব শান্ত শহর মনে হল। শহরের বাইরে অদ্ভুত সবুজ। ময়নামতির বৌদ্ধ বিহার—বিশেষত নব শালবন বিহার—দেখতে-দেখতে সন্ধে। ঢাকা শহরে ঢুকতে গিয়েই বিরাট জ্যামে পড়লাম। রিকশার শহর ঢাকায় এখন মোটরগাড়ির ভিড়ও কম নয়। ঢাকার এই নতুন ব্যাধি নিয়ে নগরপালেরা খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। কাজকর্ম প্রায় শিকেয় উঠেছে। শুধু এই ব্যাপারেই নয়, নানাদিক থেকেই কলকাতাবাসী ঢাকায় এসে মনে করতে পারেন, তিনি এখন কলকাতাতেই আছেন। কাগজ খুললেই খবর : বালিকা ধর্ষিত, প্রাইভেট কোচিং বন্ধ করতে গিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ নির্যাতিত, শেয়ার-বাজারের দর নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষও, বিদেশী শিল্পোদ্যোক্তার কাছে বিনিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্জি, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বাহিনীর সন্ত্রাস, ইত্যাদি ইত্যাদি।

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি মুজিবুর রহমানের একটি প্রতিকৃতি আঁকায় ব্যস্ত। কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন, সামান্যই বাকি। প্রধানমন্ত্রীর জন্যই নাকি ছবিটি তিনি আঁকছেন। কাইয়ুম চৌধুরীর সঙ্গে সামান্য ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল ১৯৮৭-তে—কিন্তু তাঁর ছবির সঙ্গে, তাঁর অন্যান্য কাজের সঙ্গে পরিচয় তো তার আগে ও পরে অনেকদিন। বাংলাদেশের ভালো যা বই বেরোয়, তার প্রচ্ছদ আঁকবেন কাইয়ুম চৌধুরী, এটা আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। আর তার ছবিতে,

বস্তুত ছবির প্রতিলিপিতে, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছি আমরা বাংলাদেশের নিসর্গ ও নৌকো, বাংলাদেশের গ্রাম ও মানুষ। কখনো সেখানে লোকশিল্পের ছন্দ, কখনো তা অ্যাবস্ট্রাক্ট, নিরীক্ষাময়। মুজিবের এই প্রতিকৃতি একেবারেই অন্যরকম। সময়টা যেন ধরা আছে তার মধ্যে। ইতালীয় রেনেসাঁসের শিল্পীরা যিশুর জীবন নিয়ে, যিশুর পুনরুত্থান নিয়ে ছবি আঁকতেন। বেল্লিনির কিংবা মান্তেঞা-র খ্রিষ্ট-পুরাণের প্রতিকৃতিতে থাকত নিখুঁত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ স্পষ্টতা, যেন পাথর কুঁদে তৈরি—অথচ তারই মধ্যে অতলান্ত রহস্য, প্রায় মিস্টিক। কাইয়ুম চৌধুরীর 'মুজিব' দেখতে-দেখতে এই সবই আসা-যাওয়া করতে থাকে মনে। এও তো মুজিবের পুনরুত্থানই। গভীর বেদনার সঙ্গে কঠিন দৃঢ়তার এক আশ্চর্য সমন্বয়। অভিজ্ঞতার সমস্ত ইতিহাসটাই যেন বলা হয়ে যায়। চিন্তামগ্ন স্বপ্নাচ্ছন্নতার আধার মুজিবের এই মুখ। বাংলাদেশ কি সেই মুখ নিয়েই আবার জেগে উঠবে?

রচনাকাল : ১৯৯৭

ভ্রমণের বাংলাদেশ

বন্ধুরা দেখা হলে প্রায়ই আমাকে ঠেস দিয়ে বলেন, "বাংলাদেশ থেকে কবে এলে", কিংবা যাঁরা আরো রসিক তাঁরা বলেন, "এখানে কতদিন আছ!" দোষের মধ্যে এই, গত পনেরো বছরে যে-কবার বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ করে নিয়েছি তার যোগফল আপাতত বারোয় পৌঁছেছে। উদ্দেশ্য বেড়ানোই। কিন্তু সেই সঙ্গে কখনো থিয়েটার দেখা, কখনো স্নেহভাজন কারো বিয়ের আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া, কখনো রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন বা পয়লা বৈশাখের উৎসবে হাজির হওয়া, ইত্যাদি অছিলা থাকে। গুরুগম্ভীর সেমিনারও কখনো। ভৌগোলিক দিক থেকেও এত কাছের এই দেশ, বহরমপুর বা মালদা বা শিলিগুড়ির চেয়ে বেশি তো কখনোই নয়, তবু লোকে চোখ বড়ো-বড়ো করে আমার এই ঘন-ঘন 'বিদেশ' যাওয়া নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে, তার কারণ তো একটাই, পাসপোর্ট-ভিসা না করে সেখানে যাওয়া যায় না। আর উদ্যোগ নিয়ে তা করা হয় না বলেই যাব-যাব করেও যাঁদের যাওয়া হয়নি, মনের মধ্যে ইচ্ছেটাই শুধু চাপা পড়ে রয়েছে, তাঁদেরই বোধহয় আমার যাওয়া নিয়ে এত চোখ টাটায়! না গিয়ে কী হয় তা জানলাম। কিন্তু গিয়ে কী হয় তা-ও দেখেছি। পূর্ববঙ্গ নিয়ে পূর্বস্মৃতি বা পারিবারিক স্মৃতি নেই, হয়তো একটু উদাসীনতাই আছে, এমন জনকেও দেখেছি, একবার ঘুরে এলে কী রকম আবেগে আত্মহারা হয়ে যান।

অনেক সময়ই ভাবি, কারণটা কী? প্রকৃতি? একদা পূর্ববঙ্গ নিয়ে 'স্মৃতিচারণ' যাঁরা করতেন, তাঁদের গল্পে থাকত, থইথই বর্ষায় কীভাবে খুদে নৌকোয় লগি ঠেলে বাড়ির দাওয়া থেকেই যেতে হচ্ছে বাজারে বা ইস্কুলে। সে-পূর্ববঙ্গ আর নেই। বহু নদীতে চড়া পড়েছে, জলা জমি ভরাট করে রাস্তা হয়েছে, বাড়ি হয়েছে। নদী হয়তো পড়বে পথে-পথে, কিন্তু তার ওপর ব্রিজ হয়েছে, কিংবা বিদেশ থেকে কেনা দৈত্যাকার বার্জ পার করে দিচ্ছে বাস-লরি। সেই বার্জের মাথায় দাঁড়িয়ে হয়তো হু-হু করে ওঠে শরীর-মন এখনো। কিন্তু কলকাতার মানুষ সবাই কি জানেন, যে-বরিশালে যাতায়াত নিয়ে একসময় কত কী হাসিঠাট্টা করা হত, এখন চৌরঙ্গিতে গাড়িতে উঠে, পা না ভিজিয়েই, চলে যাওয়া যায় হুশ্ করে! বন্যার সময় জল-ডাঙা এক হয়ে যায় বহু জায়গায় এখনো, কিন্তু সে কি আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও হয় না? বন্ধুরা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,

পটুয়াখালি নিয়ে যাবেন বর্ষায়, এই দেখাতে যে পূর্ববঙ্গ আছে পূর্ববঙ্গেই। বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য পূর্ববঙ্গেও, সে আর এমন কী কথা। শরৎ, হেমন্ত আর বর্ষার বাহার হয়তো আজও আকুল করবে স্বদেশ-বিদেশের ভ্রমণার্থীকে। ভরা বর্ষায় যাইনি কখনো—কিন্তু, ওখানকার বন্ধুকবিরা খোঁটা দেন, বর্ষায় না গেলে নাকি বাংলাদেশ দেখাই হয় না। কিন্তু সেই ঝুঁকি নিতে বলা যায় কজনকে!

কোনো একটা জায়গা বেড়াবার জায়গা হতে হলে কী কী থাকা দরকার? সমুদ্র, পাহাড়, জঙ্গল? বাংলাদেশে সমুদ্র বলতে তো কক্সবাজার (সাহেবরা নির্ভুল বলবেন 'কক্সেস বাজার')। চট্টগ্রাম শহরের বোল্ডার-ছড়ানো পতেঙ্গা দেখতেও যাওয়া যায়। আর কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত রাস্তা তো দুরন্ত। একটু কষ্ট করলে পটুয়াখালি থেকে কিছুটা দুর্গম কুয়াকাটা। যা হয়, প্রত্যেক সমুদ্রেরই আলাদা-আলাদা রূপ, এখানেও তা-ই। কক্সবাজারে চওড়া সৈকত, কুয়াকাটায় সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়। মনে হতে পারে, পুরী-কোভলম দেখেছে যে-বাঙালি বৈচিত্র্যময় সমুদ্রে ঘেরা সেই ভারতের মানুষকে আর নতুন কী দেখাবে বাংলাদেশ? তাই কি? প্রত্যেকটি জায়গারই আছে আলাদা স্বাদ। বাইরে থেকে এক মনে হলেও সত্যি কি এক? চট্টগ্রামের অনুচ্চ জালালাবাদ পাহাড়, পার্বত্য চট্টগ্রামের পথে রাঙামাটির উঁচুনিচু রাস্তা আর ছায়াচ্ছন্ন টিলা, কাপ্তাই লেকের স্বচ্ছ নীল জল, বান্দরবানের নদী-পাহাড় আর সবুজের সমারোহ, ময়মনসিংহ যাওয়ার আগে বাঁকাপথে কিশোরগঞ্জ-নীলগঞ্জের সবুজ, সিলেটের পাহাড়ি ঢালে চা-বাগান—এসব আকর্ষণ করবে সেই বাঙালিকেও যিনি হিমালয়ে অহরহ ঘুরে বেড়ান, মাঝে-মাঝেই গা এলান সাঁওতালপরগনায়, কিংবা ডুয়ার্সের জঙ্গলে যান বছরে অন্তত এক-আধবার। যদি না করে তবে বুঝতে হবে তিনি সত্যিকারের ভ্রমণরসিক নন।

জঙ্গলও আছে বাংলাদেশে, ক্রমশই ক্ষীয়মাণ সেই জঙ্গল—ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইলে, সিলেট-সুনামগঞ্জে বা রংপুর-দিনাজপুরে। জঙ্গলের মানুষজন নিয়ে তারও একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। এমনকী বেশি জায়গা জুড়ে যে সবুজ ধানি জমি—এই তো দু-বাংলাতেই সবচেয়ে চোখে পড়ার—কিন্তু বাংলাদেশে বাসে বা ট্রেনে বা স্টিমারে যাতেই পাড়ি দিই না কেন, মনে হয় তা যেন আরো ছড়ানো, মনে হয় সবুজটা যেন একটু বেশি সবুজ। বাংলাদেশের সুন্দরবনও আলাদা, আমাদের সুন্দরবন নয়।

একটা দেশ বেড়াতে গিয়ে প্রকৃতিই বা শুধু কেন, গ্রাম-শহর জনপদও কি কম দ্রষ্টব্য। যতবার বাংলাদেশে গেছি ঢাকাতেই থাকতে হয়েছে বেশি সময়। উপর্যুপরি দাওয়াত-এর প্রাণান্তকর আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে যখনই সুযোগ পেয়েছি ঢাকার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কখনো একা কখনো বন্ধুদের সঙ্গে, পায়ে

হেঁটে কিংবা ঢাকার সেই বিখ্যাত সাজানো-গোছানো ও বিপজ্জনকভাবে দ্রুত রিকশায় বা ডিজেলের ঝাঁঝ ছড়ানো অটোতে, ওরা যাকে বলে বেবি-ট্যাক্সি। প্রথম-প্রথম বয়সের জোরে হাঁটতেই চাইতাম বেশি—পুরোনো ঢাকার অলিগলিতে, বুড়িগঙ্গার ধারে, কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা শহিদমিনার বা বাংলা একাডেমির সংলগ্ন খোলা হাওয়ায়, রমনার মাঠের ভেতরে-বাইরে। এমনকী বড়োলোকের পাড়া ধানমন্ডিতে গিয়ে লেকের ধারে বসেছি। আরো উজিয়ে মডেল-টাউন বনানী, গুলশান বা উত্তরা-তে গিয়ে বুঝেছি, বুড়িগঙ্গার ধার থেকে গ্যান্ডারিয়া, ওয়াড়ি, পুরানা আর নয়া পলটন, সেগুনবাগিচা আর মগবাজার, বড়োজোর লালমাটিয়া আর মহম্মদপুর পর্যন্তই ঢাকার নিজস্বতা। প্রথম দিন, মনে আছে, শুধুই বাংলায় লেখা সাইনবোর্ডগুলো পড়ছিলাম বিস্ময়ে। একাধিক বইপাড়ায়—তা সে প্রাচীন বাংলাবাজার বা নিউমার্কেট, অধুনালুপ্ত স্টেডিয়াম বা নবতম আজিজ মার্কেট যেখানেই হোক—বাংলাদেশের বই ও পত্রপত্রিকা খুঁজতাম আঁতিপাতি করে। মহাশ্বেতা দেবীর মতো আমিও তো মনে করি, নতুন জায়গার খাবার না খেলে সে জায়গার সঙ্গে আত্মীয়তাই হয় না। হাঁটতে-হাঁটতে সে-সব চেখে দেখতাম—বাখরখনি আর মাঠা থেকে শুরু করে ভুল বানানের রেস্তোরাঁ 'নিরব'-এর ভর্তা-বিচিত্রা—কিছুই বাদ যেত না। শুধু ঢাকা নয়, ঢাকার বাইরে বেশ কয়েকটি মফস্বল শহরেও ঢুঁ মেরেছি। সেই সব ছোটো শহরের মেজাজের ভিন্নতা যাঁরা চিনে নিতে পারেন, তাঁরাই জানেন, শুধু ছোটো বলেই নয়, নানা দিক থেকেই তাদের রস আলাদা। বড়ো শহরের বিশ্রী চিৎকার আর ঘেমো ভিড়ের পাশে কিছুটা নীরব, কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ নয়, এই মফস্বলি হাওয়া। রাস্তা বা বাড়িঘরের বিন্যাস, দোকানবাজারের সাজসজ্জা, লোকজনের চালচলন, সবচেয়ে বেশি শহরের পাশের নদীটি—রাজশাহীর পাশে পদ্মা, বগুড়ার পাশে করতোয়া, খুলনার পাশে রূপসা, ফরিদপুরের পাশে কুমার, ময়মনসিংহের পাশে পুরোনো ব্রহ্মপুত্র, চট্টগ্রামের পাশে কর্ণফুলি, চাঁদপুরের পাশে ডাকাতিয়া আর মেঘনা—এই সমাবেশের কি তুলনা আছে! এ ছাড়া শহরে যা-যা থাকে—নানা বিষয়-নির্ভর মিউজিয়ম, ভিন্ন-ভিন্ন আকারের বা চরিত্রের পার্ক, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে ভাস্কর্যমূর্তি—তা ঢাকাতে তো থাকবেই, মফস্বল শহরেও কমবেশি চোখে পড়বে। হাঁটতে-হাঁটতে এসব দেখাও ভালো বেড়ানোরই অঙ্গ।

ফ্রান্স-ভ্রমণকারীকে যদি লুভ্‌র্ দেখতেই হয়, তবে বাংলাদেশ-ভ্রামণিককে কেন দেখতে হবে না ঢাকার জাতীয় জাদুঘর বা শিল্পকলা একাডেমীর গ্যালারি? ঢাকার বড়ো-বড়ো অফিসে চিত্রকলা বা ভাস্কর্যের সম্ভার ঘুরে দেখিয়েছিলেন আমার এক বন্ধু। সে-সময়েই দেখেছি এস এম সুলতানের সুবিশাল ক্যানভাস—বাংলাদেশের

প্রকৃতি আর মানুষকে 'নাঈভ' দৃষ্টিতে দেখার সেই প্রচণ্ডতা। ঢাকাতেই হয়তো সুযোগ পাওয়া যাবে সকলের ছবি বা ভাস্কর্য দেখার, তবু ঢাকার বাইরেও যেতে হবে—ময়মনসিংহ শহরের উপকণ্ঠে 'জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা'-য় কিংবা নড়াইলে সুলতানের সুবিখ্যাত ডেরায়। কামরুল হাসান বা সফিউদ্দিন আহমেদকে, আরো অনেককেই অবশ্য বেশি পাওয়া যাবে জাতীয় জাদুঘরে। কিংবা ঢাকাতে ছড়ানো ব্যক্তিগত সংগ্রহে। কবে এমন দিন আসবে যখন বাংলাদেশের ভ্রমণকারীকে সুপরিকল্পিতভাবে এসব দেখানোর ব্যবস্থাও করবেন কর্তৃপক্ষ?

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান দেখার জন্য যাঁরা বেড়াতে ভালোবাসেন, এমনকী স্বতন্ত্রভাবে পুরাতাত্ত্বিক উৎসাহ যাঁদের প্রবল, তাঁদেরও খোরাক আছে বাংলাদেশে। ঢাকা পুরোনো শহর—সেখানকার সপ্তদশ শতকের লালবাগ দুর্গ বা বড়ো ও ছোটো কাটরা বা ইওরোপীয় রেনেসাঁস-স্থাপত্যে গরীয়ান নবাবপ্রাসাদ আহসান মঞ্জিল থেকে শুরু করে কার্জন হল পর্যন্ত ইতিহাসের কালানুক্রমে অনেক কিছুই দেখার। আর সাম্প্রতিক গৌরবময় লড়াইয়ের সাক্ষ্য শহিদ-মিনার ও স্মৃতিসৌধ তো আছেই। একটু বাইরে গেলে সোনারগাঁও প্রাচীন ইতিহাসের কীর্তিতে সমৃদ্ধ। আর সারা বাংলাদেশ ঘুরতে পারলে তো কথাই নেই। স্থলপথে বাংলাদেশে ঢুকলে প্রথমেই পড়বে খুলনা-বাগেরহাটের বিখ্যাত 'ষাট গম্বুজ মসজিদ'—সুলতানি আমলের স্থাপত্যে তৈরি এটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো এবং বোধহয় শ্রেষ্ঠ মসজিদ। বাগেরহাটে আরো অনেক মসজিদ আছে। আর সারা বাংলাদেশ ধরলে তো উন্নত স্থাপত্যের মসজিদ সর্বত্র ছড়ানো—যাদের নির্মাণকাল পঞ্চদশ শতক থেকে সাম্প্রতিক পর্যন্ত। স্থাপত্যের বৈচিত্র্যও লক্ষ করবার। ঢাকায় দাঁড়িয়ে আছে এই শতকেরই বায়তুল মুকাররাম মসজিদ—শহরে ঘুরতে-ফিরতে চোখে পড়বেই এর চমৎকার স্থাপত্য। মন্দিরও সংখ্যায় অনেক। মন্দির-স্থাপত্যের সবরকম রীতিই লক্ষণীয়—রেখ, বাংলা, চালা, রত্ন বা তাদের মিশেল সবই আছে, পশ্চিবঙ্গের মতোই। ঢাকাতেও আছে ঢাকেশ্বরী মন্দির যাকে নিয়ে অনেক কাহিনী। চট্টগ্রামের কক্সবাজার থেকে রামুতে গিয়ে দেখার সুযোগ আছে বৌদ্ধ মন্দির। কক্সবাজারে বৌদ্ধ প্যাগোডা। কুমিল্লা শহর থেকে অনায়াসে চলে যাওয়া যায় প্রাচীন যুগের ময়নামতীতে। বৌদ্ধ মন্দির বা বিহার বা স্তূপের ভগ্নাবশেষ লালমাই-ময়নামতীর নিচু ছোটো-ছোটো পাহাড়-অঞ্চলে বিস্তারিত। এগুলোও ঘুরে-ঘুরে দেখার। তবে সবই প্রায় গেছে, শুধু পোড়ামাটির ফলক বেশ কিছু রক্ষিত আছে স্থানিক মিউজিয়মে। পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন পূর্ববঙ্গে, অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশে যে বিপুলভাবে পাওয়া যায় তার কথা অনেকেরই জানা। তবে তা চোখে দেখতে গেলে যেতে হবে উত্তরবঙ্গে, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে।

বগুড়া, যাকে বলা হয় উত্তরবঙ্গে ঢোকার দরজা, সেখান থেকে চলে যাওয়া যায় প্রায় সবকটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে। সবচেয়ে কাছে, প্রায় উপকণ্ঠে বলা যায়, মহাস্থানগড়। অখণ্ড বাংলারই সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্যনিদর্শন। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে গড়ে-ওঠা পুণ্ড্রনগর যেখানে, সেখানে চারদিকে প্রত্যক্ষগোচর স্তূপ ও খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন। এক-একটা স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের বেশ সময় কেটে যায়—বেশি সময় লাগে গোকুল গ্রামে লখিন্দর মেধের সামনে। তারপর সেখান থেকে পশ্চিমে কিছুটা লম্বা পাড়ি দিয়ে পাহাড়পুর। বৌদ্ধ-স্থাপত্যের অসামান্য নিদর্শন। ৮ম-৯ম শতাব্দীতে নির্মিত এই মন্দির বা বিহার, তার ছবি তো দেখেছি অনেক, এবার তা চোখের সামনে। এখন আর স্তূপে উঠতে দেওয়া হয় না—বাইরে থেকে ঘুরে-ঘুরেই মন ভরাতে হয়। মহাস্থানগড় আর পাহাড়পুর দু-জায়গাতেই স্থানিক মিউজিয়মে দেখা যায় ওখানকার পোড়ামাটির ফলকগুলো। অবশ্য শুধু পোড়ামাটির নয়, অন্য মাধ্যমের কাজও আছে—কিন্তু পোড়ামাটির ওই ভাস্কর্য দেখতেই বেশি করে যাওয়া, কারণ ওগুলোই বৈচিত্র্যে ও শিল্পগুণে কিংবা লোকায়ত জীবনের প্রতিফলনে দর্শককে অবাক করে দেয়। রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চের মিউজিয়মেও তার নমুনা দেখতে যাওয়া যায়।

ঠিক এরকমই, পোড়ামাটির মন্দিরগুলির মধ্যে বাংলাদেশের মন্দিরের বিশিষ্টতার কথা আগেও হয়েছে, শুনেছি বহুজনের কাছে। কিন্তু দেশভাগের পরে এ-বিষয়ে উৎসাহী গবেষকেরাও খুব কম সুযোগ পেয়েছেন দেখার বা অনুসন্ধান করার। শুধু ডেভিড ম্যাককাচ্চনের মুখে শুনেছি এবং লেখাতে পড়েছি পূর্ববঙ্গের পোড়ামাটির মন্দিরের শিল্পগত অসামান্যতার কথা। জেমস্ ফার্গুসনের বই থেকে তার অনেক আগেই জেনেছি দিনাজপুর কান্তজীর মন্দিরের প্রশংসা। বাংলাদেশে গিয়ে একটু চেষ্টা করলেই সেই নন্দনকীর্তির সামনে হাজির হওয়া যায়।

বগুড়া থেকেই দিনাজপুর হয়ে, সামান্য এগিয়ে, ঢ্যাপা নদীর ধারে ওই কান্তজীর বা কান্তনগরের মন্দির। উভয়বঙ্গেই অনেক পোড়ামাটির মন্দিরই তো আছে—কিন্তু কান্তজীর মন্দির তাদের মধ্যে নানা দিক থেকে কেন অনন্য বলে স্বীকৃত, এবার সে-বিষয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হল। আঠারো শতকে নির্মিত এই নবরত্ন মন্দিরটির চারপাশের রত্নগুলি ১৮৯৭-এর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়েছে। তা ছাড়া পোড়ামাটির কাজ তো শেষপর্যন্ত খুব একটা টেকসই হয় না। তাই ক্ষয়ের চিহ্ন অনেক। তবু এখনও এর মহিমা বুঝতে দেরি হয় না। এর সর্বাঙ্গ পোড়ামাটির ফলকে ছাওয়া, ভেতরে এবং বাইরে, এমন নাকি বাংলার কোনো মন্দিরেই নেই। মহাস্থানগড় আর পাহাড়পুরের ধারাবাহিকতাতেই অনুভব করা যায় এর ভাস্কর্যের শিল্পরহস্য।

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ-ভ্রমণের আরেকটা বড়ো টান : রবীন্দ্রস্মৃতিচিহ্নিত বেশ কয়েকটি জায়গা এখানেই পড়েছে। কুষ্টিয়া থেকে শিলাইদহ—পদ্মার ধারের ওই লালবাড়িটি—অনেক পাঠস্মৃতি টেনে আনে। বগুড়ায় যখন গিয়েছিলাম তখনও একদিন শাজাদপুরের কাছারিবাড়ি দেখে এরকমই স্মৃতিমগ্ন হয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথের স্পর্শময় আসবাবপত্র এখনো যেটুকু রয়ে গেছে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রাসঙ্গিক তথ্যের প্রদর্শনী। কিন্তু বেশি ভালো লাগে এর চারপাশের আবহাওয়াটা—বুঝতে পারি অনেক বদল হয়ে গেছে, তবু। পতিসরে যাওয়ার সুযোগ পাইনি। তবে রাজশাহী যাওয়ার পথে চলনবিলের কোনো-একটি অংশের পাশে গাড়ি থামিয়ে স্মৃতিমুখর হয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথের সে-যুগ আর কোথায়? এখন মাঝখান দিয়ে চলে গেছে উত্তরবঙ্গের আধুনিক মসৃণ সড়ক।

একটা দেশের ভ্রমণের পক্ষে এই তালিকা খুব দীর্ঘ ও আকর্ষণীয় হল কিনা জানি না। আমার মতো অনেকের কাছেই বাংলাদেশে ভ্রমণ যে এত মনোরম তার পেছনে কিন্তু এসবেরও বাইরে একটা বড়ো কারণ আছে। এবং তা হল এর মানুষজন। শুধু আমার নয়, বাংলাদেশে গিয়ে নির্লিপ্ত যাঁরা মোহাচ্ছন্ন হন, তাঁদের উচ্ছ্বাসেও সেটাই ধরা পড়ে। এই মানুষ, তার সারল্য, তার আবেগ, তার সাংস্কৃতিক কাজকর্মের ধরণ আমাদের সঙ্গে মিল-অমিলের ছন্দে এতই টানে যে তাকে উপেক্ষা করা যায় না।

বাংলাদেশের মানুষ বলতে এ-প্রসঙ্গে ওখানকার বাঙালি মুসলমানদের কথাই বেশি যে মনে আসে, সেটা কোনো সাম্প্রদায়িকতা নয়। একদা যে-মুসলমানেরা ঐতিহাসিক মনস্তাত্ত্বিক নানা কারণে আধুনিক শিক্ষাসংস্কৃতিতে পিছিয়ে ছিল, তারা দেশভাগের পরে কীভাবে জেগে উঠল, ভাষা-আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাঙালি হিশেবে আত্মপরিচয়কে স্থায়ী ও ব্যাপক করল, সেই অর্জনকে চিনতে হলে তো বাংলাদেশেই আসতে হবে।

আমি প্রথম তিনবারই বাংলাদেশে গিয়েছিলাম একুশে ফেব্রুয়ারিকে উপলক্ষ করে—ভাষা-আন্দোলন উদ্‌যাপনের সেই স্মরণীয় দিনটিতে। আগের রাত্রে সারা রাস্তা জুড়ে আলপনা দেওয়া, ভোরের শিরশিরে হাওয়ায় খালিপায়ে হাঁটতে-হাঁটতে বিভিন্ন প্রজন্মের নরনারীর মুখে একুশের গান শোনা, মিছিলে-মিছিলে শহিদ-মিনারে পৌঁছে ফুল দেওয়া—চলচ্চিত্রের মতো ভেসে ওঠে এখনো। ঢাকায় তো বটেই, বাংলাদেশের সর্বত্র যেন এই একই দৃশ্য। এই মিছিল এবং এই মানুষের মুখ দেখাই বাংলাদেশে বেড়ানোর একটা শ্রেষ্ঠ উপার্জন।

তখন আমার সঙ্গীদের অনেকেই ছিলেন গানের মানুষ, কবিতাপাঠের মানুষ। একুশে উপলক্ষে তাঁরা নানা কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। তাঁদের সঙ্গে-সঙ্গে আমি রিহার্সালরুমে

যাই, অনুষ্ঠানে যাই। তরুণতরুণীদের স্বচ্ছন্দ আলাপেও একটা উৎসবের আমেজ লেগে থাকে। ক্রমশ আবিষ্কার করি, বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা নিছক শৌখিনতা ছাড়িয়ে তাঁদের বাঙালিয়ানার আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা অস্ত্র কীভাবে হয়ে উঠেছে—মুক্তিযুদ্ধের আগে পাকিস্তান-আমলের লড়াইয়ের সময়, মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বাধীন বাংলাদেশের নানা সংকট-মুহূর্তেও।

ঢাকার ছাত্র-শিক্ষক-কেন্দ্রতে গিয়ে মনে হয়েছিল যেন একটা সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্রে এসে পৌঁছোলাম। আমরা বারবার শুনেছি, বাংলাদেশের আত্ম-উদ্বোধনে ছাত্রযুবকদের ভূমিকা কতখানি। এখানে এসে সেই উত্তরসূরিদেরই যেন দেখা পেলাম। আবৃত্তিকারদের 'কণ্ঠশীলনে'র ঘরে গিয়ে নতুন একদল তরুণ বন্ধুদের কাছাকাছি হলাম। তারপর 'ছায়ানট'-এর বিপুল কর্মকাণ্ড, 'আনন্দধ্বনি'র অন্তরঙ্গ জমায়েত, আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক আয়োজনের স্বাদ পেয়েছিলাম। আমার সবসময় মনে হয়, বাংলাদেশে যাঁরা যান, তাঁরা যদি এইসব যুবাদের সঙ্গে পরিচিত না হন, তবে তাঁরা কী দেখবেন বাংলাদেশের! আগেই বলেছি, এঁরা যে শুধু ঢাকা শহরেই আছেন তা নয়, চট্টগ্রামে রাজশাহীতে ময়মনসিংহে ফরিদপুরে বা বরিশালে কিংবা সিলেটে সর্বত্র তাঁদের দেখা মিলবে। আর রবীন্দ্রসংগীত নিয়েই শুধু যাঁরা মেতে থাকেন—বাংলাদেশে এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে অনেক—তাঁদের তো বলবার কথা ওই একটাই—'আপনাদের রবীন্দ্রসংগীত আর আমাদের রবীন্দ্রসংগীত এক নয়'।

কালক্রমে বাংলাদেশের যে আরেক গৌরব বাংলাদেশের থিয়েটার, তার লোকজনেরও কাছাকাছি চলে যাই। বেইলি রোডের থিয়েটার-হল দুটি বেশ নিরেস, তা নিয়ে ওদেরও খেদের অন্ত নেই, কিন্তু ওখানেই বাংলাদেশের নাট্যচর্চার পরীক্ষানিরীক্ষা, বৈচিত্র্য ও গুণপনার যে নিত্যপ্রকাশ ঘটছে, তার তুলনা নেই। ওই বেইলি রোড-ই, কৌতুক করে বলা হয়, জামদানি শাড়ির পাড়া আর থিয়েটারের পাড়া। বাংলাদেশ-ভ্রমণের ব্যবস্থা যাঁরা করেন, তাঁরা ওই থিয়েটার দেখানোর কথা কি ভাবতে পারেন না—কেরল-ভ্রমণের সময় যেমন দেখেছিলাম এর্নাকুলামে ভ্রমণার্থীদের জন্য কথাকলি-নাচের আখড়াগুলো তৈরি হয়েছে?

বাংলাদেশ-ভ্রমণের সেরা সময় যদি প্রাকৃতিক দিক থেকে বর্ষাকাল হয়, শত অসুবিধা সত্ত্বেও (জানি না আমাদের বন্ধু বিপাকে ফেলার জন্যই ওই প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিনা)—তেমনি সাংস্কৃতিক দিক থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি ছাড়াও যে-সময়টার কথা মনে উঠবে, তা হল পয়লা বৈশাখ। ওখানে পয়লা বৈশাখ আমাদের ঠিক একদিন আগে। এর পেছনে যে ইতিহাস ও পঞ্জিকার কূটকচালি আছে তার

কথা এখন থাক। পরপর দু-দুবার আমি প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যেও বাংলাদেশে গিয়েছিলাম ওই পয়লা বৈশাখ উপলক্ষেই। প্রথমবার ছিল আবিষ্কার, পরের বার পুরোনো সেই অভিজ্ঞতারই টান। আমাদের এ-বঙ্গে নববর্ষ উৎসব তো শুধু পারিবারিক হুল্লোড় আর খাওয়াদাওয়াতেই নিঃশেষিত। ছোটোবেলায় মাঝে-মাঝে প্রভাতফেরিতে ঘুম ভেঙে যেত। এখন তাও আর শোনা যায় না। সেখানে, আবার বলছি শুধু ঢাকায় নয়, সারা বাংলাদেশেরই শহরগুলিতে মহাসমারোহে পালিত হয় দিনটি। বিশেষ করে ঢাকায়, শহরের একটা বিরাট অংশ জুড়ে মানুষের ঢল নামে। রমনার মাঠের দিকে খুব সকাল থেকে মানুষের মিছিল। তরুণীরা লালপেড়ে শাড়ি আর তরুণেরা শাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে চলেছে। মাঠ জুড়ে গাছ আর লেকের জলকে ঘিরে তারা বসে পড়ে। ছায়ানট-এর ছেলেমেয়েরা প্রশস্ত মঞ্চে সার দিয়ে বসে গান করে—রবীন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুলের গান। সেই অনুষ্ঠান শেষ না হতেই আর্ট কলেজের ছাত্ররা সারা বছর ধরে আঁকা মুখোশ নিয়ে, জীবজন্তুর প্রতিকৃতি নিয়ে মিছিল বের করে। দুপাশে মানুষ জড়ো হয়। অনেকেরই মাথায় মুকুট, হাতে বাঁশি। রাস্তার পাশে মেলা বসে। পান্তাভাত আর ইলিশমাছ-ভাজা নিয়ে কেউ দোকান সাজায়। এরকম অসাম্প্রদায়িক উৎসব, বাঙালির উৎসব দেখাটাই তো হতে পারে বাংলাদেশ বেড়ানোর বড়ো পাওনা। এ বছর আরো একটি অভিজ্ঞতা হল ফাল্গুনের পূর্ণিমায় ধানমন্ডিতে বসন্তোৎসব দেখা। এখনো তত ছড়িয়ে পড়েনি, কিন্তু বোঝা যায়, ওখানে এ ধরণের উৎসবগুলো বেড়েই চলেছে।

সবসময়ই অভিজ্ঞতা যে খুব সুখের তা নিশ্চয়ই নয়। যাদের নিয়ে এত উচ্ছ্বাস তাদের অন্য চেহারাও দেখতে হয়। বাংলাদেশের মানুষের মুখে জোড়শব্দের একটা লব্‌জো খুব উচ্চারিত হয়। তাকে অনুসরণ করে বলা যায় : মাঝে-মাঝেই 'পচা' সময় তাদের আক্রমণ করে—সাম্প্রদায়িকতা অসহিষ্ণুতা হিংসা তাদের জাগরণের ও স্বাধীনতার যে-প্রাপ্তি তাকে নষ্ট করে দিতে চায়। বাংলাদেশে অল্পদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েও মৌলবাদের চিহ্নগুলি প্রকটভাবে ধরা পড়ে। কিন্তু সে-জন্য তো আমরা শুধু বাংলাদেশের দোষ দিয়ে পার পাব না—মানব-অস্তিত্বের এই ব্যর্থতা আজ কাউকে রেহাই দিচ্ছে না। বরং, এরই মধ্যে, বাংলাদেশের এই মানুষেরা অনেকেই যে নিজেদের সত্তাপরিচয়কে অটুট রাখতে মরিয়া, তার ছবিও বারবার দেখতে পাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, লেখালেখির জগতে, লিটল ম্যাগাজিনের স্টলে, বইপাড়ার আড্ডায়, সভাসমিতিতে, গানের বা থিয়েটারের উৎসবে—আত্মরক্ষার ও আত্মপরিচয়ের সেই 'মজা'টাও টের পাওয়া যায় বাংলাদেশে গেলে।

রচনাকাল : ২০০২

দুই বাঙালি, এক বাঙালি

বাংলাদেশ সম্পর্কে যাঁদের আবেগ একটু উচ্চকিত, তাঁদের অনেকেরই জীবনের কোনো-না-কোনো সময় কেটেছে পূর্ববঙ্গে, শৈশব বা যৌবন বা জীবনের যে-কোনো পর্বই হোক, এবং তারপর নানা অনিবার্যতায়, বিশেষত দেশভাগের চাপে ছিটকে এসে কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গের কোনো-এক অঞ্চলে দীর্ঘকাল বাস করেও জন্মভূমির কথা তাঁরা ভুলতে পারেননি। অম্লান হয়ে থাকে সেই যাপনের স্মৃতি। কেউ যদি লেখক হন, তখন তাঁর রচনায় সেই স্মৃতি বারবার উশ্‌কে ওঠে, কখনো সরাসরি কখনো পরোক্ষে। তাঁর লেখার একটি কথায় বা উপমায় বা বাক্‌প্রতিমায় 'দূর থেকে গড়িয়ে আসে ঢাকের শব্দ'। তখন সেই স্মৃতিময় জগতে ফিরে যাওয়ার বাসনাতেই কবি বলে ওঠেন :

তবে যাই
যাই মণ্ডপের পাশে ফুলতোলা ভোরবেলা যাই
খাল ছেড়ে পায়ে পায়ে উঠে-আসা আলো...

মঠের কিনার ঘিরে কেঁপেওঠা বনবাসী হাওয়া
যাই পিতৃপুরুষের প্রদীপ-বসানো দুঃখ, আর

ঠাকুমা যেমন ঠিক দশমীর চোখে দেখে জল
যাই পাকা সুপুরির রঙে-ধরা গোধূলির দেশ
আমি যাই...

(শঙ্খ ঘোষ)

এই স্মৃতিই তখন তাঁর কবিতার প্রতিমাপুঞ্জের এক বড়ো ভাঁড়ার। তবে দেশ ছেড়ে আসার অভিজ্ঞতার শুরু তো কারো-কারো দেশভাগের আগেই। কলকাতায় শুধু নয়, ঢাকাতেও 'ঘটি-বাঙাল' নাম করে এই ভাগাভাগি বেশ পুরোনো। কেউ-কেউ আছেন যাঁরা বাংলার এই পশ্চিমপারেরই মানুষ আজন্ম, যদিও পূর্ববঙ্গের স্মৃতিবাহী পূর্বপ্রজন্মের গালগল্পের হাওয়ায় লালিত—পূর্ববঙ্গের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়তো নেই, তবু এই কলকাতা শহরেও তাঁদের চেনা জগৎ ওই পূর্ববঙ্গই। এসব মানুষের ক্ষেত্রেও শিকড়ের

একটা গোপন টান বোঝা যায়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা যাঁদের নেই, নেই পূর্বস্মৃতি বা পারিবারিক স্মৃতি, তাঁরাও কেন অনেকসময় সেই টানটাই অনুভব করেন?

শিকড় হারানো মানুষের শিকড় খোঁজাটা একরকম বুঝি। পুরোনোকে নিয়েই তাঁর মোহ। কিন্তু যাঁরা নতুন করে পরিচিত হচ্ছেন বাংলাদেশের সঙ্গে, সেই এপারের বাঙালির কাছে প্রকৃতি নয়, পুরাতত্ত্ব নয়, শেষপর্যন্ত টের পাওয়া যায় মানুষের টানটাই বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে। আর সেই মানুষ বলতে বাঙালি মুসলমানের কথাই বেশি মনে আসছে। বাংলাদেশ নিশ্চয়ই মুসলমান-হিন্দুরই দেশ। তবু ঘটনা তো এই, দেশভাগের পর হিন্দুরা ব্যাপক দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন, আজও আসছেন—ফলে হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দুরা ক্রমশই প্রায় অদৃশ্য। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমান, যাঁরা দেশভাগের আগে সংখ্যায় ছিলেন খুবই কম এবং অন্তরালবর্তী, তাঁদের সংখ্যা বাড়ছে, তাঁরাই এখন 'সব'। শিক্ষাসংস্কৃতির জগতে, লেখালিখি বা বলাবলির জগতে এই অগ্রসর মুসলমানেরাই জায়গা করে নিয়েছেন। মূল কণ্ঠস্বর তাঁদেরই। সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কী হতে পারে? দেশভাগের আগের বিপন্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত অস্তিত্বের পর্ব পার হয়ে এখন, তাঁরা শুধু 'মুসলমান' নন, সেই সঙ্গে 'বাঙালি' পরিচয়ে ধন্য—দীর্ঘকাল ঘরহারানোর যন্ত্রণা থেকে ঘরেফেরার আকুলতা, বদরুদ্দীন উমর যাকে বলেছেন 'মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' সেই অনুভবে দীপ্ত। এই আবিষ্কার, এই ইতিহাস বাংলাদেশের বাঙালিকে একটি ভিন্ন চেহারা বা স্বভাব এনে দিয়েছে। এর শুরু মধ্যবিত্ত মুসলমানের বাংলাভাষা ও বাঙালি-সংস্কৃতির নিজস্ব জমি দখলের মধ্য দিয়েই। এই আত্মপরিচয়ের সন্ধানের তাগিদটা যে কত ব্যাপক ও একাগ্র তা বুঝতে পারি বাংলাদেশে প্রকাশিত বই, সাময়িকপত্র, শিল্পসাহিত্য বা আত্মসচেতন মানুষের কথাবার্তা থেকে—যেখানে প্রসঙ্গটি নানাভাবে ঘুরেফিরে আসে, যাচাই হয়। তা ছাড়া তো আছেই ভাষা-আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত লড়াইয়ের ইতিহাস। এই ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই বাংলাদেশের বাঙালি যেন স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। তখনই প্রশ্ন ওঠে মনে, অন্য বাঙালির পরিচয় সন্ধানের যে-চেষ্টা হয়েছিল একদা, তাকে উদ্‌ঘাটিত করে জানতে সাধ হয়, সত্যিই কি দুই বাঙালি তৈরি হচ্ছে দুই পৃথক রাষ্ট্রে?

ষাটের দশকেই আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম, পূর্বপাকিস্তানে মুসলমান মধ্যবিত্তের বিলম্বিত জাগরণের ফল ফলতে শুরু করেছে। একটা-দুটো করে বই হাত-ফেরতা হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছোচ্ছে। কোনো-কোনো বই আমাদের বিস্মিতও করে

তুলছে। সৃজনশীল লেখা এবং তার চেয়েও বেশি গবেষণামূলক কাজকর্ম থেকে আমরা আভাস পেয়ে যাচ্ছি পূর্ববঙ্গের লেখাপড়া এবং বইপত্রের জগতে যে নতুন হাওয়া বইছে তার। ১৯৬৮-র গোড়ায় বিষ্ণু দে লিখলেন, "পূর্ববঙ্গে যে উদ্যমে ও নিষ্ঠায় বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের চর্চা চলছে তার খবর আমরা কমই পাই। মাঝে-মাঝে হয়তো-বা শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের চেষ্টায় বা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর একাগ্র উৎসাহে কিছু কবিতা বা কিছু গল্প প্রবন্ধ যখন দেখতে পাই তখন খুশি লাগে। অধ্যাপক অমলেন্দু বসু-র দাক্ষিণ্যে সম্প্রতি কিছু বাংলা ভাষার বিষয়ে মূল্যবান সংগ্রহ ও আলোচনা পেয়ে বেশ অভিভূত বোধ করেছি। আবদুল হাই সাহেবের 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' নামক পুরোধা বইটির একটা পরিচয় অমলেন্দুবাবু নিজেই দিয়েছেন কম্পাস-এ। দিন কয়েক আগে তাঁরই কপিটি ধার পেয়ে আমার মতো ভাষা ও ধ্বনির তত্ত্বে অনভিজ্ঞ কিন্তু সাহিত্যের কারণে মজ্জায়-মজ্জায় আগ্রহান্বিত লোক খুবই উত্তেজিত। যেমন উত্তেজিত শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ্ সাহেবের নেতৃত্বে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান-এর প্রথম অংশ দেখে।" দেখা যাচ্ছে তখনো নিষিদ্ধ বইয়ের মতোই ও-বাংলার দুটি-একটি বই এভাবে হাতে-হাতে ঘুরছে। বিষ্ণু দে তার মধ্য থেকেই লক্ষ করেছিলেন, "কর্মসংলগ্ন ভাষা"র চর্চা কীভাবে সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমাদের এই বাংলার তুলনায়, কিংবা সে-তুলনাতেই কেন "পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো তীব্রভাবে ঐকান্তিকভাবে শুদ্ধ সত্য।" তিনি জেনেছিলেন, "মানুষের চৈতন্য বা সত্তাবোধ চায় মাতৃভাষার অবাধ ও গভীর মাটি এবং সাহিত্য বা সংগীত, সংস্কৃতি ও জীবনের সবই অঙ্গাঙ্গিভাবে লগ্ন ওই মাটির শিকড়েই।" সে-বছরই অসীম রায় লিখলেন ছোটো একটি প্রবন্ধ, যার শিরোনাম 'পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক জাগরণ'। তিনি বললেন, "পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে আদান-প্রদানে দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও যে সামান্য বই আমাদের হাতে এসে পৌঁছোয় তাতে নির্দ্বন্দ্বে বলা সম্ভব যে পূর্ব পাকিস্তান এক সাংস্কৃতিক জাগরণে উদ্ভাসিত যার তুলনা মেলে না বর্তমান পশ্চিম বাংলায়।...এ জাগরণের নায়ক পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ মধ্যবিত্ত, যার ফলে পাণ্ডিত্য আর থিসিস পেপারের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ নয়, অথবা বলা যেতে পারে, মাস্টারমশাইদের থিসিস আজ জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবনের থিসিসে রূপান্তরিত।"

•

শুধু কানে শোনা আর বই পড়াই নয়, জাগরণের এই নায়কদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়, যখন তাঁরা বিপুল সংখ্যায় কলকাতায় এলেন—বিতাড়িত হয়ে কিংবা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কিংবা বাইরে থেকে

লড়াই করার সংকল্পে। শুধু কলকাতায় নয়, এই 'পলাতকে'রা এসেছিলেন আগরতলায় আলিপুরদুয়ারে কুচবিহারে বহরমপুরে, সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলা-শহরেই। কলকাতায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও সবাই শহরকেন্দ্রে ছিলেন তাও নয়, কিছু দূরে সল্টলেকের শরণার্থী-শিবিরেও আশ্রয় নিতে হয়েছে অনেককে। কিন্তু যাঁদের কথা বলছি, পূর্ববঙ্গের সেই মুসলমান মধ্যবিত্ত জাগরণের সন্তান যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত নাগরিকের চেনা-পরিচয় ঘটল প্রধানত কলকাতাতেই। এঁদের মধ্যে লেখক-শিল্পী ছিলেন—গান থিয়েটার লেখালেখি সব ক্ষেত্রেরই—ছিলেন সাংবাদিক, রাজনৈতিক ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতা ও কর্মী, তা ছাড়া সাধারণভাবেই শিক্ষিত মানুষ, বুদ্ধিজীবী মানুষ। এই পরিচিতি বা সংযোগের ছবি দু-দিক থেকেই পাওয়া যাবে। একদিকে আগন্তুকদের চোখে। আনিসুজ্জামানের 'আমার একাত্তর' আর গোলাম মুরশিদের 'যখন পলাতক : মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি' বই দুটোর পাতা ওলটালেই জানা যায় তাঁদের নিজের মুখে নিজের কথা। আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষের চোখেদেখার আবেগের নিদর্শন আছে সে-সময়ে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা রিপোর্টাজগুলিতে। তাঁরা কেউ-কেউ এসেছিলেন এককভাবে, কেউ দলবদ্ধভাবে। থেকেও ছিলেন সেভাবেই। অনেকে মুক্তিযুদ্ধের কাজেই নানাভাবে জড়িয়ে থাকতেন। পথে-ঘাটে, হোটেলে-রেস্তোরাঁয়, সভা-সমিতিতে, অনুষ্ঠানে তো বটেই, বাড়ির অন্দরমহলেও দেখা হয়ে যেত তাঁদের সঙ্গে—আড্ডার সঙ্গী হিশেবেও পাওয়া যেত অনেককেই। এবং তখনই এই নবীন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমানদের খুব কাছ থেকে দেখে এ-বঙ্গের মানুষদের অনেকেরই বিস্ময় জেগেছিল।

বিস্ময়ের কারণ, এর আগে মধ্যবিত্ত মুসলমানদের সঙ্গে কলকাতাবাসীর পরিচয়ের তেমন সুযোগ ছিল না বললেই চলে। কলকাতার রাজাবাজার কলাবাগান খিদিরপুর পার্কসার্কাস ইত্যাদি জায়গায় মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলির ভেতর দিয়ে যেতে-যেতে দারিদ্র্য ও জীবনযাপনের অপরিচ্ছন্নতার যে-দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, মুসলমানদের সম্পর্কে সেটাই ছিল কলকাতাবাসী হিন্দুদের অভিজ্ঞতার জমি। ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়, পার্কসার্কাসের সম্পন্ন মুসলমানদের এলাকার কথা মনে পড়তে পারে কারো, কিন্তু সে তো নিতান্তই দলছুট। বাকি যাদের দেখি তারা প্রায় সকলেই অবাঙালি মুসলমান, উর্দুভাষী, গরমের সময় বস্তির সংকীর্ণ ঘরে টিকতে না পেরে ফুটপাতে খাটিয়া পেতে শুয়ে থাকে, দোকানে-দোকানে গভীর রাত পর্যন্ত তারস্বরে করাচি রেডিও বাজে, হিন্দুদের কাছে অসহ্য পেঁয়াজ-রসুনের উগ্র গন্ধে চারিদিক ম-ম করে। কোনোরকমে পার হয়ে যায় হিন্দু পথচারী নাক টিপে। শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান কলকাতাতে একেবারেই ছিলেন না তা নিশ্চয় নয়, কিন্তু তেমন চোখে পড়ত না। অন্তত কলকাতার

জীবনের সঙ্গে তার যোগ প্রায় ছিলই না। আর সামগ্রিকভাবেই তো বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের জন্ম ও বিকাশের ইতিহাস এতই অল্পকালের এবং পরবর্তীকালের যে তা চোখে পড়ার কথাও নয়। গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ আছে, তাঁরা হয়তো জানেন, দরিদ্র হিন্দু ও দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রতিবেশিতা তো থাকেই জীবিকার কারণে, কিন্তু পাশাপাশি থেকেও ধর্মীয় কারণে বিচ্ছিন্নতা বা দূরত্বও কম নয়। আর মধ্যবিত্ত হিন্দুর সঙ্গে দরিদ্র মুসলমানের মানসিক সম্পর্ক খুব একটা থাকবে তা প্রত্যাশিতও নয়। এরই মধ্যে যে সামান্য কিছু মুসলমানেরা লেখাপড়া শিখেছেন শহরে বা এমনকী গ্রামে—কখনো-কখনো পেয়েছেন উচ্চশিক্ষাও—তাঁরা দেশভাগের পরে অনেকেই চলে গেছেন পূর্বপাকিস্তানে। তাঁরা জানেন, হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে এবং স্বাভাবিকভাবেই ওই ইসলামি রাষ্ট্রে তাঁরা অনেক বেশি সুযোগ পাবেন উন্নত জীবিকার। পূর্বপাকিস্তানের জমিতে যে মধ্যবিত্ত মুসলমান আত্মস্থ হয়ে উঠছিলেন, বিকাশের ও ক্রমোন্নতির যে-ধারা বইতে শুরু করেছিল, তার সঙ্গে মিশে গেলেন এই নবাগত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত মুসলমানেরাও। পূর্বপাকিস্তানে বা বাংলাদেশে উচ্চপদস্থ বা নানা কারণে বিখ্যাত মুসলমানদের অনেকেরই আদিনিবাস পশ্চিমবঙ্গ এবং তা নিয়ে চলতি ঠাট্টা-পরিহাসও আছে, যেমন আছে কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের জীবনে পূর্ববঙ্গীয় 'বাঙাল'দের অবস্থান নিয়ে। তাই একাত্তরের আগে মধ্যবিত্ত মুসলমানকে চোখের সামনে এভাবে দেখার সুযোগ হয়নি এখনকার মানুষদের।

প্রথম দেখার বিস্ময় আরো গাঢ় হল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পর প্রায় তিন দশক (সত্তর থেকে নব্বই) ধরে যে-যোগাযোগ ঘটেছে দুই দেশের বাঙালির মধ্যে তার পরিণামে। একাত্তরের পরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার ইচ্ছে এবং সুযোগ ক্রমে-ক্রমে বেড়েছে, সন্দেহ নেই। পাকিস্তানি আমলে সেই সুগমতা বা আমন্ত্রণ ছিল না। সবচেয়ে বড়ো কথা, শুধু দেশভ্রমণ নয়, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু মধ্যবিত্ত অনেকেই প্রবেশাধিকার পেলেন ওখানকার মুসলমান মধ্যবিত্তের গৃহাভ্যন্তরে। এটা একেবারেই নতুন ঘটনা—দুই দেশের পক্ষেই। হিন্দু মধ্যবিত্তকে, ঘরের বাইরে থেকে হলেও, অনেক বেশি চিনতেন মুসলমানেরা, অনেককাল আগে থেকেই—হিন্দুরা তো তাঁদের পুরোনো চেনা মধ্যবিত্ত, পূর্ববঙ্গেও। নবজাগ্রত মুসলমান মধ্যবিত্তের সম্ভ্রমবোধ ও আগ্রহ ছিল দুই বঙ্গেরই হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্পর্কে। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কেও বইপত্রের মাধ্যমে তাঁদের একটা পরিচিতি ছিল বরাবর। পাকিস্তানি পর্বেও কলকাতায় পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের যাতায়াত ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। হিন্দুরা যেতেন তাঁদের 'দেশে'র বাড়ি। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পারিবারিক বন্ধুত্ব বা প্রবেশাধিকার সাধারণত ছিল না। মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দুদের চিরকালের অস্পৃশ্যতাবোধ,

মুসলমান-পরিবারের রক্ষণশীলতা, বিত্তহীন মুসলমান ও মধ্যবিত্ত হিন্দুর আর্থিক অসমতা—এইসব নানা কারণে। এইবারই প্রথম হিন্দুরা তাঁদের অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সব দিক থেকেই সমধর্মী দোসর খুঁজে পেলেন মুসলমানদের মধ্যে। একাত্তরে যেমন এই মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা অনেকেই আশ্রয় পেয়েছিলেন হিন্দু মধ্যবিত্তের বাড়িতে (গোলাম মুরশিদের বইতে তার বিবরণ আছে)—তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত মুসলমানদের ঘরে ক্রমশই প্রগতির হাওয়া বইতে লাগল, হিন্দু বন্ধুদের প্রবেশাধিকার সম্ভব হয়ে উঠল। বলা বাহুল্য, এই বিবৃতিকে আক্ষরিক অর্থে পড়লে ঠিক হবে না—এমন বহু হিন্দু বা মুসলমান নিশ্চয়ই ছিলেন, যাঁরা আগে থেকেই এই বিধিনিষেধের বাইরে, কিংবা পক্ষান্তরে এই সংযোগ ঘটেনি এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে আজও, হয়তো সংখ্যার দিক থেকে সেটাই বেশি—তবু এরকম একটা পরিবর্তন যে ঘটতে শুরু করেছে সেটাই বলবার।

নবজাগ্রত মুসলমান মধ্যবিত্তের কাছে হিন্দুদের পারিবারিক সংগঠনটা যত পরিচিত ছিল, মুসলমানদের পারিবারিক সংগঠন হিন্দুদের কাছে ততটা ছিল না। তাই, সেই প্রথম পরিচয়ের পর্বে তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন উভয় সম্প্রদায়ের মিলটা লক্ষ করেই যেন। যে-মুসলমানকে তাঁরা এর আগে বাইরে থেকে দেখেছেন, তাঁদের পারিবারিক চেহারাটা অন্যরকম হবে এরকমই বোধহয় আন্দাজ ছিল। কিন্তু দেখলেন নানা-নানী, আব্বা-আম্মা, ফুফু-বুবু, খালা-খালু ইত্যাদি নিয়ে জড়ানো সংসারে পার্থক্য যেটুকু তা হয়তো নিছক কয়েকটি শব্দ-শব্দান্তরে—তাও অনেক পরিবারে সেটুকুও নেই। কিন্তু ভাবীর সঙ্গে দেওরের সম্পর্ক, বড়োভাইয়ের সঙ্গে ছোটোভাইয়ের, তাঁদের মধ্যে প্রচলিত শাসন বা স্নেহ বা রঙ্গরসিকতা—এ সবই আগন্তুকের এত চেনা মনে হয় যে কোনো ব্যবধানই তিনি বোধ করেন না। পরিবারের অন্তরঙ্গ হাওয়ায় যে-বাগ্‌ভঙ্গি বা প্রবাদপ্রবচন ঘোরাফেরা করে, যে-গল্পগাথা মুখে-মুখে শোনা যায়, তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় গভীর মিল। ধর্মীয় অনুশাসনের পার্থক্য সত্ত্বেও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে, প্রাত্যহিক আচরণে ও অভিব্যক্তিতে প্রায় কোনো তফাতই চোখে পড়ে না। একবার সুযোগ হয়েছিল, এক মুসলমান পরিবারের বিবাহানুষ্ঠানে নিবিড়ভাবে যোগ দেওয়ার। বিবাহের যে-গম্ভীর ধর্মীয় দিকটি, সেটা একেবারেই আলাদা—ফেজ পরা পুরুষেরা প্রার্থনা করে, দেনমোহরের কথা চালাচালি হয়, মেয়েরা ঘরের ভেতরে বসে থাকে, কনের মুখ দেখবারও জো নেই। কিন্তু সে-সবকে ছাপিয়ে আগের দুটি দিন জুড়ে যে গায়ে-হলুদের অনুষ্ঠান—কুলো-সরা-প্রদীপ ইত্যাদি নিয়ে মেয়েদের হুল্লোড়—তা মনে করিয়ে দেয় হিন্দুমুসলমান (এমনকী বৌদ্ধ) নির্বিশেষে বাঙালিত্বের উৎস—সমাজতত্ত্ববিদরা যার মধ্যে অস্ট্রিক প্রভাব

খুঁজে পান। এই মিলগুলো দেখতে-দেখতে আবারও মনে হয়, কতকগুলো আরবি-ফারসি শব্দের (গোসল, দাওয়াত, নাস্তা ইত্যাদি) ব্যবহার ছাড়া তফাতটা আর কোথায়? বাংলাদেশে পয়লা বৈশাখের মতো ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব যে প্রাণময় উল্লাসে উদ্‌যাপিত হয়, তাতে এই বঙ্গের মানুষ হতবাকই শুধু হতে পারে। বাঙালির চিরন্তন সামাজিকতা—আতিথেয়তা যার একটা বড়ো অঙ্গ—তা বাংলাদেশে এখনও যে-সমারোহে ও মাধুর্যে টিকে আছে, তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না অন্যত্র। রবীন্দ্রনাথের গান যে-ভাবে গাওয়া হয়, থিয়েটার নিয়ে যে-প্রাণপাত নিষ্ঠার পরিচয় মেলে—ফিল্‌ম আন্দোলন নিয়ে, লিট্‌ল ম্যাগাজিন নিয়ে, সাহিত্যের লেখালেখি নিয়ে যে-উত্তেজনা প্রকাশ পায়—এ সবের মধ্যেই, প্রশংসা বা নিন্দা যে-অর্থেই বলি, একটা তুলনীয় বাঙালি-স্বভাবকে চিনতে ভুল হয় না।

আর সেটা তো খুবই স্বাভাবিক। হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে মৌলিক কোনো ফারাক থাকার কথা তো নয়। ভাষা এক, ইতিহাস এক, সংস্কৃতি এক। জন্মসূত্রে যে বাঙালি মুসলমান মূলত নিম্নবর্ণ হিন্দু ও বৌদ্ধ থেকে আগত তাও তো বহুকথিত। বাঙালিয়ানার উৎসমূলে যে লোকায়ত সংস্কার ও অভিজ্ঞতার চাপ খুব বেশি, তার উত্তরাধিকার তো উভয়েরই। আর সে-কারণেই উত্তরভারতীয় কঠোর হিন্দুদের চোখে বাঙালি হিন্দুর বা পশ্চিমি খানদান মুসলমানদের কাছে বাঙালি মুসলমানদের কোনো মর্যাদা নেই। তবু মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি যে মুসলমান বাঙালির সঙ্গে তাঁদের এই মিল দেখে অবাক হন, ঐক্য বোধ করেন, তার কারণ ওই এতকালের অপরিচয়। মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালি প্রাচীনতর হিন্দু মধ্যবিত্তদের আগেই চিনতেন—হয়তো হাড়ে-হাড়েই চিনতেন। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের যে-বিদ্বেষ জন্মলগ্নেই শেখানো হয়েছিল তাঁদের—শুধু শেখানো হয়েছিলই-বা বলি কেন, তিক্ত অভিজ্ঞতার চাপে এই শিখে ওঠাটাই ছিল অনিবার্য—পূর্বপাকিস্তানের অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ের ভেতর তাকে বিসর্জন দিয়েই সেই ঐক্যের ভিত্তিকে নতুন করে চেনাল। দুই দেশের বাঙালির নিহিত সাদৃশ্যের প্রসঙ্গগুলি সামনে চলে এল।

তার মানে এই নয় যে দুই দেশের বাঙালির মধ্যে কোনো বৈলক্ষণ্যই নেই, কোনো ভিন্নতাই নেই। কিংবা সেই ভিন্নতা পুরুলিয়া বা মেদিনীপুরের সঙ্গে চব্বিশ পরগনার বাঙালির যে ভিন্নতা সেইরকমই। এই স্বাতন্ত্র্য তার চেয়ে বেশি শুধু নয়, সুদূরপ্রসারী এবং গভীর। ভূগোলের বা রাষ্ট্রের পার্থক্যের কথা তো আমাদের কাছে বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। তাও নানা কারণে ভৌগোলিক ব্যবধানটা অনেকখানিই কমে গেছে। পূর্ববাংলা এখন আর ততটা জলের দেশ নয়। জনসংখ্যার বিস্তার,

নগরের বিস্তার, প্রযুক্তির বিস্তার, যত কমই হোক, এর পরিবেশকেই পালটে দিচ্ছে। এখন অনন্যতা যেটা বেশি লক্ষণীয়, তা মানুষেরই। ভাষায় আচরণে আবেগে এক হয়েও কোথায় যে দুই বাংলার বাঙালি আলাদা, সেটা অনেকসময়ই অনুভবে আসে না বলেই তা খুঁজে বের করতে হয়।

বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় পরিচয়টাই সবচেয়ে আগে চেখে পড়ে, বিশেষত হিন্দুপ্রধান পরিবেশ থেকে গিয়ে। মুসলমান বলতেই একজন হিন্দুর কাছে ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধতা ও জেহাদের ছবি ভেসে ওঠে—সেই ধর্মের সাম্প্রদায়িক চেহারাটা। অথচ হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি জানেন, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধতার বাইরে এই ধর্মের একটা মানবিক উদারতন্ত্রী দিক আছে, যা সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে, যা বহু মহাপুরুষের কথায় ও আচরণে চর্চিত হয়েছে। কিন্তু, যদিও মুসলমানেরা আমাদের দীর্ঘকালের প্রতিবেশী, তাঁদের ধর্ম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান, কোনো সন্ধান হিন্দুদের নেই। দেশের মুসলমানের সঙ্গে অপরিচয়ের কারণে দৃষ্টি সেদিকে কখনো যায়নি। বাংলাদেশে গিয়ে মুসলমান-অধ্যুষিত পরিবেশের মধ্যে পড়তে হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে আবিষ্কার ঘটে মুসলিম চারিত্র্যের যে-দিকটি আমাদের অচেনা ছিল তা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। অসংখ্য বই এবং তার মধ্য দিয়ে ইসলামি অনুশীলন, চিন্তা, ভাষণ এবং এসবের সঙ্গে জড়ানো বহু ব্যক্তিত্বের পরিচয় আমাদের ওয়াকিবহাল করে ওই ধর্মের দার্শনিকতা বা আদর্শবাদের দিকগুলো সম্পর্কে—ইসলামের সর্বমানবিকতা, সামাজিক সাম্য বা যুক্তিবাদ বিষয়ে। এটা যে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা ধর্মপালন করেন তাঁদের মধ্যেই চেনা যায় তা নয়—এমনকী ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন বা অনাগ্রহী ব্যক্তির মনে বা আচরণেও ওই ধর্মীয় আদর্শবাদ থেকে প্রভাবিত সংস্কার তাঁকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিশিষ্ট করে তোলে। অবশ্যই এটা সম্পূর্ণ ছবি নয়, এমনকী অধিকাংশ মানুষের ছবিও নয়। সারা দেশে দারিদ্র্য ও অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন প্রকট, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা সর্বব্যাপ্ত—এমনকী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমানেরা অনেকেই তার বাইরে নয়। কিন্তু তারই মধ্যে ব্যতিক্রমী মানুষ ও তার পরিবেশকে চিনতে পারা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষ একটা চরিত্র গড়ে ওঠার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, সেটাই ঘটনা। যেমন হয়, মসজিদ-দরগা-মাজার কেন্দ্রিক ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপগুলি—ফেজ বা বোরখা পরা অনেক মানুষ, তাদের ধর্মীয় তুক-তাক বা সাজসরঞ্জাম চোখে পড়বেই। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্তনটাও যে ঘটছে, বাংলাদেশেই তার পরিচয় মেলে। তাই আগন্তুকের চোখের সামনে একই সঙ্গে তৈরি হতে থাকে বিভিন্ন ও বিপরীত পরিস্থিতি। মেয়েদের অধিকারের কথাই ধরা যাক। পর্দানশিন ব্যাপারটা যেমন অনেক ক্ষেত্রে রয়ে গেছে, তেমনি জীবিকায় তো বটেই, নানান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে সহকর্মিণীও মেয়েরা।

বাংলাদেশে গিয়ে এই বৈপরীত্যটা পদে-পদে নজরে পড়ে। রাস্তাঘাটে-ময়দানে প্যান্ডেল বেঁধে রবীন্দ্রসংস্কৃতির আয়োজনও যেমন দেখি, তেমনি দেখি ইসলামি অসংখ্য জমায়েত। ধর্মস্থানকে ঘিরে আজান, ওয়াজ মাহফিল, ধর্মীয় ভাষণ। টুপি পরে তবলিগের অনুগামী তরুণেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে দলে-দলে। এরই মধ্যে আবার ছাত্র-শিক্ষক-কেন্দ্রের ভেতরে-বাইরে অসংখ্য ছাত্র ও যুবক আধুনিকতম চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চায় ব্যস্ত। শুধু ঈদ-মহর্‌রম বা রোজা পালনের সময়ই নয়, গোঁড়া ধর্মীয় একটা আবহ্ প্রায় সবসময়ই ঘিরে থাকে দেশে—অথচ তারই মধ্যে সেকুলার চেতনাও কাজ করে যাচ্ছে, সংখ্যাল্পতার মধ্যেও তা বেড়ে-বেড়ে চলেছে। এমনকী সেক্ষেত্রেও মুসলিম ভাবধারার একটা প্রভাব থাকে। হয়তো সে-কারণে বাহ্য কিছু-কিছু অভ্যাসের পার্থক্যও চোখে পড়ে—বিবাহ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে, খাদ্যাভ্যাস ও রান্নাবান্নার পদ-প্রকরণে, পোশাকে-আশাকে। কখনো-কখনো শব্দে, উপমায়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ শারীরিক ও মানসিক ভঙ্গিমায়। ঠিক যেমন থাকে একজন সেকুলার হিন্দুর মধ্যেও তাঁর জন্মগত পরিবেশগত অভ্যাসের প্রতিফলন। বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ যাঁদের আমরা মুসলমান বলে চিহ্নিত করি, তাঁদের অনেকের মধ্যেই অসাম্প্রদায়িকতা তর্কাতীত প্রশ্নাতীত। সেখানে সেকুলার বোধ এত গভীর নিশ্চয়তায় আছে বলে টের পাই, মাঝে-মাঝে মনে হয় তা আমাদের মতো ধর্মনিরপেক্ষ বলে নন্দিত দেশেও বিরল। অন্তত বলা যায়, সে-ব্যাপারে একটুও পিছিয়ে নেই তাঁরা অনেকেই। অথচ, খুব স্বাভাবিকভাবেই যেন, তাঁদের স্বভাবে চারপাশের ইসলামি চেতনার একটু সুস্থ ছাপও রয়ে গেছে বলে শনাক্ত করতে পারি কখনো-কখনো। সেটা হয়তো কোনো-একটা শব্দের প্রয়োগে, কোনো এক সময়ের আবেগ বা যুক্তির প্রকাশের ধরণে। হয়তো সে-কারণেই দুই বাংলার বাঙালির এত মিলের মধ্যেও অচেনার একটা আভাস পাওয়া যায় সেখানে—বাংলাদেশের বাঙালি সম্পর্কে এপার বাংলার বাঙালির আকর্ষণের বড়ো উৎস সেটাই। মনে রাখতে হবে, এই আকর্ষণটা 'মুসলমান' বলে নয়, 'বাংলাদেশে'র বাংলাভাষী মুসলমান বলে—বাংলাদেশের স্বরূপকে চিহ্নিত করেছে যে-পরিচয়। ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দুর যে-সংযোগ আংশিকভাবে হলেও আজ ঘটতে পারছে, এই বঙ্গের মুসলমানদের সঙ্গে সে-সংযোগ কিন্তু এতকাল ঘটেনি। সেটা খুবই দুর্ভাগ্যের, তবু অনিবার্য—আর্থিক ও শিক্ষাসংস্কৃতিগত অসমতাই সেখানে বাধা হয়ে ছিল। সেই বাধা ক্রমশই যে দূর হয়ে যাচ্ছে তাও লক্ষ করেছেন কেউ, কিন্তু আপাতত তা আমাদের আলোচ্য নয়। আলোচ্য, দেশভাগের পরে বাংলাদেশের মুসলমানের সঙ্গে এই নতুন পরিচয়ে এখানকার মানুষের কেন মনে হয়েছে এই বাঙালি আমাদের এত কাছের, তবু যেন কোথায় অচেনা!

এই অচেনার সন্ধান মেলে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের চারিত্র্যেও, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তের পাশে। অখণ্ড বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত তুলনায় অনেক পুরোনো, ইংরেজের ছত্রচ্ছায়ায় ও আনুগত্যে তার বিকাশ, ক্রমশ গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত ও শিকড়হীন। এক ধরণের বৈদগ্ধ্য তারা অর্জন করেছে ঠিকই, দীর্ঘকালীন চর্চায়, কিন্তু পাশাপাশি যত দিন গেছে একটা ক্লান্তি অবসাদ ও নৈরাশ্যও তাদের পেয়ে বসেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমান মধ্যবিত্ত ইংরেজ-বিদ্বেষের কারণেই গড়ে উঠতে সময় নিয়েছে। বিলম্বিত প্রথম জাগরণ যখন ঘটেছে, তখন চিরন্তন বিচ্ছিন্নতাকে কাজে লাগিয়ে হিন্দুবিদ্বেষের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু তার বীজ তো তাদের নিপীড়িত অবস্থার মধ্যেই ছিল—দেশভাগ না হলে সেই পীড়ন কমত বা সাতচল্লিশের পরে তাদের দ্বিতীয় জাগরণ এত ব্যাপক হত এমন কি বলা যায়? অবশ্য দেশভাগ ও পাকিস্তানের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে তারা বুঝেছে প্রতিরোধের আরো বড়ো জায়গা উর্দু-আধিপত্য ও পশ্চিম-পাকিস্তানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। ফলে লড়াকু একটা মনোভাব এই সেদিনও ছিল সেই মধ্যবিত্তের মধ্যে, আজও তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মধ্যবিত্তের অবসাদের সঙ্গে মিশেছে ভারতীয়ত্বের মধ্যে পরিপূরক সম্পর্ক স্থাপনের সংগত দায়বোধ—তাতে ভারতীয়তা কতখানি অর্জিত হয়েছে জানি না, কিন্তু বাঙালিত্ব ফিকে হয়েছে অনেকটাই। হয়তো এই দুইয়ের সংযোগের প্রক্রিয়াটা জটিল বলেই অনেকসময় লাভ হয়নি কোনোদিকেই। কিন্তু এছাড়া অন্য উপায়ও তো নেই। সঠিক আত্মসচেতনতায় হয়তো সম্ভব ছিল সমন্বয়ের এবং সেটা উচ্চতর স্তরে মুক্তিও সুনিশ্চিত, যা নিছক বাঙালিয়ানায় মেলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঠিক পথের আত্মসচেতনতা এবং তা থেকে জটিল সমন্বয় অর্জনের জন্য ভারতীয় বাঙালির অপেক্ষা এখনো শেষ হয়নি। এবং সেদিক থেকেই বাংলাদেশের বাঙালির বাংলা-চর্চার ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা এবং আংশিক সাফল্য এ বঙ্গের বাঙালিকে উৎসুক ও শ্রদ্ধান্বিত করে রাখবে, প্রেরণা জোগাবে—হিশেব করতে পারা যাবে নিজের ভারতীয়ত্বের কাঠামোর মধ্যে বাঙালিয়ানার ওই ঐকান্তিক চর্চা থেকে কতখানি কীভাবে গ্রহণ করা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির কাছে এই প্রতিবাদের চেয়ে, লড়াইয়ের চেয়ে সমন্বয়-প্রচেষ্টার চাপটাই বোধহয় বড়ো দীর্ঘকাল ধরে।

পক্ষান্তরে, অখণ্ড ভারতের সময় থেকেই এবং পরে পূর্বপাকিস্তানের ও আরো পরে বাংলাদেশের পর্বে মুসলমান মধ্যবিত্ত সাবালক হয়েছে বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে—প্রথমে ইংরেজের 'পক্ষপাতে'র বিরুদ্ধে পরে হিন্দু-আধিপত্যের বিরুদ্ধে এবং আরো পরে পশ্চিমি মুসলমানের নগ্ন শোষণের বিরুদ্ধে। দেশভাগের পর দ্বিতীয় জাগরণের কাল থেকে এই প্রতিবাদী সত্তা তাদের যে-স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে—৫২-র ভাষা-আন্দোলন

থেকে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যা বারবার মুখর হয়েছে—একাত্তরের স্বাধীনতার পরে বেশ অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এলেও, তা একভাবে অটুট থাকেই, মৌলবাদের মুহুর্মুহু পুনরুত্থানেও। এই উত্তরাধিকারেই বাংলাদেশের বাঙালির অন্তরে প্রচণ্ড আবেগ—যা তাদের আচার-আচরণে শুধু নয়, তাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, এমনকী শিল্পসাহিত্যের প্রকরণেও প্রতিফলিত।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশের বাঙালি প্রসঙ্গে মুসলমানদের কথাই বলছি কেন শুধু? পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুদের, আর বাংলাদেশ মুসলমানদের? বেদানাদায়ক হলেও সত্য এই, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের মধ্যবিত্ততা অর্জনের গতি এত ধীর যে এখানে মুসলমানের প্রগতি কখনোই একটা সচেতন প্রক্রিয়া হয়ে উঠতে পারে না। আর পূর্বপাকিস্তানে বা বাংলাদেশে, সেই দেশভাগের পর থেকে, হিন্দুদের অবিরল দেশত্যাগ এবং ঐস্লামিক কাঠামোর অনড়তা হিন্দু-অস্তিত্বকে এতই দুর্বল করে রেখেছে যে, সে-দেশকে শেষপর্যন্ত মূলত মুসলমানদের দেশ বলেই ধরে নিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমানদের দেশত্যাগ হয়তো সেই মাত্রায় ঘটেনি, কিন্তু মুসলমানদের অনুন্নতি, আড়ালে পড়ে থাকা, সংখ্যালঘুত্বের নিঃসঙ্গতা ঘোচেনি, মনে হয় বেড়েই গেছে। ফলে, পশ্চিমবঙ্গও শেষপর্যন্ত যেন অনেকটাই হিন্দু বাঙালিরই দেশ। এ নিয়ে অন্য দিক থেকে ভুল বোঝাবুঝির যে-সম্ভাবনাটুকু আছে সে-সম্পর্কে অবশ্য সতর্ক থাকা দরকার। ভারতের অন্তর্গত একটি রাজ্য হিশেবে পশ্চিমবঙ্গে, সমস্ত ছিদ্র সত্ত্বেও, ধর্মনিরপেক্ষতার যে-ঐতিহ্য ও প্রয়োগ, তার সঙ্গে দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানের বা বাংলাদেশের বাস্তবতা, মুজিবুর রহমানের চার বছর বাদ দিলে, কখনোই তুলনীয় নয়। তবু, একথা মেনে নিতেই হয়, ভিন্ন মাত্রায় হলেও দুই দেশেই আছে সংখ্যালঘু অস্তিত্বের বেদনা এবং সংখ্যালঘুর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সৃজনশীলতার কষ্টকর লড়াই। অন্তত বাংলাদেশে তো হিন্দুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলির অন্তর্ধান নিয়ে সেখানকার অনুভূতিপ্রবণ মানুষের হাহাকার আছে। কবিসাহিত্যিকদের শুধু নয়, রাজনীতির মানুষের মনেও। মওলানা ভাসানী নাকি বলতেন, এখন যে গ্রামে কীর্তনের খোলের আওয়াজ শোনা যায় না বাংলাদেশে, অন্তত আগের মতো, তাতে তাঁর মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। আমার কবিবন্ধু মোহাম্মদ রফিক একদা চিঠিতে লিখেছিলেন, সন্ধেবেলায় বাংলাদেশের গ্রাম থেকে আর আজানের ধ্বনির সঙ্গে-সঙ্গে শঙ্খের আওয়াজ শুনি না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে! এঁরা কোনো ধর্মীয় প্রেরণা থেকে এ-কথা বলেছেন তা তো নয়—হিন্দুমুসলমানের সহাবস্থানে সংস্কৃতির যে-বহুমাত্রিকতা একদা সত্য ছিল, তা হারিয়ে দেশ যে নিঃস্বতার দিকে ছুটেছে, তা নিয়েই তাঁদের খেদ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ঘটনা বোধহয় এটাই—নবীন মধ্যবিত্ত মুসলমান এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতর মধ্যবিত্ত হিন্দু পরস্পরকে চেনার জন্য হাত বাড়িয়েছে—যতই তা সীমিত ও ছোটো পরিধিতে হোক। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে, জীবনের নিচু স্তরে যা-ই থাকুক, সেই চেনাপরিচয় যে ঘটেনি, তার কারণ মধ্যবিত্ত-বিকাশের এই সংকট—তার জন্য যতই খেদ করি আমরা, সেটাই অনিবার্য। মধ্যবিত্ত শুধু মধ্যবিত্তকেই চেনে, জানে, হাত বাড়ায়, কাছে পৌঁছোয়।

এর পরের প্রশ্ন তাই, মধ্যবিত্তই বা কেন শুধু? প্রকৃতই দরিদ্র যারা, তাদের 'বাঙালি' পরিচয় কেন, কোনো পরিচয়ই নেই। যে-আত্মসচেতনতা বাঙালি-পরিচয়কে অর্থবহ করে তোলে তা মধ্যবিত্তের আত্মবোধের মধ্যেই ভাষা পায়। তা ছাড়া, বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের অনন্যতা এখানেই যে তাদের মধ্যে, বিলম্বিত জাগরণের ফলেই নিশ্চয়, গ্রামীণ সংযোগ—ভাবনা ও আচরণের গ্রামীণ সংস্কৃতি—এখনো লোপ পায়নি, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের তুলনায়। ঢাকা কখনোই নিরাবেগ নির্মনন মেট্রোপলিস নয়, অভিযুক্ত কলকাতার মতো। হয়তো অনেক কিছুই বদলে যাচ্ছে, সেদিকেই ছুটে চলেছে সময়—কিন্তু গ্রাম ও নগরের বিচ্ছেদের সূত্রপাত যদি হয়েও থাকে, তা এখনো অতিকায় হয়ে ওঠেনি। আর এই গ্রামীণতায় কোনো এক মাত্রার সজীবতা অটুট থেকেছে পূর্ববঙ্গের বাঙালির অস্তিত্বে—যা প্রকাশ পায় কথায়বার্তায়, আচরণে বা ভাবনায়। একটা ভালো উদাহরণ তাদের সাগ্রহ আতিথেয়তা। অবশ্য এই প্রাণোচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের আরো নানা সূত্রেই—তা সে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চার বিশিষ্ট ধরণেরই হোক বা তাদের শক্তিশালী থিয়েটার-চর্চার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যেই।

দুই বাংলার বাঙালির পারস্পরিক আগ্রহের কথা নানাভাবেই ওঠে। যাঁরা ওখান থেকে আসেন, তাঁদের মনের কথা তাঁরাই বলতে পারবেন। কিন্তু আমরা ভেবে দেখার চেষ্টা করতে পারি, এখান থেকে যাঁরা ওখানে যান তাঁদের প্রত্যাশা ও প্রতিক্রিয়ার কথা।

পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা উদ্বাস্তু বা দেশছাড়া বাঙালি জন্মভূমির জন্য টান অনুভব করতেই পারেন। তাঁদের কথা তো আগেই হয়েছে। এরকম অভিজ্ঞতা নেই এমন নিখাদ পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালিও স্বল্প সময়ের জন্য বাংলাদেশে গিয়ে, প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে, বাংলাদেশ সম্পর্কে আসক্ত হয়ে পড়েন, তাও আমরা বারবার ঘটতে দেখেছি। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বুঝতে পারি, ভৌগোলিক বিস্ময়ের কারণটা এখন আর তত বড়ো হয়ে উঠছে না, বস্তুত বহুদিক থেকেই ওই ভূখণ্ডের পরিবেশ-মানুষ অভিন্ন—

কিন্তু যেটা বাংলাদেশের অতিথিকে অবাক করে, তা হল : অল্প সময়ের মধ্যেই যে-প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, যে-মনোযোগ, যে-আপ্যায়ন তাঁরা ওখানকার বাঙালির কাছে পেয়ে যান তা তাঁদের কাছে একেবারেই নতুন অভিজ্ঞতা। এবং তার মধ্যে জড়িয়ে থাকে বাঙালি হিশেবেই একাত্মতা, সহমর্মিতা, প্রাসঙ্গিক অনুভবের বিনিময়। পূর্বপরিচিতির সূত্রে তার হয়তো তর-তম আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষত কলকাতার মানুষ সম্পর্কে আগ্রহটা চিনতে ভুল হয় না। কারণ কি এই, অবচেতনে থাকে এই বোধ: আধুনিক বাঙালির কৃতির আদি কীর্তিস্থান যে কলকাতা শহর তারই প্রতিনিধি এমনকী এই 'অযোগ্য' ব্যক্তিটিও? অথবা, এটা তাঁদের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত—মানুষ সম্পর্কে, প্রতিবেশী সম্পর্কে, সহধর্মী সম্পর্কে আন্তরিক আচরণ—যা আমরা এখানে হারিয়ে ফেলেছি, যা ওখানে নাগরিক চতুরতার চাপে এখনো নিষ্পিষ্ট হয়ে যায়নি। বৃহত্তর সমৃদ্ধতর দেশের মানুষ সম্পর্কে হীনম্মন্যতার বোধ এই বলে যাঁরা ব্যাখ্যা দেন, তা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ : অতিথি বারবার আবিষ্কার করেন, নিজেদের মধ্যে ব্যবহারেও তাঁরা কীভাবে মনোযোগী ও সমুৎসুক! সেই আগন্তুকের সঙ্গেই দল বেঁধে যখন কোনো বাড়িতে সে-দেশের বন্ধুরা যান, তখন, মধ্যাহ্ন বা নৈশ ভোজনের সময় চলে এলে, সবাই মিলে চকিত আহ্বানেই একসঙ্গে মাটিতে চাদর পেতে (এখন অবশ্য টেবিল-চেয়ারেও) খেতে বসে যান। গৃহকর্তা বা আগন্তুক কারোর মধ্যেই দ্বিধা থাকে না—যেন এটাই স্বাভাবিক ও সংগত। বাংলাদেশে ইসলামি আচরণের যে পরিবেশের বা প্রভাবের কথা উঠেছিল, তার রীতিনীতি থেকেই এই সুন্দর সভ্য এবং আন্তরিক আচরণবিধি গড়ে ওঠেনি, তা-ই বা কে বলবে? এটি একটি উদাহরণ মাত্র। শুধু পুরোনো প্রবীণ বন্ধুদের মধ্যেই নয়, যুবক বা তরুণদের মধ্যেও পারস্পরিক নির্ভরতা বা সহৃদয়তার যে-ঘটনা মুহূর্তে-মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের অতিথির চোখের সামনে ঘটে আজও, তার অভাব যেন তাঁরা টের পান নিজেদের পরিবেশে।

হয়তো আমরা আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতাকেই বড়ো করে বলছি। হয়তো উলটো ঘটনা বা পরিস্থিতিও অনেক। বাংলাদেশে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বা আচরণের একটাই প্রকার, একথা নিশ্চয় বলা চলে না। তবু, বাংলাদেশে পা দিয়েই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে, বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে সহস্র মিল ও মূলগত অখণ্ডতার মধ্যেও, অচেনার একটা অনুভব ঘটে যে-সব কারণে, তার মধ্যে মানুষের স্বভাবপ্রকৃতির এই যে একটা গড় প্রচলন টের পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই তার ভিত্তি আছে। অভিজ্ঞতার চেয়ে বড়ো প্রামাণিক আর কী হতে পারে? সেটা ক্রমশই ক্ষয় পাচ্ছে কিনা, কিংবা কতদিন তা টিকে থাকবে, তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। বস্তুত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা সম্ভবত একই পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছি, ব্যবধান ক্রমশই কমে

আসছে—কিন্তু এখনও যে পার্থক্যটা চেনা যাচ্ছে সেই আবিষ্কারই হয়তো বলে দেবে, তাকে টিকিয়ে রাখার দরকার আছে কিনা। শুধু মুগ্ধতা নয়, তাকে গ্রহণ করে, তার সঙ্গে বিনিময় ঘটিয়েই বাঙালিত্বের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি ঘটাতে চাইবেন কিনা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিও।

বোধহয় টিকিয়ে রাখতে, আত্মস্থ করতেই চান। নইলে কেন পশ্চিমবঙ্গের মনীষীদের মধ্যে কারো-কারো কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পায় বাংলাদেশের বাঙালি সম্পর্কে সেই অকুণ্ঠ তারিফ, যা অতিশয়োক্তিতে ঝুঁকে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির সংকট ও অধঃপতনের বিষয়টি এখন প্রায় লবজো। এই নিরুদ্যম স্থবিরতা ও আদর্শহীনতার পরিবেশে থাকতে-থাকতেই বোধহয় এখানকার কোনো-কোনো প্রবীণ লেখক শেষপর্যন্ত ভবিষ্যতের আশাভরসার বা বাঙালি-সত্তার স্থায়িত্বের অবলম্বন খুঁজে পান বাংলাদেশের এই মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যেই। অনেকসময় বলেই ফেলেন, বাঙালি-পরিচয়টা টিকে থাকবে শুধু ওখানেই! এই মরিয়া আশাবাদে ওই প্রবীণদের অসহায়তা বা নিরুপায়তাটা টের পাওয়া যায়, কিন্তু বোধহয় তাঁদের অতিরঞ্জনে বাস্তবের প্রতি সুবিচার থাকে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মধ্যে যে-নেতির লক্ষণগুলো সঠিকভাবেই শনাক্ত করা হয়, সেগুলো যে কালক্রমে বাংলাদেশের বাঙালিকেও গ্রাস করছে, তা ওঁদের স্বীকারোক্তি থেকেই শুধু জানা যায় না, বারবার বাংলাদেশে গিয়েও পরিবর্তনটা লক্ষ করতে হয়। তাই যে বাংলা-চর্চা বা বাঙালিয়ানার উদ্বোধন আমাদের উজ্জীবিত করত, তার জায়গায় ক্রমশই নজরে পড়ে—কথায়বার্তায় ইংরেজি বুলি বা কেতার অভ্যাস, সাহেবি স্কুলে পড়ানোর মোহ, সাইনবোর্ডেও ইংরেজি হরফের অনুপ্রবেশ ওখানেও কীভাবে বাড়ছে। শুধু এরকম টুকরো দৃষ্টান্তেই নয়, সামগ্রিকভাবেই হয়তো শূন্যগর্ভ চালিয়াতি ও কৃত্রিম আত্মপ্রদর্শনের চর্চায় অচিরে তারাও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইবে। এবং তাতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। কারণ যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে দো-আঁশলা অস্তিত্বের এই পরিণতি, সেই পটভূমি তো বাংলাদেশেও ক্রমশ সত্য হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের সুলভ সুবিধাগুলো তাদের হাতের মুঠোয় পৌঁছে যাচ্ছে আরো অনায়াসে।

অবশ্য বাংলাদেশের বাঙালি তাঁদের গ্রামীণ সারল্যে ও অপরিণতিতেই আটকে থাকবেন এটাও নিশ্চয়ই কাম্য নয়। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বৈদগ্ধ্যের নামে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মতো উঁচকপালে কিন্তু অন্তঃসারশূন্য, যদিও লোভনীয়, জগতের অধিবাসী হয়ে উঠবেন, তাও কি চাই আমরা? বরং, অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বয়স্কের অকারণ জটিলতার চোরাগলি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন বাংলাদেশের বাঙালির ওই অপেক্ষাকৃত নবীন সহজের দিকে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিয়ানার সবটাই বৈদগ্ধ্য ও

বাংলাদেশের বাঙালিয়ানার সবটাই কাঁচা, এই ভুল বিভাজন অগ্রাহ্য করেই বলা যায় : স্বাধীনভাবে সেই সমন্বয়ই আজ দুই বাংলার বাঙালিরই অভিপ্রেত হওয়া উচিত যাতে উভয় বঙ্গেই নাগরিক বিচক্ষণতার সঙ্গে মিলতে পারে গ্রামীণ সজীবতা—'বয়স্ক মননে' 'শিশুর নিশ্চিতি'।

দুই দেশের বাঙালির এই স্বাতন্ত্র্যের কথা উঠলেই কারো-কারো মনে হয়, বাঙালির অখণ্ডতার ব্যাপারটা উপেক্ষা করা হচ্ছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে : আমরা কি দুই বাংলার মিলটাকে অস্বীকার করতে চাইছি, অমিলটাকেই বড়ো করে দেখছি? দুই বাংলার বাঙালির বা তাঁদের কৃতির পৃথক বৈশিষ্ট্যের কোনো আলোচনাতেই এই প্রশ্নকারীদের বোধহয় সায় থাকে না। দুই বাংলার মানসিক বা সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রসঙ্গে কোনোরকম পার্থক্যের প্রসঙ্গ উঠলেই তাঁদের মনে হয় যেন দ্বিজাতিতত্ত্বের দিকেই ঝোঁক। তফাতের কথা যাঁরা জোর দিয়ে বেশি করে বলেন, তাঁদের ভুলের মতোই, এও আরেক ভুল। দেশভাগের আগেও তো নদীনালার দেশ পূর্ববঙ্গের একটা স্বতন্ত্রতা ছিল। ভৌগোলিক কারণে, মুসলমান-সংখ্যাধিক্যের কারণে, আরো নানা কারণেই। দেশভাগের পর রাষ্ট্রীয় ব্যবধানে সেই স্বাতন্ত্র্যের কারণগুলো ক্রমশ বেড়েই গেল। এই ব্যবধানের কিছু-কিছু অনিবার্য, আবার কিছু-কিছু বানিয়ে-তোলা এবং অনভিপ্রেত। যেমন একদা বাঙালি-সত্তার চেয়ে মুসলমান-সত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে স্বভাবের বিরুদ্ধতা করার চেষ্টা। হিন্দুদের মনোভঙ্গি ও ব্যবহার তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে। ফলে মৌলিক অখণ্ডতার বদলে অনৈক্য, বিচ্ছেদ, বিদ্বেষ পাকানো হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। পিছিয়ে থাকার বাস্তবে ও মনস্তত্ত্বে মুসলমানেরা ভর করেছে ওই জাতিগত ভিন্নতার তত্ত্বে এবং নিজস্ব স্বতন্ত্র দেশ হিশেবে দাবি করেছে পাকিস্তান। ভেবেছে এতেই তাঁদের মুক্তি। কিন্তু আমরা জানি, সেই মোহ ভাঙতে দেরি হয়নি। প্রথম মুসলিম জাগরণের সূত্রপাত ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ধরা হয় বটে, এবং সীমিতভাবে সত্যও তা, কিন্তু তা প্রথম একটা নিশ্চিত অবয়ব পেল দেশভাগের পর—তাকে যদি বলি দ্বিতীয় জাগরণ, তখনই। ভুল তত্ত্বের আশ্রয়ে নিজের জায়গা পেয়ে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তত্ত্বের ভ্রান্তি বুঝতে পেরে যে-সৃষ্টির বাস্তবে ও আত্মসচেতনতায় পৌঁছোলেন বাঙালি মুসলমান, সেটাই তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি। হয়তো দরকার ছিল গোটা প্রক্রিয়াটিরই। পাকিস্তান অর্জনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা গিয়েছিল বঞ্চনাবোধের প্রাথমিক স্তর, কিন্তু তারপরই মুখোমুখি হতে হল আসল সমস্যার। দেশভাগের পর মুসলমানদের নিজস্ব ভূখণ্ডের অধিকার অর্জনের মধ্যেই পরের স্তরের সচেতনতা অর্জিত হল—ঘটতে পারল বিরাট এক অংশের মধ্যে ধর্মান্ধতার

লোপ, মাতৃভাষার জন্য আকুতি, ভাষার অধিকারের দাবি থেকে রাষ্ট্রীয় অধিকার পাওয়ার লড়াই। এর কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয়নি সীমান্তের এপারে। তুলনায় আমরা নিশ্চিন্ত থেকেছি ভারতীয়তায়—হারিয়েছি ক্রমশই বাঙালি-পরিচয়ের উত্তাপ।

বিকাশের এই স্বতন্ত্র ইতিহাসের কথা বলা মানে এই দুই দেশের বাঙালির মূলগত ঐক্যটাকে অস্বীকার করা নয়। অস্বীকারের চেষ্টা অবশ্যই হয়। কিন্তু, আজও ঐক্যের সত্যকে উচ্চারণ করা যিনি জরুরি মনে করবেন, তাঁরও ভুললে চলবে না উভয়ের বৈচিত্র্য বা স্বাতন্ত্র্যকে। বৈচিত্র্যকে বাদ দিয়ে যে-ঐক্য তার বিপত্তি কী তা আমরা ইতিহাসে দেখেছি। বৈচিত্র্য শুধু রাষ্ট্রনৈতিক ভিন্নতা থেকেই আসে না, মানসিক দিক থেকেও আসে। তার বহিঃপ্রকাশ ব্যক্তির উচ্চারণে, সামাজিক আচরণে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গড়নে ও ধরণে। এবং সেই সমস্ত বৈচিত্র্য—মিল ও অমিলের সমন্বয়—বরং পৌঁছে দেয় বাঙালি-পরিচয়ের ঐক্যে ও সম্পূর্ণতায়। বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রশ্নটি একেবারেই অবাস্তব ও অবান্তর। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয়ভাবে এক হলেই কি মনের ঐক্য অর্জিত হয়? একই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে মনের অমিল, অথচ ভিন্ন-ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেও মনের মিল কি নিয়ত আমরা দেখিনি দেশবিদেশের অভিজ্ঞতায়?

পার্থক্যের এই আলোচনায় তাই দুই দেশের মানুষের ভেতরকার গভীর মিলকে এবং আরো মানসিক ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হল তা নয়। বরং, এটাই বলবার, একবগ্‌গা ভাবাবেগ এড়িয়ে বৈচিত্র্যের বাস্তবের ওপর দাঁড়িয়ে সত্যিকারের মিলনে পৌঁছোনোটাই স্থায়ী হতে পারবে এই আলোচনায়। পশ্চিমবঙ্গের যে-বাঙালি বাংলাদেশের বাঙালির প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন, আমরা তো দেখেছি, তা এই মিলের মধ্যে অমিলের এবং অমিলের মধ্যে মিলের আবিষ্কারেই। ওপার বাংলাতেও যে একই বাঙালি বাস করেন সেই অনুভবের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁদের স্বভাবের ভিন্ন মাত্রা, আচার-আচরণের ভিন্ন ধরণ এপারের বাঙালিকে নিবিড়ভাবে টানে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরও তো আছে তাঁদের গড়ে-ওঠার, পরিণতি অর্জনের ভিন্ন ইতিহাস। বাঙালি হিশেবে নিজেদের সেই ইতিহাস ও গড়ন নিয়েই তাঁরা যান অন্য ইতিহাস ও গড়নের কাছে। এর ফলে বাঙালি-পরিচয়ের বৈচিত্র্য ও বিস্তারের সম্ভাবনা বাড়ে। 'দুই বাঙালি' এবং 'এক বাঙালি' যে আসলে কোনো বিরোধী উচ্চারণ নয় তা স্পষ্ট হয়।